প্রকাশক : শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস
জেনারেল প্রিন্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন, ১৩৬৭

শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস, ১৮৬/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড [illegible] কাতা-৪
হইতে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

বাংলা দেশের ইতিহাস

[মধ্যযুগ]

লেখকবৃন্দ :

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম্-এ, পিএইচ্-ডি

ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি-লিট

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, এম-এ

ডঃ অমরনাথ লাহিড়ী, এম্-এ, পিএইচ্-ডি

চিত্র-সূচি

২৭। কালাচাঁদ মন্দির (বিষ্ণুপুর)
২৮। রাধাশ্যামের মন্দির (বিষ্ণুপুর)
২৯। রাধাবিনোদ মন্দির (বিষ্ণুপুর)
৩০। নন্দদুলালের মন্দির (বিষ্ণুপুর)
৩১। মদনমোহন মন্দির (বিষ্ণুপুর)
৩২। মুরলীমোহন মন্দির (বিষ্ণুপুর)
৩৩। জোড়া মন্দির (বিষ্ণুপুর)
৩৪। রাধামাধবের মন্দির (বিষ্ণুপুর)
৩৫। শ্যামরায়ের মন্দির (বিষ্ণুপুর)
৩৬। গোকুলচাঁদের মন্দির
৩৭। মল্লেশ্বরের মন্দির (বিষ্ণুপুর)
৩৮। রাসমঞ্চ (বিষ্ণুপুর)
৩৯। ইষ্টকনির্মিত রথ (রাধাগোবিন্দ মন্দির, বিষ্ণুপুর)
৪০। দুর্গ তোরণ (বিষ্ণুপুর)
৪১। রামচন্দ্রের মন্দির (গুপ্তিপাড়া)
৪২। রামচন্দ্রের মন্দির (গুপ্তিপাড়া)—বাহিরের কারুকার্য
৪৩। বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির (গুপ্তিপাড়া)
৪৪। কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির (গুপ্তিপাড়া)
৪৫। আনন্দভৈরবের মন্দির (সোমড়া সুখড়িয়া)
৪৫ ক। সোমড়া সুখড়িয়ার আনন্দভৈরবীর মন্দিরের ভাস্কর্য
৪৬। কান্তনগরের মন্দির (দিনাজপুর)
৪৭। রেখ দেউল (বান্দা)
৪৮। ১ ও ২নং বেগুনিয়ার মন্দির (বরাকর)
৪৯ ক। শিকার দৃশ্য—জোড়াবাংলার মন্দির (বিষ্ণুপুর)
৪৯ খ। টিয়াপাখী—শ্রীধর মন্দির
৪৯ গ। হংসলতা—মদনমোহন মন্দির (বিষ্ণুপুর)
৫০ ক। রাসলীলা (বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দিরের ভাস্কর্য)
৫০ খ। নৌকাবিলাস—(বাঁকুড়ার মন্দিরের ভাস্কর্য)
৫১। বাঁকুড়ার বিভিন্ন মন্দিরের পোড়ামাটির অলঙ্কার

ভূমিকা

মালদহ-নিবাসী রজনীকান্ত চক্রবর্তী সর্বপ্রথমে বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা করেন। কিন্তু তৎপ্রণীত 'গৌড়ের ইতিহাস' সেকালে খুব মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইলেও ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাস বলিয়া গণ্য করা যায় না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও ১৩২৪ সনে প্রকাশিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস—দ্বিতীয় ভাগ' এই শ্রেণীর প্রথম গ্রন্থ। ইহার ৩১ বৎসর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ইংরেজী ভাষায় মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস প্রবীণ ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় (History of Bengal, Volume II, 1948)। কিন্তু এই দুইখানি গ্রন্থেই কেবল রাজনীতিক ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। রাখালদাসের গ্রন্থে "চৈতন্যদেব ও গৌড়ীয় সাহিত্য" নামে একটি পরিচ্ছেদ আছে, কিন্তু অন্যান্য সকল পরিচ্ছেদেই কেবল রাজনীতিক ইতিহাসই আলোচিত হইয়াছে। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ)' নামে একটি ইতিহাসগ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থখানিও প্রধানত রাজনীতিক ইতিহাস।

একুশ বৎসর পূর্বে মৎসম্পাদিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ইংরেজী ভাষায় লিখিত বাংলার ইতিহাস—প্রথমভাগ (History of Bengal, Vol. I, 1943) অবলম্বনে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে 'বাংলাদেশের ইতিহাস' লিখিয়াছিলাম। ইংরেজী বইয়ের অনুকরণে এই বাংলা গ্রন্থেও রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক উভয়বিধ ইতিহাসের আলোচনা ছিল। এই গ্রন্থের এ যাবৎ চারিটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা এই শ্রেণীর ইতিহাসের জনপ্রিয়তা ও প্রয়োজনীয়তা সূচিত করে—এই ধারণার বশবর্তী হইয়া আমার পরম স্নেহাস্পদ ভূতপূর্ব ছাত্র এবং পূর্বোক্ত 'বাংলাদেশের ইতিহাসের' প্রকাশক শ্রীমান সুরেশচন্দ্র দাস, এম. এ. আমাকে একখানি পূর্ণাঙ্গ মধ্যযুগের বাংলাদেশের ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করে। কিন্তু এই গ্রন্থ লেখা অধিকতর দুরূহ মনে করিয়া আমি নিবৃত্ত হই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত বাংলার ইতিহাস—প্রথম ভাগে রাজনীতিক ও সামাজিক ইতিহাস উভয়ই আলোচিত

হইয়াছিল—সুতরাং মোটামুটি ঐতিহাসিক উপকরণগুলি সকলই সহজলভ্য ছিল। কিন্তু মধ্যযুগের রাজনীতিক ইতিহাস থাকিলেও সাংস্কৃতিক ইতিহাস এ যাবৎ লিখিত হয় নাই। অতএব তাহা আগাগোড়াই নূতন করিয়া অনুশীলন করিতে হইবে। আমার পক্ষে বৃদ্ধ বয়সে এইরূপ শ্রমসাধ্য কার্যে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলাম। কিন্তু শ্রীমান সুরেশের নির্বন্ধাতিশয্যে এবং দুইজন সহযোগী সাগ্রহে আংশিক দায়িত্বভার গ্রহণ করায় আমি এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। একজন আমার ভূতপূর্ব ছাত্র অধ্যাপক ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আর একজন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়। ইঁহাদের সহায়তার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বর্তমানকালে বাংলাদেশের—তথা ভারতের মধ্যযুগের সংস্কৃতি বা সমাজের ইতিহাস লেখা খুবই কঠিন। কারণ এ বিষয়ে নানা প্রকার বদ্ধমূল ধারণা ও সংস্কারের প্রভাবে ঐতিহাসিক সত্য উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। এই শতকের গোড়ার দিকে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে যাহাতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করে, সেই উদ্দেশ্যে হিন্দু রাজনীতিকেরা হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় সম্বন্ধে কতকগুলি সম্পূর্ণ নূতন "তথ্য" প্রচার করিয়াছেন। গত ৫০।৬০ বৎসর যাবৎ ইঁহাদের পুনঃ পুনঃ প্রচারের ফলে এ বিষয়ে কতকগুলি বাঁধা গৎ বা বুলি অনেকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা গুরুতর—অথচ ঐতিহাসিক সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত—৩৩৪-৩৫০ পৃষ্ঠায় তাহার আলোচনা করিয়াছি। ইহার সারমর্ম এই যে ভারতের প্রাচীন হিন্দু-সংস্কৃতি লোপ পাইয়াছে এবং মধ্যযুগে মুসলিম সংস্কৃতির সহিত সমন্বয়ের ফলে এমন এক সম্পূর্ণ নূতন সংস্কৃতির আবির্ভাব হইয়াছে, যাহা হিন্দুও নহে মুসলমানও নহে। মুসলমানেরা অবশ্য ইহা স্বীকার করেন না এবং ইসলামীয় সংস্কৃতির ভিত্তির উপরই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত, ইহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতে 'হিন্দু-সংস্কৃতি' এই কথাটি এবং ইহার অন্তর্নিহিত ভাবটি উল্লেখ করিলেই তাহা সংকীর্ণ অনুদার সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করা হয়। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা এই মতের সমর্থন করে কিনা তাহার কোনরূপ আলোচনা না করিয়াই কেবল মাত্র বর্তমান রাজনীতিক তাগিদে এই সব বুলি বা বাঁধা গৎ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। একজন সর্বজনমান্য রাজনৈতিক নেতা বলিয়াছেন যে অ্যাংলো-স্যাকসন, জুট, ডেন ও নর্মান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির

মিলনে যেমন ইংরেজ জাতির উদ্ভব হইয়াছে, ঠিক সেইরূপে হিন্দু-মুসলমান একেবারে মিলিয়া (coalesced) একটি ভারতীয় জাতি গঠন করিয়াছে। আদর্শ হিসাবে ইহা যে সম্পূর্ণ কাম্য, তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহা কতদূর ঐতিহাসিক সত্য, তাহা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই জন্যই এই প্রসঙ্গটি এই গ্রন্থে আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ঐতিহাসিক প্রণালীতে বিচারের ফলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা অনেকেই হয়ত গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু "বাদে বাদে জায়তে তত্ত্ববোধঃ" এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া আমি যাহা প্রকৃত সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে ৫১ বৎসর পূর্বে আচার্য যদুনাথ সরকার বর্ধমান সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস-শাখার সভাপতির ভাষণে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:

"সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হউক, তাহা ভাবিব না। আমার স্বদেশগৌরবকে আঘাত করুক আর না করুক, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিব না। সত্য প্রচার করিবার জন্য, সমাজের বা বন্ধুবর্গের মধ্যে উপহাস ও গঞ্জনা সহিতে হয়, সহিব। কিন্তু তবুও সত্যকে খুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব। ইহাই ঐতিহাসিকের প্রতিজ্ঞা"।

এই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতির সমন্বয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি (৩৩৪-৩৫০ পৃষ্ঠা), তাহা অনেকেরই মনঃপূত হইবে না ইহা জানি। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ইহার ঐতিহাসিক সত্য স্বীকার করেন, তাঁহারাও বলিবেন যে এরূপ সত্য প্রচারে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও জাতীয় একীকরণের (National integration) বাধা জন্মিবে। একথা আমি মানি না। মধ্যযুগের ইতিহাস বিকৃত করিয়া কল্পিত হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃভাব ও উভয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের কথা প্রচার করিয়া বেড়াইলেই ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। সত্যের দৃঢ় প্রস্তরময় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা না করিয়া কাল্পনিক মনোহর কাহিনীর বালুকার স্তূপের উপর এইরূপ মিলন-সৌধ প্রস্তুত করিবার প্রয়াস যে কিরূপ ব্যর্থ হয় পাকিস্তান তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি—রাজনৈতিক দলের বাহিরে অনেকেই তাহার সমর্থন করেন—কিন্তু প্রকাশ্যে বলিতে সাহস করেন না। তবে সম্প্রতি ইহার একটি ব্যতিক্রম দেখিয়া সুখী হইয়াছি। এই গ্রন্থের যে অংশে হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতির সমন্বয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি তাহা

মুদ্রিত হইবার পরে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি প্রবন্ধ পড়িলাম। 'বড়বাবু' নামক গ্রন্থে চারি মাস পূর্বে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই যে কিরূপ নিষ্ঠার সহিত পরস্পরের সংস্কৃতির সহিত কোনওরূপ পরিচয় স্থাপন করিতে বিমুখ ছিল, আলী সাহেব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গপ্রধান সরস রচনায় তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:

"ষড়দর্শননির্মাতা আর্য মনীষীগণের ঐতিহ্যগর্বিত পুত্রপৌত্রেরা মুসলমান-আগমনের পর সাত শত বৎসর ধরে আপন আপন চতুষ্পাঠীতে দর্শনচর্চা করলেন, কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামের মাদ্রাসায় ঐ সাত শত বৎসর ধরে যে আরবীতে প্লাতো থেকে আরম্ভ করে নিওপ্লাতনিজম্ তথা কিন্দী, ফারাবী, বূআলীসিনা (লাতিনে আভিসেনা), অল-গজ্জালী (লাতিনে অল-গাজেল), আবূরুশ্‌দ্ (লাতিনে আভেরস্) ইত্যাদি মনীষীগণের দর্শনচর্চা হল তার কোনো সন্ধান পেলেন না। এবং মুসলমান মৌলানারাও কম গাফিলী করলেন না। যে মৌলানা অমুসলমান প্লাতো আরিস্ততলের দর্শনচর্চায় সোৎসাহে সানন্দে জীবন কাটালেন তিনি এক বারের তরেও সন্ধান করলেন না, পাশের চতুষ্পাঠীতে কিসের চর্চা হচ্ছে। ...এবং সবচেয়ে পরমাশ্চর্য, তিনি যে চরক সুশ্রুতের আরবী অনুবাদে পুষ্ট বূআলী সিনার চিকিৎসাশাস্ত্র...আপন মাদ্রাসায় পড়াচ্ছেন, সুলতান বাদশার চিকিৎসার্থে প্রয়োগ করছেন, সেই চরক-সুশ্রুতের মূল পাশের টোলে পড়ান হচ্ছে তারই সন্ধান তিনি পেলেন না।......পক্ষান্তরে ভারতীয় আয়ুর্বেদ মুসলমানদের ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে বিশেষ কিছু নিয়েছে বলে আমার জানা নেই।.....শ্রীচৈতন্য-দেব নাকি ইসলামের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন......কিন্তু চৈতন্যদেব উভয় ধর্মের শাস্ত্রীয় সম্মেলন করার চেষ্টা করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। বস্তুত তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দুধর্মের সংগঠন ও সংস্কার, এবং তাকে ধ্বংসের পথ থেকে নবযৌবনের পথে নিয়ে যাবার।[১]......মুসলমান যে-জ্ঞান-বিজ্ঞান ধর্মদর্শন সঙ্গে এনেছিলেন, এবং পরবর্তী যুগে বিশেষ করে মোগল আমলে আকবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত মঙ্গোল-জর্জরিত ইরান-তুরান থেকে যেসব সহস্র সহস্র কবি পণ্ডিত ধর্মজ্ঞ দার্শনিক এদেশে এসে মোগল রাজসভায় আপন

১ এই গ্রন্থের ২৮৮ পৃষ্ঠায় আমিও এই মত ব্যক্ত করিয়াছি।

আপন কবিত্ব পাণ্ডিত্য নিঃশেষে উজাড় করে দিলেন তার থেকে এ দেশের হিন্দু ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, দার্শনিকরা কণামাত্র লাভবান্ হন নি।......হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগসূত্র স্থাপিত হয় নি।"

সৈয়দ মুজতবা আলীর এই উক্তি আমি আমার মতের সমর্থক প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করি নাই। কিন্তু একদিকে যেমন রাজনীতির প্রভাবে হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতির মধ্যে একটি কাল্পনিক মিলনক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি একজন মুসলমান সাহিত্যিকের মানসিক অনুভূতি যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করে ইহা দেখানই আমার উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা আমি যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছি, তাহা রাজনীতিক বাঁধা বুলির অপেক্ষা এই সাহিত্যিক অনুভূতিরই বেশি সমর্থন করে। আমার মত যে অভ্রান্ত এ কথা বলি না। কিন্তু প্রচলিত মতই যে সত্য তাহাও স্বীকার করি না। বিষয়টি লইয়া নিরপেক্ষভাবে ঐতিহাসিক প্রণালীতে আলোচনা করা প্রয়োজন—এবং এই গ্রন্থে আমি কেবল-মাত্র তাহাই চেষ্টা করিয়াছি। আচার্য যদুনাথ ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণের যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা অনুসরণ করিয়া চলিলে হয়ত প্রকৃত সত্যের সন্ধান মিলিবে। এই গ্রন্থ যদি সেই বিষয়ে সাহায্য করে তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

এই গ্রন্থের 'শিল্প' অধ্যায় প্রণয়নে শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত 'বাঁকুড়ার মন্দির' হইতে বহু সাহায্য পাইয়াছি। তিনি অনেকগুলি চিত্রের ফটোও দিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টও বহু চিত্রের ফটো দিয়াছেন—ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। স্থানান্তরে কোন্ ফটোগুলি কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত, তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

মধ্যযুগের বাংলায় মুসলমানদের শিল্প সম্বন্ধে ঢাকা হইতে প্রকাশিত এ. এচ্. দানীর গ্রন্থ হইতে বহু সাহায্য পাইয়াছি। এই গ্রন্থে মুসলমানগণের বহুসংখ্যক সৌধের বিস্তৃত বিবরণ ও চিত্র আছে। হিন্দুদের শিল্প সম্বন্ধে এই শ্রেণীর কোন গ্রন্থ নাই—এবং হিন্দু মন্দিরগুলির চিত্র সহজলভ্য নহে। এই কারণে শিল্পের উৎকর্ষ হিসাবে মুসলমান সৌধগুলি অধিকতর মূল্যবান হইলেও হিন্দু মন্দিরের চিত্রগুলি বেশী সংখ্যায় এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে মধ্যযুগের বাংলার সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস ইতিপূর্বে লিখিত

হয় নাই। সুতরাং আশা করি এ বিষয়ে এই প্রথম প্রয়াস বহু দোষত্রুটি সত্ত্বেও পাঠকদের সহানুভূতি লাভ করিবে।

মধ্যযুগের ইতিহাসের আকর-গ্রন্থগুলিতে সাধারণত হিজরী অব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাঠকগণের সুবিধার জন্য এই অব্দগুলির সমকালীন খ্রীষ্টীয় অব্দের তারিখসমূহ পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে।

মধ্যযুগে বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরেও বহুকাল পর্যন্ত কয়েকটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ত্রিপুরা এবং কামতা-কোচবিহার এই দুই রাজ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক কালে এ দুয়েরই আয়তন বেশ বিস্তৃত ছিল। উভয় রাজ্যেই শাসন কার্যে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হইত এবং বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল—হিন্দু ধর্মের প্রাধান্যও অব্যাহত ছিল। ত্রিপুরার রাজকীয় মুদ্রায় বাংলা অক্ষরে রাজা ও রাণী এবং তাঁহাদের ইষ্ট দেবতার নাম লিখিত হইত। মধ্যযুগে হিন্দুর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতীক স্বরূপ বাংলার ইতিহাসে এই দুই রাজ্যের বিশিষ্ট স্থান আছে। এই জন্য পরিশিষ্টে এই দুই রাজ্য সম্বন্ধে পৃথকভাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর অমরনাথ লাহিড়ী কোচবিহারের ও ত্রিপুরার মুদ্রার বিবরণী ও চিত্র সংযোজন করিয়াছেন এজন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

৪নং বিপিন পাল রোড
কলিকাতা ২৬

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

সূচীপত্র

মানচিত্র

মুদ্রা-চিত্র

॥ কৃতজ্ঞতা-স্বীকৃতি ॥

চিত্র-সূচির ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭ ও ৫৮ সংখ্যক চিত্রের ফটো ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সংস্থা (পূর্বাঞ্চল) এবং ২০, ২১, ২২, ২৬, ৩৬, ৪৫, ৪৫ক, ৪৯ক, খ, গ, ৫০ক, খ, ৫১, ৫২ক, খ, ৫৩ ও ৫৯ সংখ্যক চিত্রের ফটো শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলায় মুসলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা

১। ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী

১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া মুহম্মদ ঘোরী সর্বপ্রথম আর্যাবর্তে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার মাত্র কয়েক বৎসর পরে গর্মসীরের অধিবাসী অসমসাহসী ভাগ্যান্বেষী ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী অতর্কিতভাবে পূর্ব ভারতে অভিযান চালাইয়া প্রথমে দক্ষিণ বিহার এবং পরে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের অনেকাংশ জয় করিয়া এই অঞ্চলে প্রথম মুসলিম অধিকার স্থাপন করিলেন। বখতিয়ার প্রথমে "নোদীয়হ্" অর্থাৎ নদীয়া (নবদ্বীপ) এবং পরে "লখনৌতি" অর্থাৎ লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় জয় করেন। মীনহাজ-ই-সিরাজের "তবকাৎ-ই-নাসিরী" গ্রন্থে বখতিয়ারের নবদ্বীপ জয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ঐ বিবরণের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

বখতিয়ারের নবদ্বীপ বিজয় তথা বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা কোন্ বৎসরে হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। মীনহাজ-ই-সিরাজ লিখিয়াছেন যে বিহার দুর্গ অর্থাৎ ওদন্তপুরী বিহার ধ্বংস করার অব্যবহিত পরে বখতিয়ার বদায়ুনে গিয়া কুৎবুদ্দীন আইবকের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে নানা উপঢৌকন দিয়া প্রতিদানে তাঁহার নিকট হইতে খিলাৎ লাভ করেন; কুৎবুদ্দীনের কাছ হইতে ফিরিয়া বখতিয়ার আবার বিহার অভিমুখে অভিযান করেন এবং ইহার পরের বৎসর তিনি "নোদীয়হ্" আক্রমণ করিয়া জয় করেন। কুৎবুদ্দীনের সভাসদ হাসান নিজামীর 'তাজ-উল-মাসির' গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কুৎবুদ্দীন কালিঞ্জর দুর্গ জয় করেন, এবং কালিঞ্জর হইতে তিনি সরাসরি বদায়ুনে চলিয়া আসেন; তাঁহার বদায়ুনে আগমনের পরেই "ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার উদন্দ্-বিহার (অর্থাৎ ওদন্তপুরী বিহার) হইতে তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন" এবং তাঁহাকে কুড়িটি হাতী, নানারকমের রত্ন ও বহু অর্থ উপঢৌকন

স্বরূপ দিলেন। সুতরাং বখতিয়ার ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দের পরের বৎসর অর্থাৎ ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন, এইরূপ ধারণা করাই সঙ্গত।

"নোদীয়হ্" জয়ের পরে মীনহাজ-ই-সিরাজের মতে "নোদীয়হ্" ও "লখনৌতি" জয়ের পরে বখতিয়ার লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বখতিয়ারের জীবদ্দশায় এবং তাঁহার মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বৎসর পর পর্যন্ত বর্তমান দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেবকোট (আধুনিক নাম গঙ্গারামপুর) বাংলার মুসলিম শক্তির প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল।

নদীয়া ও লখনৌতি জয়ের পরে বখতিয়ার একটি রাজ্যের কার্যত স্বাধীন অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে বখতিয়ার বাংলা দেশের অধিকাংশই জয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার নদীয়া ও লক্ষ্মণাবতী বিজয়ের পরেও পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণসেনের অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল, লক্ষ্মণসেন যে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দেও জীবিত ও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পরে তাঁহার বংশধররা এবং দেব বংশের রাজারা পূর্ববঙ্গ শাসন করিয়াছিলেন। ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীনহাজ-ই-সিরাজ তাঁহার 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে তখনও পর্যন্ত লক্ষ্মণসেনের বংশধররা পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দেও মধুসেন নামে একজন রাজার রাজত্ব করার প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দশকের আগে মুসলমানরা পূর্ববঙ্গের কোন অঞ্চল জয় করিতে পারেন নাই। দক্ষিণবঙ্গের কোন অঞ্চলও মুসলমানদের দ্বারা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিজিত হয় নাই। সুতরাং বখতিয়ারকে 'বঙ্গবিজেতা' বলা সঙ্গত হয় না। তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কতকাংশ জয় করিয়া বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের প্রথম সূচনা করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার কীর্তি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুসলিম ঐতিহাসিকরাও বখতিয়ারকে 'বঙ্গবিজেতা' বলেন নাই; তাঁহারা বখতিয়ার ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের অধিকৃত অঞ্চলকে 'লখনৌতি রাজ্য' বলিয়াছেন, 'বাংলা রাজ্য' বলেন নাই।

বখতিয়ারের নদীয়া বিজয় হইতে সুরু করিয়া তাজুদ্দীন অর্সলানের হাতে ইজ্জুদ্দীন বলবন যুজবকীর পরাজয় ও পতন পর্যন্ত লখনৌতি রাজ্যের ইতিহাস একমাত্র মীনহাজ-ই-সিরাজের 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' হইতে জানা যায়। নীচে এই গ্রন্থ অবলম্বনে এই সময়কার ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ হইল।

নদীয়া ও লখনৌতি বিজয়ের পরে প্রায় দুই বৎসর বখতিয়ার আর কোন

অভিযানে বাহির হন নাই। এই সময়ে তিনি পরিপূর্ণভাবে অধিকৃত অঞ্চলের শাসনে মনোনিবেশ করেন। সমগ্র অঞ্চলটিকে তিনি কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করিলেন এবং তাঁহার সহযোগী বিভিন্ন সেনানায়ককে তিনি বিভিন্ন বিভাগের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ইহারা সকলেই ছিলেন হয় তুর্কী না হয় খিলজী জাতীয়। রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে বখতিয়ার আলী মর্দান, মুহম্মদ শিরান, হুসামুদ্দীন ইউয়জ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। বখতিয়ার তাঁহার রাজ্যে অনেকগুলি মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা করিলেন। হিন্দুদের বহু মন্দির তিনি ভাঙিয়া ফেলিলেন এবং বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিলেন।

লখনৌতি জয়ের প্রায় দুই বৎসর পরে বখতিয়ার তিব্বত জয়ের সঙ্কল্প করিয়া অভিযানে বাহির হইলেন। লখনৌতি ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে কোচ, মেচ ও থারু নামে তিনটি জাতির লোক বাস করিত। মেচ জাতির একজন সর্দার একবার বখতিয়ারের হাতে পড়িয়াছিল, বখতিয়ার তাহাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া আলী নাম রাখিয়াছিলেন। এই আলী বখতিয়ারের পথ-প্রদর্শক হইল। বখতিয়ার দশ সহস্র সৈন্য লইয়া তিব্বত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আলী মেচ তাঁহাকে কামরূপ রাজ্যের অভ্যন্তরে বেগমতী নদীর তীরে বর্ধন নামে একটি নগরে আনিয়া হাজির করিল। বেগমতী ও বর্ধনের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। বখতিয়ার বেগমতীর তীরে তীরে দশ দিন গিয়া একটি পাথরের সেতু দেখিতে পাইলেন, তাহাতে বারোটি খিলান ছিল। একজন তুর্কী ও একজন খিলজী আমীরকে সেতু পাহারা দিবার জন্য রাখিয়া বখতিয়ার অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া সেতু পার হইলেন।

এদিকে কামরূপের রাজা বখতিয়ারকে দূতমুখে জানাইলেন যে ঐ সময় তিব্বত আক্রমণের উপযুক্ত নয়; পরের বৎসর যদি বখতিয়ার তিব্বত আক্রমণ করেন, তাহা হইলে তিনিও তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া ঐ অভিযানে যোগ দিবেন। বখতিয়ার কামরূপরাজের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তিব্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। পূর্বোক্ত সেতুটি পার হইবার পর বখতিয়ার পনেরো দিন পার্বত্য পথে চলিয়া ষোড়শ দিবসে এক উপত্যকায় পৌঁছিলেন এবং সেখানে লুণ্ঠন সুরু করিলেন; এই স্থানে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। এই দুর্গ ও তাহার আশপাশ হইতে অনেক সৈন্য বাহির হইয়া বখতিয়ারের সৈন্যদলকে আক্রমণ

করিল। ইহাদের কয়েকজন বখতিয়ারের বাহিনীর হাতে বন্দী হইল। তাহাদের কাছে বখতিয়ার জানিতে পারিলেন যে ঐ স্থান হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে করমপত্তন বা করারপত্তন নামে একটি স্থানে পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য আছে। ইহা শুনিয়া বখতিয়ার আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না।

কিন্তু প্রত্যাবর্তন করাও তাঁহার পক্ষে সহজ হইল না। তাঁহার শত্রুপক্ষ ঐ এলাকার সমস্ত লোকজন সরাইয়া যাবতীয় খাদ্যশস্য নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। বখতিয়ারের সৈন্যেরা তখন নিজেদের ঘোড়াগুলির মাংস খাইতে লাগিল। এইভাবে অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া বখতিয়ার কোন রকমে কামরূপে পৌছিলেন।

কিন্তু কামরূপে পৌছিয়া বখতিয়ার দেখিলেন পূর্বোক্ত সেতুটির দুইটি খিলান ভাঙা; যে দুইজন আমীরকে তিনি সেতু পাহারা দিতে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা বিবাদ করিয়া ঐ স্থান ছাড়িয়া গিয়াছিল, ইত্যবসরে কামরূপের লোকেরা আসিয়া এই দুইটি খিলান ভাঙিয়া দেয়। বখতিয়ার তখন নদীর তীরে তাঁবু ফেলিয়া নদী পার হইবার জন্য নৌকা ও ভেলা নির্মাণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইল না। তখন বখতিয়ার নিকটবর্তী একটি দেবমন্দিরে সসৈন্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কামরূপের রাজা এই সময় বখতিয়ারের স্বপক্ষ হইতে বিপক্ষে চলিয়া গেলেন। (বোধহয় মুসলমানরা দেবমন্দিরে প্রবেশ করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।) তাঁহার সেনারা আসিয়া ঐ দেবমন্দির ঘিরিয়া ফেলিল এবং মন্দিরটির চারিদিকে বাঁশ দিয়া প্রাচীর খাড়া করিল। বখতিয়ারের সৈন্যেরা চারিদিক বন্ধ দেখিয়া মরিয়া হইয়া প্রাচীরের একদিক ভাঙিয়া ফেলিল এবং তাহাদের মধ্যে দুই একজন অশ্বারোহী অশ্ব লইয়া নদীর ভিতরে কিছুদূর গমন করিল। তীরের লোকেরা "রাস্তা মিলিয়াছে" বলিয়া চীৎকার করায় বখতিয়ারের সমস্ত সৈন্য জলে নামিল। কিন্তু সামনে গভীর জল ছিল, তাহাতে বখতিয়ার এবং অল্প কয়েকজন অশ্বারোহী ব্যতীত আর সকলেই ডুবিয়া মরিল। বখতিয়ার হতাবশিষ্ট অশ্বারোহীদের লইয়া কোনক্রমে নদীর ওপারে পৌছিয়া আলী মেচের আত্মীয়স্বজনকে প্রতীক্ষারত দেখিতে পাইলেন। তাহাদের সাহায্যে তিনি অতিকষ্টে দেবকোটে পৌছিলেন।

দেবকোটে পৌছিয়া বখতিয়ার সাংঘাতিক রকম অসুস্থ হইয়া পড়িলেন।

ইহার অল্পদিন পরেই তিনি পরলোকগমন করিলেন। (৬০২ হিঃ=১২০৫-০৬ খ্রীঃ) কেহ কেহ বলেন যে বখতিয়ারের অনুচর নারান-কোই-র শাসনকর্তা আলী মর্দান তাঁহাকে হত্যা করেন। তিব্বত অভিযানের মত অসম্ভব কাজে হাত না দিলে হয়ত এত শীঘ্র বখতিয়ারের এরূপ পরিণতি হইত না।

২। ইজ্জুদ্দীন মুহম্মদ শিরান খিলজী

ইজ্জুদ্দীন মুহম্মদ শিরান খিলজী ও তাঁহার ভ্রাতা আহমদ শিরান বখতিয়ার খিলজীর অনুচর ছিলেন। বখতিয়ার তিব্বত অভিযানে যাত্রা করিবার পূর্বে এই দুই ভ্রাতাকে লখনোর ও জাজনগর আক্রমণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তিব্বত হইতে বখতিয়ারের প্রত্যাবর্তনের সময় মুহম্মদ শিরান জাজনগরে ছিলেন। বখতিয়ারের তিব্বত অভিযানের ব্যর্থতার কথা শুনিয়া তিনি দেবকোটে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইতিমধ্যে বখতিয়ার পরলোকগমন করিয়াছিলেন। তখন মুহম্মদ শিরান প্রথমে নারান-কোই আক্রমণ করিয়া আলী মর্দানকে পরাস্ত ও বন্দী করিলেন এবং দেবকোটে ফিরিয়া আসিয়া নিজেকে বখতিয়ারের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিলেন। এদিকে আলী মর্দান কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া দিল্লীতে সুলতান কুৎবুদ্দীন আইবকের শরণাপন্ন হইলেন। কায়েমাজ রুমী নামে কুৎবুদ্দীনের জনৈক সেনাপতি এই সময়ে অযোধ্যায় ছিলেন, তাঁহাকে কুৎবুদ্দীন লখনৌতি আক্রমণ করিতে বলিলেন। কায়েমাজ লখনৌতি রাজ্যে পৌছিয়া অনেক খিলজী আমীরকে হাত করিয়া ফেলিলেন। বখতিয়ারের বিশিষ্ট অনুচর, গাঙ্গুরীর জায়গীরদার হুসামুদ্দীন ইউয়জ অগ্রসর হইয়া কায়েমাজকে স্বাগত জানাইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দেবকোটে লইয়া গেলেন। মুহম্মদ শিরান তখন কায়েমাজের সহিত যুদ্ধ না করিয়া দেবকোট হইতে পলাইয়া গেলেন। অতঃপর কায়েমাজ হুসামুদ্দীনকে দেবকোটের কর্তৃত্ব দান করিলেন। কিন্তু কায়েমাজ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলে মুহম্মদ শিরান এবং তাঁহার দলভুক্ত খিলজী আমীররা দেবকোট আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া কায়েমাজ আবার ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার সহিত মুহম্মদ শিরান ও তাঁহার অনুচরদের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মুহম্মদ শিরান ও তাঁহার দলের লোকেরা পরাজিত হইয়া মক্সদা এবং সন্তোষের দিকে পলায়ন

করিলেন। পলায়নের সময় তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ হইল এবং এই বিবাদের ফলে মুহম্মদ শিরান নিহত হইলেন।

৩। আলী মর্দান (আলাউদ্দীন)

আলী মর্দান কিছুকাল দিল্লীতেই রহিলেন। কুৎবুদ্দীন আইবক যখন গজনীতে যুদ্ধ করিতে গেলেন, তখন তিনি আলী মর্দানকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। গজনীতে আলী মর্দান তুর্কীদের হাতে বন্দী হইলেন। কিছুদিন বন্দিদশায় থাকিবার পর আলী মর্দান মুক্তি লাভ করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন কুৎবুদ্দীন তাঁহাকে লখনৌতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। আলী মর্দান দেবকোটে আসিলে হুসামুদ্দীন ইউয়জ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং আলী মর্দান নির্বিবাদে লখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করিলেন (আঃ ১২১০ খ্রীঃ)।

কুৎবুদ্দীন যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন আলী মর্দান দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু কুৎবুদ্দীন পরলোকগমন করিলে (১২১১ খ্রীঃ) আলী মর্দান স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং আলাউদ্দীন নাম লইয়া স্থলতান হইলেন। তাহার পর তিনি চারিদিকে সৈন্য পাঠাইয়া বহু খিলজী আমীরকে বধ করিলেন। তাঁহার অত্যাচার ক্রমে ক্রমে চরমে উঠিল। তিনি বহু লোককে বধ করিলেন এবং নিরীহ দরিদ্র লোকদের দুর্দশার একশেষ করিলেন। অবশেষে তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া বহু খিলজী আমীর ষড়যন্ত্র করিয়া আলী মর্দানকে হত্যা করিলেন। ইহার পর তাঁহারা হুসামুদ্দীন ইউয়জকে লখনৌতির স্থলতান নির্বাচিত করিলেন। হুসামুদ্দীন ইউয়জ গিয়াস্থদ্দীন ইউয়জ শাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে বসিলেন (১২১২ খ্রীঃ)।

৪। গিয়াস্থদ্দীন ইউয়জ শাহ

গিয়াস্থদ্দীন ইউয়জ শাহ ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি প্রিয়দর্শন, দয়ালু ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। আলিম, ফকীর ও সৈয়দদের তিনি বৃত্তি দান করিতেন। দূর দেশ হইতেও বহু মুসলমান অর্থের প্রত্যাশী হইয়া তাঁহার কাছে আসিত এবং সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যাইত। বহু মসজিদও তিনি নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

গিয়াসুদ্দীনের শাসনকালে দেবকোটের প্রাধান্য হ্রাস পায় এবং লখনৌতি পুরাপুরি রাজধানী হইয়া উঠে। গিয়াসুদ্দীনের আর একটি বিশেষ কীর্তি দেবকোট হইতে লখনোর বা রাজনগর (বর্তমান বীরভূম জেলার অন্তর্গত) পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ উচ্চ রাজপথ নির্মাণ করা। এই রাজপথটির কিছু চিহ্ন পঞ্চাশ বছর আগেও বর্তমান ছিল। গিয়াসুদ্দীন বসকোট বা বসনকোট নামক স্থানে একটি দুর্গও নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বাগদাদের খলিফা অন্নাসিরোলেদীন ইল্লাহের নিকট হইতে গিয়াসুদ্দীন তাঁহার রাজ-মর্যাদা স্বীকারসূচক পত্র আনান। গিয়াসুদ্দীনের অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের কয়েকটিতে খলিফার নাম আছে।

কিন্তু ১৫ বৎসর রাজত্ব করিবার পর গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ শাহের অদৃষ্টে দুর্দিন ঘনাইয়া আসিল। দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ শাহকে দমন করিয়া লখনৌতি রাজ্য জয় করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইলতুৎমিস বিহার হইতে লখনৌতির দিকে রওনা হইলে গিয়াসুদ্দীন তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য এক নৌবাহিনী পাঠাইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ইলতুৎমিসের নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করিতে খুৎবা ও পাঠ করিতে স্বীকৃত হইয়া এবং অনেক টাকা ও হাতী উপঢৌকন দিয়া ইলতুৎমিসের সহিত সন্ধি করিলেন। ইলতুৎমিস তখন ইজ্জুদ্দীন জানী নামে এক ব্যক্তিকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু ইলতুৎমিসের প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরেই গিয়াসুদ্দীন ইজ্জুদ্দীন জানীকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া বিহার অধিকার করিলেন। ইজ্জুদ্দীন তখন ইলতুৎমিসের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদের কাছে গিয়া সমস্ত কথা জানাইলেন এবং তাঁহার অনুরোধে নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ লখনৌতি আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ পূর্ববঙ্গ এবং কামরূপ জয় করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, সুতরাং নাসিরুদ্দীন অনায়াসেই লখনৌতি অধিকার করিলেন। গিয়াসুদ্দীন এই সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং নাসিরুদ্দীনের সহিত যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল এবং তিনি সমস্ত খিলজী আমীরের সহিত বন্দী হইলেন। অতঃপর গিয়াসুদ্দীনের প্রাণবধ করা হইল (১২২৭ খ্রীঃ)।

৫। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ

গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ শাহের পরাজয় ও পতনের ফলে লখনৌতি রাজ্য সম্পূর্ণ-ভাবে দিল্লীর সুলতানের অধীনে আসিল। দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস প্রথমে নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদকেই লখনৌতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ সুলতান গারি নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি লখনৌতি অধিকার করার পর দিল্লী ও অন্যান্য বিশিষ্ট নগরের আলিম, সৈয়দ এবং অন্যান্য ধার্মিক ব্যক্তিদের কাছে বহু অর্থ পাঠাইয়াছিলেন। নাসিরুদ্দীন অত্যন্ত যোগ্য ও নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। তাঁহার পিতা ইলতুৎমিসের নিকট একবার বাগদাদের খলিফার নিকট হইতে খিলাৎ আসিয়াছিল, ইলতুৎমিস তাহার মধ্য হইতে একটি খিলাৎ ও একটি লাল চন্দ্রাতপ লখনৌতিতে পুত্রের কাছে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মাত্র দেড় বৎসর লখনৌতি শাসন করিবার পরেই নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ রোগাক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃতদেহ লখনৌতি হইতে দিল্লীতে লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করা হয়।

নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ পিতার অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে লখনৌতি শাসন করিলেও পিতার অনুমোদনক্রমে নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন মুদ্রায় বাগদাদের খলিফার নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

৬। ইখতিয়ারুদ্দীন মালিক বলকা

নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদের শাসনকালে হুসামুদ্দীন ইউয়জের পুত্র ইখতিয়ারুদ্দীন দৌলৎ শাহ্-ই-বলকা আমীরের পদ লাভ করিয়াছিলেন। নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর তিনি বিদ্রোহী হইলেন এবং লখনৌতি রাজ্য অধিকার করিলেন। তখন ইলতুৎমিস তাঁহাকে দমন করিতে সসৈন্যে লখনৌতি আসিলেন এবং তাঁহাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া আলাউদ্দীন জানী নামে তুর্কীস্তানের রাজবংশসম্ভূত এক ব্যক্তিকে লখনৌতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

৭। আলাউদ্দীন জানী, সৈফুদ্দীন আইবক য়গানতৎ ও আওর খান

আলাউদ্দীন জানী অল্পদিন লখনৌতি শাসন করিবার পরে ইলতুৎমিস্ কর্তৃক পদচ্যুত হন এবং সৈফুদ্দীন আইবক নামে আর এক ব্যক্তি তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হন। সৈফুদ্দীন আইবক অনেকগুলি হাতী ধরিয়া ইলতুৎমিসকে পাঠাইয়াছিলেন, এজন্য ইলতুৎমিস তাঁহাকে 'য়গানতৎ' উপাধি দিয়াছিলেন। দুই তিন বৎসর শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর সৈফুদ্দীন আইবক য়গানতৎ পরলোকগমন করেন। প্রায় একই সময়ে দিল্লীতে ইলতুৎমিসও পরলোকগমন করিলেন (১২৩৬ খ্রীঃ)।

ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পরে তাঁহার উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীন রাজার মত আচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আওর খান নামে একজন তুর্কী লখনৌতি ও লখনোর অধিকার করিয়া বসিলেন। বিহারের শাসনকর্তা তুগরল তুগান খানের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিল এবং তুগান খান লখনৌতি আক্রমণ করিলেন। লখনৌতি নগর ও বসনকোট দুর্গের মধ্যবর্তী স্থানে তুগান খান আওর খানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। ফলে লখনোর হইতে বসনকোট পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখন তুগান খানের হস্তে আসিল।

৮। তুগরল তুগান খান

তুগান খানের শাসনকালে সুলতানা রাজিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অভিষেকের সময়ে তুগান খান দিল্লীতে কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন। রাজিয়া তুগান খানকে একটি ধ্বজ ও কয়েকটি চন্দ্রাতপ উপহার দিয়াছিলেন। তুগান খান সুলতানা রাজিয়ার নামে লখনৌতির টাকশালে মুদ্রাও উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। রাজিয়ার সিংহাসনচ্যুতির পরে তুগান খান অযোধ্যা, কড়া ও মানিকপুর প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিয়া বসিলেন।

এই সময়ে 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'র লেখক মীনহাজ-ই-সিরাজ অযোধ্যায় ছিলেন। তুগরল তুগান খানের সহিত মীনহাজের পরিচয় হইয়াছিল। তুগান খান

মীনহাজকে বাংলাদেশে লইয়া আসেন। মীনহাজ প্রায় তিন বৎসর এদেশে ছিলেন এবং এই সময়কার ঘটনাবলী তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তুগান খানের শাসনকালে জাজনগরের (উড়িষ্যা) রাজা লখনৌতি আক্রমণ করেন। উড়িষ্যার শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, এই জাজনগররাজ উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজা প্রথম নরসিংহদেব। তুগরল তুগান খান তাঁহার আক্রমণ প্রতিহত করিয়া পাল্টা আক্রমণ চালান এবং জাজনগর অভিমুখে অভিযান করেন (১২৪৩ খ্রীঃ)। মীনহাজ-ই-সিরাজ এই অভিযানে তুগান খানের সহিত গিয়াছিলেন। তুগান খান জাজনগর রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত কটাসিন দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু দুর্গ জয়ের পর যখন তাঁহার সৈন্যেরা বিশ্রাম ও আহারাদি করিতেছিল, তখন জাজনগররাজের সৈন্যেরা অকস্মাৎ পিছন হইতে তাহাদের আক্রমণ করিল। ফলে তুগান খান পরাজিত হইয়া লখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর তিনি তাঁহার দুইজন মন্ত্রী শর্ফুলমুল্‌ক্ আশারী ও কাজী জলালুদ্দীন কাসানীকে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন মসুদ শাহের কাছে পাঠাইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। আলাউদ্দীন তখন অযোধ্যার শাসনকর্তা কমরুদ্দীন তমুর খান-ই-কিরানকে তুগান খানের সহায়তা করিবার আদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে জাজনগরের রাজা আবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিলেন। তিনি প্রথমে লখনোর আক্রমণ করিলেন এবং সেখানকার শাসনকর্তা ফখ্‌রু-উল্‌-মুল্‌ক্ করিমুদ্দীন লাগ্‌রিকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ঐ স্থান দখল করিয়া লইলেন। তাহার পর তিনি লখনৌতি অবরোধ করিলেন। অবরোধের ফলে তুগান খানের খুবই অসুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু অবরোধের দ্বিতীয় দিনে অযোধ্যার শাসনকর্তা তমুর খান তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন জাজনগররাজ লখনৌতি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কিন্তু জাজনগররাজের বিদায়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তুগরল তুগান খান ও তমুর খানের মধ্যে বিবাদ বাধিল এবং বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হইল। সারাদিন যুদ্ধ চলিবার পর অবশেষে সন্ধ্যায় কয়েক ব্যক্তি মধ্যস্থ হইয়া যুদ্ধ বন্ধ করিলেন। যুদ্ধের শেষে তুগান খান নিজের আবাসে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার আবাস ছিল নগরের প্রধান দ্বারের সামনে এবং সেখানে তিনি সেদিন একাই ছিলেন। তমুর খান

এই সুযোগে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তুগান খানের আবাস আক্রমণ করিলেন। তখন তুগান খান পলাইতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি মীনহাজ-ই-সিরাজকে তমুর খানের কাছে পাঠাইলেন এবং মীনহাজের দৌত্যের ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। সন্ধির সর্ত অনুসারে তমুর খান লখনৌতির অধিকার-প্রাপ্ত হইলেন এবং তুগান খান তাঁহার অনুচরবর্গ, অর্থভাণ্ডার এবং হাতীগুলি লইয়া দিল্লীতে গমন করিলেন। দিল্লীর দুর্বল সুলতান আলাউদ্দীন মস্‌উদ শাহ তুগান খানের উপর তমুর খানের এই অত্যাচারের কোনই প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না। তুগান খান অতঃপর আউধের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন।

৯। কমরুদ্দীন তমুর খান-ই-কিরান ও জলালুদ্দীন মস্‌উদ জানী

তমুর খান দিল্লীর সুলতানের কর্তৃত্ব অস্বীকারপূর্বক দুই বৎসর লখনৌতি শাসন করিয়া পরলোকগমন করিলেন (১২৪৬-৪৭ খ্রীঃ)। ঘটনাচক্রে তিনি ও তুগরল তুগান খান একই রাত্রিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাহার পর আলাউদ্দীন জানীর পুত্র জলালুদ্দীন মস্‌উদ জানী বিহার ও লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইনি "মালিক-উশ্‌-শর্ক" ও "শাহ" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় চারি বৎসর তিনি ঐ দুইটি প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন।

১০। ইখতিয়ারুদ্দীন য়ুজবক তুগরল খান (মুগীসুদ্দীন য়ুজবক শাহ)

জলালুদ্দীন মস্‌উদ জানীর পরে যিনি লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার নাম মালিক ইখতিয়ারুদ্দীন য়ুজবক তুগরল খান। ইনি প্রথমে আউধের শাসনকর্তা এবং পরে লখনৌতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে ইনি দুইবার দিল্লীর তৎকালীন সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুইবারই উজীর উলুগ খান বলবনের হস্তক্ষেপের ফলে ইনি সুলতানের মার্জনা লাভ করেন। ইঁহার শাসনকালে জাজনগরের সহিত লখনৌতির আবার যুদ্ধ বাধিয়াছিল। তিনবার যুদ্ধ হয়, প্রথম দুইবার জাজনগরের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়, কিন্তু তৃতীয়বার তাহারাই য়ুজবক তুগরল খানের

বাহিনীকে পরাজিত করে এবং যুজবকের একটি বহুমূল্য শ্বেতহস্তীকে জাজনগরের সৈন্যেরা লইয়া যায়। ইহার পরের বৎসর যুজবক উমর্দন রাজ্য * আক্রমণ করেন। অলক্ষিতভাবে অগ্রসর হইয়া তিনি ঐ রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন; তখন সেখানকার রাজা রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন এবং তাঁহার অর্থ, হস্তী, পরিবার, অনুচরবর্গ—সমস্তই যুজবকের দখলে আসিল।

উমর্দন রাজ্য জয় করিবার পর যুজবক খুবই গর্বিত হইয়া উঠিলেন এবং আউধের রাজধানী অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সুলতান মুগীসুদ্দীন নাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আউধে এক পক্ষ কাল অবস্থান করিবার পর তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত সম্রাটের সৈন্যবাহিনী অদূরে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি নৌকাযোগে লখনৌতিতে পলাইয়া আসিলেন। যুজবক স্বাধীনতা ঘোষণা করায় ভারতের হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহার বিরূপ সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

লখনৌতিতে পৌঁছিবার পর যুজবক কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কামরূপরাজের সৈন্যবল বেশী ছিল না বলিয়া তিনি প্রথমে যুদ্ধ না করিয়া পিছু হটিয়া গেলেন। যুজবক তখন কামরূপের প্রধান নগর জয় করিয়া প্রচুর ধনরত্ন হস্তগত করিলেন। কামরূপরাজ যুজবকের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইলেন। তিনি যুজবকের সামন্ত হিসাবে কামরূপ শাসন করিতে এবং তাঁহাকে প্রতি বৎসর হস্তী ও স্বর্ণ পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। যুজবক এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু যুজবক একটা ভুল করিয়াছিলেন। কামরূপের শস্যসম্পদ খুব বেশী ছিল বলিয়া যুজবক নিজের বাহিনীর আহারের জন্য শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কামরূপের রাজা ইহার সুযোগ লইয়া তাঁহার প্রজাদের দিয়া সমস্ত শস্য কিনিয়া লওয়াইলেন এবং তাহার পর তাহাদের দিয়া সমস্ত পয়ঃপ্রণালীর মুখ খুলিয়া দেওয়াইলেন। ইহার ফলে যুজবকের অধিকৃত সমস্ত ভূমি জলমগ্ন হইয়া পড়িল এবং তাঁহার খাদ্যভাণ্ডার শূন্য হইয়া পড়িল। তখন তিনি লখনৌতিতে ফিরিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ফিরিবার পথও জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। সুতরাং যুজবকের বাহিনী অগ্রসর হইতে পারিল না। ইহা ব্যতীত অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে কামরূপরাজের বাহিনী আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল।

* এই রাজ্যের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে।

তখন পর্বতমালাবেষ্টিত একটি সঙ্কীর্ণ স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে য়ুজবক পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন এবং বন্দিদশাতেই তিনি পরলোকগমন করিলেন।

মুগীসুদ্দীন য়ুজবক শাহের সমস্ত মুদ্রায় লেখা আছে যে এগুলি "নদীয়া ও অর্জ বদন (?)-এর ভূমি-রাজস্ব হইতে প্রস্তুত" হইয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক ভ্রমবশত এগুলিকে নদীয়া ও "অর্জ বদন" বিজয়ের স্মারক-মুদ্রা বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু নদীয়া বা নবদ্বীপ য়ুজবকের বহু পূর্বে বখতিয়ার খিলজী জয় করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, য়ুজবকের এই মুদ্রাগুলি হইতে এ কথা বুঝায় না যে য়ুজবকের রাজত্বকালেই নদীয়া ও অর্জ বদন (?) প্রথম বিজিত হইয়াছিল। 'অর্জ বদন'-কে কেহ 'বর্ধনকোটে'র, কেহ 'বর্ধমানে'র, কেহ 'উমর্দনে'র বিকৃত রূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

১১। জলালুদ্দীন মসুদ জানী, ইজ্জুদ্দীন বলবন য়ুজবকী ও তাজুদ্দীন অর্সলান খান

য়ুজবকের মৃত্যুর পরে লখনৌতি রাজ্য আবার দিল্লীর সম্রাটের অধীনে আসে, কারণ ৬৫৫ হিজরায় (১২৫৭-৫৮ খ্রীঃ) লখনৌতির টাকশাল হইতে দিল্লীর সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময়ে লখনৌতির শাসনকর্তা কে ছিলেন, তাহা জানা যায় না। ৬৫৬ হিজরায় জলালুদ্দীন মসুদ জানী দ্বিতীয়বার লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু ৬৫৭ হিজরার মধ্যেই তিনি পদচ্যুত বা পরলোকগত হন, কারণ ৬৫৭ হিজরায় যখন কড়ার শাসনকর্তা তাজুদ্দীন অর্সলান খান লখনৌতি আক্রমণ করেন, তখন ইজ্জুদ্দীন বলবন য়ুজবকী নামে এক ব্যক্তি লখনৌতি শাসন করিতেছিলেন। ইজ্জুদ্দীন বলবন য়ুজবকী লখনৌতি অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সেই সুযোগে তাজুদ্দীন অর্সলান খান মালব ও কালিঞ্জর আক্রমণ করিবার ছলে লখনৌতি আক্রমণ করেন। লখনৌতি নগরের অধিবাসীরা তিনদিন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে আত্মসমর্পণ করিল। অর্সলান খান নগর অধিকার করিয়া লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আক্রমণের খবর পাইয়া ইজ্জুদ্দীন বলবন ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তিনি অর্সলান খানের সহিত যুদ্ধ করিয়া

পরাজিত ও নিহত হইলেন। ইজ্জুদ্দীন বলব্রনের শাসনকালের আর কোন ঘটনার কথা জানা যায় না, তবে ৬৫৭ হিজরায় লখনৌতি হইতে দিল্লীতে দুইটি হস্তী ও কিঞ্চিৎ অর্থ প্রেরিত হইয়াছিল—এইটুকু জানা গিয়াছে। ইজ্জুদ্দীন বলবনকে নিহত করিয়া তাজুদ্দীন অর্সলান খান লখনৌতি রাজ্যের অধিপতি হইলেন।

১২। তাতার খান ও শের খান

ইহার পরবর্তী কয় বৎসরের ইতিহাস একান্ত অস্পষ্ট। তাজুদ্দীন অর্সলান খানের পরে তাতার খান ও শের খান নামে বাংলার দুইজন শাসনকর্তার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার

১। আমিন খান ও তুগরল খান

১২৭১ খ্রীঃর কাছাকাছি সময়ে দিল্লীর সুলতান বলবন আমিন খান ও তুগরল খানকে যথাক্রমে লখনৌতির শাসনকর্তা ও সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তুগরল বলবনের বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। লখনৌতির সহকারী শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইয়া তুগরল জীবনে সর্বপ্রথম একটি গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার প্রাপ্ত হইলেন। আমিন খান নামেই বাংলার শাসনকর্তা রহিলেন। তুগরলই সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন।

জিয়াউদ্দীন বারনির 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে তুগরল "অনেক অসমসাহসিক কঠিন কর্ম" করিয়াছিলেন। 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে লেখা আছে যে, তুগরল সোনারগাঁওয়ের নিকটে একটি বিরাট দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা 'কিলা-ই-তুগরল' নামে পরিচিত ছিল। এই দুর্গ সম্ভবত ঢাকার ২৫ মাইল দক্ষিণে নরকিলা (লোরিকল) নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। মোটের উপর, তুগরল যে পূর্ববঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত মুসলিম রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্ত 'রাজমালা'য় লেখা আছে যে, ত্রিপুরার বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রত্ন-ফা যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা-ফাকে উচ্ছেদ করিয়া ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন, তখন তিনি গৌড়ের "তুরুষ্ক নৃপতি"র সাহায্য চাহেন, "তুরুষ্ক নৃপতি" তখন ত্রিপুরা আক্রমণ করিলেন ও রাজা-ফাকে বিতাড়িত করিয়া রত্ন-ফাকে সিংহাসনে বসাইলেন; রাজা তাঁহাকে একটি বহুমূল্য রত্ন উপহার দিলেন; "তুরুষ্ক নৃপতি" রত্ন-ফাকে "মাণিক্য" উপাধি দিলেন; এই উপাধি এখনও পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজাদের নামের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আসিতেছে। অনেকের মতে এই "তুরুষ্ক নৃপতি" তুগরল। বারনির গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তুগরল জাজনগর (উড়িষ্যা) রাজ্যও আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে রাঢ়ের নিম্নার্ধ অর্থাৎ বর্তমান মেদিনীপুর জেলার সমগ্র অংশ এবং বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলী

জেলার অনেকাংশ জাজনগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তুগরল জাজনগর আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন চালাইলেন এবং প্রচুর ধনরত্ন ও হস্তী লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

জিয়াউদ্দীন বারনির গ্রন্থ হইতে ইহার পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহার সারমর্ম নীচে প্রদত্ত হইল। জাজনগর-অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তুগরল নানা প্রকারে দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করিলেন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এই অভিযানের লুণ্ঠনলব্ধ সামগ্রীর এক পঞ্চমাংশ দিল্লীতে প্রেরণ করিবার কথা, কিন্তু তুগরল তাহা করিলেন না। বলবন এতদিন পাঞ্জাবে মঙ্গোলদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া বাংলার ব্যাপারে মন দিতে পারেন নাই। এই সময় তিনি আবার লাহোরে সাংঘাতিক অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সুলতান দীর্ঘকাল প্রকাশ্যে বাহির হইতে না পারায় ক্রমশ গুজব রটিল তিনি মারা গিয়াছেন। এই গুজব বাংলাদেশেও পৌছিল। তখন তুগরল স্বাধীন হইবার সুবর্ণসুযোগ দেখিয়া আমিন খানের সহিত শত্রুতায় লিপ্ত হইলেন; অবশেষে লখনৌতি নগরের উপকণ্ঠে উভয়ের মধ্যে এক যুদ্ধ হইল। তাহাতে আমিন খান পরাজিত হইলেন।

এদিকে বলবন সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং দিল্লীতে আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহার অসুস্থ থাকার সময়ে তুগরল যাহা করিয়াছিলেন, সে জন্য তিনি তুগরলকে শাস্তি দিতে চাহেন নাই। তিনি তুগরলকে এক ফরমান পাঠাইয়া বলিলেন, তাঁহার রোগমুক্তি যেন তুগরল যথাযোগ্যভাবে উদ্‌যাপন করেন। কিন্তু তুগরল তখন পুরাপুরিভাবে বিদ্রোহী হইয়া গিয়াছেন। তিনি সুলতানের ফরমান আসার অব্যবহিত পরেই এক বিপুল সৈন্যসমাবেশ করিয়া বিহার আক্রমণ করিলেন; বলবনের রাজত্বকালেই বিহার লখনৌতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইয়াছিল। ইহার পর তুগরল মুগীসুদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া সুলতান হইলেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ ও খুৎবা পাঠ করাইলেন (১২৭৯ খ্রীঃ)। তাঁহার দরবারের জাঁকজমক দিল্লীর দরবারকেও হার মানাইল!

বাংলাদেশে তুগরল বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি ছিল উদার। দানেও তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। দরবেশদের একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি একবার পাঁচ মণ স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন, দিল্লীতেও তিনি দানস্বরূপ অনেক অর্থ ও সামগ্রী পাঠাইয়াছিলেন। বলবনের কঠোর স্বভাবের

জন্য তাঁহাকে সকলেই ভয় করিত, প্রায় কেহই ভালবাসিত না। সুতরাং বলবনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তুগরল সমুদয় অমাত্য, সৈন্য ও প্রজার সমর্থন পাইলেন।

তুগরলের বিদ্রোহের খবর পাইয়া বলবন প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। তুগরলকে দমন করিবার জন্য তিনি আউধের শাসনকর্তা মালিক তুরমতীর অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন, এই সৈন্যদলের সহিত তমর খান শামসী ও মালিক তাজুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন আর একদল সৈন্য যোগ দিল। তুগরলের সৈন্যবাহিনীর লোকবল এই মিলিত বাহিনীর চেয়ে অনেক বেশী ছিল, তাহাতে অনেক হাতী এবং পাইক (হিন্দু পদাতিক সৈন্য) থাকায় বলবনের বাহিনীর নায়কেরা তাহাকে সহজে আক্রমণ করিতেও পারিলেন না। দুই বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া কিছুদিন রহিল, ইতিমধ্যে তুগরল শত্রুবাহিনীর অনেক সেনাধ্যক্ষকে অর্থ দ্বারা হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে যুদ্ধ হইল এবং তাহাতে মালিক তুরমতী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। তাঁহার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের যথাসর্বস্ব হিন্দুরা লুঠ করিয়া লইল এবং অনেক সৈন্য —ফিরিয়া গেলে বলবন পাছে শাস্তি দেন, এই ভয়ে তুগরলের দলে যোগ দিল। বলবন তুরমতীকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই, গুপ্তচর দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করাইয়াছিলেন।

ইহার পরের বৎসর বলবন তুগরলের বিরুদ্ধে আর একজন সেনাপতির অধীনে আর একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তুগরল এই বাহিনীর অনেক সৈন্যকে অর্থ দ্বারা হস্তগত করিলেন এবং তাহার পর তিনি যুদ্ধ করিয়া সেনাপতিকে পরাজিত করিলেন।

তখন বলবন নিজেই তুগরলের বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। প্রথমে তিনি শিকারে যাওয়ার ছল করিয়া দিল্লী হইতে সমান ও সনামে গেলেন এবং সেখানে তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজ্যশাসন ও মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে সঙ্গে লইয়া আউধের দিকে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে তিনি যত সৈন্য পাইলেন, সংগ্রহ করিলেন এবং আউধে পৌঁছিয়া আরও দুই লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। তিনি এক বিশাল নৌবহরও সংগঠন করিলেন এবং এখানকার লোকদের নিকট হইতে অনেক কর আদায় করিয়া নিজের অর্থভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিলেন।

তুগরল তাঁহার নৌবহর লইয়া সরযূ নদীর মোহানা পর্যন্ত অগ্রসর

হইলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বলবনের বাহিনীর সহিত যুদ্ধ না করিয়া পিছু হটিয়া আসিলেন। বলবনের বাহিনী নির্বিঘ্নে সরযূ নদী পার হইল, ইতিমধ্যে বর্ষা নামিয়াছিল, কিন্তু বলবনের বাহিনী বর্ষার অসুবিধা ও ক্ষতি উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইল। তুগরল লখনৌতিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু এখানেও তিনি সুলতানের বিরাট বাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না বুঝিয়া লখনৌতি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। লখনৌতির সম্ভ্রান্ত লোকেরা বলবন কর্তৃক নির্যাতিত হইবার ভয়ে তাঁহার সহিত গেল।

বলবন লখনৌতিতে উপস্থিত হইয়া জিয়াউদ্দীন বারনির মাতামহ সিপাহ্-শালার হসামুদ্দীনকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন এবং নিজে সেখানে একদিন মাত্র থাকিয়া সৈন্যবাহিনী লইয়া তুগরলের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

বারনি লিখিয়াছেন, তুগরল জাজনগরের (উড়িষ্যা) দিকে পলাইয়াছিলেন; কিন্তু বলবন তুগরলের জলপথে পলায়নের পথ বন্ধ করিবার জন্য সোনারগাঁওয়ে গিয়া সেখানকার হিন্দু রাজা রায় দনুজের সহিত চুক্তি করিয়াছিলেন। লখনৌতি বা গৌড় হইতে উড়িষ্যা যাইবার পথে সোনারগাঁও পড়ে না। এইজন্য কোন কোন ঐতিহাসিক বারনির উক্তি ভুল বলিয়া মনে করিয়াছেন, কেহ কেহ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে দ্বিতীয় জাজনগর রাজ্যের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ বারনির গ্রন্থে 'হাজীনগর'-এর স্থানে 'জাজনগর' লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু সম্ভবত বারনির উক্তিতে কোনই গোলযোগ নাই। তখন 'জাজনগর' বলিতে উড়িষ্যার রাজার অধিকারভুক্ত সমস্ত অঞ্চল বুঝাইত, সে সময় বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা এবং হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার অনেকাংশ উড়িষ্যার রাজার অধিকারে ছিল। সেইরূপ 'সোনারগাঁও' বলিতেও সোনারগাঁওয়ের রাজার অধিকারভুক্ত সমস্ত অঞ্চল বুঝাইত; তখনকার দিনে শুধু পূর্ববঙ্গ নহে, মধ্যবঙ্গেরও অনেকখানি অঞ্চল এই রাজার অধীনে ছিল। বলবন খবর পাইয়াছিলেন যে তুগরল জাজনগর রাজ্যের দিকে গিয়াছেন, পশ্চিম বঙ্গের উত্তরার্ধ পার হইলেই তিনি ঐ রাজ্যে পৌছিবেন, কিন্তু বলবনের বাহিনী তাঁহার নাগাল ধরিয়া ফেলিলে তিনি পূর্বদিকে সরিয়া গিয়া সোনারগাঁওয়ের রাজার অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জলপথে পলাইতে পারেন, তখন আর তাঁহাকে ধরিবার কোন উপায় থাকিবে না। এইজন্য বলবনকে সোনারগাঁওয়ের রাজা রায় দনুজের সহিত চুক্তি করিতে হইয়াছিল।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই রায় দনুজ কে? ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গে দশরথদেব নামে একজন রাজা ছিলেন, ইঁহার পিতার নাম ছিল দামোদরদেব। দশরথদেব ও দামোদরদেবের কয়েকটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। দামোদরদেব ১২৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অন্তত ১২৪৩-৪৪ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পরে রাজা হন দশরথদেব, দশরথদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় তাঁহার 'অরিরাজ-দনুজমাধব' বিরুদ ছিল। বাংলার কুলজী-গ্রন্থগুলিতে লেখা আছে যে লক্ষ্মণসেনের সামান্য পরে দনুজমাধব নামে একজন রাজার আবির্ভাব হইয়াছিল। বলবন ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে রায় দনুজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সুতরাং 'অরিরাজ-দনুজমাধব' দশরথদেব, কুলজীগ্রন্থের দনুজমাধব এবং বারনির গ্রন্থে উল্লিখিত রায় দনুজকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

রায় দনুজ অত্যন্ত পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি বলবনের শিবিরে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন এই সর্তে যে তিনি বলবনের সভায় প্রবেশ করিলে বলবন উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সম্মান দেখাইবেন। বলবন এই সর্ত পালন করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, বলবনের সহিত আলোচনার পর রায় দনুজ কথা দিলেন যে তুগরল যদি তাঁহার অধিকারের মধ্যে জলে বা স্থলে অবস্থান করেন অথবা জলপথে পলাইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে আটকাইবেন। ইহার পর বলবন ৭০ ক্রোশ চলিয়া জাজনগর রাজ্যের সীমান্তের খানিকটা দূরে পৌঁছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক বারনির এই উক্তিকেও ভুল মনে করিয়াছেন, কিন্তু তখনকার 'সোনারগাঁও' রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত হইতে 'জাজনগর' রাজ্যের পূর্ব সীমান্তের দূরত্ব কোন কোন জায়গায় কিঞ্চিদূর্ধ্ব ৭০ ক্রোশ (১৪০ মাইল) হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

জাজনগরের সীমার কাছাকাছি উপস্থিত হইয়া বলবন তুগরলের কোন সংবাদ পাইলেন না, তিনি অন্য পথে গিয়াছিলেন। বলবন মালিক বেকতরস্‌কে সাত আট হাজার ঘোড়সওয়ার সৈন্য দিয়া আগে পাঠাইয়া দিলেন। বেকতরস্‌ চারিদিকে গুপ্তচর পাঠাইয়া তুগরলের খোঁজ লইতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন তাঁহার দলের মুহম্মদ শের-আন্দাজ এবং মালিক মুকদ্দর একদল বণিকের কাছে সংবাদ পাইলেন যে তুগরল দেড় ক্রোশ দূরেই শিবির স্থাপন করিয়া আছেন, পরদিন

তিনি জাজনগর রাজ্যে প্রবেশ করিবেন। শের-আন্দাজ মালিক বেকতবুসের কাছে এই খবর পাঠাইয়া নিজের মুষ্টিমেয় কয়েক জন অনুচর লইয়াই তুগরলের শিবির আক্রমণ করিলেন। তুগরল বলবনের সমগ্র বাহিনী আক্রমণ করিয়াছে ভাবিয়া শিবিরের সামনে নদী সাঁতরাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু একজন সৈন্য তাঁহাকে শরাহত করিয়া তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিল। তখন তুগরলের সৈন্যেরা শের-আন্দাজ ও তাঁহার অনুচরদের আক্রমণ করিল। ইহারা হয়তো নিহত হইতেন, কিন্তু মালিক বেক্‌তব্‌স্‌ তাঁহার বাহিনী লইয়া সময়মত উপস্থিত হওয়াতে ইহারা রক্ষা পাইলেন।

তুগরল নিহত হইলে বলবন বিজয়গৌরবে লুণ্ঠনলব্ধ প্রচুর ধনসম্পত্তি এবং বহু বন্দী লইয়া লখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। লখনৌতির বাজারে এক ক্রোশেরও অধিক দৈর্ঘ্য পরিমিত স্থান জুড়িয়া সারি সারি বধ্যমঞ্চ নির্মাণ করা হইল এবং সেই সব বধ্যমঞ্চে তুগরলের পুত্র, জামাতা, মন্ত্রী, কর্মচারী, ক্রীতদাস, সেনাধ্যক্ষ, দেহরক্ষী, তরবারি-বাহক এবং পাইকদের ফাঁসী দেওয়া হইল। তুগরলের অনুচরদের মধ্যে যাহারা দিল্লীর লোক, তাহাদের দিল্লীতে লইয়া গিয়া তাহাদের আত্মীয় ও বন্ধুদের সামনে বধ করা হইবে বলিয়া বলবন স্থির করিলেন। অবশ্য দিল্লীতে লইয়া যাওয়ার পর বলবন দিল্লীর কাজীর অনুরোধে তাহাদের অধিকাংশকেই মুক্তি দিয়াছিলেন। লখনৌতিতে এত লোকের প্রাণ বধ করিয়া বলবন যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমর্থকদেরও মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই হত্যাকাণ্ডের পরে বলবন আরও কিছুদিন লখনৌতিতে রহিলেন এবং এখানকার বিশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করিলেন। তাহার পর তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। বুগরা খানকে অনেক সদুপদেশ দিয়া এবং পূর্ববঙ্গ বিজয়ের চেষ্টা করিতে বলিয়া বলবন আনুমানিক ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

২। নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ (বুগরা খান)

বলবনের কনিষ্ঠ পুত্রের প্রকৃত নাম নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ, কিন্তু ইনি বুগরা খান নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তুগরলের বিরুদ্ধে বলবনের অভিযানের সময়

ইনি বলবনের বাহিনীর পিছনে যে বাহিনী ছিল, তাহা পরিচালনা করিয়াছিলেন। বলবন তুগরলের স্বর্ণ ও হস্তীগুলি দিল্লীতে লইয়া গিয়াছিলেন, অন্যান্য সম্পত্তি বুগরা খানকে দিয়াছিলেন। বুগরা খানকে তিনি ছত্র প্রভৃতি রাজচিহ্ন ব্যবহারেরও অনুমতি দিয়াছিলেন।

বুগরা খান অত্যন্ত অলস ও বিলাসী ছিলেন। লখনৌতির শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি ভোগবিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন। পিতা দূর বিদেশে, সুতরাং বুগরা খানকে নিবৃত্ত করিবার কেহ ছিল না।

এইভাবে বৎসর চারেক কাটিয়া গেল। তাহার পর বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মঙ্গোলদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন (১৮৮৬ খ্রীঃ)। উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুতে বলবন শোকে ভাঙিয়া পড়িলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পীড়িত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। বলবন তখন নিজের অন্তিম সময় আসন্ন বুঝিয়া বুগরা খানকে বাংলা হইতে আনাইয়া তাঁহাকে দিল্লীতে থাকিতে ও তাঁহার মৃত্যুর পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। অতঃপর বুগরা খান তিন মাস দিল্লীতেই রহিলেন। কিন্তু কঠোর সংযমী বলবনের কাছে থাকিয়া তাঁহার ভোগবিলাসের তৃষ্ণা মিটানোর কোন সুযোগই মিলিতেছিল না বলিয়া তিনি অধৈর্য হইয়া উঠিলেন। এদিকে বলবনেরও দিন দিন অবস্থার উন্নতি হইতেছিল। তাহার ফলে একদিন বুগরা খান সমস্ত ধৈর্য হারাইয়া বসিলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া আবার লখনৌতিতে ফিরিয়া গেলেন। পথে তিনি পিতার অবস্থার পুনরায় অবনতি হওয়ার সংবাদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু আবার দিল্লীতে ফিরিতে তাঁহার সাহস হয় নাই। লখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বুগরা খান পূর্ববৎ এদেশ শাসন করিতে লাগিলেন।

ইহার অল্প পরেই বলবন পরলোকগমন করিলেন (১২৮৭ খ্রীঃ)। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের পুত্র কাইখসরুকে আপনার উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উজীর ও কোতোয়ালের সহিত কাইখসরুর পিতার বিরোধ ছিল, এইজন্য তাঁহারা কাইখসরুকে দিল্লীর সিংহাসনে না বসাইয়া বুগরা খানের পুত্র কাইকোবাদকে বসাইলেন। এদিকে লখনৌতিতে বুগরা খান স্বাধীন হইলেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ ও খুৎবা পাঠ করাইতে সুরু করিলেন।

কাইকোবাদ তাঁহার পিতার চেয়েও বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক

ছিলেন। তিনি সুলতান হইবার পরে দিল্লীর সন্নিকটে কীলোখারী নামক স্থানে একটি নূতন প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া চরম উচ্ছৃঙ্খলতায় মগ্ন হইয়া গেলেন। মালিক নিজামুদ্দীন এবং মালিক কিওয়ামুদ্দীন নামে দুই ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিল, ইহাদের প্রথমজন প্রধান বিচারপতি ও রাজপ্রতিনিধি এবং দ্বিতীয়জন সহকারী রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইল এবং ইহারাই রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া দাঁড়াইল। ইহাদের কুমন্ত্রণায় কাইকোবাদ কাইখসরুকে নিহত করাইলেন, পুরাতন উজীরকে অপমান করিলেন এবং বলবনের আমলের কর্মচারীদের সকলকেই একে একে নিহত বা পদচ্যুত করিলেন।

কাইকোবাদ যে এইরূপে সর্বনাশের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছেন, এই সংবাদ লখনৌতিতে বুগরা খানের কাছে পৌঁছিল। তিনি তখন পুত্রকে অনেক সদুপদেশ দিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু কাইকোবাদ (বোধ হয় পিতার "উপযুক্ত পুত্র" বলিয়াই) পিতার উপদেশে কর্ণপাত করিলেন না। বুগরা খান যখন দেখিলেন যে পত্র লিখিয়া কোন লাভ নাই, তখন তিনি স্থির করিলেন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করার চেষ্টা করিবেন এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি এক সৈন্যবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন।

পিতা সসৈন্যে দিল্লীতে আসিতেছেন শুনিয়া কাইকোবাদ তাঁহার প্রিয়পাত্র নিজামুদ্দীনের সহিত পরামর্শ করিলেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী এক সৈন্য-বাহিনী লইয়া বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন। সরযূ নদীর তীরে যখন তিনি পৌঁছিলেন, তখন বুগরা খান সরযূর অপর পারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

ইহার পর দুই তিন দিন উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া রহিল। কিন্তু যুদ্ধ হইল না। তাহার বদলে সন্ধির কথাবার্তা চলিতে লাগিল। সন্ধির সর্ত স্থির হইলে বুগরা খান তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কাইকাউসকে উপঢৌকন সমেত কাইকোবাদের দরবারে পাঠাইলেন। কাইকোবাদও পিতার কাছে নিজের শিশুপুত্র কাইমুরস্‌কে একজন উজীরের সঙ্গে উপহার সমেত পাঠাইলেন। পৌত্রকে দেখিয়া বুগরা খান সমস্ত কিছু ভুলিয়া গেলেন এবং দিল্লীর উজীরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তাহাকে আদর করিতে লাগিলেন।

দুষ্ট নিজামুদ্দীনের পরামর্শে কাইকোবাদ এই সর্তে বুগরা খানের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন যে বুগরা খান কাইকোবাদের সভায় গিয়া সাধারণ প্রাদেশিক শাসনকর্তার মতই তাঁহাকে অভিবাদন করিবেন ও সম্মান দেখাইবেন। অনেক

আলাপ-আলোচনা ও ভীতিপ্রদর্শনের পরে বুগরা খান এই সর্তে রাজী হইয়াছিলেন। এই সর্ত পালনের জন্য বুগরা খান একদিন বৈকালে সরযূ নদী পার হইয়া কাইকোবাদের শিবিরে গেলেন। কাইকোবাদ তখন সম্রাটের উচ্চ মসনদে বসিয়াছিলেন। কিন্তু পিতাকে দেখিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি খালি পায়েই তাঁহার পিতার কাছে দৌড়াইয়া গেলেন এবং তাঁহার পায়ে পড়িবার উপক্রম করিলেন। বুগরা খান তখন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কাইকোবাদ পিতাকে মসনদে বসিতে বলিলেন, কিন্তু বুগরা খান তাহাতে রাজী না হইয়া পুত্রকে নিজে লইয়া গিয়া মসনদে বসাইয়া দিলেন এবং নিজে মসনদের সামনে করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইভাবে বুগরা খান "সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন" করার পর কাইকোবাদ মসনদ হইতে নামিয়া আসিলেন। তখন সভায় উপস্থিত আমীরেরা দুই বাদশাহের শির স্বর্ণ ও রত্নে ভূষিত করিয়া দিলেন। শিবিরের বাহিরে উপস্থিত লোকেরা শিবিরের মধ্যে আসিয়া দুইজনকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিতে লাগিল, কবিরা বাদশাহদ্বয়ের প্রশস্তি করিতে লাগিলেন, এক কথায় পিতা-পুত্রের মিলনে কাইকোবাদের শিবিরে মহোৎসব উপস্থিত হইল। তাহার পর বুগরা খান নিজের শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পরেও কয়েকদিন বুগরা খান ও কাইকোবাদ সরযূ নদীর তীরেই রহিয়া গেলেন। এই কয়দিনও পিতাপুত্রে সাক্ষাৎকার ও উপহারবিনিময় চলিয়াছিল। বিদায়গ্রহণের পূর্বাহ্ণে বুগরা খান কাইকোবাদকে প্রকাশ্যে অনেক সদুপদেশ দিলেন, সংযমী হইতে বলিলেন এবং মালিক নিজামুদ্দীন ও কিওয়ামুদ্দীনকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু বিদায় লইবার সময় কাইকোবাদের কানে কানে বলিলেন যে, তিনি যেন এই দুইজন আমীরকে প্রথম সুযোগ পাইবামাত্র বধ করেন। ইহার পর দুই সুলতান নিজের নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

বিখ্যাত কবি আমীর খসরু কাইকোবাদের সভাকবি ছিলেন এবং এই অভিযানে তিনি কাইকোবাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। কাইকোবাদের নির্দেশে তিনি বুগরা খান ও কাইকোবাদের এই মধুর মিলন অবিকলভাবে বর্ণনা করিয়া 'কিরান-ই-সদাইন' নামে একটি কাব্য লিখেন। সেই কাব্য হইতেই উপরের বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে।

কাইকোবাদের সঙ্গে সন্ধি হইবার পরে বুগরা খান—আউধের যে অংশ

তিনি অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা কাইকোবাদকে ফিরাইয়া দেন। কিন্তু বিহার তিনি নিজের দখলেই রাখিলেন।

দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পথে কাইকোবাদ মাত্র কয়েক দিন ভালভাবে চলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর আবার তিনি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন। তাঁহার প্রধান সেনাপতি জলালুদ্দীন খিলজী তাঁহাকে হত্যা করান (১২৯০ খ্রীঃ)। ইহার তিন মাস পরে জলালুদ্দীন কাইকোবাদের শিশু পুত্র কাইমুর্‌স্‌কে অপসারিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর বৎসর হইতে বাংলার সিংহাসনে বুগরা খানের দ্বিতীয় পুত্র রুকমুদ্দীন কাইকাউসকে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই। পুত্রের মৃত্যুজনিত শোকই বুগরা খানের সিংহাসন ত্যাগের কারণ বলিয়া মনে হয়।

৩। রুকনুদ্দীন কাইকাউস

মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, রুকনুদ্দীন কাইকাউস ১২৯১ হইতে ১৩০১ খ্রীঃ পর্যন্ত লখনৌতির সুলতান ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের বিশেষ কোন ঘটনার কথা জানা যায় নাই।

কাইকাউসের প্রথম বৎসরের একটি মুদ্রায় লেখা আছে যে ইহা 'বঙ্গ'-এর ভূমি-রাজস্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ববঙ্গের কিছু অংশ যে কাইকাউসের রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অংশ ১২৯১ খ্রীঃর পূর্বেই মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গের ত্রিবেণী অঞ্চলও কাইকাউসের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবত এই অঞ্চল কাইকাউসের রাজত্বকালেই প্রথম বিজিত হয়, কারণ প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে জাফর খান নামে একজন বীর মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম ত্রিবেণী জয় করিয়াছিলেন। কাইকাউসের অধীনস্থ রাজপুরুষ এক জাফর খানের নামাঙ্কিত দুইটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একটি শিলালিপি ত্রিবেণীতেই মিলিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, এই জাফর খানই কাইকাউসের রাজত্বকালে ত্রিবেণী জয় করেন। বিহারেও কাইকাউসের অধিকার ছিল, এই প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন খান ইখতিয়ারুদ্দীন ফিরোজ আতিগীন নামে একজন প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি।

কাইকাউসের সহিত প্রতিবেশী রাজ্যগুলির কী রকম সম্পর্ক ছিল, সে সম্বন্ধে

কিছু জানা যায় না। তবে দিল্লীর খিলজী সুলতানদের বাংলার উপর একটা আক্রোশ ছিল। জলালুদ্দীন খিলজী মুসলিম ঠগীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া নৌকায় বোঝাই করিয়া বাংলা দেশে পাঠাইয়া দিতেন, যাহাতে উহারা বাংলা দেশে লুঠতরাজ চালাইয়া এদেশের শাসক ও জনসাধারণকে অস্থির করিয়া তুলে।

৪। শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ

রুকনুদ্দীন কাইকাউসের পর শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ লখনৌতির সুলতান হন। ১৩০১ হইতে ১৩২২ খ্রীঃ—এই সুদীর্ঘ একুশ বৎসর কাল তিনি রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজ্যের আয়তন ছিল বিরাট। তাঁহার পূর্ববর্তী লখনৌতির সুলতানরা যে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, তাহার অতিরিক্ত বহু অঞ্চল—সাতগাঁও, ময়মনসিংহ ও সোনারগাঁও, এমন কি সুদূর সিলেট পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ইনি অত্যন্ত পরাক্রান্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন নরপতি ছিলেন, কিন্তু ইঁহার সম্বন্ধে খুব কম তথ্যই জানা যায়। ইঁহার বংশপরিচয়ও আমাদের অজ্ঞাত। ইব্‌ন্ বতুতার মতে ইনি বুগরা খানের পুত্র। কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্য এবং অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা ইব্‌ন্ বতুতার মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। যতদূর মনে হয় রুকনুদ্দীন কাইকাউসের আমলে যিনি বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন, সেই ইখতিয়ারুদ্দীন ফিরোজ আতিগীনই কাইকাউসের মৃত্যুর পরে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ নাম লইয়া সুলতান হন। ইতিপূর্বে বলবন বুগরা খানকে সাহায্য করিবার জন্য "ফিরোজ" নামক দুইজন যোগ্য ব্যক্তিকে বাংলা দেশে রাখিয়া গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন ফিরোজকে বুগরা খান কাইকোবাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; অপরজন বাংলাতেই ছিলেন, ইনিও আমাদের আলোচ্য শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের সহিত অভিন্ন হইতে পারেন।

শিলালিপির সাক্ষ্যের সহিত প্রাচান প্রবাদ ও 'খুর্শীনামা' নামক ফার্সী গ্রন্থের সাক্ষ্য মিলাইয়া লইলে দেখা যায়, শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলেই সর্বপ্রথম সাতগাঁও মুসলিম শক্তি কর্তৃক বিজিত হয়; এই বিজয়ে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব করেন ত্রিবেণী-বিজেতা জাফর খান; এই জাফর খান অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন, শিলালিপিতে ইনি "রাজা ও সম্রাটদের সাহায্যকারী" বলিয়া উল্লিখিত

হইয়াছেন ; ত্রিবেণী ও সাতগাঁও বিজয়ের পরে জাফর খান এই অঞ্চলেই পরলোক-গমন করেন ; ত্রিবেণীতে তাঁহার সমাধি আছে।

শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, শ্রীহট্ট বা সিলেটও শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালেই প্রথম বিজিত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে শাহ জলাল নামে একজন দরবেশ মুসলমানদের সিলেট অভিযানে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এই শাহ জলাল সম্ভবত শেখ জালালুদ্দীন তব্রিজীর (১১৯৭-১৩৪৭ খ্রীঃ) সহিত অভিন্ন।

কিংবদন্তী অনুসারে সাতগাঁও ও সিলেটের শেষ হিন্দু রাজাদের নাম যথাক্রমে ভূদেব নৃপতি ও গৌড়গোবিন্দ ; উভয়েই নাকি গোবধ করার জন্য মুসলিম প্রজাদের পীড়ন করিয়াছিলেন এবং সেই কারণে মুসলমানরা তাঁহাদের রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিল। এইসব কিংবদন্তীর বিশেষ কোন ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না।

শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের অন্তত ছয়টি বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইঁহাদের নাম—শিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহ, জলালুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ, গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ, নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ, হাতেম খান ও কৎলু খান। ইঁহাদের মধ্যে হাতেম খান পিতার রাজত্বকালে বিহার অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া শিলালিপি হইতে জানা যায়। শিহাবুদ্দীন, জলালুদ্দীন, গিয়াসুদ্দীন ও নাসিরুদ্দীন পিতার জীবদ্দশাতেই বিভিন্ন টাকশাল হইতে নিজেদের নামে মুদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে ইঁহারা পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত যে ভ্রান্ত, তাহা মুদ্রার সাক্ষ্য এবং বিহারের সমসাময়িক দরবেশ হাজী আহমদ য়াহয়া মনেরির 'মলফুজৎ' (আলাপ-আলোচনার সংগ্রহ)-এর সাক্ষ্য হইতে প্রতিপন্ন হয়। প্রকৃত সত্য এই যে, শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ তাঁহার ঐ চারি জন পুত্রকেও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিজ নামে মুদ্রা প্রকাশের অধিকার দিয়াছিলেন।

আহমদ য়াহয়া মনেরির 'মলফুজৎ'-এর মতে 'কামরু' (কামরূপ)-ও শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল এবং তাহার শাসনকর্তা ছিলেন গিয়াসুদ্দীন। এই 'মলফুজৎ' হইতে জানা যায় যে গিয়াসুদ্দীন অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও উদ্ধত প্রকৃতির এবং হাতেম খান একান্ত মৃদু ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন।

'মলফুজৎ'-এর সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজধানী ছিল সোনারগাঁওয়ে।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতেই বাংলার সুলতানের মুদ্রায় পাণ্ডুয়া (মালদহ জেলা) নগরের নামান্তর 'ফিরোজাবাদ'-এর উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবত শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের নাম অনুসারেই নগরীটির এই নাম রাখা হইয়াছিল।

৫। গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ ও নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ

শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে তিনজন সমসাময়িক লেখকের বিবরণ পাওয়া যায়। ইঁহারা হইলেন জিয়াউদ্দীন বারনি, ইসমি এবং ইব্‌ন্ বতুতা। এই তিনজন লেখকের উক্তি এবং মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে যাহা জানা যায়, তাহার সংক্ষিপ্তসার নীচে প্রদত্ত হইল।

শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ শিহাবুদ্দীনকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া লখনৌতি অধিকার করিলেন। গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরের হাতে শিহাবুদ্দীন বুগড়া ও নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম ব্যতীত তাঁহার আর সমস্ত ভ্রাতাই নিহত হইলেন। শিহাবুদ্দীন ও নাসিরুদ্দীন দিল্লীর তৎকালীন সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুগলকের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শিহাবুদ্দীন বুগড়া সম্ভবত সাহায্য প্রার্থনা করার অব্যবহিত পরেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন, কারণ ইহার পরে তাঁহার আর কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। বারনি লিখিয়াছেন যে লখনৌতির কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া গিয়াসুদ্দীন তুগলকের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গিয়াসুদ্দীন তুগলক এই সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিলেন এবং তাঁহার পুত্র জুনা খানের উপর দিল্লীর শাসনভার অর্পণ করিয়া পূর্ব ভারত অভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। প্রথমে তিনি ত্রিহুত আক্রমণ করিলেন এবং সেখানকার কর্ণাটবংশীয় রাজা হরিসিংহ-দেবকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া ঐ রাজ্যে প্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করিলেন। ত্রিহুতে নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। গিয়াসুদ্দীন তুগলক তাঁহার পালিত পুত্র তাতার খানের অধীনে এক বিরাট

সৈন্যবাহিনী নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে দিলেন। এই বাহিনী লখনৌতি অধিকার করিয়া লইল।

গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ ইতিমধ্যে লখনৌতি হইতে পূর্ববঙ্গে পলাইয়া গিয়াছিলেন এবং গিয়াসপুর (বর্তমান ময়মনসিংহ শহরের ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) অবস্থান করিতেছিলেন। শত্রুবাহিনীর অগ্রগতির খবর পাইয়া তিনি ঐ ঘাঁটি হইতে বাহির হইয়া লখনৌতির দিকে অগ্রসর হইলেন।

অতঃপর দুই পক্ষে যুদ্ধ হইল। ইসমি এই যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর প্রচণ্ড আক্রোশে তাঁহার ভ্রাতা নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম পরিচালিত শত্রুবাহিনীর বাম অংশে আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার আক্রমণের মুখে দিল্লীর সৈন্যেরা প্রথম প্রথম ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু সংখ্যাধিক্যের বলে তাহারা শেষ পর্যন্ত জয়ী হইল। গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর তখন পূর্ববঙ্গের দিকে পলায়ন করিলেন। হয়বৎউল্লার নেতৃত্বে দিল্লীর একদল সৈন্য তাঁহার অনুসরণ করিল। অবশেষে গিয়াসুদ্দীনের ঘোড়া একটি নদী পার হইতে গিয়া কাদায় পড়িয়া গেলে দিল্লীর সৈন্যেরা তাঁহাকে বন্দী করিল।

গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরকে তখন লখনৌতিতে লইয়া যাওয়া হইল এবং সেখানে দড়ি বাঁধিয়া তাঁহাকে গিয়াসুদ্দীন তুগলকের সভায় উপস্থিত করা হইল।

গিয়াসুদ্দীন তুগলক বাংলাকে তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিমকে লখনৌতি অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করিলেন; তাতার খান সোনারগাঁও ও সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। নাসিরুদ্দীন নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সার্বভৌম সম্রাট হিসাবে প্রথমে গিয়াসুদ্দীন তুগলকের এবং পরে মুহম্মদ তুগলকের নাম থাকিত।

গিয়াসুদ্দীন তুগলক বাংলাদেশ হইতে লুণ্ঠিত বহু ধনরত্ন এবং বন্দী গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরকে লইয়া দিল্লীর দিকে রওনা হইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি দিল্লীতে পৌঁছিতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র জুনা খান দিল্লীর উপকণ্ঠে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে মণ্ডপ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রবেশ করিবামাত্র তাহা ভাঙিয়া পড়িল, এবং ইহাতেই তাঁহার প্রাণান্ত হইল (১৩২৫ খ্রীঃ)।

ইহার পর জুনা খান মুহম্মদ শাহ নাম লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইতিহাসে তিনি মুহম্মদ তুগলক নামে পরিচিত। তিনি বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করিলেন। লখনৌতি অঞ্চলের শাসনভার কেবলমাত্র

নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহের অধীনে না রাখিয়া তিনি পিণ্ডার খিলজী নামে এক ব্যক্তিকে নাসিরুদ্দীনের সহযোগী শাসনকর্তা রূপে নিয়োগ করিয়া দিল্লী হইতে পাঠাইয়া দিলেন এবং পিণ্ডারকে 'কদর খান' উপাধি দিলেন; মালিক আবু-রেজাকে তিনি লখনৌতির উজীরের পদে নিয়োগ করিলেন। গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহকেও তিনি মুক্তি দিলেন এবং তাঁহাকে সোনারগাঁওয়ে তাতার খানের সহযোগী শাসনকর্তা রূপে নিয়োগ করিয়া পাঠাইলেন; ইতিপূর্বে তিনি তাঁহার অভিষেকের সময়ে তাতার খানকে 'বহরাম খান' উপাধি দিয়াছিলেন। মালিক ইজ্জুদ্দীন য়াহয়াকে তিনি সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করিলেন।

ইহার দুই বৎসর পর যখন মুহম্মদ তুগলক কিসলু খানের বিদ্রোহ দমন করিতে মুলতানে গেলেন, তখন লখনৌতি হইতে নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম গিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন এবং কিসলু খানের সহিত যুদ্ধে দক্ষতার পরিচয় দিলেন। ইহার পর নাসিরুদ্দীনের কী হইল, সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ ১৩২৫ খ্রীঃ হইতে ১৩২৮ খ্রীঃ পর্যন্ত বহরাম খানের সঙ্গে যুক্তভাবে সোনারগাঁও অঞ্চল শাসন করেন। এই কয় বৎসর তিনি নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ করেন; সেইসব মুদ্রায় যথারীতি সম্রাট হিসাবে মুহম্মদ তুগলকের নামও উল্লিখিত থাকিত। অতঃপর মুহম্মদ তুগলক যখন মুলতানে কিসলু খানের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর সুযোগ বুঝিয়া বিদ্রোহ করিলেন। কিন্তু বহরাম খানের তৎপরতার দরুণ তিনি বিশেষ কিছু করিবার সুযোগ পাইলেন না। বহরাম খান গিয়াসুদ্দীনের বিদ্রোহের সংবাদ পাইবামাত্র সমস্ত সেনানায়ককে একত্র করিলেন এবং এই সম্মিলিত বাহিনী লইয়া গিয়াসুদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া গিয়াসুদ্দীন পরাজিত হইলেন এবং যমুনা নদীর দিকে পলাইতে লাগিলেন। কিন্তু বহরাম খান তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে পিছন হইতে আক্রমণ করিলেন। গিয়াসুদ্দীনের বহু সৈন্য নদী পার হইতে গিয়া জলে ডুবিয়া গেল। গিয়াসুদ্দীন স্বয়ং বহরাম খানের হাতে বন্দী হইলেন। বহরাম খান তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার গাত্রচর্ম ছাড়াইয়া লইয়া মুহম্মদ তুগলকের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। মুহম্মদ তুগলক সমস্ত সংবাদ শুনিয়া সকলকে চল্লিশ দিন

উৎসব করিতে আদেশ দিলেন এবং গিয়াসুদ্দীন ও মুলতানের বিদ্রোহীর গাত্রচর্ম বিজয়-গম্বুজে টাঙাইয়া রাখিতে আদেশ দিলেন।

ইহার পর দশ বৎসর কদর খান, বহরাম খান ও মালিক ইজ্জুদ্দীন য়াহয়া মুহম্মদ তুগলকের অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে যথাক্রমে লখনৌতি, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও অঞ্চল শাসন করেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বহরাম খান পরলোক গমন করিবার পর তাঁহার বর্মরক্ষক ফখরুদ্দীন সোনারগাঁওয়ে বিদ্রোহ করিলেন। এই ঘটনা হইতেই বাংলার ইতিহাসের একটি নূতন অধ্যায় সুরু হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ—ইলিয়াস শাহী বংশ

১। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ

জিয়াউদ্দীন বারনির 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' গ্রন্থে ফখরুদ্দীনের বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে রচিত 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' হইতে।

এই বিবরণ নির্ভরযোগ্য। এই গ্রন্থের মতে বহরাম খানের মৃত্যুর পর তাঁহার বর্মরক্ষক ফখরুদ্দীন সোনারগাঁও অধিকার করিয়া নিজেকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিলে লখনৌতির শাসনকর্তা কদর খান, সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তা ইজ্জুদ্দীন য়াহয়া এবং সম্রাটের অধীনস্থ অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা তাঁহাকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন। তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ফখরুদ্দীন পলায়ন করেন। তাঁহার হাতী ও ঘোড়াগুলি কদর খানের অধীনে আসে। কদর খান লুঠ করিয়া অনেক রৌপ্যমুদ্রাও হস্তগত করেন। মাসিক হিসামুদ্দীন নামে জনৈক পদস্থ অমাত্য কদর খানকে এই অর্থ রাজকোষে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু কদর খান তাহা করিলেন না। তিনি সৈন্যদের এই লুঠের কোন ভাগও দিলেন না। ইহাতে সৈন্যেরা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইল এবং তাহারা ফখরুদ্দীনের সঙ্গে যোগ দিয়া কদর খানকে হত্যা করিল। ফখরুদ্দীন সোনারগাঁও পুনরধিকার করিলেন। লখনৌতিও তিনি সাময়িকভাবে অধিকার করিলেন এবং মুখলিশ নামে এক ব্যক্তিকে ঐ অঞ্চলে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু কদর খানের অধীনস্থ আরিজ-ই-লস্কর (সৈন্যবাহিনীর বেতন-দাতা) আলী মুবারক মুখলিশকে বধ করিয়া লখনৌতি অধিকার করিলেন। তিনি মুহম্মদ তুগলককে লখনৌতিতে একজন শাসনকর্তা পাঠাইতে অনুরোধ জানাইলেন। মুহম্মদ তুগলক দিল্লীর শাসনকর্তা য়ুসুফকে লখনৌতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু লখনৌতিতে পৌছিবার পূর্বেই য়ুসুফ পরলোকগমন করিলেন। মুহম্মদ তুগলক আর কাহাকেও তাঁহার জায়গায় নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন না। এদিকে লখনৌতিতে কোন শাসনকর্তা না থাকায় বিশৃঙ্খলা

দেখা দিয়াছিল। ইহার জন্য ফখরুদ্দীনের আক্রমণ রোধ করাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। তাই আলী মুবারক বাধ্য হইয়া আলাউদ্দীন (আলাউদ্দীন আলী শাহ) নাম গ্রহণ করিয়া নিজেকে লখনৌতির নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ লখনৌতি বেশীদিন নিজের অধিকারে রাখিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু সোনারগাঁও সমেত পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ বরাবরই তাঁহার অধীনে ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ঔরঙ্গজেবের অধীনস্থ কর্মচারী শিহাবুদ্দীন তালিশ লিখিয়াছিলেন যে ফখরুদ্দীন চট্টগ্রামও জয় করিয়াছিলেন এবং চাঁদপুর হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত তিনি একটি বাঁধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন ; চট্টগ্রামের বহু মসজিদ ও সমাধিও তাঁহারই আমলে নির্মিত হয়।

ইব্‌ন্ বত্তুতা ফখরুদ্দীনেরই রাজত্বকালে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি গোলযোগের ভয়ে ফখরুদ্দীনের সহিত দেখা করেন নাই। ইব্‌ন্ বত্তুতার ভ্রমণ-বিবরণী হইতে ফখরুদ্দীন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। ইব্‌ন্ বত্তুতা লিখিয়াছেন যে, ফখরুদ্দীনের সহিত (আলাউদ্দীন) আলী শাহের প্রায়ই যুদ্ধ হইত। ফখরুদ্দীনের নৌবল বেশী শক্তিশালী ছিল, তাই তিনি বর্ষাকাল ও শীতকালে লখনৌতি আক্রমণ করিতেন, কিন্তু গ্রীষ্মকালে আলী শাহ ফখরুদ্দীনের রাজ্য আক্রমণ করিতেন, কারণ স্থলে তাঁহারই শক্তি বেশী ছিল। ফকীরদের প্রতি ফখরুদ্দীনের অপরিসীম দুর্বলতা ছিল। তিনি একবার শায়দা নামে একজন ফকীরকে তাঁহার অন্যতম রাজধানী 'সোদকাওয়াঙ' (চাটগাঁও ?)-এ তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া জনৈক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতক শায়দা সেই সুযোগে বিদ্রোহ করে এবং ফখরুদ্দীনের একমাত্র পুত্রকে হত্যা করে। ফখরুদ্দীন তখন 'সোদকাওয়াঙে' ফিরিয়া আসেন। শায়দা তখন সোনারগাঁও-এ পলাইয়া যায় এবং ঐ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া থাকে, কিন্তু সোনারগাঁওয়ের অধিবাসীরা তাহাকে বন্দী করিয়া সুলতানের বাহিনীর কাছে পাঠাইয়া দেয়। তখন শায়দা ও অন্য অনেক ফকীরের প্রাণদণ্ড হইল। ইহার পরেও কিন্তু ফখরুদ্দীনের ফকীরদের প্রতি দুর্বলতা কমে নাই। তাঁহার আদেশের বলে ফকীররা মেঘনা নদী দিয়া বিনা ভাড়ায় নৌকায় যাতায়াত করিতে পারিত ; নিঃসম্বল ফকীরদের খাদ্যও দেওয়া হইত। সোনারগাঁও শহরে কোন ফকীর আসিলে সে আধ দীনার (আট আনার মত) পাইত।

ইব্‌ন্ বত্তুতার বিবরণ হইতে জানা যায় যে ফখরুদ্দীনের আমলে বাংলাদেশে জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব সুলভ ছিল। ফখরুদ্দীন কিন্তু হিন্দুদের প্রতি খুব ভাল ব্যবহার করেন নাই। ইব্‌ন্ বত্তুতা 'হবঙ্ক' শহরে (আধুনিক শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভুক্ত) গিয়া দেখিয়াছিলেন যে সেখানকার হিন্দুরা তাহাদের উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক সরকারকে দিতে বাধ্য হইত এবং ইহা ব্যতীত তাহাদের আরও নানারকম কর দিতে হইত।

কয়েকখানি ইতিহাসগ্রন্থের মতে ফখরুদ্দীন শত্রুর হাতে নিহত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহার হাতে তিনি নিহত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণের উক্তির মধ্যে ঐক্য নাই এবং এইসব বিবরণের মধ্যে যথেষ্ট ভুলও ধরা পড়িয়াছে। ফখরুদ্দীন সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহার ভিত্তিতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে ফখরুদ্দীন ১৩৩৮ হইতে ১৩৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন।

ফখরুদ্দীন সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে তাঁহার মুদ্রাগুলি অত্যন্ত সুন্দর, বাংলাদেশে প্রাপ্ত সমস্ত মুদ্রার মধ্যে এইগুলিই শ্রেষ্ঠ।

২। ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ

ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের ঠিক পরেই ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ নামে এক ব্যক্তি পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন (১৩৪৯-১৩৫২ খ্রীঃ)। ইখতিয়ারুদ্দীনের সোনারগাঁও-এর টাকশালে উৎকীর্ণ অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রাগুলি হুবহু ফখরুদ্দীনের মুদ্রার অনুরূপ। এই সব মুদ্রায় ইখতিয়ারুদ্দীনকে "সুলতানের পুত্র সুলতান" বলা হইয়াছে। সুতরাং ইখতিয়ারুদ্দীন যে ফখরুদ্দী-নেরই পুত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে এই ইখতিয়ারুদ্দীনের নাম পাওয়া যায় না।

৭৫৩ হিজরায় (১৩৫২-৫৩ খ্রীঃ) শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও অধিকার করেন। কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থের মতে তিনি ফখরুদ্দীনকে এই সময়ে বধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য হইতে পারে না, কারণ ফখরুদ্দীন ইহার তিন বৎসর পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। সম্ভবত ইখতিয়ারুদ্দীনই ইলিয়াস শাহের হাতে নিহত হন।

৩। আলাউদ্দীন আলী শাহ

আলাউদ্দীন আলী শাহ কীভাবে লখনৌতির রাজা হইয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের সহিত আলী শাহের প্রায়ই সংঘর্ষ হইত। এ সম্বন্ধেও পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

আলী শাহ সম্ভবত লখনৌতি অঞ্চল ভিন্ন আর কোন অঞ্চল অধিকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার সমস্ত মুদ্রাই পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদের টাকশালে নির্মিত হইয়াছিল। যতদূর মনে হয় তিনি গৌড় বা লখনৌতি হইতে পাণ্ডুয়ায় তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ইহার পর প্রায় একশত বৎসর পাণ্ডুয়াই বাংলার রাজধানী ছিল। আলাউদ্দীন আলী শাহ ৭৪২ হিজরায় (১৩৪১-৪২ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মাত্র এক বৎসর কয়েক মাস রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। মালিক ইলিয়াস হাজী নামে তাঁহার অধীনস্থ এক ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে বধ করেন এবং শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নাম গ্রহণ করিয়া নিজে সুলতান হন।

পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত 'শাহ জলালের দরগা' আলাউদ্দীন আলী শাহই প্রথম নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

৪। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের পূর্ব-ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় না। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর আরবী ঐতিহাসিক ইব্‌ন্-ই হজর ও অল-সখাওয়ীর মতে ইলিয়াস শাহের আদি নিবাস ছিল পূর্ব ইরানের সিজিস্তানে। পরবর্তীকালে রচিত ইতিহাসগ্রন্থগুলির কোনটিতে তাঁহাকে আলী শাহের ধাত্রীমাতার পুত্র, কোনটিতে তাঁহার ভৃত্য বলা হইয়াছে।

লখনৌতি রাজ্যের অধীশ্বর হইবার পর ইলিয়াস রাজ্যবিস্তার ও অর্থসংগ্রহে মন দেন। প্রথমে সম্ভবত তিনি সাতগাঁও অঞ্চল অধিকার করেন। নেপালের সমসাময়িক শিলালিপি ও গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে, ইলিয়াস নেপাল আক্রমণ করিয়া সেখানকার বহু নগর জ্বালাইয়া দেন এবং বহু মন্দির ধ্বংস করেন; বিখ্যাত পশুপতিনাথের মূর্তিটি তিনি তিন খণ্ড করেন (১৩৫০ খ্রীঃ)। ইলিয়াস

-রাজ্যবিস্তার করিবার জন্য নেপালে অভিযান করেন নাই, সেখানে ব্যাপকভাবে লুঠপাট করিয়া ধন সংগ্রহ করাই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। 'তবকাৎ-ই-আকবরী' ও 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'য় লেখা আছে, ইলিয়াস উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া চিল্কা হ্রদের সীমা পর্যন্ত অভিযান চালান এবং সেখানে ৪৪টি হাতী সমেত অনেক সম্পত্তি লুঠ করেন। বারনির 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' হইতে জানা যায় যে ইলিয়াস ত্রিহুত অধিকার করিয়াছিলেন; ষোড়শ শতাব্দীর ঐতিহাসিক মুল্লা তকিয়ার মতে ইলিয়াস হাজীপুর অবধি জয় করেন। 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী' নামে একটি সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ইলিয়াস চম্পারণ, গোরক্ষপুর ও কাশী প্রভৃতি অঞ্চলও জয় করেন। পূর্বদিকেও ইলিয়াস রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে ইলিয়াস ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহের নিকট হইতে সোনারগাঁও অঞ্চল অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন (১৩৫২ খ্রীঃ)। কামরূপেরও অন্তত কতকাংশ ইলিয়াসের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, কারণ তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহের রাজত্বের প্রথম বৎসরের একটি মুদ্রা কামরূপের টাকশালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

এইভাবে ইলিয়াস শাহ নানা রাজ্য জয় করায় এবং পূর্বতন তুগলক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অনেক অঞ্চল অধিকার করায় দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ তুগলক ক্রুদ্ধ হন এবং ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই অভিযানের সময় ফিরোজ শাহ কর হ্রাস প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়া ইলিয়াস শাহের প্রজাদের দলে টানিবার চেষ্টা করেন এবং তাহাতে আংশিক সাফল্য লাভ করেন। এই অভিযানের ফলে শেষপর্যন্ত ত্রিহুত প্রভৃতি নববিজিত অঞ্চলগুলি ইলিয়াসের হস্তচ্যুত হয়, কিন্তু বাংলায় তাঁহার সার্বভৌম অধিকার অক্ষুণ্ণই রহিয়া যায়।

জিয়াউদ্দীন বারনির 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী', শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফ-এর 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' এবং অজ্ঞাতনামা সমসাময়িক ব্যক্তির লেখা 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী' হইতে ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই তিনটি গ্রন্থই ফিরোজ শাহের পক্ষভুক্ত লোকের লেখা বলিয়া ইহাদের মধ্যে একদেশদর্শিতা উৎকটরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহাদের বিবরণের সারমর্ম এই।

ফিরোজ শাহ তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের পরেই (১৩৫১ খ্রীঃ) সংবাদ পান যে ইলিয়াস ত্রিহুত অধিকার করিয়া সেখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে

সকলের উপর অত্যাচার ও লুঠতরাজ চালাইতেছে। ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ফিরোজ শাহ ইলিয়াসকে দমন করিবার জন্য এক বিশাল বাহিনী লইয়া বাংলার দিকে যাত্রা করেন। অযোধ্যা প্রদেশ হইয়া তিনি ত্রিহুতে পৌছান এবং ত্রিহুত পুনরধিকার করেন। অতঃপর ফিরোজ শাহ বাংলাদেশে উপনীত হইয়া ইলিয়াসের রাজধানী পাণ্ডুয়া জয় করিয়া লন। ইলিয়াস তাহার পূর্বেই পাণ্ডুয়া হইতে তাঁহার লোকজন সরাইয়া লইয়া একডালা নামক একটি অনতি-দূরবর্তী দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই একডালা যেমনই বিরাট, তেমনি দুর্ভেদ্য দুর্গ; ইহার চারিদিক নদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ফিরোজ শাহ কিছুকাল একডালা দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিলেন, কিন্তু ইলিয়াস আত্মসমর্পণের কোন লক্ষণই দেখাইলেন না। অবশেষে একদিন ফিরোজ শাহের সৈন্যেরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়ায় ইলিয়াস মনে করিলেন ফিরোজ শাহ পশ্চাদপসরণ করিতেছেন। (ইহা বারনির বিবরণে লিখিত হইয়াছে, আফিফ ও 'সিরাৎ'-এর বিবরণ এক্ষেত্রে ভিন্নরূপ) তখন তিনি একডালা দুর্গ হইতে সসৈন্যে বাহির হইয়া ফিরোজ শাহের বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। দুই পক্ষে যে যুদ্ধ হইল তাহাতে ইলিয়াস পরাজিত হইলেন, এবং ইহার পর তিনি আবার একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এতদূর পর্যন্ত এই তিনটি গ্রন্থের বিবরণের মধ্যে মোটামুটিভাবে ঐক্য আছে, কেবলমাত্র দুই একটি খুঁটিনাটি বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়; ইলিয়াস শাহ সম্বন্ধে বিদ্বেষমূলক উক্তিগুলি বাদ দিলে এই বিবরণ মোটের উপর নির্ভরযোগ্য। কিন্তু যুদ্ধের ধরন এবং পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে তিনটি গ্রন্থের উক্তিতে মিল নাই এবং তাহা বিশ্বাসযোগ্যও নহে। বারনির মতে এই যুদ্ধে ফিরোজ শাহের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয় নাই, ইলিয়াসের অসংখ্য সৈন্য :মারা পড়িয়াছিল এবং ফিরোজ শাহ ৪৪টি হাতী সমেত ইলিয়াসের বহু সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছিলেন; ইলিয়াসের পরাজয়ের পরে ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গ অধিকার করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই, কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে ৪৪টি হাতী হারানোর ফলে ইলিয়াসের দম্ভ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে! আফিফের মতে ইলিয়াস শাহের অন্তঃপুরের মহিলারা একডালা দুর্গের ছাদে দাঁড়াইয়া মাথার কাপড় খুলিয়া শোক প্রকাশ করায় ফিরোজ শাহ বিচলিত হইয়াছিলেন এবং মুসলমানদের নিধন ও মহিলাদের অমর্যাদা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া একডালা দুর্গ অধিকারের পরিকল্পনা ত্যাগ

করিয়াছিলেন; তিনি বাংলাদেশের বিজিত অঞ্চলগুলি স্থায়িভাবে নিজের অধিকারে রাখার ব্যবস্থাও করেন নাই, কারণ এ দেশ জলাভূমিতে পূর্ণ। 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র মতে ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গের অধিবাসীদের, বিশেষত মহিলাদের করুণ আবেদনের ফলে একডালা দুর্গ অধিকারে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।

এই সমস্ত কথা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। ফিরোজ শাহ যে এই সমস্ত কারণের জন্য একডালা দুর্গ অধিকারে বিরত হন নাই, তাহার প্রমাণ,—ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পরে তিনি আর একবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন ও একডালা দুর্গ জয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মোটের উপর ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয় যে ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই বলিয়াই করেন নাই। যুদ্ধে ফিরোজ শাহের কোন ক্ষতি হয় নাই,—বারনির এই কথাও সত্য বলিয়া মনে হয় না। আফিফ লিখিয়াছেন যে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল এবং পরবর্তী গ্রন্থ 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে তাঁহার উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়।

আসল কথা, ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের যুদ্ধে কোন পক্ষই চূড়ান্তভাবে জয়ী হইতে পারে নাই। ফিরোজ শাহ যুদ্ধের ফলে শেষ পর্যন্ত কয়েকজন বন্দী, কিছু লুঠের মাল এবং কয়েকটি হাতী ভিন্ন আর কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পক্ষেও নিশ্চয়ই কিছু ক্ষতি হইয়াছিল, যাহা তাঁহার অনুগত ঐতিহাসিকরা গোপন করিয়া গিয়াছেন। ইলিয়াস যুদ্ধের আগেও একডালা দুর্গে ছিলেন, এখনও তাহাই রহিয়া গেলেন। সুতরাং কার্যত তাঁহার কোন ক্ষতিই হয় নাই। ফিরোজ শাহ যে কেন পশ্চাদপসরণ করিলেন, তাহাও স্পষ্টই বোঝা যায়। বারনি ও আফিফ লিখিয়াছেন যে, যে সময় ফিরোজ শাহ একডালা অবরোধ করিয়াছিলেন, তখন বর্ষাকাল আসিতে বেশী দেরী ছিল না। বর্ষাকাল আসিলে চারিদিক জলে প্লাবিত হইবে, ফলে ফিরোজ শাহের বাহিনী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, মশার কামড়ে ঘোড়াগুলি অস্থির হইবে এবং তখন ইলিয়াস অনায়াসেই জয়লাভ করিবেন, এই সব ভাবিয়া ফিরোজ শাহ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করিতে-ছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, ফিরোজ শাহের আক্রমণের সময় ইলিয়াস প্রথমেই সম্মুখ যুদ্ধ না করিয়া কৌশলপূর্ণ পশ্চাদপসরণ করিয়াছিলেন, ফিরোজ শাহকে দেশের মধ্যে অনেক দূর আসিতে দিয়াছিলেন এবং নিজে একডালার দুর্ভেদ্য

দুর্গে আশ্রয় লইয়া বর্ষার প্রতীক্ষায় কালহরণ করিতেছিলেন। ফিরোজ শাহ ইলিয়াসের সঙ্গে একদিনের যুদ্ধে কোনরকমে নিজের মান বাঁচাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই যুদ্ধে ইলিয়াসের শক্তিরও পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন যে ইলিয়াসকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। উপরন্তু বর্ষাকাল আসিয়া গেলে তিনি ইলিয়াস শাহের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইবেন। সেইজন্য, ইলিয়াসের হাতী জয় করিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিয়াছি, এই জাতীয় কথা বলিয়া ফিরোজ শাহ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন এবং মানে মানে বাংলাদেশ হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

ফিরোজ শাহ একডালার নাম বদলাইয়া 'আজাদপুর' রাখিয়াছিলেন। দিল্লীতে পৌঁছিয়া ফিরোজ শাহ ধুমধাম করিয়া 'বিজয়-উৎসব' অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ হইতে তাঁহার বিদায়গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইলিয়াস তাঁহার অধিকৃত বাংলার অঞ্চলগুলি পুনরধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই দুই সুলতানের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধির ফলে ফিরোজ শাহ ইলিয়াস শাহের স্বাধীনতা কার্যত স্বীকার করিয়া লন। ইহার পরে দুই রাজা নিয়মিতভাবে পরস্পরের কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন।

একডালার যুদ্ধে ইলিয়াস শাহের সৈন্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী বীরত্ব প্রদর্শন করে তাঁহার বাঙালী পাইক অর্থাৎ পদাতিক সৈন্যেরা। পাইকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল হিন্দু। পাইকদের দলপতি সহদেব এই যুদ্ধে প্রাণ দেন।

এই একডালা কোন্ স্থানে বর্তমান ছিল, সে সম্বন্ধে এতদিন কিছু মতভেদ ছিল। তবে বর্তমানে এ সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে গৌড় নগরের পাশে গঙ্গাতীরে একডালা অবস্থিত ছিল।*

ইলিয়াস শাহ সম্বন্ধে প্রামাণিকভাবে আর বিশেষ কোন তথ্যই জানা যায় না। তিনি যে দৃঢ়চেতা ও অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তাহা ফিরোজ শাহের আক্রমণ প্রতিরোধ এবং পরিণামে সাফল্য অর্জন হইতেই বুঝা যায়। মুসলিম সাধুসন্তদের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল। তাঁহার সময়ে বাংলাদেশে তিনজন বিশিষ্ট মুসলিম সন্ত বর্তমান ছিলেন—অখী সিরাজুদ্দীন, তাঁহার শিষ্য আলা অল-হক এবং রাজা বিয়াবানি। কথিত আছে, ফিরোজ শাহের একডালা

---

* এ সম্বন্ধে লেখকের বিস্তৃত আলোচনা—'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর' গ্রন্থের (২য় সং) অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

দুর্গ অবরোধের সময় রাজা বিয়াবানির মৃত্যু হয় এবং ইলিয়াস শাহ অসীম বিপদের ঝুঁকি লইয়া ফকীরের ছদ্মবেশে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন, দুর্গে ফিরিবার আগে ইলিয়াস ফিরোজ শাহের সহিত দেখা করিয়া কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, কিন্তু ফিরোজ শাহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই এবং পরে সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বন্দী করার এত বড় সুযোগ হারানোর জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন।

অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থের মতে ইলিয়াস শাহ ভাঙ্ বা সিদ্ধির নেশা করিতেন। 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র মতে ইলিয়াস কুষ্ঠরোগী ছিলেন। কিন্তু ইহা ইলিয়াসের শত্রুপক্ষের লোকের বিদ্বেষপ্রণোদিত মিথ্যা উক্তি বলিয়া মনে হয়।

ইলিয়াস শাহ ৭৫৯ হিজরায় (১৩৫৮-৫৯ খ্রীঃ) পরলোক গমন করেন।

৫। সিকন্দর শাহ

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সিকন্দর শাহ সিংহাসনে বসেন। তিনি সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর (আনুমানিক ১৩৫৮ হইতে ১৩৯১ খ্রীঃ পর্যন্ত) রাজত্ব করেন। বাংলার আর কোন সুলতান এত বেশী দিন রাজত্ব করেন নাই।

সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে ফিরোজ শাহ তুগলক আবার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। পূর্বোল্লিখিত 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী' এবং শাম্স্-ই-সিরাজ আফিফের 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' হইতে এই আক্রমণ ও তাহার পরিণামের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। আফিফ লিখিয়াছেন যে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের জামাতা জাফর খান দিল্লীতে গিয়া ফিরোজ শাহের কাছে অভিযোগ করেন যে ইলিয়াস শাহ তাঁহার শ্বশুরের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছেন ; ফিরোজ শাহ তখন ইলিয়াসকে শাস্তি দিবার জন্য এবং জাফর খানকে শ্বশুরের রাজ্যের সিংহাসনে বসাইবার জন্য বাংলাদেশে অভিযান করেন। কিন্তু যখন তিনি বাংলাদেশে পৌঁছান, তখন ইলিয়াস শাহ পরলোক গমন করিয়াছিলেন এবং সিকন্দর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সিকন্দর শাহের সহিতই ফিরোজ শাহের সংঘর্ষ হইল।

আফিফ এবং 'সিরাৎ' হইতে জানা যায় যে, সিকন্দর ফিরোজ শাহের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ না করিয়া একডালা দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ফিরোজ শাহ অনেক দিন একডালা দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। অবশেষে উভয় পক্ষই ক্লান্ত হইয়া পড়িলে সন্ধি স্থাপিত হয়।

আফিফ ও 'সিরাৎ'-এর মতে সিকন্দর শাহের পক্ষ হইতেই প্রথমে সন্ধি প্রার্থনা করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ সন্ধির ফলে ফিরোজ শাহ কোন সুবিধাই লাভ করিতে পারেন নাই। পরবর্তী ঘটনা হইতে দেখা যায়, তিনি বাংলাদেশের উপর সিকন্দর শাহের সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং সমকক্ষ রাজার মতই তাঁহার সঙ্গে দূত ও উপঢৌকন বিনিময় করিয়াছিলেন। আফিফের মতে সিকন্দর শাহ জাফর খানকে সোনারগাঁও অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু জাফর খান বলেন যে, তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা সকলেই নিহত হইয়াছে, সেইজন্য তিনি সোনারগাঁওয়ে নিরাপদে থাকিতে পারিবেন না ; এই কারণে তিনি ঐ রাজ্য গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না। ফিরোজ শাহের এই দ্বিতীয় বঙ্গাভিযান শেষ হইতে দুই বৎসর সাত মাস লাগিয়াছিল।

সিকন্দর শাহের একটি বিশিষ্ট কীর্তি পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ (১৩৬৯ খ্রীঃ)। স্থাপত্য-কৌশলের দিক দিয়া এই মসজিদটি অতুলনীয়। ভারতবর্ষে নির্মিত সমস্ত মসজিদের মধ্যে আদিনা মসজিদ আয়তনের দিক হইতে দ্বিতীয়।

পিতার মত সিকন্দর শাহও মুসলিম সাধুসন্তদের ভক্ত ছিলেন। দেবীকোটের বিখ্যাত সন্ত মুল্লা আতার সমাধিতে তিনি একটি মসজিদ তৈরী করাইয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত দরবেশ আলা অল-হকের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

সিকন্দরের শেষ জীবন সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-এ একটি করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কাহিনীটির সারমর্ম এই। সিকন্দর শাহের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে সতেরটি পুত্র এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটিমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভ-জাত পুত্র গিয়াসুদ্দীন সব দিক দিয়াই যোগ্য ছিলেন। ইহাতে সিকন্দরের প্রথমা স্ত্রীর মনে প্রচণ্ড ঈর্ষা হয় এবং তিনি গিয়াসুদ্দীনের বিরুদ্ধে সিকন্দর শাহের মন বিষাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। তাহাতে সিকন্দর শাহের মন একটু টলিলেও তিনি গিয়াসুদ্দীনকেই রাজ্য শাসনের ভার দেন। গিয়াসুদ্দীন কিন্তু বিমাতার মতি-গতি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া সোনারগাঁওয়ে চলিয়া যান। কিছুদিনের মধ্যে তিনি

এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করিলেন এবং পিতার নিকট সিংহাসন দাবী করিয়া লখনৌতির দিকে রওনা হইলেন। গোয়ালপাড়ার প্রান্তরে পিতাপুত্রে যুদ্ধ হইল। গিয়াসুদ্দীন তাঁহার পিতাকে বধ করিতে সৈন্যদের নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু একজন সৈন্য না চিনিয়া সিকন্দরকে বধ করিয়া বসে। শেষ নিঃশ্বাস ফেলিবার আগে সিকন্দর বিদ্রোহী পুত্রকে আশীর্বাদ জানাইয়া যান।

এই কাহিনীটি সম্পূর্ণভাবে সত্য কিনা তাহা বলা যায় না, তবে পিতার বিরুদ্ধে গিয়াসুদ্দীনের বিদ্রোহ এবং পুত্রের সহিত যুদ্ধে সিকন্দরের নিহত হওয়ার কথা যে সত্য, তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

৬। গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ

ইলিয়াস শাহী বংশের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই বংশের প্রথম তিনজন রাজাই অত্যন্ত যোগ্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। তন্মধ্যে ইলিয়াস শাহ ও সিকন্দর শাহ যুদ্ধ ও স্বাধীনতা রক্ষার দ্বারা নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সিকন্দর শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাঁহার লোকরঞ্জক ব্যক্তিত্বের জন্য। তাঁহার মত বিদ্বান, রুচিমান, রসিক ও ন্যায়পরায়ণ নৃপতি এ পর্যন্ত খুব কমই আবির্ভূত হইয়াছেন।

স্নেহপরায়ণ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং রণক্ষেত্রে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার গিয়াসুদ্দীনের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে সন্দেহ নাই। তবে বিমাতার চক্রান্ত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য অনেকাংশে বাধ্য হইয়াই গিয়াসুদ্দীন এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে না হইলেও আংশিকভাবে ক্ষমা করা যায়।

গিয়াসুদ্দীন যে কতখানি রসিক ও কাব্যামোদী ছিলেন, তাহা তাঁহার একটি কাজ হইতে বুঝিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-এ যাহা লেখা আছে, তাহার সারমর্ম এই। একবার গিয়াসুদ্দীন সাংঘাতিক রকম অসুস্থ হইয়া পড়িয়া বাঁচিবার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সরূব্, গুল্ ও লালা নামে তাঁহার হারেমের তিনটি নারীকে তাঁহার মৃত্যুর পর শবদেহ ধৌত করার ভার দিয়াছিলেন। কিন্তু সেবারে তিনি সুস্থ হইয়া উঠেন এবং তাহার পর ঐ তিনটি নারীকে হারেমের

অন্যান্য নারীরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে থাকে। ঐ তিনটি নারী সুলতানকে এই কথা জানাইলে সুলতান সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নামে একটি ফার্সী গজল লিখিতে সুরু করেন। কিন্তু এক ছত্রের বেশী তিনি আর লিখিতে পারেন নাই, তাঁহার রাজ্যের কোন কবিও ঐ গজলটি পূরণ করিতে পারেন নাই। তখন গিয়াসুদ্দীন ইরানের শিরাজ শহরবাসী অমর কবি হাফিজের নিকট ঐ ছত্রটি পাঠাইয়া দেন। হাফিজ উহা পূরণ করিয়া ফেরৎ পাঠান।

এই কাহিনীর প্রথমাংশের খুঁটিনাটি বিবরণগুলি সব সত্য কিনা তাহা বলা যায় না, তবে দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ হাফিজের কাছে গিয়াসুদ্দীন কর্তৃক গজলের এক ছত্র পাঠানো এবং হাফিজের তাহা সম্পূর্ণ করিয়া পাঠানো সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত 'আইন-ই-আকবরী'তেও এই ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। 'রিয়াজ' ও 'আইন'-এ এই গজলটির কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই-গুলি সমেত সম্পূর্ণ গজলটি (হাফিজের মৃত্যুর অল্প পরে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু মুহম্মদ গুল-অন্দাম কর্তৃক সংকলিত) 'দিওয়ান-ই-হাফিজে' পাওয়া যায়, তাহাতে সুলতান গিয়াসুদ্দীন ও বাংলাদেশের নাম আছে।

গিয়াসুদ্দীনের ন্যায়নিষ্ঠা সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-এ একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সেটি এই। একবার গিয়াসুদ্দীন তীর ছুঁড়িতে গিয়া আকস্মিকভাবে এক বিধবার পুত্রকে আহত করিয়া বসেন। ঐ বিধবা কাজী সিরাজুদ্দীনের কাছে এ সম্বন্ধে নালিশ করে। কর্তব্যনিষ্ঠ কাজী তখন পেয়াদার হাত দিয়া সুলতানের কাছে সমন পাঠান। পেয়াদা সহজ পথে সুলতানের কাছে সমন লইয়া যাওয়ার উপায় নাই দেখিয়া অসময়ে আজান দিয়া সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন সুলতানের কাছে পেয়াদাকে লইয়া যাওয়া হইলে সে তাঁহাকে সমন দিল। সুলতান তৎক্ষণাৎ কাজীর আদালতে উপস্থিত হইলেন। কাজী তাঁহাকে কোন খাতির না দেখাইয়া বিধবার ক্ষতিপূরণ করিতে নির্দেশ দিলেন। সুলতান সেই নির্দেশ পালন করিলেন। তখন কাজী উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুলতানকে যথোচিত সম্মান দেখাইয়া মসনদে বসাইলেন। সুলতানের বগলের নীচে একটি ছোট তলোয়ার লুকানো ছিল, সেটি বাহির করিয়া তিনি কাজীকে বলিলেন যে তিনি সুলতান বলিয়া কাজী যদি বিচারের সময় তাঁহার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেন, তাহা হইলে তিনি তলোয়ার দিয়া কাজীর মাথা কাটিয়া ফেলিতেন। কাজীও তাঁহার মসনদের তলা হইতে একটি বেত বাহির করিয়া বলিলেন, সুলতান যদি

আইনের নির্দেশ লঙ্ঘন করিতেন, তাহা হইলে আদালতের বিধান অনুসারে তিনি ঐ বেত দিয়া তাঁহার পিঠ ক্ষতবিক্ষত করিতেন—ইহার জন্য তাঁহাকে বিপদে পড়িতে হইবে জানিয়াও! তখন সুলতান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কাজীকে অনেক উপহার ও পারিতোষিক দিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

এই কাহিনীটি সত্য কিনা তাহা বলা যায় না। তবে সত্য হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। কারণ গিয়াসুদ্দীনকে লেখা বিহারের দরবেশ মুজাফফর শাম্‌স্‌ বল্‌খির চিঠি হইতে জানা যায় যে গিয়াসুদ্দীন সত্যই ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বল্‌খির চিঠি হইতে জানা যায় যে, গিয়াসুদ্দীন প্রথম দিকে সুখ এবং আমোদপ্রমোদে নিমগ্ন ছিলেন, কিন্তু বল্‌খির সহিত পত্রালাপের সময় তিনি পবিত্র ও ধর্মনিষ্ঠ জীবন যাপন করিতেছিলেন। গিয়াসুদ্দীন বিদ্যা, মহত্ত্ব, উদারতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণে ভূষিত ছিলেন এবং সেজন্য তিনি রাজা হিসাবে জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। গিয়াসুদ্দীন কবিও ছিলেন এবং সুন্দর গজল লিখিয়া মুজাফফর শাম্‌স্‌ বল্‌খিকে পাঠাইতেন।

বল্‌খি ভিন্ন আর একজন দরবেশের সহিত গিয়াসুদ্দীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি আলা অল-হকের পুত্র নূর কুৎব্‌ আলম। 'রিয়াজ'-এর মতে ইনি গিয়াসুদ্দীনের সহপাঠী ছিলেন। গিয়াসুদ্দীন ও নূর কুৎব্‌ আলম উভয়ে পরস্পরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। কথিত আছে, নূর কুৎব্‌ আলমের ভ্রাতা আজম খান সুলতানের উজীর ছিলেন; তিনি নূর কুৎব্‌কে একটি উচ্চ রাজপদ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নূর কুৎব্‌ তাহাতে রাজী হন নাই।

মুজাফফর শাম্‌স্‌ বল্‌খি ও নূর কুৎব্‌ আলমের সহিত গিয়াসুদ্দীনের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইতে বুঝিতে পারা যায়, গিয়াসুদ্দীনও পিতা ও পিতামহের মত সাধু-সন্তদের ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ধর্মনিষ্ঠার অন্য নিদর্শনও আমরা পাই। অল-সখাওয়ী এবং গোলাম আলী আজাদ বিলগ্রামী নামে দুইজন প্রামাণিক গ্রন্থকারের লেখা হইতে জানা যায় যে, গিয়াসুদ্দীন অনেক টাকা খরচ করিয়া মক্কা ও মদিনায় দুইটি মাদ্রাসা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। মক্কার মাদ্রাসাটি নির্মাণ করিতে বার হাজার মিশরী স্বর্ণ-মিথ্‌কল লাগিয়াছিল। গিয়াসুদ্দীন নিজে হানাফী ছিলেন কিন্তু মক্কার মাদ্রাসায় তিনি হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হানবালী—মুসলিম সম্প্রদায়ের এই চারিটি মধ্‌হবের জন্যই বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন গিয়াসুদ্দীন মক্কাতে একটি সরাইও নির্মাণ করান এবং মাদ্রাসা ও সরাইয়ের ব্যয়

নির্বাহের জন্য এই দুই প্রতিষ্ঠানকে বহুমূল্যের সম্পত্তি দান করেন। তিনি মক্কার আরাফাহ্ নামক স্থানে একটি খালও খনন করাইয়াছিলেন। গিয়াসুদ্দীন মক্কায় য়াকুৎ অনানী নামক এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছিলেন, ইনিই এই সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। গিয়াসুদ্দীন মক্কা ও মদিনার লোকদের দান করিবার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার এক অংশ মক্কার শরীফ গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্টাংশ হইতে মক্কা ও মদিনার প্রতিটি লোককেই কিছু কিছু দেওয়া হয়।

বিদেশে দূত প্রেরণ গিয়াসুদ্দীনের একটি অভিনব ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য। জৌনপুরের সুলতান মালিক সারওয়ারের কাছে তিনি দূত পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে হাতী উপহার দিয়াছিলেন। চীনদেশের ইতিহাস হইতে জানা যায়, চীন-সম্রাট য়ুং-লোর কাছে গিয়াসুদ্দীন ১৪০৫, ১৪০৮ ও ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে উপহার সমেত দূত পাঠাইয়াছিলেন। য়ুং-লো ইহার প্রত্যুত্তরস্বরূপ কয়েকবার গিয়াসুদ্দীনের কাছে উপহার সমেত দূত পাঠান।

কিন্তু গিয়াসুদ্দীন যে সমস্ত ব্যাপারেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা নহে। কোন কোন ব্যাপারে তিনি শোচনীয় ব্যর্থতারও পরিচয় দিয়াছেন। যেমন, যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে তিনি মোটেই সুবিধা করিতে পারেন নাই। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার যে বিরোধ ও যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে রাজ্যের সামরিক শক্তি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণের পরে গিয়াসুদ্দীন যে সমস্ত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেও সামরিক শক্তির অপচয় ভিন্ন আর কোন ফল হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহাকে পরাজয়ও বরণ করিতে হয়। কথিত আছে, শাহেব খান (?) নামে এক ব্যক্তির সহিত গিয়াসুদ্দীন দীর্ঘকাল নিষ্ফল যুদ্ধ চালাইয়া প্রচুর শক্তি ক্ষয় করিয়াছিলেন, অবশেষে নূর কুৎব্ আলম উভয় পক্ষে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু সন্ধির কথাবার্তা চলিবার সময় গিয়াসুদ্দীন শাহেব খানকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করেন এবং এই বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা কোনক্রমে নিজের মান বাঁচান। গিয়াসুদ্দীন কামরূপ-কামতা রাজ্যের কিছু অংশ সাময়িকভাবে অধিকার করিয়াছিলেন। কথিত আছে, গিয়াসুদ্দীন কামতা-রাজ ও অহোম-রাজের মধ্যে বিরোধের সুযোগ লইয়া কামতা রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার আক্রমণের ফলে কামতা-রাজ অহোম-রাজের সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দিয়া সন্ধি করেন এবং তাহার পর

উভয় রাজা মিলিতভাবে গিয়াসুদ্দীনের বাহিনীকে প্রতিরোধ করেন। তাহার ফলে গিয়াসুদ্দীনের বাহিনী কামতা রাজ্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। মিথিলার অমর কবি বিদ্যাপতি তাঁহার একাধিক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক শিবসিংহ একজন গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন; যতদূর মনে হয়, এই গৌড়েশ্বর গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ।

গিয়াসুদ্দীন যে তাঁহার শেষ জীবনে হিন্দুদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন ও তাহার জন্যই শেষ পর্যন্ত তিনি শোচনীয় পরিণাম বরণ করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। মুজাফফর শামস বল্‌খির ৮০০ হিজরায় (১৩৯৭ খ্রীঃ) লেখা চিঠিতে পাই তিনি গিয়াসুদ্দীনকে বলিতেছেন যে মুসলিম রাজ্যে বিধর্মীদের উচ্চ পদে নিয়োগ করা একেবারেই উচিত নহে। গিয়াসুদ্দীন বল্‌খিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার উপদেশ অনুসারে চলিতেন। সুতরাং তিনি যে এই ব্যাপারে বল্‌খির অভিপ্রায় অনুযায়ী চলিয়াছিলেন অর্থাৎ রাজ্যের সমস্ত উচ্চ পদ হইতে বিধর্মী হিন্দুদের অপসারিত করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভব। ইহার স্বপক্ষে কিছু প্রমাণও আছে। গিয়াসুদ্দীন ও তাঁহার পুত্র সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহের রাজত্বকালে কয়েকবার চীন-সম্রাটের দূতেরা বাংলার রাজদরবারে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে বাংলার সুলতানের অমাত্য ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সকলেই মুসলমান, একজনও অমুসলমান নাই। এই কথা জনৈক চীনা রাজপ্রতিনিধিই লিখিয়া গিয়াছেন।

ফিরিশ্‌তার মতে হিন্দু রাজা গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশের একজন আমীর ছিলেন। আবার 'রিয়াজ'-এর মতে এই রাজা গণেশের চক্রান্তেই গিয়াসুদ্দীন নিহত হইয়াছিলেন। মনে হয়, বল্‌খির অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করিয়া গিয়াসুদ্দীন রাজা গণেশ প্রমুখ সমস্ত হিন্দু আমীরকেই পদচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে রাজা গণেশ গিয়াসুদ্দীনের শত্রু হইয়া দাঁড়ান এবং শেষ পর্যন্ত তিনি চক্রান্ত করিয়া গিয়াসুদ্দীনকে হত্যা করান। গিয়াসুদ্দীন যে শেষ জীবনে সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাহার আর একটি প্রমাণ—তাঁহার রাজত্বকালে আগত চীনা রাজদূতদের কেবলমাত্র বাংলার মুসলমানদের জীবনযাত্রাই দেখানো হইয়াছিল, বাংলার হিন্দুদের সম্বন্ধে তাঁহারা কোন বিবরণই লেখেন নাই।

গিয়াসুদ্দীন যে কবি ও কাব্যামোদী ছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

ইরানের কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ ছিল, কিন্তু কোন ভারতীয় কবির সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। "বিদ্যাপতি কবি"-র ভনিতাযুক্ত একটি পদে জনৈক "গ্যাসদীন সুরতান"-এর প্রশস্তি আছে। অনেকের মতে এই "বিদ্যাপতি কবি" মিথিলার বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতি (জীবৎকাল আঃ ১৩৭০-১৪৬০ খ্রীঃ) এবং "গ্যাসদীন সুরতান (সুলতান)" গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ। কিন্তু এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইবার মত প্রমাণ মিলে নাই। বাংলা 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের রচয়িতা শাহ মোহাম্মদ সগীরের আত্ম-বিবরণীর একটি ছত্রের উপর ভিত্তি করিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ সগীরের সমসাময়িক ও পৃষ্ঠপোষক নৃপতি ছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ পিতার মৃত্যুর পর কুড়ি বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

৭। সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ, শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ও আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি "সুলতান-উস্‌-সলাতীন" (রাজাধিরাজ) উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। সৈফুদ্দীন চীন-সম্রাট য়ুং-লোর কাছে দূত পাঠাইয়া গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যু ও নিজের সিংহাসনে আরোহণের সংবাদ জানাইয়াছিলেন। চীন-সম্রাটও বাংলার মৃত রাজার শোকানুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য এবং নূতন রাজাকে স্বাগত জানাইবার জন্য তাঁহার প্রতিনিধিদের পাঠাইয়াছিলেন।

সৈফুদ্দীনের রাজত্বকালের আর কোন ঘটনার কথা জানা যায় না। দুই বৎসর রাজত্ব করিবার পর সৈফুদ্দীন পরলোকগমন করেন। সৈফুদ্দীনের পরে শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ সুলতান হন। ইব্‌ন্‌-ই-হজর নামে একজন সমসাময়িক আরব-দেশীয় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, হম্‌জা শাহ তাঁহার ক্রীতদাস শিহাব (শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ) কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

শিহাবুদ্দীন রাজার পুত্র না হইয়াও রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, কারণ অমিতশক্তিধর রাজা গণেশ তাঁহার পিছনে ছিলেন। বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের

সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় যে, রাজা গণেশই শিহাবুদ্দীনের রাজত্বকালে শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করিয়াছিলেন এবং রাজকোষও তাঁহারই হাতে আসিয়াছিল, শিহাবুদ্দীন নামে মাত্র সুলতান ছিলেন।

শিহাবুদ্দীন একবার চীনসম্রাটের কাছে দূত মারফৎ একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র পাঠান এবং সেই সঙ্গে জিরাফ, বাংলার বিখ্যাত ঘোড়া এবং এদেশে উৎপন্ন আরও অনেক দ্রব্য উপহারস্বরূপ পাঠান। তাঁহার পাঠানো জিরাফ চীনদেশে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

দুই বৎসর (১৪১২-১৪ খ্রীঃ) রাজত্ব করিবার পরে শিহাবুদ্দীন পরলোকগমন করেন। কাহারও কাহারও মতে রাজা গণেশ তাঁহাকে হত্যা করাইয়াছিলেন। সমসাময়িক আরবদেশীয় গ্রন্থকার ইব্ন্-ই-হজরও লিখিয়াছেন যে গণেশ কর্তৃক শিহাবুদ্দীন (শিহাব) নিহত হইয়াছিলেন। সম্ভবত শিহাবুদ্দীন গণেশের বিরুদ্ধে কোন সময়ে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন এবং তাহারই জন্য গণেশ তাঁহাকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিয়াছিলেন।

মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ। কিন্তু কোন ঐতিহাসিক বিবরণীতে এই আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নাম পাওয়া যায় না। যতদূর মনে হয়, রাজা গণেশ শিহাবুদ্দীনের মৃত্যুর পরে তাঁহার শিশু পুত্র আলাউদ্দীনকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নামমাত্র রাজা করিয়া রাখিয়া নিজেই রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের কেবলমাত্র ৮১৭ হিজরার (১৪১৪-১৫ খ্রীঃ) মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ৮১৮ হিজরা হইতে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের মুদ্রা শুরু হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কয়েক মাস রাজত্ব করার পরেই আলাউদ্দীন সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। সম্ভবত রাজা গণেশই স্বয়ং রাজা হইবার অভিপ্রায় করিয়া আলাউদ্দীনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজা গণেশ ও তাঁহার বংশ

১। রাজা গণেশ

রাজা গণেশ বাংলার ইতিহাসের এক জন অবিস্মরণীয় পুরুষ। তিনিই একমাত্র হিন্দু, যিনি বাংলার পাঁচ শতাধিক বর্ষ ব্যাপী মুসলিম শাসনের মধ্যে কয়েক বৎসরের জন্য ব্যতিক্রম করিয়া হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অবশ্য গণেশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই হিন্দু অভ্যুদয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গণেশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই।

'তবকাৎ-ই-আকবরী,' 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা', 'মাসির-ই-রহিমী' প্রভৃতি গ্রন্থে গণেশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। 'রিয়াজ-উস-সলাতীন'-এর বিবরণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ; বুকাননের বিবরণী, মুল্লা তকিয়ার বয়াজ, 'মিরাৎ-উল আসরার' প্রভৃতি সূত্রেও গণেশ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এই সূত্রগুলি পরবর্তীকালের রচনা। সম্প্রতি গণেশ সম্বন্ধীয় কিছু কিছু সমসাময়িক সূত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে; যেমন,—দরবেশ নূর কুৎব্‌ আলম ও আশরফ সিম্‌নানীর পত্রাবলী, ইব্রাহিম শর্কীর জনৈক সামন্তের আজ্ঞায় রচিত এবং গণেশ ও ইব্রাহিমের সংঘর্ষের উল্লেখ সংবলিত 'সঙ্গীতশিরোমণি' গ্রন্থ, চীনসম্রাট কর্তৃক বাংলার রাজসভায় প্রেরিত প্রতিনিধিদলের জনৈক সদস্যের লেখা 'শিং-ছা-শ্যং-লান' গ্রন্থ, আরবী ঐতিহাসিক ইব্‌ন্‌-ই-হজর ও অল-সখাওয়ীর লেখা গ্রন্থদ্বয়, দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা প্রভৃতি।

উপরে উল্লিখিত সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়া রাজা গণেশের ইতিহাসটি মোটামুটিভাবে পুনর্গঠন করা সম্ভব হইয়াছে। এই পুনর্গঠিত ইতিহাসের সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রাজা গণেশ ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী একজন জমিদার। উত্তরবঙ্গের ভাতুড়িয়া অঞ্চলে তাঁহার জমিদারী ছিল। তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানদের অন্যতম আমীরও ছিলেন।

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ, সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ, শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ও

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলে বাংলার রাজনীতিতে গণেশ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শেষ দুইজন সুলতানের আমলে তিনিই যে বাংলা দেশের প্রকৃত শাসক ছিলেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ৮১৭ হিজরার (১৪১৪-১৫ খ্রীঃ) শেষ দিকে গণেশ আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে সিংহাসনচ্যুত (ও সম্ভবত নিহত) করেন এবং নিজের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে মুসলমান রাজত্বের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়া স্বয়ং বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কিন্তু বেশীদিন রাজত্ব করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশ বিধর্মীর সিংহাসন অধিকারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রচণ্ড বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। ইহাদের নেতা ছিলেন বাংলার দরবেশরা। রাজা গণেশ এই বিরোধিতা কঠোরভাবে দমন করিলেন এবং দরবেশদের মধ্যে কয়েক-জনকে বধ করিলেন। ইহাতে দরবেশরা তাঁহার উপর আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। দরবেশদের নেতা নূর কুৎব্‌ আলম উত্তর ও পূর্ব ভারতের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত নৃপতি জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর নিকট উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে গণেশ ঘোরতর অত্যাচারী এবং মুসলমানদের পরম শত্রু; তিনি ইব্রাহিমকে সসৈন্যে বাংলায় আসিয়া গণেশের উচ্ছেদসাধন করিতে অনুরোধ জানাইলেন। ইব্রাহিম শর্কী এই পত্র পাইয়া এ বিষয়ে জৌনপুরের দরবেশ আশরফ সিমনানীর উপদেশ প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার সম্মতিক্রমে সৈন্য-বাহিনী লইয়া বাংলার দিকে রওনা হইলেন।

যে সমস্ত দেশের উপর দিয়া ইব্রাহিম গেলেন, তাহাদের মধ্যে মিথিলা বা ত্রিহুত অন্যতম। ত্রিহুত জৌনপুরের সুলতানের অধীন সামন্ত রাজ্য। কিন্তু এই সময়ে ত্রিহুতের রাজা দেবসিংহকে উচ্ছেদ করিয়া তাঁহার স্বাধীনচেতা পুত্র শিবসিংহ রাজা হইয়াছিলেন। তিনি জৌনপুররাজের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং রাজা গণেশের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। গণেশের সহিত যেমন বাংলার দরবেশদের সংঘর্ষ বাধিয়াছিল, শিবসিংহের সহিতও তেমনি ত্রিহুতের দরবেশদের সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। ইব্রাহিম শর্কী যখন ত্রিহুতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন শিবসিংহ তাঁহার সহিত সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন; ইব্রাহিম তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং তাঁহার সুদৃঢ় দুর্গ লেহ্‌রা জয় করিয়া তাঁহাকে

বন্দী করিলেন। অতঃপর ইব্রাহিম শিবসিংহের পিতা দেবসিংহকে আনুগত্যের সর্তে ত্রিহুতের রাজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ইহার পর ইব্রাহিম আবার তাঁহার অভিযান সুরু করিলেন এবং বাংলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা গণেশ তাঁহার বিপুল সামরিক শক্তির নিকট দাঁড়াইতে পারিলেন না। তাহার উপরে তাঁহার পুত্র রাজনীতিচতুর যদু (নামান্তর জিৎমল) পিতার পক্ষ ত্যাগ করিয়া ইব্রাহিমের পক্ষে যোগ দিলেন। তখন গণেশ সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন। যদু রাজ্যের লোভে নিজের ধর্ম পর্যন্ত বিসর্জন দিলেন। ইব্রাহিম যদুকে মুসলমান করিয়া বাংলার সিংহাসনে বসাইলেন। যদু সুলতান হইয়া জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ নাম গ্রহণ করিলেন; ৮১৮ হিজরার (১৪১৫-১৬ খ্রীঃ) মাঝামাঝি সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

অতঃপর ইব্রাহিম দেশে ফিরিয়া গেলেন। জলালুদ্দীনের সিংহাসনে আরোহণের ফলে বাংলায় আবার হিন্দু-প্রাধান্যের অবসান ঘটিল। মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু এই পরিবর্তন বেশীদিন স্থায়ী হইল না। রাজা গণেশ কিছুদিন পরে সুযোগ বুঝিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং অল্পায়াসে নিজের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিলেন। পুত্র জলালুদ্দীন নামে সুলতান রহিলেন, কিন্তু তিনি পিতার ক্রীড়নকে পরিণত হইলেন। বাংলাদেশে আবার হিন্দু-ধর্মের জয়পতাকা উড়িতে লাগিল। গণেশ আবার তাঁহার প্রতিপক্ষ দরবেশদিগকে ও অন্যান্য মুসলমান-দিগকে দমন করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া নূর কুৎব্‌ আলম অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি পরলোকগমন করিলেন।

এদিকে রাজা গণেশ যখন নানা দিক্‌ দিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিলেন, তখন তিনি পুত্র জলালুদ্দীনকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং 'দনুজমর্দনদেব' নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 'দনুজমর্দনদেব'-এর বঙ্গাক্ষরে ক্ষোদিত মুদ্রাও প্রকাশিত হইল, এই মুদ্রাগুলির এক পৃষ্ঠায় রাজার নাম এবং অপর পৃষ্ঠায় টাকশালের নাম, উৎকীর্ণ হওয়ার সাল এবং "চণ্ডীচরণপরায়ণস্য" লেখা থাকিত। 'দনুজমর্দনদেব'-রূপে সমগ্র ১৩৩৯ শকাব্দ (১৪১৭-১৮ খ্রীঃ) এবং ১৩৪০ শকাব্দের (১৪১৮-১৯ খ্রীঃ) কিয়দংশ রাজত্ব করিবার পর রাজা গণেশ পরলোকগমন করিলেন। সম্ভবত তিনি জলালুদ্দীন (যদু)-কে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মে পুনর্দীক্ষিত করাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। সম্ভবত জলালুদ্দীনের ষড়যন্ত্রেই গণেশের মৃত্যু হয়।

স্বল্প সময়ের জন্য রাজত্ব করিলেও রাজা গণেশ বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলের উপরই তাঁহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের প্রায় সমস্তটা এবং মধ্যবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কতকাংশ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রাজা গণেশ যে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং কুশাগ্রবুদ্ধি কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন, তাহা তাঁহার পূর্ববর্ণিত ইতিহাস হইতেই বুঝা যায়। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দুও ছিলেন। চণ্ডীদেবীর প্রতি তাঁহার আনুগত্যের কথা তিনি মুদ্রায় ঘোষণা করিয়াছিলেন; বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ পদ্মনাভের তিনি চরণপূজা করিতেন, এ কথা পদ্মনাভের বংশধর জীব গোস্বামীর সাক্ষ্য হইতে জানা যায়। পরধর্মদ্বেষ হইতে রাজা গণেশ একেবারে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কয়েকটি মসজিদ ও ঐস্লামিক প্রতিষ্ঠানকে তিনি ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি বহু মুসলমানের প্রতি দমননীতি প্রয়োগও করিয়াছিলেন, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক কারণে উহা করিয়াছিলেন। মুসলমানদের প্রতি গণেশের অত্যাচার সম্বন্ধে কোন কোন সূত্রে অনেক অতিরঞ্জিত বিবরণ স্থান পাইয়াছে। ফিরিশ্‌তার কথা বিশ্বাস করিলে বলিতে হয় গণেশ অনেক মুসলমানের আন্তরিক ভালবাসাও লাভ করিয়াছিলেন। ফিরিশ্‌তার মতে গণেশ দক্ষ সুশাসকও ছিলেন।

গৌড় ও পাণ্ডুয়ার কয়েকটি বিখ্যাত স্থাপত্যকীর্তি গণেশেরই নির্মিত বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। ইহাদের মধ্যে গৌড়ের 'ফতে খানের সমাধি-ভবন' নামে পরিচিত একটি সৌধ এবং পাণ্ডুয়ার একলাখী প্রাসাদের নাম উল্লেখযোগ্য। গণেশ বিখ্যাত আদিনা মসজিদের সংস্কার সাধন করিয়া উহাকে তাঁহার কাছারীবাড়ীতে পরিণত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

গণেশের নাম প্রায় সমস্ত ফার্সী পুথিতেই 'কান্‌স্‌' লেখা হইয়াছে, এই কারণে কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল 'কংস'। কিন্তু প্রাচীন ফার্সী পুঁথিতে প্রায় সর্বত্রই 'গ্‌' (গাফ্‌)-এর জায়গায় 'ক্‌' (কাফ্‌) লিখিত হইত বলিয়া ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে পারা যায় না। বুকাননের বিবরণী এবং কয়েকটি বৈষ্ণব গ্রন্থের সাক্ষ্য হইতে মনে হয় যে, 'গণেশ'ই তাঁহার প্রকৃত নাম। কোন কোন সূত্রের মতে তাঁহার নাম ছিল 'কাশী'।

২। মহেন্দ্রদেব

গণেশ বা দনুজমর্দনদেবের সমস্ত মুদ্রাই ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দের। ১৩৪০ শকাব্দেই আবার মহেন্দ্রদেব নামে আর একজন হিন্দু রাজার মুদ্রা পাওয়া যাইতেছে। ইঁহার মুদ্রাগুলি দনুজমর্দনদেবের মুদ্রারই অনুরূপ।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দনদেবের উত্তরাধিকারী এবং সম্ভবত পুত্র। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন মহেন্দ্রদেব জলালুদ্দীনেরই হিন্দু নাম, পিতার মৃত্যুর পরে জলালুদ্দীন কিছু সময়ের জন্য এই নামে মুদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। মহেন্দ্রদেব তাঁহার মুদ্রায় নিজেকে 'চণ্ডীচরণপরায়ণ' বলিয়াছেন, যাহা নিষ্ঠাবান মুসলমান জলালুদ্দীনের পক্ষে সম্ভব নহে।

'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'র মতে গণেশের আর একজন পুত্র ছিলেন, ইনি জলালুদ্দীনের কনিষ্ঠ। দনুজমর্দনদেবের ও জলালুদ্দীনের মুদ্রার মাঝখানে মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার আবির্ভাব হইতে এইরূপ অনুমান খুব অসঙ্গত হইবে না যে, মহেন্দ্রদেব জলালুদ্দীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, গণেশের মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু জলালুদ্দীন অল্প সময়ের মধ্যেই মহেন্দ্রদেবকে অপসারিত করিয়া সিংহাসন পুনরধিকার করেন। অবশ্য ইহা নিছক অনুমান মাত্র।

মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, ১৪১৮ খ্রীঃর এপ্রিল হইতে ১৪১৯ খ্রীঃর জানুয়ারী—এই নয় মাসের মধ্যে দনুজমর্দনদেব, মহেন্দ্রদেব ও জলালুদ্দীন—তিনজন রাজাই রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, মহেন্দ্রদেব খুবই অল্প সময় রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন।

৩। জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ

জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ দুই দফায় রাজত্ব করিয়াছিলেন—প্রথমবার ৮১৮-১৯ হিজরায় (১৪১৫-১৬ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয়বার ৮২১-৩৬ হিজরায় (১৪১৮-৩৩ খ্রীঃ)।

প্রথমবারের রাজত্বে জলালুদ্দীনের রাজসভায় চীন-সম্রাটের দূতেরা আসিয়াছিলেন। চীনা বিবরণী 'শিং-ছা-শ্যং-লান' হইতে জানা যায় যে, জলালুদ্দীন প্রধান দরবার-ঘরে বসিয়া চীনা রাজদূতদের দর্শন দিয়াছিলেন ও চীন-সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত পত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি চীনা দূতদের এক ভোজ

দিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, এই ভোজে মুসলমানী রীতি অনুযায়ী গোমাংস পরিবেশন করা হইয়াছিল এবং সুরা দেওয়া হয় নাই। অতঃপর জলালুদ্দীন দূতদের প্রত্যেককে পদমর্যাদা অনুযায়ী উপহার প্রদান করেন এবং স্বর্ণময় আধারে রক্ষিত একটি পত্র চীনসম্রাটকে দিবার জন্য তাঁহাদের হাতে দেন।

জলালুদ্দীনের দ্বিতীয়বার রাজত্বেরও কয়েকটি ঘটনার কথা জানিতে পারা যায়। আবদুর রজ্জাক রচিত 'মতলা-ই-সদাইন' ও চীনা গ্রন্থ 'মিং-শ্-র্'-এর সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিলে জানা যায়, ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কী জলালুদ্দীনের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তৈমুরলঙ্গের পুত্র শাহ্‌রুখ তখন পারস্যের হিরাটে ছিলেন; তাঁহার নিকটে এবং চীন সম্রাট য়ুং-লোর নিকটে দূত পাঠাইয়া জলালুদ্দীন ইব্রাহিমের আক্রমণের কথা জানান। তখন শাহ্‌রুখ ও য়ুং-লো উভয়েই ইব্রাহিমকে ভর্ৎসনা করিয়া অবিলম্বে আক্রমণ বন্ধ করিতে বলেন, ইব্রাহিমও আক্রমণ বন্ধ করেন।

আরাকান দেশের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, আরাকানরাজ মেং-সোআ-মৃউন (নামান্তর নরমেইখ্‌লা) ব্রহ্মের রাজার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজ্য হারান এবং বাংলার সুলতানের অর্থাৎ জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জালালুদ্দীনকে আরাকানরাজ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করায় জলালুদ্দীন প্রীত হইয়া তাঁহার রাজ্য উদ্ধারের জন্য এক সৈন্যবাহিনী দেন। ঐ সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ব্রহ্মের রাজার সহিত যোগ দেয় এবং আরাকানরাজকে বন্দী করে। আরাকানরাজ কোনক্রমে পলাইয়া আসিয়া জলালুদ্দীনকে সব কথা জানান। তখন জলালুদ্দীন আর একজন সেনা-নায়ককে প্রেরণ করেন এবং ইঁহার প্রচেষ্টায় ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজের হৃত রাজ্য উদ্ধার হয়। কিন্তু জলালুদ্দীনের উপকারের বিনিময়ে আরাকানরাজ তাঁহার সামন্ত হইতে বাধ্য হইলেন।

ইব্‌ন্-ই-হজর ও অল-সখাওয়ীর লেখা গ্রন্থদ্বয় হইতে জানা যায় যে, জলালুদ্দীন ইসলামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং তাঁহার পিতা কর্তৃক বিধ্বস্ত মসজিদগুলির সংস্কার সাধন করেন; তিনি আবু হানিফার সম্প্রদায়ের মতবাদ গ্রহণ করেন; মক্কায় তিনি অনেকগুলি ভবন ও একটি সুন্দর মাদ্রাসা নির্মাণ করাইয়াছিলেন; খলিফার নিকট এবং মিশরের রাজা অল-আশরফ বার্‌স্‌বায়ের নিকট তিনি অনেক উপহার পাঠাইয়াছিলেন; খলিফা জলালুদ্দীনের প্রার্থনা

অনুযায়ী জলালুদ্দীনকে সম্মান-পরিচ্ছদ পাঠাইয়া তাঁহার "অনুমোদন" জানান।

উপরে প্রদত্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, জলালুদ্দীন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। ইহার প্রমাণ অন্যান্য বিষয় হইতেও পাওয়া যায়। প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া বাংলার সুলতানদের মুদ্রায় 'কলমা' উৎকীর্ণ হইত না, জলালুদ্দীন কিন্তু তাঁহার মুদ্রায় 'কলমা' খোদাই করান। রাজত্বের শেষ দিকে জলালুদ্দীন 'খলীফৎ আল্লাহ্' (ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী) উপাধি গ্রহণ করেন। জলালুদ্দীন তাঁহার পূর্বতন ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বুকাননের বিবরণী অনুসারে তিনি অনেক হিন্দুকে জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছিলেন, যাহার ফলে বহু হিন্দু কামরূপে পলাইয়া গিয়াছিল; 'রিয়াজ'-এর মতে ইতিপূর্বে জলালুদ্দীনকে হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিত করার ব্যাপারে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল, জলালুদ্দীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদের যন্ত্রণা দিয়া গোমাংস খাওয়াইয়াছিলেন।

কিন্তু 'স্মৃতিরত্নহার' নামক সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, এই জলালুদ্দীনই রায় রাজ্যধর নামক একজন নিষ্ঠাবান হিন্দুকে তাঁহার সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'স্মৃতিরত্নহার'-এর লেখক বৃহস্পতি মিশ্রও জলালুদ্দীনের নিকটে কিছু সমাদর পাইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জলালুদ্দীন হিন্দু ধর্মের অনুরাগী না হইলেও যোগ্য হিন্দুদের মর্যাদাদান করিতেন। সংস্কৃত পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রের সমাদর করার কারণ হয়ত জলালুদ্দীনের প্রথম জীবনে প্রাপ্ত সংস্কৃত শিক্ষা।

মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে জলালুদ্দীন সুশাসক ও ন্যায়বিচারক ছিলেন; 'রিয়াজ'-এর মতে তিনি জনাকীর্ণ পাণ্ডুয়া নগরী পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

জলালুদ্দীনের রাজ্যের আয়তন খুব বিশাল ছিল। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ ও আরাকান ব্যতীত—ত্রিপুরা ও দক্ষিণ বিহারেরও কিছু অংশ অন্তত সাময়িকভাবে তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে মনে হয়।

জলালুদ্দীন ১৪৩৩ খ্রীঃর গোড়ার দিক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবত তাহার অল্প কিছুকাল পরেই তিনি পরলোকগমন করেন। পাণ্ডুয়ার একলাখী প্রাসাদে তাঁহার সমাধি আছে।

৪। শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহ

জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'আইন-ই-আকবরী', 'তবকাৎ-ই-আকবরী,' 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা', 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন' প্রভৃতি গ্রন্থের মতে শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহ ১৬ বা ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য হইতে পারে না। কারণ শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহের রাজত্বের প্রথম বৎসর অর্থাৎ ৮৩৬ হিজরা (১৪৩২-৩৩ খ্রীঃ) ভিন্ন আর কোন বৎসরের মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। এদিকে ৮৪১ হিজরা (১৪৩৭-৩৮ খ্রীঃ) হইতে তাঁহার পরবর্তী সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের মুদ্রা পাওয়া যাইতেছে। বুকাননের বিবরণী অনুসারে শামসুদ্দীন তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই কথাই সত্য বলিয়া মনে হয়।

ফিরিশ্‌তার মতে শামসুদ্দীন মহান, উদার, ন্যায়পরায়ণ এবং দানশীল নৃপতি ছিলেন। কিন্তু 'রিয়াজ'-এর মতে শামসুদ্দীন ছিলেন বদমেজাজী, অত্যাচারী এবং রক্তপিপাসু; বিনা কারণে তিনি মানুষের রক্তপাত করিতেন এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করিতেন। সমসাময়িক আরব-দেশীয় গ্রন্থকার ইবন্‌-ই-হজরের মতে শামসুদ্দীন মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে রাজা হইয়াছিলেন! এই কথা সত্য হইলে বলিতে হইবে, তাঁহার সম্বন্ধে ফিরিশ্‌তার প্রশংসা এবং 'রিয়াজ'-এর নিন্দা—দুইই অতিরঞ্জিত।

'রিয়াজ' ও বুকাননের বিবরণীর মতে শামসুদ্দীনের দুই ক্রীতদাস সাদী খান ও নাসির খান ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। এই কথা সত্য বলিয়া মনে হয়, কারণ একলাখী প্রাসাদের মধ্যস্থিত শামসুদ্দীনের সমাধির গঠন শহীদের সমাধির অনুরূপ।

শামসুদ্দীন সম্বন্ধে আর কোন সংবাদই জানা যায় না। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে গণেশের বংশের রাজত্ব শেষ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মাহ্‌মূদ শাহী বংশ ও হাবশী রাজত্ব

১। নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ

শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহের পরবর্তী সুলতানের নাম নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ। ইনি ১৪৩৭ খ্রীঃ বা তাহার দুই এক বৎসর পূর্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন, 'রিয়াজ'-এর মতে শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহের দুই হত্যাকারীর অন্যতম শাদী খান অপর হত্যাকারী নাসির খানকে বধ করিয়া নিজে রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নাসির খান তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন এবং নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আহ্‌মদ শাহের অমাত্যেরা তাঁহার কর্তৃত্ব মানিতে রাজী না হইয়া তাঁহাকে বধ করেন এবং শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের জনৈক পৌত্র নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহকে সিংহাসনে বসান। অন্য বিবরণগুলি হইতে 'রিয়াজ'-এর বিবরণের অধিকাংশ কথারই সমর্থন পাওয়া যায় এবং তাহাদের অধিকাংশেরই মতে নাসিরুদ্দীন ইলিয়াস শাহের বংশধর। বুকাননের বিবরণী হইতেও 'রিয়াজ'-এর বিবরণের সমর্থন মিলে, তবে বুকাননের বিবরণীতে নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহকে ইলিয়াস শাহের বংশধর বলা হয় নাই। বুকাননের বিবরণীর মতে শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহের ক্রীতদাস ও হত্যাকারী নাসির খান ও নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ অভিন্ন লোক।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের অধিকাংশই ধরিয়া লইয়াছেন যে নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ ইলিয়াস শাহী বংশের সন্তান, এই কারণে তাঁহারা নাসিরুদ্দীনের বংশকে "পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার পরিবর্তে "মাহ্‌মূদ শাহী বংশ" নামই (নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের নাম অনুসারে) অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। 'রিয়াজ'-এর মতে নাসিরুদ্দীন সমস্ত কাজ ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতার সহিত করিতেন; দেশের আবালবৃদ্ধনির্বিশেষে সমস্ত প্রজা তাঁহার শাসনে সন্তুষ্ট ছিল; গৌড় নগরীর অনেক দুর্গ ও প্রাসাদ তিনি নির্মাণ করান। গৌড় নগরীই ছিল নাসিরুদ্দীনের রাজধানী। নাসিরুদ্দীন যে সুযোগ্য নৃপতি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ

তাহা না হইলে তাঁহার পক্ষে সুদীর্ঘ ২৪।২৫ বৎসর রাজত্ব করা সম্ভব হইত না।

নাসিরুদ্দীনের রাজত্বকাল মোটামুটিভাবে শান্তিতেই কাটিয়াছিল। তবে উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের (১৪৩৫-৬৭ খ্রীঃ) এক তাম্রশাসনের সাক্ষ্য হইতে অনুমিত হয় যে, কপিলেন্দ্রদেবের সহিত নাসিরুদ্দীনের সংঘর্ষ হইয়াছিল। খুলনা-যশোহর অঞ্চলে প্রচলিত ব্যাপক প্রবাদ এবং বাগেরহাট অঞ্চলে প্রাপ্ত এক শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে মনে হয় যে, খান জহান নামে নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের জনৈক সেনাপতি ঐ অঞ্চলে প্রথম মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর বিদ্যাপতি তাঁহার 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'তে বলিয়াছেন যে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ভৈরবসিংহ গৌড়েশ্বরকে "নম্রীকৃত" করিয়াছিলেন; 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ১৪৫০ খ্রীঃর কাছাকাছি সময়ে লেখা হয়, সুতরাং ইহাতে উল্লিখিত গৌড়েশ্বর নিশ্চয়ই বাংলার তৎকালীন সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ। সম্ভবত মিথিলার রাজা ভৈরবসিংহের সহিত নাসিরুদ্দীনের সংঘর্ষ হইয়াছিল। মিথিলার সন্নিহিত অঞ্চল নাসিরুদ্দীনের অধীন ছিল—ভাগলপুর ও মুঙ্গেরে তাঁহার শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং মিথিলার রাজাদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে চীনের সহিত বাংলার রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ৩৪ বৎসর ধরিয়া এই সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। নাসিরুদ্দীন দুইবার—১৪৩৮ ও ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনসম্রাটের কাছে উপহার সমেত রাজদূত পাঠাইয়াছিলেন। প্রথমবার তিনি চীনসম্রাটকে একটি জিরাফও পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর চীনের সঙ্গে বাংলার যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এ জন্য নাসিরুদ্দীন দায়ী নহেন, চীনসম্রাটই দায়ী। য়ুং-লো (১৪০২-২৫ খ্রীঃ) যখন চীনের সম্রাট ছিলেন, তখন যেমন বাংলা হইতে চীনে দূত ও উপহার যাইত, তেমনি চীন হইতে বাংলায়ও দূত ও উপহার আসিত। কিন্তু য়ুং-লোর উত্তরাধিকারীরা শুধু বাংলার রাজার পাঠানো উপহার গ্রহণ করিতেন, নিজেরা বাংলার রাজার কাছে দূত ও উপহার পাঠাইতেন না। তাঁহারা বোধহয় ভাবিতেন যে সামন্ত রাজা ভেট পাঠাইয়াছে, তাহার আবার প্রতিদান দিব কি! * বলা বাহুল্য এই একতরফা

* চীন সম্রাটরা পৃথিবীর অন্যান্য রাজাদের নিজেদের সামন্ত বলিয়াই মনে করিতেন।

উপহার প্রেরণ বেশীদিন চলা সম্ভব ছিল না। তাহার ফলে উভয় দেশের সংযোগ অচিরেই ছিন্ন হইয়া যায়।

২। রুকনুদ্দীন বারবক শাহ

রুকনুদ্দীন বারবক শাহ নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। ইনি বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান।

বারবক শাহ অন্তত একুশ বৎসর—১৪৫৫ হইতে ১৪৭৬ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে ১৪৫৫ হইতে ১৪৫৯ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি নিজের পিতা নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন, ১৪৭৪ হইতে ১৪৭৬ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি তাঁহার পুত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন, অবশিষ্ট সময়ে তিনি এককভাবে রাজত্ব করেন। বাংলার সুলতানদের মধ্যে অনেকেই নিজের রাজত্বের শেষ দিকে পুত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করিয়াছেন। সুলতানের মৃত্যুর পর যাহাতে তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া সংঘর্ষ না বাধে, সেই জন্যই সম্ভবত বাংলাদেশে এই অভিনব প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল।

বারবক শাহ অনেক নূতন রাজ্য জয় করিয়া নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইসমাইল গাজী নামে একজন ধার্মিক ব্যক্তি তাঁহার অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ইনি ছিলেন কোরেশ জাতীয় আরব। 'রিসালৎ-ই-শুহাদা' নামক একখানি ফার্সী গ্রন্থে ইসমাইলের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে; এই কাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য উপাদান থাকিলেও মোটের উপর ইহা বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 'রিসালৎ-ই-শুহাদা'র মতে ইসমাইল ছুটিয়া-পটিয়া নামক একটি নদীতে সেতু নির্মাণ করিয়া তাহার বন্যা নিবারণ করিয়াছিলেন, "মান্দারণের বিদ্রোহী রাজা গজপতি"কে পরাস্ত ও নিহত করিয়া তিনি মান্দারণ দুর্গ অধিকার করিয়া ছিলেন—ইহার অন্তর্নিহিত প্রকৃত ঘটনা সম্ভবত এই যে, ইসমাইল গজপতি-বংশীয় উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের কোন সৈন্যাধ্যক্ষকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া মান্দারণ দুর্গ জয় করিয়াছিলেন। এই মান্দারণ দুর্গ বাংলার অন্তর্গত ছিল। কপিলেন্দ্রদেব তাহা জয় করেন। 'রিসালৎ'-এর মতে ইসমাইল কামরূপের রাজা "কামেশ্বরের" (কামতেশ্বর?) সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহার অলৌকিক মহিমা দেখিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন ও ইসলাম ধর্ম

গ্রহণ করেন। কিন্তু ঘোড়াঘাটের দুর্গাধ্যক্ষ ভান্দসী রায় ইসমাইলের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনায় বারবক শাহ ইসমাইলকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

মুল্লা তকিয়ার বয়াজে লেখা আছে যে, বারবক শাহ ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিহুত রাজ্যে অভিযান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে হাজীপুর ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলি পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল এবং উত্তরে বুড়ি গণ্ডক নদী পর্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল; বারবক শাহ ত্রিহুতের হিন্দু রাজাকে তাঁহার সামন্ত হিসাবে ত্রিহুতের উত্তর অংশ শাসনের ভার দিয়াছিলেন এবং কেদার রায় নামে একজন উচ্চপদস্থ হিন্দুকে তিনি ত্রিহুতে রাজস্ব আদায় ও সীমান্ত রক্ষার জন্য তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু পূর্বোক্ত হিন্দু রাজার পুত্র ভরত সিংহ (ভৈরব সিংহ?) বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া কেদার রায়কে বলপূর্বক অপসারিত করেন; ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বারবক শাহ তাঁহাকে শাস্তি দিবার উদ্যোগ করেন, কিন্তু ত্রিহুতের রাজা তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁহাকে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে আর কোন গোলযোগ ঘটে নাই।

মুল্লা তকিয়ার বয়াজের এই বিবরণ মূলত সত্য, কেন না সমসাময়িক মৈথিল পণ্ডিত বর্ধমান উপাধ্যায়ের লেখা 'দণ্ডবিবেক' হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে ত্রিহুত জৌনপুরের শর্কী সুলতানদের অধীন সামন্ত রাজ্য ছিল। কিন্তু শর্কী বংশের শেষ সুলতান হোসেন শাহের অক্ষমতার জন্য তাঁহার রাজত্বকালে জৌনপুর-সাম্রাজ্য ভাঙিয়া যায়। এই সুযোগেই বারবক শাহ ত্রিহুত অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বারবক শাহের শিলালিপিগুলিতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক 'অল-ফাজিল' ও 'অল-কামিল' এই দুইটি উপাধির উল্লেখ দেখা যায়। বারবক শাহ শুধু পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মেরই অনেক কবি ও পণ্ডিত তাঁহার কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম পরে উল্লিখিত হইল।

(ক) বিশারদ

ইহার একটি জ্যোতিষবিষয়ক বচন হইতে বুঝা যায় যে ইনি বারবক শাহের সমসাময়িক ছিলেন এবং সম্ভবত তাঁহার পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। এই বিশারদ ও বাসুদেব সার্বভৌমের পিতা বিশারদ অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

(খ) বৃহস্পতি মিশ্র

ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং গীতগোবিন্দটীকা, কুমারসম্ভবটীকা, রঘুবংশটীকা, শিশুপালবধটীকা, অমরকোষটীকা, স্মৃতিরত্নহার প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। ইহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অমরকোষটীকা 'পদচন্দ্রিকা'। বৃহস্পতির প্রথম দিককার বইগুলি জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়; জলালুদ্দীনের সেনাপতি রায় রাজ্যধর তাঁহার শিষ্য ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জলালুদ্দীনের কাছেও তিনি খানিকটা সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, 'স্মৃতিরত্নহার'-এ তিনি জলালুদ্দীনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; 'পদচন্দ্রিকা'র প্রথমাংশও জলালুদ্দীনেরই রাজত্বকালে—১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। কিন্তু 'পদচন্দ্রিকা'র শেষাংশ অনেক পরে—১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়; তখন রুকনুদ্দীন বারবক শাহ বাংলার সুলতান। 'পদচন্দ্রিকা'য় বৃহস্পতি লিখিয়াছেন যে তিনি গৌড়েশ্বরের কাছে 'পণ্ডিতসার্বভৌম' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজা তাঁহাকে উজ্জ্বল মণিময় হার, দ্যুতিমান দুইটি কুণ্ডল, রত্নখচিত দশ আঙ্গুলের অঙ্গুরীয় দিয়া হাতীর পিঠে চড়াইয়া স্বর্ণকলসের জলে অভিষেক করাইয়া ছত্র ও অশ্বের সহিত 'রায়মুকুট' উপাধি দান করিয়াছিলেন।

(গ) মালাধর বসু

ইনি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামক বিখ্যাত বাংলা কাব্যের রচয়িতা। 'গুণরাজ খান' নামেই ইনি বেশী পরিচিত। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' মালাধর বসু বলিয়াছেন যে গৌড়েশ্বর তাঁহাকে "গুণরাজ খান" উপাধি দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনা ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়; কাব্যের প্রথম হইতেই কবি 'গুণরাজ খান' নামে ভনিতা দিয়াছেন। সুতরাং ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে যিনি বাংলার সুলতান ছিলেন, সেই বারবক

শাহের নিকট হইতেই মালাধর "গুণরাজ খান" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(ঘ) কৃত্তিবাস

বাংলা রামায়ণের রচয়িতা কৃত্তিবাস তাঁহার আত্মকাহিনীতে লিখিয়াছেন যে তিনি একজন গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়াছিলেন এবং তাঁহার কাছে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন। এই গৌড়েশ্বর যে কে, সে সম্বন্ধে গবেষকেরা এতদিন অনেক জল্পনা কল্পনা করিয়াছেন। সম্প্রতি এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যাহা হইতে বলা যায়, এই গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দীন বারবক শাহ। বর্তমান গ্রন্থের 'বাংলা সাহিত্য' সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

(ঙ) ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী

ইনি 'ফরঙ্গ-ই-ইব্রাহিমী' নামে ফার্সী ভাষার একটি শব্দকোষ-গ্রন্থ রচনা করেন, এই গ্রন্থটি 'শরফ্নামা' নামেই বিশেষভাবে পরিচিত। ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকীর আদি নিবাস ছিল জৌনপুরে। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন এবং বাংলার বিভিন্ন সুলতানের কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। 'শরফ্নামা'তে ইব্রাহিম এই সব সুলতানের মধ্যে কয়েকজনের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন, বারবক শাহ ইঁহাদের অন্যতম। বারবক শাহের উচ্ছ্বসিত স্তুতি করিয়া ফারুকী লিখিয়াছেন "যিনি প্রার্থীকে বহু ঘোড়া দিয়াছেন। যাহারা পায়ে হাঁটে তাহারাও (ইঁহার কাছে) বহু ঘোড়া দানস্বরূপ পাইয়াছে। এই মহান আবুল মুজাফফর, যাঁহার সর্বাপেক্ষা সামান্য ও সাধারণ উপহার একটি ঘোড়া।"

(চ) আমীর জৈনুদ্দীন হর্উয়ি

ইঁহার নাম একজন সমসাময়িক কবি হিসাবে ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকীর 'শরফ্নামা'তে উল্লিখিত হইয়াছে। ফারুকী ইঁহাকে "মালেকুশ শোয়ারা" বা রাজকবি বলিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, ইনি বারবক শাহ ও তাঁহার পরবর্তী সুলতানদের সভাকবি ছিলেন।

বারবক শাহ যে উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় হিন্দু কবি-পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে। ইহা ভিন্ন বারবক শাহ হিন্দুদের উচ্চ রাজপদেও নিয়োগ করিতেন। দ্রব্যগুণের বিখ্যাত টীকাকার শিবদাস সেন লিখিয়াছেন যে তাঁহার পিতা অনন্ত সেন গৌড়েশ্বর বারবক শাহের "অন্তরঙ্গ" অর্থাৎ চিকিৎসক ছিলেন। বৃহস্পতি মিশ্রের 'পদচন্দ্রিকা' হইতে জানা যায় যে, তাঁহার বিশ্বাস রায় প্রভৃতি পুত্রেরা বারবক শাহের প্রধান মন্ত্রীদের অন্যতম ছিলেন। 'পুরাণসর্বস্ব' নামক একটি গ্রন্থের (সঙ্কলনকাল ১৪৭৪ খ্রীঃ) হইতে জানা যায় যে ঐ গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা গোবর্ধনের পৃষ্ঠপোষক কুলধর বারবক শাহের কাছে প্রথমে "সত্য খান" এবং পরে "শুভরাজ খান" উপাধি লাভ করেন, ইহা হইতে মনে হয়, কুলধর বারবক শাহের অধীনে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়া আসিয়াছি যে কেদার রায় ছিলেন ত্রিহুতে বারবক শাহের প্রতিনিধি, নারায়ণদাস ছিলেন তাঁহার চিকিৎসক এবং ভান্দসী রায় ছিলেন তাঁহার রাজ্যের সীমান্তে ঘোড়াঘাট অঞ্চলে একটি দুর্গের অধ্যক্ষ। কৃত্তিবাস তাঁহার আত্মকাহিনীতে গৌড়েশ্বরের অর্থাৎ বারবক শাহের যে কয়জন সভাসদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কেদার রায় এবং নারায়ণ ছাড়াও জগদানন্দ রায়, "ব্রাহ্মণ" সুনন্দ, কেদার খাঁ, গন্ধর্ব রায়, তরণী, সুন্দর, শ্রীবৎস্য, মুকুন্দ প্রভৃতি নাম পাওয়া যাইতেছে। ইঁহাদের মধ্যে মুকুন্দ ছিলেন "রাজার পণ্ডিত"; কেদার খাঁ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী সভাসদ ছিলেন এবং কৃত্তিবাসের সংবর্ধনার সময়ে তিনি কৃত্তিবাসের মাথায় "চন্দনের ছড়া" ঢালিয়াছিলেন; সুন্দর ও শ্রীবৎস্য ছিলেন "ধর্মাধিকারিণী" অর্থাৎ বিচারবিভাগীয় কর্মচারী। গন্ধর্ব রায়কে কৃত্তিবাস "গন্ধর্ব অবতার" বলিয়াছেন, ইহা হইতে মনে হয়, গন্ধর্ব রায় সুপুরুষ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন; কৃত্তিবাস কর্তৃক উল্লিখিত অন্যান্য সভাসদের পরিচয় সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

বারবক শাহের বিভিন্ন শিলালিপি হইতে ইকরার খান, আজমল খান, নসরৎ খান, মরাবৎ খান, খান জহান, অজলকা খান, আশরফ খান, খুর্শীদ খান, উজৈর খান, রাস্তি খান প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আঞ্চলিক শাসনকর্তা; ইঁহাদের অন্যতম রাস্তি খান চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন; ইঁহার পরে ইঁহার বংশধররা বহুদিন পর্যন্ত ঐ অঞ্চল শাসন করিয়াছিলেন।

বারবক শাহ শুধু যে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদেরই রাজপদে নিয়োগ করিতেন তাহা নয়। প্রয়োজন হইলে ভিন্ন দেশের লোককে নিয়োগ করিতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। মুল্লা তকিয়ার বয়াজ হইতে জানা যায় যে, তিনি ত্রিহুতে অভিযানের সময় বহু আফগান সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'তারিখ-ই-ফিরিশতা'য় লেখা আছে যে বারবক শাহ বাংলায় ৮০,০০০ হাবশী আমদানী করিয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা, মন্ত্রী, অমাত্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কথা সম্ভবত সত্য, কারণ বারবক শাহের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে হাবশীরা বাংলার সর্বময় কর্তা হইয়া ওঠে, এমন কি তাহারা বাংলার সিংহাসনও অধিকার করে। হাবশীদের এদেশে আমদানী করা ও শাসন-ক্ষমতা দেওয়ার জন্য কোন কোন গবেষক বারবক শাহের উপর দোষারোপ করিয়াছেন; কিন্তু বারবক শাহ হাবশীদের শারীরিক পটুতার জন্য তাহাদিগকে উপযুক্ত পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন; তাহারা যে ভবিষ্যতে এতখানি শক্তিশালী হইবে, ইহা বুঝা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রকৃত পক্ষে হাবশীদের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য বারবক শাহ দায়ী নহেন, দায়ী তাঁহার উত্তরাধিকারীরা।

আরাকানদেশের ইতিহাসের মতে আরাকানরাজ মেং-খরি (১৪৩৪-৫৯ খ্রীঃ) রামু (বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত) ও তাহার দক্ষিণস্থ বাংলার সমস্ত অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী বসোআহ্‌প্যু (১৪৫৯-৮২ খ্রীঃ) চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে ১৪৭৪ খ্রীঃর মধ্যেই বারবক শাহ চট্টগ্রাম পুনরধিকার করিয়াছিলেন, কারণ ঐ সালে উৎকীর্ণ চট্টগ্রামের একটি শিলালিপিতে রাজা হিসাবে তাঁহার নাম আছে।

বারবক শাহের বিভিন্ন প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি একজন সত্যকার সৌন্দর্যরসিকও ছিলেন। তাঁহার মুদ্রা এবং শিলালিপিগুলির মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত সুন্দর। তাঁহার প্রাসাদের একটি সমসাময়িক বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে; তাহা হইতে দেখা যায় যে, এই প্রাসাদটির মধ্যে উদ্যানের মত একটি শান্ত ও আনন্দদায়ক পরিবেশ বিরাজ করিত, ইহার নীচ দিয়া একটি পরম রমণীয় জলধারা প্রবাহিত হইত এবং প্রাসাদটিতে "মধ্য তোরণ" নামে একটি অপূর্ব সুন্দর "বিশেষ প্রবেশপথ হিসাবে নির্মিত" তোরণ ছিল। গৌড়ের "দাখিল দরওয়াজা" নামে পরিচিত

বিরাট ও সুন্দর তোরণটি বারবক শাহই নির্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

বাংলার সুলতানদের মধ্যে রুকনুদ্দীন বারবক শাহ যে নানা দিক্ দিয়াই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই

৩। শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ

রুকনুদ্দীন বারবক শাহের পুত্র শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ কিছুদিন পিতার সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর তিনি এককভাবে ১৪৭৬-৮১ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সর্বসমেত তাঁহার রাজত্ব ছয় বৎসরের মত স্থায়ী হইয়াছিল।

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহকে উচ্চশিক্ষিত, ধর্মপ্রাণ ও শাসনদক্ষ নরপতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ফিরিশতা লিখিয়াছেন যে য়ুসুফ শাহ আইনের শৃঙ্খলা কঠোরভাবে রক্ষা করিতেন; কেহ তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে সাহস পাইত না; তিনি তাঁহার রাজ্যে প্রকাশ্যে মদ্যপান একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন; আলিমদের তিনি সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, যেন তাঁহারা ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে গিয়া কাহারও পক্ষ অবলম্বন না করেন; তিনি বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, ন্যায়বিচারের দিকেও তাঁহার আগ্রহ ছিল। তাই যে মামলার বিচার করিতে গিয়া কাজীরা ব্যর্থ হইত, সেগুলির অধিকাংশ তিনি স্বয়ং বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিতেন।

য়ুসুফ শাহ যে ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার রাজত্বকালে রাজধানী গৌড় ও তাহার আশেপাশে অনেকগুলি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। তাহাদের কয়েকটির নির্মাতা ছিলেন স্বয়ং য়ুসুফ শাহ। কেহ কেহ মনে করেন, গৌড়ের বিখ্যাত লোটন মসজিদ ও চামকাটি মসজিদ য়ুসুফ শাহই নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

য়ুসুফ শাহের যেমন স্বধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ছিল, তেমনি পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষও ছিল। তাহার প্রমাণ, তাঁহারই রাজত্বকালে পাণ্ডুয়ায় (হুগলী জেলা) হিন্দুদের সূর্য ও নারায়ণের মন্দিরকে মসজিদ ও মিনারে পরিণত করা হইয়াছিল এবং ব্রহ্মশিলা-নির্মিত বিরাট সূর্যমূর্তির বিকৃতিসাধন করিয়া তাহার পৃষ্ঠে শিলালিপি খোদাই করা হইয়াছিল। পাণ্ডুয়ার (হুগলী) পূর্বোক্ত মসজিদটি এখন 'বাইশ

দরওয়াজা' নামে পরিচিত। ইহার মধ্যে হিন্দু মন্দিরের বহু শিলাস্তম্ভ ও ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডুয়া (হুগলী) সম্ভবত য়ুসুফ শাহের রাজত্বকালেই বিজিত হইয়াছিল, কারণ এখানে সর্বপ্রথম তাঁহারই শিলালিপি পাওয়া যায়।

৪। জলালুদ্দীন ফতেহ শাহ

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের মতে শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের মৃত্যুর পরে সিকন্দর শাহ নামে একজন রাজবংশীয় যুবক সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি অযোগ্য ছিলেন বলিয়া অমাত্যেরা তাঁহাকে অল্প সময়ের মধ্যেই অপসারিত করেন। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে এই সিকন্দর শাহ ছিলেন য়ুসুফ শাহের পুত্র; তিনি উন্মাদরোগগ্রস্ত ছিলেন; এই কারণে তিনি যেদিন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই দিনই অমাত্যগণ কর্তৃক অপসারিত হন। কিন্তু মতান্তরে সিকন্দর শাহ দুই মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেষোক্ত মতই সত্য বলিয়া মনে হয়; কারণ যে যুবককে সুস্থ ও যোগ্য জানিয়া অমাত্যেরা সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, তাহার অযোগ্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতে যে কিছু সময় লাগিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য পরবর্তীকালে রচিত ইতিহাসগ্রন্থগুলির উক্তি ব্যতীত এই সিকন্দর শাহের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

পরবর্তী সুলতানের নাম জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহ। ইনি নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের পুত্র এবং শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের খুল্লতাত। ইনি ৮৮৬ হইতে ৮৯২ হিজরা (১৪৮১-৮২ খ্রীঃ হইতে ১৪৮৭-৮৮ খ্রীঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার মুদ্রাগুলি হইতে জানা যায় যে ইহার দ্বিতীয় নাম ছিল হোসেন শাহ।

'তবকাৎ-ই-আকবরী' ও 'রিয়াজ-উস-সলাতীন'-এর মতে ফতেহ্‌ শাহ বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও উদার নৃপতি ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে প্রজারা খুব সুখে ছিল। সমসাময়িক কবি বিজয় গুপ্তের লেখা 'মনসামঙ্গলে' লেখা আছে যে এই নৃপতি বাহুবলে বলী ছিলেন এবং তাঁহার প্রজাপালনের গুণে প্রজারা পরম সুখে ছিল। ফার্সী শব্দকোষ 'শরফ্‌নামা'র রচয়িতা ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের প্রশস্তি করিয়া একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের হাসন-হোসেন পালায় যাহা লেখা আছে, তাহা হইতে মনে হয়, ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালে হিন্দু প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষের যথেষ্ট কারণ বর্তমান ছিল। পালাটিতে হোসেনহাটী গ্রামের কাজী হাসন-হোসেন ভ্রাতৃ-যুগলের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই দুই ভাই এবং হোসেনের শালা দুলা হিন্দুদের উপর অপরিসীম অত্যাচার করিত, ব্রাহ্মণদের নাগালে পাইলে তাহারা তাহাদের পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া মুখে থুতু দিত। একদিন এক বনে একটি কুটিরে রাখাল বালকেরা মনসার ঘট পূজা করিতেছিল, এমন সময়ে তকাই নামে একজন মোল্লা ঝড়বৃষ্টির জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়; সে মনসার ঘট ভাঙিতে গেল, কিন্তু রাখাল বালকেরা তাহাকে বাধা দিয়া প্রহার করিল এবং নাকে খৎ দিয়া ক্ষমা চাহিতে বাধ্য করিল। তকাই ফিরিয়া আসিয়া হাসন-হোসেনের কাছে রাখাল বালকদের নামে নালিশ করিল। নালিশ শুনিয়া হাসন-হোসেন বহু সশস্ত্র মুসলমানকে একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখালদের কুটির আক্রমণ করিল, তাহাদের আদেশে সৈয়দেরা রাখালদের কুটির এবং মনসার ঘট ভাঙিয়া ফেলিল। রাখালরা ভয় পাইয়া বনের মধ্যে লুকাইয়াছিল। কাজীর লোকেরা বন তোলপাড় করিয়া তাহাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিল। হাসন-হোসেন বন্দী রাখালদের "ভূতের" পূজা করার জন্য ধিক্কার দিতে লাগিল।

এই কাহিনী কাল্পনিক বটে, কিন্তু কবির লেখনীতে ইহার বর্ণনা যেরূপ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় যে, সে যুগে মুসলমান কাজী ও ক্ষমতাশালী রাজকর্মচারীরা সময় সময় হিন্দুদের উপর এইরূপ অত্যাচার করিত এবং কবি স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া এই বর্ণনার মধ্যে তাহা প্রতিফলিত করিয়াছেন।

জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালেই নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন—১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে।

চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট ভক্ত যবন হরিদাস তাঁহার অনেক আগেই জন্মগ্রহণ করেন। 'চৈতন্যভাগবত' হইতে জানা যায় যে, হরিদাস মুসলমান হইয়াও কৃষ্ণ নাম করিতেন; এই কারণে কাজী তাঁহার বিরুদ্ধে "মুলুক-পতি" অর্থাৎ আঞ্চলিক শাসনকর্তার কাছে নালিশ করেন। মুলুক-পতি তখন হরিদাসকে বলেন, যে হিন্দুদের তাঁহারা এত ঘৃণা করেন, তাহাদের আচার-ব্যবহার হরিদাস কেন অনুসরণ করিতেছেন? হরিদাস ইহার উত্তরে বলেন যে, সব জাতির ঈশ্বর একই। মুলুক-পতি বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও হরিদাস কৃষ্ণনাম ত্যাগ করিয়া "কলিমা

উচ্চার" করিতে রাজী হইলেন না। তখন কাজীর আজ্ঞায় হরিদাসকে বাইশটি বাজারে লইয়া গিয়া বেত্রাঘাত করা হইল। শেষ পর্যন্ত হরিদাসের অলৌকিক মহিমা দর্শন করিয়া মুলুক-পতি তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে আর কেহ তাঁহার কৃষ্ণনামে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে না। চৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল; সুতরাং ইহা যে জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের রাজত্ব-কালেরই ঘটনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' হইতে জানা যায় যে, চৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে নবদ্বীপের নিকটবর্তী পিরল্যা গ্রামের মুসলমানরা গৌড়েশ্বরের কাছে গিয়া মিথ্যা নালিশ করে যে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে, গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে বলিয়া প্রবাদ আছে, সুতরাং গৌড়েশ্বর যেন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না থাকেন। এই কথা শুনিয়া গৌড়েশ্বর "নবদ্বীপ উচ্ছন্ন" করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহার লোকেরা তখন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের প্রাণবধ ও সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে লাগিল এবং নবদ্বীপের মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া, তুলসীগাছগুলি উপড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। বিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম এই অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হইয়া সপরিবারে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যায় চলিয়া গেলেন। কিছুদিন এইরূপ অত্যাচার চলিবার পর কালী দেবী স্বপ্নে গৌড়েশ্বরকে দেখা দিয়া ভীতিপ্রদর্শন করিলেন। তখন গৌড়েশ্বর নবদ্বীপে অত্যাচার বন্ধ করিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞায় বিধ্বস্ত নবদ্বীপের আমূল সংস্কার সাধন করা হইল। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' হইতে জয়ানন্দের এই বিবরণের আংশিক সমর্থন পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে, চৈতন্যদেবের জন্মের সামান্য পূর্বে নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত গঙ্গাদাস রাজভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া সপরিবারে গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস আরও লিখিয়াছেন যে চৈতন্যদেবের জন্মের ঠিক আগে শ্রীবাস ও তাঁহার তিন ভাইয়ের হরিনাম-সঙ্কীর্তন দেখিয়া নবদ্বীপের লোকে বলিত "মহাতীব্র নরপতি" নিশ্চয়ই ইহাদিগকে শাস্তি দিবেন। এই "নরপতি" জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহ। সুতরাং নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর গৌড়েশ্বরের অত্যাচার সম্বন্ধে জয়ানন্দের বিবরণকে মোটামুটিভাবে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করা যায়। বলা বাহুল্য এই গৌড়েশ্বরও জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহ। অবশ্য জয়ানন্দের বিবরণের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় সত্য না-ও হইতে পারে। গৌড়েশ্বরকে কালী দেবী স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন এবং গৌড়েশ্বর ভীত হইয়া

অত্যাচার বন্ধ করিয়াছিলেন—এই কথা কবিকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু জয়ানন্দের বিবরণ মূলত সত্য, কারণ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে ইহার সমর্থন মিলে এবং জয়ানন্দ নবদ্বীপে মুসলিম রাজশক্তির যে ধরনের অত্যাচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালে রচিত বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের হাসন-হোসেন পালাতেও সেই ধরনের অত্যাচারের বিবরণ পাওয়া যায়। সুতরাং ফতেহ্ শাহ যে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, এবং পরে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অত্যাচার বন্ধ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই। এই অত্যাচারের কারণ বুঝিতেও কষ্ট হয় না। চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলি পড়িলে জানা যায় যে, গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে বলিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলায় ব্যাপক আকারে প্রবাদ রটিয়াছিল। চৈতন্যদেবের জন্মের কিছু পূর্বেই নবদ্বীপ বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসাবে গড়িয়া উঠে এবং এখানকার ব্রাহ্মণেরা সব দিক দিয়াই সমৃদ্ধি অর্জন করেন ; এই সময়ে বাহির হইতেও অনেক ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে আসিতে থাকেন। এইসব ব্যাপার দেখিয়া গৌড়েশ্বরের বিচলিত হওয়া এবং এতগুলি ঐশ্বর্যবান ব্রাহ্মণ একত্র সমবেত হইয়া গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হওয়ার প্রবাদ সার্থক করার ষড়যন্ত্র করিতেছে ভাবা খুবই স্বাভাবিক। ইহার কয়েক দশক পূর্বে বাংলাদেশে রাজা গণেশের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। দ্বিতীয় কোন হিন্দু অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় পরবর্তী গৌড়েশ্বররা নিশ্চয়ই সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতেন। সুতরাং এক শ্রেণীর মুসলমানের উস্কানিতে জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের সন্দেহের চোখে দেখিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই।

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' হইতে জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালের কোন কোন ঘটনা সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে চৈতন্যদেবের জন্মের আগের বৎসর দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল ; চৈতন্যদেবের জন্মের পরে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং দুর্ভিক্ষেরও অবসান হয় ; এই জন্যই তাঁহার 'বিশ্বম্ভর' নাম রাখা হইয়াছিল। 'চৈতন্যভাগবত' হইতে আরও জানা যায় যে যবন হরিদাসকে যে সময়ে বন্দিশালায় প্রেরণ করা হইয়াছিল, সেই সময়ে বহু ধনী হিন্দু জমিদার কারারুদ্ধ ছিলেন ; মুসলিম রাজশক্তির হিন্দু-বিদ্বেষের জন্য ইহারা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, না খাজনা বাকী পড়া বা অন্য কোন কারণে ইহাদের কয়েদ করা হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

বৃন্দাবনদাস জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহকে "মহাতীব্র নরপতি" বলিয়াছেন। ফিরিশ্‌তা লিখিয়াছেন যে কেহ অন্যায় করিলে ফতেহ্‌ শাহ তাহাকে কঠোর শাস্তি দিতেন।

কিন্তু এই কঠোরতাই পরিণামে তাঁহার কাল হইল। ফিরিশ্‌তা লিখিয়াছেন যে এই সময়ে হাবশীদের প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তাহারা সব সময়ে সুলতানের আদেশও মানিত না। ফতেহ্‌ শাহ কঠোর নীতি অনুসরণ করিয়া তাহাদের কতকটা দমন করেন এবং আদেশ-অমান্যকারীদের শাস্তিবিধান করেন। কিন্তু তিনি যাহাদের শাস্তি দিতেন, তাহারা প্রাসাদের প্রধান খোজা বারবকের সহিত দল পাকাইত। এই ব্যক্তির হাতে রাজপ্রাসাদের সমস্ত চাবী ছিল।

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, প্রতি রাত্রে যে পাঁচ হাজার পাইক সুলতানকে পাহারা দিত, তাহাদের অর্থ দ্বারা হাত করিয়া খোজা বারবক এক রাত্রে তাহাদের দ্বারা ফতেহ্‌ শাহকে হত্যা করাইল। ফতেহ্‌ শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় মাহ্‌মূদ শাহী বংশের রাজত্ব শেষ হইল।

৫। সুলতান শাহ্‌জাদা

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের মতে ফতেহ্‌ শাহকে হত্যা করিবার পরে খোজা বারবক "সুলতান শাহজাদা" নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করে। ইহা সত্য হওয়াই সম্ভব, কিন্তু এই ঘটনা সম্বন্ধে তথা বারবক বা সুলতান শাহজাদার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচ্য সময়ের অনেক পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থগুলির উক্তি ভিন্ন আর কোন প্রমাণ মিলে নাই।

আধুনিক গবেষকরা মনে করেন বারবক জাতিতে হাবশী ছিল এবং তাহার সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলদেশে হাবশী রাজত্ব সুরু হইল। কিন্তু এই ধারণার কোন ভিত্তি নাই, কারণ কোন ইতিহাসগ্রন্থেই বারবককে হাবশী বলা হয় নাই। যে ইতিহাসগ্রন্থটিতে বারবক সম্বন্ধে সর্বপ্রথম বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, সেই 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'র মতে বারবক বাঙালী ছিল।

'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন' অনুসারে ফতেহ্‌ শাহের প্রধান অমাত্য মালিক আন্দিল সুলতান শাহজাদাকে হত্যা করেন।

সুলতান শাহজাদার রাজত্বকাল কোনও মতে আট মাস, কোনও মতে ছয় মাস, কোনও মতে আড়াই মাস।

৮৯২ হিজরার (১৪৮৭-৮৮ খ্রীঃ) গোড়ার দিকে জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ ও শেষ দিকে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরেরই মাঝের দিকে কয়েক মাস সুলতান শাহজাদা রাজত্ব করিয়াছিল।

সুলতান শাহজাদা তাহার প্রভুকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। আবার তাহাকে বধ করিয়া একজন অমাত্য সিংহাসন অধিকার করিলেন। এই ধারা কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল; এই কয়েক বৎসরে বাংলাদেশে অনেকেই প্রভুকে হত্যা করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। বাবর তাঁহার আত্মকাহিনীতে বাংলা দেশের এই বিচিত্র ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন এবং যেভাবে এদেশে রাজার হত্যাকারী সকলের কাছে রাজা বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিত, তাহাতে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

৬। সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ

পরবর্তী রাজার নাম সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ। 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন'-এর মতে মালিক আন্দিলই এই নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহই বাংলার প্রথম হাবশী সুলতান। অনেকের ধারণা হাবশী সুলতানরা অত্যন্ত অযোগ্য ও অত্যাচারী ছিলেন এবং তাঁহাদের রাজত্বকালে দেশের সর্বত্র সন্ত্রাস ও অরাজকতা বিরাজমান ছিল। কিন্তু এই ধারণা সত্য নহে। বাংলার প্রথম হাবশী সুলতান ফিরোজ শাহ মহৎ, দানশীল এবং নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম। অন্যান্য হাবশী সুলতানদের মধ্যেও এক মুজাফফর শাহ ভিন্ন আর কোন হাবশী সুলতানকে কোন ইতিহাসগ্রন্থে অত্যাচারী বলা হয় নাই।

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ তাঁহার বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব, মহত্ত্ব ও দয়ালুতার জন্য প্রশংসিত হইয়াছেন। 'রিয়াজ-উস-সলাতীন'-এর মতে তিনি বহু প্রজাহিতকর কাজ করিয়াছিলেন; তিনি এত বেশী দান করিতেন যে পূর্ববর্তী রাজাদের সঞ্চিত সমস্ত ধনদৌলত তিনি নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; কথিত আছে একবার তিনি এক দিনেই এক লাখ টাকা দান করিয়াছিলেন; তাঁহার

অমাত্যেরা এই মুক্তহস্ত দান পছন্দ করেন নাই ; তাঁহারা একদিন ফিরোজ শাহের সামনে এক লক্ষ টাকা মাটিতে স্তূপীকৃত করিয়া তাঁহাকে ঐ অর্থের পরিমাণ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফিরোজ শাহের নিকট এক লক্ষ টাকার পরিমাণ খুবই কম বলিয়া মনে হয় এবং তিনি এক লক্ষের পরিবর্তে দুই লক্ষ টাকা দরিদ্রদের দান করিতে বলেন।

'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লেখা আছে যে, ফিরোজ শাহ গৌড় নগরে একটি মিনার, একটি মসজিদ এবং একটি জলাধার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে মিনারটি এখনও বর্তমান আছে। ইহা 'ফিরোজ মিনার' নামে পরিচিত।

ফিরোজ শাহের মৃত্যু কীভাবে হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। কোন কোন মত অনুসারে তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যু হয় ; কিন্তু অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থের মতে তিনি পাইকদের হাতে নিহত হইয়াছিলেন। ফিরোজ শাহ ১৪৮৭ খ্রীঃ হইতে ১৪৯০ খ্রীঃ—কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ "ফতে শাহের ক্রীত-দাস" ও "নপুংসক" ছিলেন। কিন্তু এই মতের সপক্ষে কোন প্রমাণ নাই।

৭। নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ (দ্বিতীয়)

পরবর্তী সুলতানের নাম নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ। ইহার পূর্বে এই নামের আর একজন সুলতান ছিলেন, সুতরাং ইহাকে দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ বলা উচিত।

ইহার পিতৃপরিচয় রহস্যাবৃত। ফিরিশ্‌তা ও 'রিয়াজ'-এর মতে ইনি সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের পুত্র, কিন্তু হাজী মুহম্মদ কন্দাহারী নামে ষোড়শ শতাব্দীর একজন ঐতিহাসিকের মতে ইনি জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের পুত্র। এই সুলতানের শিলা-লিপিতে ইহাকে শুধুমাত্র সুলতান বলা হইয়াছে—পিতার নাম করা হয় নাই। ফিরোজ শাহ ও ফতেহ্‌ শাহ—উভয়েই সুলতান ছিলেন, সুতরাং দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ কাহার পুত্র ছিলেন, তাহা সঠিকভাবে বলা অত্যন্ত কঠিন। তবে ইহাকে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের পুত্র বলিয়া মনে করার পক্ষেই যুক্তি প্রবলতর।

ফিরিশ্‌তা, 'রিয়াজ' ও মুহম্মদ কন্দাহারীর মতে দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের রাজত্বকালে হাব্‌শ্‌ খান নামে একজন হাবশী (কন্দাহারীর মতে ইনি সুলতানের শিক্ষক, ফিরোজ শাহের জীবদ্দশায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন) সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করেন, সুলতান তাঁহার ক্রীড়নকে পরিণত হন। কিছুদিন এইভাবে চলিবার পরে (কন্দাহারীর মতে হাব্‌শ্‌ খান তখন নিজে সুলতান হইবার মতলব আঁটিতেছিলেন) সিদি বদ্‌র্‌ নামে আর একজন হাবশী বেপরোয়া হইয়া উঠিয়া হাব্‌শ্‌ খানকে হত্যা করে এবং নিজেই শাসনব্যবস্থার কর্তা হইয়া বসে। কিছুদিন পরে এক রাত্রে সিদি বদ্‌র্‌ পাইকদের সর্দারের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহকে হত্যা করে এবং পরের দিন প্রভাতে সে অমাত্যদের সম্মতিক্রমে (শামসুদ্দীন) মুজাফফর শাহ নাম লইয়া সিংহাসনে বসে।

মুজাফফর শাহ কর্তৃক দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের হত্যা এবং তাঁহার সিংহাসন অধিকারের কথা সম্পূর্ণ সত্য, কারণ বাবর তাঁহার আত্মকাহিনীতে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

৮। শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ

মুজাফফর শাহ অত্যাচারী ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতির লোক ছিলেন; রাজা হইয়া তিনি বহু দরবেশ, আলিম ও সম্ভ্রান্ত লোকদের হত্যা করেন। অবশেষে তাঁহার অত্যাচার যখন চরমে পৌঁছিল, তখন সকলে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল; তাঁহার মন্ত্রী সৈয়দ হোসেন বিরুদ্ধবাদীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং মুজাফফর শাহকে বধ করিয়া নিজে রাজা হইলেন।

মুজাফফর শাহের নৃশংসতা, অত্যাচার ও কুশাসন সম্বন্ধে পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলিতে যাহা লেখা আছে, তাহা কতদূর সত্য বলা যায় না; সম্ভবত খানিকটা অতিরঞ্জন আছে।

কীভাবে মুজাফফর শাহ নিহত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকদের মধ্যে দুইটি মত প্রচলিত আছে। একটি মত এই যে, মুজাফফর শাহের সহিত তাঁহার বিরোধীদের মধ্যে কয়েক মাস ধরিয়া যুদ্ধ চলিবার পর এবং লক্ষাধিক লোক এই যুদ্ধে নিহত হইবার পর মুজাফফর শাহ পরাজিত ও নিহত হন। দ্বিতীয় মত এই যে, সৈয়দ হোসেন পাইকদের সর্দারকে ঘুষ দিয়া হাত

করেন এবং কয়েকজন লোক সঙ্গে লইয়া মুজাফফর শাহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। সম্ভবত শেষোক্ত মতই সত্য, কারণ বাবরের আত্ম-কাহিনীতে ইহার প্রচ্ছন্ন সমর্থন পাওয়া যায়।

মুজাফফর শাহের রাজত্বকালে পাণ্ডুয়ায় নূর কুৎব্ আলমের সমাধি-ভবনটি পুনর্নির্মিত হয়। এই সমাধি-ভবনের শিলালিপিতে মুজাফফর শাহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে। মুজাফফর শাহ গঙ্গারামপুরে মৌলানা আতার দরগায়ও একটি মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সুতরাং মুজাফফর শাহ যে দরবেশ ও ধার্মিক লোকদের হত্যা করিতেন—পূর্বোল্লিখিত ইতিহাসগ্রন্থগুলির এই উক্তিতে আস্থা স্থাপন করা যায় না।

মুজাফফর শাহ ৮৯৬ হইতে ৮৯৮ হিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে হাবশী রাজত্বের অবসান হইল। পরবর্তী সুলতান আলা-উদ্দীন হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হাবশীদের বাংলা হইতে বিতাড়িত করেন। রুকনুদ্দীন বারবক শাহের রাজত্বকালে যাহারা এদেশের শাসনব্যবস্থায় প্রথম অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ পায়, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহাদের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ ও তাহার ঠিক পরেই সদলবলে বিদায় গ্রহণ—দুইই নাটকীয় ব্যাপার। এই হাবশীদের মধ্যে সকলেই যে খারাপ লোক ছিল না, সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহই তাহার প্রমাণ। হাবশীদের চেয়েও অনেক বেশী দুর্বৃত্ত ছিল পাইকেরা। ইহারা এদেশেরই লোক। ১৪৮৭ হইতে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন সুলতানের আততায়ীরা এই পাইকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়াই রাজাদের বধ করিয়াছিল। জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের হত্যাকারী বারবক স্বয়ং পাইকদের সর্দার ও বাঙালী ছিল বলিয়া 'তারিখ-ই-ফিরিশতা'য় লিখিত হইয়াছে।

বাংলার হাবশীদের মধ্যে যাঁহারা প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে মালিক আন্দিল (ফিরোজ শাহ), সিদি বদ্‌র্ (মুজাফফর শাহ), হাব্‌শ্ খান, কাফুর প্রভৃতির নাম বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ ও শিলালিপি হইতে জানা যায়। রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁহার 'গৌড়ের ইতিহাসে' আরও কয়েকজন "প্রধান হাবশী"র নাম করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হোসেন শাহী বংশ

১। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের নামই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ইহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজ্যের আয়তন অন্যান্য সুলতানদের রাজ্যের তুলনায় বৃহত্তর ছিল। দ্বিতীয়ত, বাংলার অন্যান্য সুলতানদের তুলনায় হোসেন শাহের অনেক বেশী ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন (অর্থাৎ গ্রন্থাদিতে উল্লেখ, শিলালিপি প্রভৃতি) মিলিয়াছে। তৃতীয়ত, হোসেন শাহ ছিলেন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং এইজন্য চৈতন্যদেবের নানা প্রসঙ্গের সহিত হোসেন শাহের নাম যুক্ত হইয়া বাঙালীর স্মৃতিতে স্থান লাভ করিয়াছে।

কিন্তু এই বিখ্যাত নরপতি সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্য এ পর্যন্ত খুব বেশী জানিতে পারা যায় নাই। তাহার ফলে অধিকাংশ লোকের মনেই হোসেন শাহ সম্বন্ধে যে ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মধ্যে সত্য অপেক্ষা কল্পনার পরিমাণই অধিক। সুতরাং হোসেন শাহের ইতিহাস যথাসম্ভব সঠিকভাবে উদ্ধারের জন্য একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

মুদ্রা, শিলালিপি এবং অন্যান্য প্রামাণিক সূত্র হইতে জানা যায় যে, হোসেন শাহ সৈয়দ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ আশরফ অল-হোসেনী। 'রিয়াজ'-এর মতে হোসেন শাহের পিতা তাঁহাকে ও তাঁহার ছোট ভাই য়ুসুফকে সঙ্গে লইয়া তুর্কিস্তানের তারমুজ শহর হইতে বাংলায় আসিয়াছিলেন এবং রাঢ়ের চাঁদপুর (বা চাঁদপাড়া) মৌজায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন ; সেখানকার কাজী তাঁহাদের দুই ভাইকে শিক্ষা দেন এবং তাঁহাদের উচ্চ বংশমর্যাদার কথা জানিয়া হোসেনের সহিত নিজের কন্যার বিবাহ দেন। স্টুয়ার্টের মতে হোসেন আরবের মরুভূমি হইতে বাংলায় আসিয়াছিলেন। একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে হোসেন বাল্যকালে চাঁদপাড়ায় এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাখালের কাজ করিতেন ; বাংলার সুলতান হইয়া তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে মাত্র এক

আনা খাজনায় চাঁদপাড়া গ্রামখানি জায়গীর দেন; তাহার ফলে গ্রামটি আজও পর্যন্ত একানী চাঁদপাড়া নামে পরিচিত; হোসেন কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহার বেগমের নির্বন্ধে ঐ ব্রাহ্মণকে গোমাংস খাওয়াইয়া তাঁহার জাতি নষ্ট করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কাহিনীর মধ্যে কতখানি সত্য আছে, তাহা বলা যায় না। তবে চাঁদপুর বা চাঁদপাড়া গ্রামের সহিত হোসেন শাহের সম্পর্কের কথা সত্য বলিয়া মনে হয়, কারণ এই অঞ্চলে তাঁহার বহু শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার 'চৈতন্যচরিতামৃতে' (মধ্যলীলা, ২৫ শ পরিচ্ছেদ) লিখিয়াছেন যে, রাজা হইবার পূর্বে সৈয়দ হোসেন "গৌড়-অধিকারী" (বাংলার রাজধানী গৌড়ের প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী) সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকুরী করিতেন; সুবুদ্ধি রায় তাঁহাকে এক দীঘি কাটানোর কাজে নিয়োগ করেন এবং তাঁহার কার্যে ত্রুটি হওয়ায় তাঁহাকে চাবুক মারেন; পরে সৈয়দ হোসেন সুলতান হইয়া সুবুদ্ধি রায়ের পদমর্যাদা অনেক বাড়াইয়া দেন; কিন্তু তাঁহার বেগম একদিন তাঁহার দেহে চাবুকের দাগ আবিষ্কার করিয়া সুবুদ্ধি রায়ের চাবুক মারার কথা জানিতে পারেন এবং সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণবধ করিতে সুলতানকে অনুরোধ জানান। সুলতান তাহাতে সম্মত না হওয়ায় বেগম সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নষ্ট করিতে বলেন। হোসেন শাহ তাহাতেও প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর নির্বন্ধাতিশয্যে অবশেষে সুবুদ্ধি রায়ের মুখে করোয়ার (বদনার) জল দেওয়ান এবং তাহার ফলে সুবুদ্ধি রায়ের জাতি যায়।

এই বিবরণ সত্য বলিয়াই মনে হয়, কারণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে হোসেন শাহের অমাত্য এবং সুবুদ্ধি রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপ-সনাতনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। সুবুদ্ধি রায়ও স্বয়ং শেষ জীবনে বহুদিন বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন, সুতরাং কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহারও পরিচিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। অতএব কৃষ্ণদাস যে পূর্ব্বোক্ত কাহিনী কোন প্রামাণিক সূত্র হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

পর্তুগীজ ঐতিহাসিক জোআঁ-দে-বারোস তাঁহার 'দা এসিয়া' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে পর্তুগীজদের চট্টগ্রামে আগমনের একশত বৎসর পূর্বে একজন আরব বণিক দুইশত জন অনুচর লইয়া বাংলায় আসিয়াছিলেন এবং নানা রকম কৌশল করিয়া তিনি ক্রমশ বাঙলার সুলতানের বিশ্বাসভাজন হন ও শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে বধ করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই

কাহিনী হোসেন শাহ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কিন্তু জোআঁ-দে-বারোস ঐ আরব বণিকের যে সময় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হোসেন শাহের সময়ের একশত বৎসর পূর্ববর্তী।

যাহা হউক, হোসেন শাহের পূর্ব-ইতিহাস অনেকখানি রহস্যাবৃত। কয়েকটি বিবরণে খুব জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে তিনি বিদেশ (আরব বা তুর্কিস্তান) হইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। কোন কোন মতে হোসেন শাহ বিদেশাগত নহেন, তিনি বাংলা দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফ্রান্সিস বুকাননের মতে হোসেন রংপুরের বোদা বিভাগের দেবনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হোসেন শাহের মাতা যে হিন্দু ছিলেন, এইরূপ কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। বাবর তাঁহার আত্মজীবনীতে হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহকে "নসরৎ শাহ বঙ্গালী" বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, হোসেন শাহের দেহ কৃষ্ণবর্ণ ছিল। এই সমস্ত বিষয় হইতে মনে হয়, হোসেন শাহ বিদেশী ছিলেন না, তিনি বাঙালীই ছিলেন ; যে সমস্ত সৈয়দ-বংশ বাংলা দেশে বহু পুরুষ ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছিল, সেইরূপ একটি বংশেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পূর্বে হোসেন শাহ হাবশী সুলতান মুজাফফর শাহের উজীর ছিলেন—বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে এ কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহার সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। মুজাফফর শাহের উজীর থাকিবার সময় হোসেন একদিকে তাঁহাকে বৈধ অবৈধ নানাভাবে অর্থ সংগ্রহের পরামর্শ দিতেন ও অপর দিকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচার করিতেন ; ইহা খুবই নিন্দনীয়। যে ভাবে হোসেন প্রভুকে বধ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন, তাহারও প্রশংসা করা যায় না। তবে মুজাফফর শাহও তাঁহার প্রভুকে হত্যা করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার প্রতি হোসেনের এই আচরণকে "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" নীতির অনুসরণ বলিয়া ক্ষমা করা যায়।

মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, হোসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রীঃর নভেম্বর হইতে ১৪৯৪ খ্রীঃর জুলাই মাসের মধ্যে কোন এক সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় যে তাঁহার যথেষ্ট বয়স হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে।

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের মতে মুজাফফর শাহের মৃত্যুর পরে প্রধান অমাত্যেরা একত্র সমবেত হইয়া হোসেনকে রাজা হিসাবে নির্বাচিত করেন। তবে, ফিরিশ্‌তা ও 'রিয়াজ'-এর মতে হোসেন শাহ অমাত্যদিগকে লোভ দেখাইয়া রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। হোসেন অমাত্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা যদি তাঁহাকে রাজপদে নির্বাচন করেন, তবে তিনি গৌড় নগরের মাটির উপরের সমস্ত ধন-সম্পত্তি তাঁহাদিগকে দিবেন এবং মাটির নীচে লুকানো সব সম্পদ তিনি নিজে লইবেন। অমাত্যেরা এই সর্তে সম্মত হইয়া তাঁহাকে রাজা করেন এবং গৌড়ের মাটির উপরের সম্পত্তি লুঠ করিয়া লইতে থাকেন; কয়েক দিন পরে হোসেন শাহ তাঁহাদিগকে লুঠ বন্ধ করিতে বলেন; তাঁহারা তাহাতে রাজী না হওয়ায় হোসেন বারো হাজার লুণ্ঠনকারীকে বধ করেন; তখন অন্যেরা লুঠ বন্ধ করে; হোসেন নিজে কিন্তু গৌড়ের মাটির নীচের সম্পত্তি লুঠ করিয়া হস্তগত করেন; তখন ধনী ব্যক্তিরা সোনার থালাতে খাইতেন; হোসেন এইরূপ তেরশত সোনার থালা সমেত বহু গুপ্তধন লাভ করিলেন।

এই বিবরণ সত্য হইলে বলিতে হইবে হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণের সময় নানা ধরনের ক্রূর কূটনীতি ও হীন চাতুরীর আশ্রয় লইয়াছিলেন।

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের মতে হোসেন রাজা হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যে পরিপূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন। এ কথা সত্য, কারণ সমসাময়িক সাহিত্য হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। ইতিহাসগ্রন্থগুলির মতে ইতিপূর্বে বিভিন্ন সুলতানের হত্যাকাণ্ডে যাহারা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, সেই পাইকদের দলকে হোসেন শাহ ভাঙিয়া দেন এবং প্রাসাদ রক্ষার জন্য অন্য রক্ষি-দল নিযুক্ত করেন; হাবশীদের তিনি তাঁহার রাজ্য হইতে একেবারে বিতাড়িত করেন; তাহারা গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতে চলিয়া গেল; হোসেন সৈয়দ, মোগল ও আফগানদের উচ্চপদে নিয়োগ করিলেন।

হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের প্রায় দুই বৎসর পরে (১৪৯৫ খ্রীঃ) জৌনপুরের রাজ্যচ্যুত সুলতান হোসেন শাহ শর্কী দিল্লীর সুলতান সিকন্দর শাহ লোদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং পরাজিত হইয়া বাংলায় পলাইয়া আসেন। বাংলার সুলতান হোসেন শাহ তাঁহাকে আশ্রয় দেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সিকন্দর লোদী বাংলার সুলতানের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। হোসেন শাহও তাঁহার পুত্র দানিয়েলের নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী পাঠাইলেন। উভয় বাহিনী

বিহারের বাঢ় নামক স্থানে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া কিছুদিন রহিল, কিন্তু যুদ্ধ হইল না। অবশেষে দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি অনুসারে দুই পক্ষের অধিকার পূর্ববৎ রহিল এবং হোসেন শাহ সিকন্দর লোদীকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে সিকন্দরের শত্রুদের তিনি ভবিষ্যতে নিজ রাজ্যে আশ্রয় দিবেন না। সিকন্দরও হোসেনকে অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইহার পর সিকন্দর লোদী দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন। দিল্লীর পরাক্রান্ত সুলতানের সহিত সংঘর্ষের এই সম্মানজনক পরিণাম হোসেন শাহের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হোসেন শাহ তাঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসর হইতেই মুদ্রায় নিজেকে "কামরূপ-কামতা-জাজনগর-উড়িষ্যা-বিজয়ী" বলিয়া অভিহিত করিতে এবং এই রাজ্যগুলি বিজয়ের সক্রিয় চেষ্টা করিতে থাকেন। কয়েক বৎসরের চেষ্টায় তিনি কামতাপুর ও কামরূপ রাজ্য সম্পূর্ণভাবে জয় করিলেন। ঐ অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে হোসেন শাহ বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে কামতাপুর (কোচবিহার) ও কামরূপ (আসামের পশ্চিম অংশ) জয় করিয়াছিলেন; কামতাপুর ও কামরূপের রাজা খেন-বংশীয় নীলাম্বর তাঁহার মন্ত্রীর পুত্রকে বধ করিয়াছিলেন সে তাঁহার রানীর প্রতি অবৈধ আসক্তি প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া; তাহাকে বধ করিয়া তিনি তাহার পিতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার মাংস খাওয়াইয়াছিলেন; তখন তাহার পিতা প্রতিশোধ লইবার জন্য গঙ্গাস্নান করিবার অছিলা করিয়া গৌড়ে চলিয়া আসেন এবং হোসেন শাহকে কামতাপুর আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করেন। হোসেন শাহ তখন কামতাপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু নীলাম্বর তাঁহার আক্রমণ প্রতিহত করেন। অবশেষে হোসেন শাহ মিথ্যা করিয়া নীলাম্বরকে বলিয়া পাঠান যে তিনি চলিয়া যাইতে চাহেন, কিন্তু তাহার পূর্বে তাঁহার বেগম একবার নীলাম্বরের রানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন; নীলাম্বর তাহাতে সম্মত হইলে হোসেন শাহের শিবির হইতে তাঁহার রাজধানীর ভিতরে পালকী যায়, তাহাতে নারীর ছদ্মবেশে সৈন্য ছিল; তাহারা কামতাপুর নগর অধিকার করে; ১৪৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

এই প্রবাদের খুঁটিনাটি বিবরণগুলি এবং ইহাতে উল্লিখিত তারিখ সত্য বলিয়া মনে হয় না। তবে হোসেন শাহের কামতাপুর-কামরূপ বিজয় যে ঐতিহাসিক ঘটনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ 'রিয়াজ', বুকাননের বিবরণী এবং

কামতাপুর অঞ্চলের কিংবদন্তী—সমস্ত সূত্রই এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে একমত। 'আসাম বুরঞ্জী'র মতে কোচ রাজা বিশ্বসিংহ হোসেন শাহের অধীনস্থ আটগাঁওয়ের মুসলমান শাসনকর্তা "তুরকা কোতয়াল" কে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া কামতাপুর-কামরূপ রাজ্য পুনরধিকার করেন। কথিত আছে যে ১৫১৩ খ্রীঃর পরে কামতাপুর রাজ্য হইতে মুসলমানরা বিতাড়িত হইয়াছিল। এই সব কথা কতদূর সত্য, তাহা বলা যায় না।

ঐ সময়ে কামরূপের পূর্ব ও দক্ষিণে আসাম বা অহোম রাজ্য অবস্থিত ছিল। রাজ্যটি দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য এবং এখানে বর্ষার প্রকোপ খুব বেশী হওয়ার জন্য বাহিরের কোন শক্তির পক্ষে এই রাজ্য জয় করা খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিহাবুদ্দীন তালিশ নামে মোগল সরকারের জনৈক কর্মচারী তাঁহার 'তারিখ-ফতে-ই-আশাম' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে হোসেন শাহ ২৪,০০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আসাম আক্রমণ করেন, তখন আসামের রাজা পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হোসেন শাহ আসামের সমতল অঞ্চল অধিকার করিয়া সেখানে তাঁহার জনৈক পুত্রকে (কিংবদন্তী অনুসারে ইহার নাম "দুলাল গাজী") এক বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ রাখিয়া নিজে গৌড়ে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু যখন বর্ষা নামিল, তখন চারিদিক জলে ভরিয়া গেল। সেই সময়ে আসামের রাজা পার্বত্য অঞ্চল হইতে নামিয়া হোসেনের পুত্রকে বধ করিলেন ও তাঁহার সৈন্য ধ্বংস করিলেন। মীর্জা মুহম্মদ কাজিমের 'আলমগীরনামা' এবং গোলাম হোসেনের 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন'-এ শিহাবুদ্দীন তালিশের এই বিবরণের পরিপূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু অসমীয়া বুরঞ্জীগুলির মতে বাংলার রাজা "খুনফং" বা "খুফং" (হুসন) "বড় উজীর" ও "বিৎ মালিক" (বা "মিৎ মানিক") নামে দুই ব্যক্তির নেতৃত্বে আসাম জয়ের জন্য ২০,০০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য এবং অসংখ্য রণতরী প্রেরণ করিয়াছিলেন; এই বাহিনী প্রায় বিনা বাধায় অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়; তাহার পর আসামরাজ সুহুঙ্গ মুঙ্গ তাহাদের প্রচণ্ড বাধা দেন; দুই পক্ষের মধ্যে নৌযুদ্ধ হয় এবং তাহাতে মুসলমানরা প্রথম দিকে জয়লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়; "বড় উজীর" পলাইয়া প্রাণ বাঁচান; কিছুদিন পরে তিনি আবার "বিৎ মালিক" সমভিব্যাহারে আসাম আক্রমণ করেন; ইতিমধ্যে আসামরাজ কয়েকটি নদীর মোহানায় ঘাঁটি বসাইয়া তাঁহার প্রধান সেনাপতিদের মোতায়েন করিয়া রাখিয়াছিলেন; বাংলার সৈন্য-

বাহিনী জলপথ ও স্থলপথে সিংরী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া সেখানকার ঘাঁটি আক্রমণ করে ও এখানে বহুক্ষণব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে অসমীয়া সেনাপতি বরপুত্র গোহাইন বাংলার বাহিনীকে পরাজিত করেন। "বিৎ মালিক" এবং বাংলার বহু সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, অনেকে বন্দী হইয়াছিল; "বড় উজীর" এবারও স্বল্পসংখ্যক অনুচর লইয়া পলাইয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন; তাঁহাদিগকে অসমীয়া বাহিনী অনেক দূর পর্যন্ত তাড়া করিয়া লইয়া গেল।

মুসলমান লেখকদের লেখা বিবরণে এবং অসমীয়া বুরঞ্জীর বিবরণে কিছু পার্থক্য থাকিলেও এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে হোসেন শাহের আসামজয়ের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছিল।

আসামের "হোসেন শাহী পরগণা" নামে পরিচিত একটি অঞ্চল এখনও হোসেন শাহের স্মৃতি বহন করিতেছে।

উড়িষ্যার সহিতও হোসেন শাহের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হইয়াছিল। মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, হোসেন শাহের রাজত্বের প্রথম বৎসরেই উড়িষ্যার সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধে। ঐ সময়ে পুরুষোত্তমদেব উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র প্রতাপরুদ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতাপরুদ্রের দীক্ষাগুরু জীবদেবাচার্যের লেখা 'ভক্তিভাগবত' মহাকাব্য হইতে জানা যায় যে, সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতাপরুদ্রকে বাংলার সুলতানের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল।

হোসেন শাহের মুদ্রা ও শিলালিপি, 'রিয়াজ-উস্ সলাতীন' এবং ত্রিপুরার রাজমালার সাক্ষ্য অনুসারে হোসেন শাহ উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে, উড়িষ্যার বিভিন্ন সূত্রের মতে উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রই হোসেন শাহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জীবদেবাচার্য 'ভক্তিভাগবত'-এ লিখিয়াছেন যে পিতার মৃত্যুর ছয় সপ্তাহের মধ্যেই প্রতাপরুদ্র বাংলার সুলতানকে পরাজিত করিয়া গঙ্গা (ভাগীরথী) নদীর তীর পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে প্রতাপরুদ্রের নিকট পরাজিত হইয়া গৌড়েশ্বর কাঁদিয়াছিলেন এবং ভয়াকুল চিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের রচনা বলিয়া ঘোষিত 'সরস্বতীবিলাসম্' গ্রন্থে (১৫১৫ খ্রীঃ বা তাহার পূর্ব্বে রচিত) প্রতাপরুদ্রকে "শরণাগত-জবুনা-পুরাধীশ্বর-হুসনশাহ-সুরত্রাণ-শরণরক্ষণ" বলা হইয়াছে, অর্থাৎ প্রতাপরুদ্র শুধু

হোসেন শাহের বিজেতা নহেন, তাঁহার রক্ষাকর্তাও! উড়িয়া ভাষায় লেখা জগন্নাথ মন্দিরের 'মাদলা পাঞ্জী' ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা 'কটকরাজবংশাবলী' গ্রন্থের মতে বাংলার সুলতান উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া উড়িষ্যার রাজধানী কটক এবং পুরী পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল জয় করিয়া লন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রায় সমস্ত দেবমূর্তি তিনি নষ্ট করেন, জগন্নাথের মূর্তিকে দোলায় চড়াইয়া চিল্কা হ্রদের মধ্যস্থিত চড়াইগুহা পর্ব্বতে লইয়া গিয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়া উহা ধ্বংস হইতে রক্ষা পায়। এই সময়ে প্রতাপরুদ্র দক্ষিণ দিকে অভিযানে গিয়াছিলেন, এই সংবাদ পাইয়া তিনি দ্রুতগতিতে চলিয়া আসেন এবং বাংলার সুলতানকে তাড়া করিয়া গঙ্গার তীর পর্যন্ত লইয়া যান। 'মাদলা পাঞ্জী'র মতে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই সূত্রের মতে চউমুহিঁতে প্রতাপরুদ্র ও হোসেন শাহের মধ্যে বিরাট যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হোসেন শাহ মান্দারণ দুর্গে আশ্রয় লন। প্রতাপরুদ্র তখন মান্দারণ দুর্গ অবরোধ করেন। প্রতাপরুদ্রের অন্যতম সেনাপতি গোবিন্দ ভোই বিদ্যাধর ইতিপূর্বে হোসেন শাহের কটক আক্রমণের সময়ে কটক রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল, সে এখন হোসেন শাহের সহিত যোগ দিল; হোসেন শাহ ও গোবিন্দ বিদ্যাধর প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে মান্দারণ হইতে বিতাড়িত করিলেন। মান্দারণ হইতে অনেকখানি পশ্চাদপসরণ করিয়া প্রতাপরুদ্র গোবিন্দ বিদ্যাধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাকে অনেক বুঝাইয়া সুজাইয়া আবার স্বদেশে আনয়ন করিলেন; ইহার পর তিনি গোবিন্দকে পাত্রের পদে অধিষ্ঠিত করিয়া তাহাকেই রাজ্য শাসনের ভার দিলেন; হোসেন শাহ আর উড়িষ্যা জয় করিতে পারিলেন না। এই বিবরণের সমস্ত কথা সত্য না হইলেও অনেকখানিই যে সত্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে হোসেন শাহ ও উড়িষ্যারাজের সংঘর্ষে উভয়পক্ষই জয়ের দাবী করিয়াছেন।

বাংলার চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলি—বিশেষভাবে 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক' হইতে এ সম্বন্ধে অনেকটা নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। এগুলি হইতে জানা যায় যে, হোসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া সেখানকার বহু দেবমন্দির ও দেবমূর্তি ভাঙিয়াছিলেন ও দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার সহিত উড়িষ্যার রাজার যুদ্ধ চলিয়াছিল। চৈতন্যদেব যখন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের শেষে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন (১৫১২ খ্রীঃ), তখন বাংলা ও

উড়িষ্যার যুদ্ধ বন্ধ ছিল। বাংলা হইতে চৈতন্যদেবের নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের (জুন ১৫১৫ খ্রীঃ) অব্যবহিত পরে হোসেন শাহ আবার উড়িষ্যায় অভিযান করেন।

জয়ানন্দ তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গলে' লিখিয়াছেন যে উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র একবার বাংলা দেশ আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া সে সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁহাকে এই প্রচেষ্টা হইতে বিরত হইতে বলেন; তিনি প্রতাপরুদ্রকে বলেন যে "কালযবন রাজা পঞ্চগৌড়েশ্বর" মহাশক্তিমান; তাহার রাজ্য আক্রমণ করিলে সে উড়িষ্যা উৎসন্ন করিবে এবং জগন্নাথকে নীলাচল ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে। চৈতন্যদেবের কথা শুনিয়া প্রতাপরুদ্র বাংলা আক্রমণ হইতে নিরস্ত হন। এই উক্তি কত দূর সত্য বলা যায় না।

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে, ১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহের সহিত উড়িষ্যার রাজার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৫১২ খ্রীঃ হইতে ১৫১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত এই যুদ্ধ বন্ধ ছিল। কিন্তু ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ আবার উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং স্বয়ং এই অভিযানে নেতৃত্ব করেন। কিন্তু এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে কোন পক্ষই বিশেষ কোন স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারেন নাই।

হোসেন শাহ এবং ত্রিপুরার রাজার মধ্যেও অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল। ইহা 'রাজমালা' (ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস) নামক বাংলা গ্রন্থে কবিতার আকারে বর্ণিত হইয়াছে। 'রাজমালা'র দ্বিতীয় খণ্ডে (রচনাকাল ১৫৭৭-৮৬ খ্রীঃ-র মধ্যে) হোসেন শাহ ও ত্রিপুরারাজের সংঘর্ষের বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ বিবরণের সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হোসেন শাহের সহিত ত্রিপুরারাজের বহু সংঘর্ষ হয়। ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই ত্রিপুরারাজ ধন্যমাণিক্য বাংলার সুলতানের অধীন অনেক অঞ্চল জয় করেন। ১৪৩৫ শকে ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম অধিকার করেন ও এতদুপলক্ষে স্বর্ণমুদ্রা প্রকাশ করেন। হোসেন শাহ তাঁহার বিরুদ্ধে গৌরাই মল্লিক নামক একজন সেনাপতির অধীনে এক বিপুল বাহিনী পাঠান। গৌরাই মল্লিক ত্রিপুরার অনেক অঞ্চল জয় করেন, কিন্তু চণ্ডীগড় দুর্গ জয় করিতে অসমর্থ হন। ইহার পর তিনি চণ্ডীগড়ের পাশ কাটাইয়া গিয়া গোমতী নদীর উপর দিক দখল করেন, বাঁধ দিয়া গোমতীর জল অবরুদ্ধ করেন এবং তিন দিন পরে বাঁধ খুলিয়া জল ছাড়িয়া দেন; ঐ জল দেশ ভাসাইয়া দিয়া ত্রিপুরার বিপর্যয় সাধন করিল। তখন ত্রিপুরারাজ

অভিচার অনুষ্ঠান করিলেন; এই অনুষ্ঠানে বলিপ্রদত্ত চণ্ডালের মাথা বাংলার সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটিতে অলক্ষিতে পুঁতিয়া রাখিয়া আসা হইল। তাহার ফলে সেই রাত্রেই বাংলার সৈন্যরা ভয়ে পলাইয়া গেল।

১৪৩৮ শকে ধন্যমাণিক্যের রাইকছাগ ও রাইকছম নামে দুইজন সেনাপতি আবার চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তখন হোসেন শাহ হৈতন খাঁ নামে একজন সেনাপতির অধীনে আর একটি বাহিনী পাঠান। হৈতন খাঁ সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইয়া ত্রিপুরারাজ্যের দুর্গের পর দুর্গ জয় করিতে থাকেন এবং গোমতী নদীর তীরে গিয়া উপস্থিত হন। ইহাতে বিচলিত হইয়া ধন্যমাণিক্য ডাকিনীদের সাহায্য চান। তখন ডাকিনীরা গোমতী নদীর জল শোষণ করিয়া সাত দিন নদীর খাত শুষ্ক রাখিয়া অতঃপর জল ছাড়িয়া দিল। সেই জলে ত্রিপুরার লোকেরা বহু ভেলা ভাসাইল, প্রতি ভেলায় তিনটি করিয়া পুতুল ও প্রতি পুতুলের হাতে দুইটি করিয়া মশাল ছিল। অর্গলমুক্ত জলধারায় বাংলার সৈন্যদের হাতী ঘোড়া উট ভাসিয়া গেল, ইহা ভিন্ন তাহারা দূর হইতে জলন্ত মশাল দেখিয়া ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল; তাহার পর ত্রিপুরার লোকেরা তাহাদের নিকটবর্তী একটি বনে আগুন লাগাইয়া দিল। বাংলার সৈন্যেরা তখন পলাইয়া গেল, তাহাদের অনেকে ত্রিপুরার সৈন্যদের হাতে মারা পড়িল। ত্রিপুরার সৈন্যেরা বাংলার বাহিনীর অধিকৃত চারিটি ঘাঁটি পুনরধিকার করিল। বাংলার বাহিনী ছয়কড়িয়া ঘাঁটিতে অবস্থান করিতে লাগিল।

এখন প্রশ্ন এই, 'রাজমালা'র এই বিবরণ কতদূর বিশ্বাসযোগ্য? ধন্যমাণিক্য অভিচারের দ্বারা গৌরাই মল্লিককে এবং ডাকিনীদের সাহায্যে হৈতন খাঁকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। এই সব অলৌকিক কাণ্ড বাদ দিলে 'রাজমালা'র বিবরণের অবশিষ্টাংশ সত্য বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং এই বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে হোসেন শাহ-ধন্যমাণিক্যের সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়ে ধন্যমাণিক্যই জয়যুক্ত হন এবং তিনি খণ্ডল পর্যন্ত হোসেন শাহের রাজ্যের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করিয়া লন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত জয় করেন, কিন্তু প্রতিপক্ষের আক্রমণে তাঁহাকে পূর্বাধিকৃত সমস্ত অঞ্চল হারাইতে হয় এবং গৌড়েশ্বরের সেনাপতি গৌরাই মল্লিক গোমতী নদীর তীরবর্তী চণ্ডীগড় দুর্গ পর্যন্ত অধিকার করেন; গৌরাই মল্লিক গোমতী নদীর জল প্রথমে রুদ্ধ ও পরে মুক্ত করিয়া ত্রিপুরারাজের

ভাগ্যবিপর্যয় ঘটাইয়াছিলেন। তৃতীয় পর্যায়ে ধন্যমাণিক্য আবার পূর্বাধিকৃত অঞ্চলগুলি অধিকার করেন, কিন্তু হোসেন শাহের সেনাপতি হৈতন খাঁ প্রতি-আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বিতাড়িত করেন এবং তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গোমতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত অধিকার করেন। এইবার ত্রিপুরা-রাজ গোমতী নদীর জল প্রথমে রুদ্ধ ও পরে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলেন। তাহার ফলে হৈতন খাঁ পিছু হটিয়া ছয়কড়িয়ায় চলিয়া আসেন। ত্রিপুরারাজ ছয়কড়িয়ার পূর্ব পর্যন্ত হৃত অঞ্চলগুলি পুনরধিকার করেন, ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য অধিকৃত অঞ্চল হোসেন শাহের দখলেই থাকিয়া যায়।

'রাজমালা'র বিবরণ পড়িলে মনে হয়, ধন্যমাণিক্য বাংলার খণ্ডল পর্যন্ত যে অভিযান চালাইয়াছিলেন, তাহা হইতেই হোসেন শাহের সহিত তাঁহার সংঘর্ষের আরম্ভ হয় এবং ১৪৩৫ শক বা ১৫১৩-১৪ খ্রীঃর পূর্বে হোসেন শাহ ত্রিপুরারাজকে প্রতি-আক্রমণ করেন নাই। কিন্তু সোনারগাঁও অঞ্চলে ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হোসেন শাহের এক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে খওয়াস খান নামে হোসেন শাহের একজন কর্মচারীকে ত্রিপুরার "সর-এ-লস্কর" বলা হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, ১৫১৩ খ্রীঃর মধ্যেই হোসেন শাহ ত্রিপুরার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া ত্রিপুরার অঞ্চলবিশেষ অধিকার করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহার মহাভারতে লিখিয়াছেন যে হোসেন শাহ ত্রিপুরা জয় করিয়াছিলেন। শ্রীকর নন্দী তাঁহার মহাভারতে লিখিয়াছেন যে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক, হোসেন শাহের অন্যতম সেনাপতি ছুটি খান ত্রিপুরার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ত্রিপুরারাজ দেশত্যাগ করিয়া "পর্বতগহ্বরে" "মহাবনমধ্যে" গিয়া বাস করিতে থাকেন; ছুটি খানকে তিনি হাতী ও ঘোড়া দিয়া সম্মানিত করেন; ছুটি খান তাঁহাকে অভয় দান করা সত্ত্বেও তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া থাকেন। এইসব কথা কতদূর যথার্থ তাহা বলা যায় না। তবে হোসেন শাহের রাজত্বকালে কোন সময়ে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বাংলার বাহিনীর সাফল্যে ছুটি খান উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন—এই কথা সত্য বলিয়া মনে হয়।

হোসেন শাহের সহিত আরাকানরাজেরও সম্ভবত সংঘর্ষ হইয়াছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই মর্মে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে হোসেন শাহের রাজত্বকালে আরাকানীরা চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিল; হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের নেতৃত্বে এক বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে প্রেরিত হয়, তাহারা আরাকানীদের

বিতাড়িত করিয়া চট্টগ্রাম পুনরধিকার করে। জোআঁ-দে-বারোসের 'দা এশিয়া' এবং অন্যান্য সমসাময়িক পর্তুগীজ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজ বাংলার রাজার অর্থাৎ হোসেন শাহের সামন্ত ছিলেন। চট্টগ্রাম অধিকারের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করার ফলেই সম্ভবত আরাকানরাজ হোসেন শাহের সামন্তে পরিণত হইয়াছিলেন।

হোসেন শাহ ত্রিহুতের কতকাংশ সমেত বর্তমান বিহার রাজ্যের অনেকাংশ জয় করিয়াছিলেন। বিহারের পাটনা ও মুঙ্গের জেলায়, এমন কি ঐ রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সারণ জেলায়ও হোসেন শাহের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। বিহারের একাংশ সিকন্দর শাহ লোদীর রাজ্যভুক্ত ছিল। সিকন্দর শাহ লোদীর সহিত সন্ধি করিবার সময় হোসেন শাহ তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি সিকন্দরের শত্রুতা করিবেন না এবং সিকন্দরের শত্রুদের আশ্রয় দিবেন না। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত পালিত হয় নাই। সারণ অঞ্চলের একাংশ হোসেন শাহের এবং অপরাংশ সিকন্দর শাহের অধিকারভুক্ত ছিল। লোদী রাজবংশ সম্বন্ধীয় ইতিহাসগ্রন্থগুলি হইতে জানা যায় যে, সারণে সিকন্দরের প্রতিনিধি হোসেন খান ফর্মুলির সহিত হোসেন শাহ খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা করিতে থাকায় এবং হোসেন খান ফর্মুলির প্রাধান্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকায় সিকন্দর শাহ ক্রুদ্ধ হইয়া ফর্মুলির বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন (১৫০৯ খ্রীঃ); তখন হোসেন শাহ ফর্মুলিকে আশ্রয় দেন। সিকন্দর শাহ লোদীর মৃত্যুর (১৫১৭ খ্রীঃ) পর তাঁহার বিহারস্থ প্রতিনিধিদের সহিত হোসেন শাহ প্রকাশ্যভাবেই শত্রুতা করিতে আরম্ভ করেন।

হোসেন শাহের রাজত্বকালেই বাংলাদেশের মাটিতে পর্তুগীজরা প্রথম পদার্পণ করে। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে বাণিজ্য সুরু করার অভিপ্রায়ে চারিটি জাহাজ পাঠান, কিন্তু মধ্যপথে প্রধান জাহাজটি অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হওয়ায় পর্তুগীজ প্রতিনিধিদল বাংলায় পৌছিতে পারেন নাই। ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে জোআঁ-দে-সিলভেরার নেতৃত্বে একদল পর্তুগীজ প্রতিনিধি চট্টগ্রামে আসিয়া পৌছান। সিলভেরা বাংলার স্থলতানের নিকট এদেশে বাণিজ্য করার ও চট্টগ্রামে একটি কুঠি নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু সিলভেরা চট্টগ্রামের শাসনকর্তার একজন আত্মীয়ের দুইটি জাহাজ ইতিপূর্বে দখল করিয়াছিলেন এবং চট্টগ্রামেও খাদ্যাভাবে পড়িয়া একটি চাল-বোঝাই নৌকা লুণ্ঠন করিয়াছিলেন

বলিয়া চট্টগ্রামের শাসনকর্তা তাঁহার প্রতি বিরূপ হন ও তাঁহার জাহাজ লক্ষ্য করিয়া কামান দাগেন। পর্তুগীজরা ইহার উত্তরে চট্টগ্রাম অবরোধ করিয়া বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য বিপর্যস্ত করিল। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা এই সময়ে কয়েকটি জাহাজের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাই তিনি সাময়িকভাবে পর্তুগীজদের সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু জাহাজগুলি বন্দরে পৌছিবামাত্র তিনি পর্তুগীজদের প্রতি আক্রমণ পুনরারম্ভ করিলেন। তখন সিলভেরা আরাকানে অবতরণের এবং সেখানে বাণিজ্য সুরু করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আরাকানরাজ পর্তুগীজদের সহিত বন্ধুত্ব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সিলভেরা জানিতে পারিলেন যে আরাকানে অবতরণ করিলেই তিনি বন্দী হইবেন। এই কারণে তিনি নিরাশ হইয়া সিংহলে চলিয়া গেলেন।

হোসেন শাহ গৌড় হইতে নিকটবর্তী একডালায় তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এই একডালার অবস্থান সম্বন্ধে ইলিয়াস শাহের প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। সম্ভবত: ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য এবং ক্রমাগত লুণ্ঠনের ফলে গৌড় নগরী শ্রীহীন হইয়া পড়ায় হোসেন শাহ একডালায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন হোসেন শাহ সর্বপ্রথম সত্যপীরের উপাসনা প্রবর্তন করেন। এই ধারণার কোন ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে, সত্যপীরের উপাসনা যে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে প্রবর্তিত হয় নাই, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

হোসেন শাহের বহু মন্ত্রী, অমাত্য ও কর্মচারীর নাম এপর্যন্ত জানিতে পারা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন। নিম্নে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

(১) পরাগল খান

ইনি হোসেন শাহের সেনাপতি ছিলেন এবং হোসেন শাহ কর্তৃক চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহারই আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন।

(২) ছুটি খান

ইনি পরাগল খানের পুত্র। ইহার প্রকৃত নাম নসরৎ খান। ইহার আদেশে শ্রীকর নন্দী বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীকর নন্দীর বিবরণ অনুসারে ছুটি খান লস্করের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ত্রিপুরার রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন।

(৩) সনাতন

সনাতন হোসেন শাহের মন্ত্রী ও সভাসদ ছিলেন এবং তাঁহার বিশিষ্ট উপাধি ছিল "সাকর মল্লিক" ('সগীর মালিক', অর্থ ছোট রাজা)। সনাতন হোসেন শাহের অন্যতম 'দবীর খাস' বা প্রধান সেক্রেটারীও ছিলেন। হোসেন শাহ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ও তাঁহার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা হইবার পর সনাতন রাজকার্যে অবহেলা করেন এবং উড়িষ্যা-অভিযানে সুলতানেব সহিত যাইতে অস্বীকার করেন। তাঁহার এই "অপরাধের" জন্য হোসেন শাহ তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়া উড়িষ্যায় চলিয়া যান। কারারক্ষককে উৎকোচদানে বশীভূত করিয়া সনাতন মুক্তিলাভ করেন ও বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর একজন প্রিয় ভক্ত ছিলেন।

(৪) রূপ

ইনি সনাতনের অনুজ। ইনিও হোসেন শাহের মন্ত্রী এবং "দবীর খাস" ছিলেন। দীর্ঘকাল চাকুরী করিবার পরে রূপ-সনাতনের সংসারে বিরাগ জন্মে এবং চৈতন্যের উপদেশে সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান। অতঃপর রূপ-সনাতন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভাষ্য রচনায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

বল্লভ (সনাতন-রূপের ভ্রাতা), শ্রীকান্ত (ইহাদের ভগ্নীপতি), চিরঞ্জীব সেন (গোবিন্দদাস কবিরাজের পিতা), কবিশেখর, দামোদর, যশোরাজ খান (সকলেই পদকর্তা), মুকুন্দ (বৈদ্য), কেশব খান (ছত্রী) প্রভৃতি বিশিষ্ট হিন্দুগণ হোসেন শাহের অমাত্য, কর্মচারী, চিকিৎসক প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অনেকের ধারণা, 'পুরন্দর খান' নামে হোসেন শাহের একজন হিন্দু উজীর ছিলেন। এই ধারণা সত্য নহে।

হোসেন শাহের রাজ্যের আয়তন অত্যন্ত বিশাল ছিল। বাংলাদেশের প্রায় সমস্তটা এবং বিহারের এক বৃহদংশ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা ভিন্ন কামরূপ ও কামতা রাজ্য এবং উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দংশ অন্তত সাময়িকভাবে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

এখন আমরা হোসেন শাহের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এক অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে হোসেন শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অভ্যুদয়ের পূর্বে পরপর কয়েকজন সুলতান অল্পদিন মাত্র রাজত্ব করিয়া আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। এই অবস্থার মধ্যে রাজা হইয়া হোসেন শাহ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন, বিভিন্ন রাজ্য জয় করিয়া নিজের রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর এই বিরাট ভূখণ্ডে নিরুদ্বেগে অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা অল্প কৃতিত্বের কথা নহে।

'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'তারিখ ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস-সলাতীনে'র মতে হোসেন শাহ সুশাসক এবং জ্ঞানী ও গুণীবর্গের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; ইহার ফলে দেশে পরিপূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়; তিনি গণ্ডক নদীর কূলে একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া রাজ্যের সীমানা সুরক্ষিত করেন, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, সরাইখানা ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং আলিম ও দরবেশদের বহু অর্থ দান করেন।

হোসেন শাহের রাজত্বকালে তাঁহার বা তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীদের দ্বারা বহু সুন্দর সুন্দর মসজিদ, ফটক প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে গৌড়ের "ছোটি সোনা মসজিদ" এবং "গুম্‌তি ফটক" এখনও বর্তমান আছে। ইহাদের শিল্পসৌন্দর্য অসাধারণ।

হোসেন শাহের রাজত্বকালে দেশে অশুভ ঘটনাও কিছু কিছু ঘটিয়াছিল। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' হইতে জানা যায় যে, ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। এই জাতীয় দুর্ভিক্ষের জন্য হোসেন শাহকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা না গেলেও পরোক্ষ দায়িত্ব তিনি এড়াইতে পারেন না। তিনি সিংহাসনে আরোহণের পর হইতে ক্রমাগত একের পর এক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সমস্ত যুদ্ধের ব্যয়ভার নিশ্চয়ই বাংলা দেশের জনসাধারণকে যোগাইতে হইত। ফলে তাঁহার রাজত্বকালে বাঙালী জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা আগেকার

তুলনায় হ্রাস পাইয়াছিল এবং তাহাদের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের শক্তি অনেকখানি কমিয়া গিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। হোসেন শাহ বহু যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু পরিপূর্ণ জয়লাভ করিয়াছেন মাত্র কয়েকটি যুদ্ধে। যতদিন ধরিয়া তিনি যুদ্ধ করিয়াছেন এবং যত শক্তি ক্ষয় করিয়াছেন, তাহার তুলনায় তিনি ভিন্ন রাজ্য-গুলির যতটা অঞ্চল স্থায়িভাবে অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা খুবই কম মনে হয়। সুতরাং তিনি সামরিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইলেও পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন বলা যায় না।

এইসব দিক দিয়া বিচার করিলে রাজা হিসাবে হোসেন শাহকে ষোল আনা কৃতিত্ব দেওয়া যায় না। তবে মোটের উপর তিনি যে একজন সুদক্ষ শাসক ছিলেন, তাহা পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন সূত্রের সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায়।

হোসেন শাহ যদিও বেশীর ভাগ সময়েই ভিন্ন দেশের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তাহাতে দেশের শান্তি ব্যাহত হয় নাই, কারণ এইসব যুদ্ধ রাজ্যজয়ের যুদ্ধ এবং এগুলি অনুষ্ঠিত হইত দেশের বাহিরে। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে হোসেন শাহ বহুবার নিজেই সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করিয়া বিদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও কেহ রাজ্যে তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিদ্রোহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া জানা যায় না; এই ব্যাপার হইতেও হোসেন শাহের কৃতিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

হোসেন শাহের চরিত্রে মহত্ত্বেরও অভাব ছিল না; ইহার দৃষ্টান্ত আমরা পাই জৌনপুরের রাজ্যচ্যুত সুলতান হোসেন শাহ শর্কীকে আশ্রয় দানের মধ্যে।

অনেকের ধারণা, হোসেন শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের—বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু এই ধারণার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। যশোরাজ খান, দামোদর, কবিরঞ্জন প্রভৃতি কয়েকজন বাঙালী কবি হোসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন; কিন্তু ইহাদের কাব্যসৃষ্টির মূলে যে হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষণ বা অনুপ্রেরণা ছিল, সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বিপ্রদাস পিপিলাই, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি সমসাময়িক কবিরা তাঁহাদের কাব্যে হোসেন শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু হোসেন শাহের সহিত তাঁহাদের কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। হোসেন শাহের সঙ্গে একজন মাত্র হিন্দু পণ্ডিত—

বিদ্যাবাচস্পতির কিছু যোগ ছিল। কিন্তু বিদ্যাবাচস্পতি হোসেন শাহের কাছে কোন রকমের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

কয়েকজন মুসলমান পণ্ডিতের সঙ্গে হোসেন শাহের যোগাযোগ সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একজন ফার্সী ভাষায় একটি ধনুর্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন এবং তৎকালীন গৌড়েশ্বর হোসেন শাহকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। দ্বিতীয় মুসলমান পণ্ডিত হোসেন শাহের কোষাগারের জন্য একখানি ঐস্লামিক গ্রন্থের তিনটি খণ্ড নকল করেন; তৃতীয় খণ্ডের পুষ্পিকায় তিনি হোসেন শাহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। এই বই হোসেন শাহই উৎসাহী হইয়া নকল করাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই নকল করানোর মধ্যে তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার বদলে ধর্মপরায়ণতার নিদর্শনই বেশী মিলে।

ভুলবশত হোসেন শাহকে মালাধর বসুর পৃষ্ঠপোষক মনে করায়ও এইরূপ ধারণা প্রচলিত হইয়াছে যে হোসেন শাহ পণ্ডিত ও কবিদের পৃষ্ঠপোষণ করিতেন। আমাদের ইহা মনে রাখিতে হইবে যে,—হোসেন শাহ কোন কবি বা পণ্ডিতকে কোন উপাধি দেন নাই (যেমন রুকনুদ্দীন বারবক শাহ দিয়াছিলেন), এবং বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবতে' একজন লোককে দিয়া বলাইয়াছেন, "না করে পাণ্ডিত্যচর্চা রাজা সে যবন।" সুতরাং হোসেন শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পর্বকে অনেকে 'হোসেন শাহী আমল' নামে চিহ্নিত করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ করার কোন সার্থকতা নাই। কারণ হোসেন শাহের রাজত্বকালে মাত্র কয়েকখানি বাংলা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থগুলির রচনার মূলে যেমন হোসেন শাহের প্রত্যক্ষ প্রভাব কিছু ছিল না, তেমনি এই সমস্ত গ্রন্থ রচিত হওয়ার ফলে যে বাংলা সাহিত্যের বিরাট সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, তাহাও নহে। কেহ কেহ ভুল করিয়া বলিয়াছেন যে হোসেন শাহের আমলে বাংলার পদাবলী-সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পদাবলী-সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে হোসেন শাহের রাজত্ব অবসানের কয়েক দশক বাদে,—জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিদের আবির্ভাবের পর। অতএব বাংলা সাহিত্যের একটি অধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে হোসেন শাহের নাম যুক্ত করার কোন সার্থকতা নাই।

হোসেন শাহ সম্বন্ধে আর একটি প্রচলিত মত এই যে, তিনি ধর্মের ব্যাপারে

অত্যন্ত উদার ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন। কিন্তু এই ধারণাও কোন বিশিষ্ট তথ্য দ্বারা সমর্থিত নহে। হোসেন শাহের শিলালিপিগুলির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তিনি একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন এবং ইসলামধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের মঙ্গল সাধনের জন্যই বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। হোসেন শাহ গোঁড়া মুসলমান ও পরধর্মদ্বেষী দরবেশ নূর কুৎব্‌ আলমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং প্রতি বৎসর নূর কুৎব্‌ আলমের সমাধি প্রদক্ষিণ করিবার জন্য তিনি একডালা হইতে পাণ্ডুয়ায় যাইতেন।

হোসেন শাহ হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করিতেন, ইহা দ্বারা তাঁহার হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শিতা প্রমাণিত হয় না। হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের প্রথা ইলিয়াস শাহী আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। সব সময়ে সমস্ত পদের জন্য যোগ্য মুসলমান কর্মচারী পাওয়া যাইত না, অযোগ্যদের নিয়োগ করিলে শাসনকার্যের ক্ষতি হইবে, এই কারণে সুলতানরা ঐ সব পদে হিন্দুদের নিয়োগ করিতেন। হোসেন শাহও তাহাই করিয়াছিলেন। সুতরাং এ ব্যাপারে তিনি পূর্ববর্তী সুলতানদের তুলনায় কোনরূপ স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেন নাই।

হোসেন শাহের রাজত্বকালে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। চৈতন্যচরিত-গ্রন্থগুলি হইতে জানা যায় যে, চৈতন্যদেব যখন গৌড়ের নিকটে রামকেলি গ্রামে আসেন, তখন কোটালের মুখে চৈতন্যদেবের কথা শুনিয়া হোসেন শাহ চৈতন্যদেবের অসাধারণত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা হইতেও তাঁহার ধর্মবিষয়ে উদারতা প্রমাণিত হয় না। কারণ চৈতন্যদেব হোসেন শাহের কাজীর কাছে দুর্ব্যবহার পাইয়াছিলেন। হোসেন শাহের সরকার তাঁহার অভ্যুদয়ে কোন-রূপ সাহায্য করে নাই, বরং নানাভাবে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। এ ব্যাপারও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে সন্ন্যাসগ্রহণের পরে চৈতন্যদেব আর বাংলায় থাকেন নাই, হিন্দু রাজার দেশ উড়িষ্যায় চলিয়া গিয়াছিলেন; বাংলায় থাকিলে বিধর্মী রাজশক্তি তাঁহার ধর্মচর্চার বিঘ্ন ঘটাইতে পারে ভাবিয়াই তিনি হয়তো উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন। হোসেন শাহ কর্তৃক চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য স্বীকার যে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, সে কথা চৈতন্যচরিতকারেরাই বলিয়াছেন। ইহাও লক্ষণীয় যে হোসেন শাহ চৈতন্যদেবের ক্ষতি না করিবার আশ্বাস দিলেও তাঁহার হিন্দু কর্মচারীরা তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই।

চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলির রচয়িতারা কোন সময়েই বলেন নাই যে হোসেন শাহ

ধর্মবিষয়ে উদার ছিলেন। বরং তাঁহারা ইহার বিপরীত কথা লিখিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবতে' হোসেন শাহকে "পরম দুর্বার" "যবন রাজা" বলিয়াছেন এবং চৈতন্যদেব ও তাঁহার সম্প্রদায় যে হোসেন শাহের নিকটে রামকেলি গ্রামে থাকিয়া হরিধ্বনি করিতেছিলেন, এজন্য তাঁহাদের সাহসের প্রশংসা করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলি পড়িলে বুঝা যায় যে, হোসেন শাহকে তাঁহার সমসাময়িক হিন্দুরা মোটেই ধর্মবিষয়ে উদার মনে করিত না, বরং তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিত। অবৈষ্ণবরা প্রায়ই বৈষ্ণবদের এই বলিয়া ভয় দেখাইত যে, "যবন রাজা" অর্থাৎ হোসেন শাহ তাঁহাদের ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইতেছেন।

সমসাময়িক পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা হোসেন শাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ও তাঁহার অধীনস্থ শাসনকর্তাদের আনুকূল্য অর্জনের জন্য প্রতিদিন বাংলায় অনেক হিন্দু ইসলামধর্ম গ্রহণ করিত। সুতরাং হোসেন শাহ যে হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন, সে কথা বলিবার কোন উপায় নাই।

উড়িষ্যার 'মাদলা পাঞ্জী' ও বাংলার চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলি হইতে জানা যায় যে, হোসেন শাহ উড়িষ্যা-অভিযানে গিয়া বহু দেবমন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করিয়াছিলেন। শেষবারের উড়িষ্যা-অভিযানে হোসেন শাহ সনাতনকে তাঁহার সহিত যাইতে বলিলে সনাতন বলেন যে সুলতান উড়িষ্যায় গিয়া দেবতাকে দুঃখ দিবেন, এই কারণে তাঁহার সহিত তিনি যাইতে পারিবেন না।

যুদ্ধের সময়ে হোসেন শাহ হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন দেবমন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করিয়া। শান্তির সময়েও তাঁহার হিন্দুর প্রতি অনুদার ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। বাল্যকালে তাঁহার মনিব সুবুদ্ধি রায় তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি তাঁহার জাতি নষ্ট করেন। হোসেন শাহ যখন কেশব ছত্রীকে চৈতন্যদেবের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন কেশব ছত্রী তাঁহার কাছে চৈতন্যদেবের মহিমা লাঘব করিয়া বলিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয়, হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি হোসেন শাহের পূর্ব-ব্যবহার খুব সন্তোষজনক ছিল না।

হোসেন শাহের অধীনস্থ আঞ্চলিক শাসনকর্তা ও রাজকর্মচারীদের আচরণ সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাই, সেগুলি হইতেও হোসেন শাহের হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শিতা সম্বন্ধীয় ধারণা সমর্থিত হয় না। 'চৈতন্যভাগবত' হইতে জানা যায়, যখন চৈতন্যদেব নবদ্বীপে হরি-সঙ্কীর্তন করিতেছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণে

অন্যেরাও কীর্তন করিতেছিল, তখন নবদ্বীপের কাজী কীর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মতে কাজী একজন কীর্তনীয়ার খোল ভাঙিয়া দিয়াছিলেন এবং কেহ কীর্তন করিলেই তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া জাতি নষ্ট করিবেন বলিয়া শাসাইয়াছিলেন।

'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যায় যে, হোসেন শাহের অথবা তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহের রাজত্বকালে বেনাপোলের জমিদার রামচন্দ্র খানের রাজকর বাকী পড়ায় বাংলার স্থলতানের উজীর তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে স্ত্রী-পুত্র সমেত বন্দী করেন এবং তাঁহার দুর্গামণ্ডপে গরু বধ করিয়া তিন দিন ধরিয়া তাহার মাংস রন্ধন করান; এই তিন দিন তিনি রামচন্দ্র খানের গৃহ ও গ্রাম নিঃশেষে লুণ্ঠন করিয়া, তাঁহার জাতি নষ্ট করিয়া অবশেষে তাঁহাকে লইয়া চলিয়া যান। 'চৈতন্য-চরিতামৃত' হইতে আরও জানা যায় যে, সপ্তগ্রামের মুসলমান শাসনকর্তা নিছক গায়ের জোরে ঐ অঞ্চলের ইজারাদার হিরণ্য মজুমদার ও গোবর্ধন মজুমদারের স্থলতানের কাছে প্রাপ্য আট লক্ষ টাকার ভাগ চাহিয়াছিলেন, তাঁহার মিথ্যা নালিশ শুনিয়া হোসেন শাহের উজীর হিরণ্য ও গোবর্ধনকে বন্দী করিতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের না পাইয়া গোবর্ধনের পুত্র নিরীহ রঘুনাথকে বন্দী করিয়াছিলেন; সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, স্থলতানের কারাগারে বন্দী হইবার পরেও সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা রঘুনাথকে তর্জনগর্জন ও ভীতি-প্রদর্শন করিতে থাকেন।

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসামঙ্গল' হোসেন শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়। এই গ্রন্থের "হাসন-হুসেন" পালায় লেখা আছে যে মুসলমানরা "জুলুম" করিত এবং "ছৈয়দ মোল্লা"রা হিন্দুদের কলমা পড়াইয়া মুসলমান করিত।

হোসেন শাহের রাজত্বকালে তাঁহার মুসলমান কর্মচারীরা হিন্দুদের ধর্মকর্ম লইয়া উপহাস করিত। বৈষ্ণবদের কীর্তনকে তাহারা বলিত "ভূতের সংকীর্তন"।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে হোসেন শাহের মুসলমান কর্মচারীদের বা প্রজাদের হিন্দু-বিদ্বেষ হইতে স্থলতানের হিন্দু-বিদ্বেষ প্রমাণিত হয় না। কিন্তু হোসেন শাহ যদি হিন্দুদের উপর সহানুভূতি-সম্পন্ন হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কর্মচারীরা বা অন্য মুসলমানরা হিন্দু-বিদ্বেষের পরিচয় দিতে ও হিন্দুদের উপর নির্যাতন করিতে সাহস পাইত বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, হোসেন শাহও যে খুব বেশী হিন্দুদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, সে কথাও চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলিতে লেখা আছে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র এক জায়গায় দেখা যায়, নবদ্বীপের মুসলমানরা

স্থানীয় কাজীকে বলিতেছে যে নবদ্বীপে হিন্দুরা "হরি হরি" বলিয়া কোলাহল করিতেছে এ কথা শুনিলে বাদশাহ (অর্থাৎ হোসেন শাহ) কাজীকে শাস্তি দিবেন। 'চৈতন্যভাগবতে' দেখা যায়, হোসেন শাহের হিন্দু কর্মচারীরা বলিতেছে যে হোসেন শাহ "মহাকালযবন" এবং তাঁহার ঘন ঘন "মহাতমোগুণবুদ্ধি জন্মে"। নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবরা হোসেন শাহকে কোনদিনই উদার মনে করেন নাই। তাঁহাদের মতে হোসেন শাহ দ্বাপর যুগে কৃষ্ণলীলার সময়ে জরাসন্ধ ছিলেন।

সুতরাং হোসেন শাহ যে অসাম্প্রদায়িক-মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন এবং হিন্দুদের প্রতি অপক্ষপাত আচরণ করিতেন, এই ধারণা একেবারেই ভুল।

অবশ্য হোসেন শাহ যে উৎকট রকমের হিন্দু-বিদ্বেষী বা ধর্মোন্মাদ ছিলেন না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যদি ধর্মোন্মাদ হইতেন, তাহা হইলে নবদ্বীপের কীর্তন বন্ধ করায় সেখানকার কাজী ব্যর্থতা বরণ করার পর স্বয়ং অকুস্থলে উপস্থিত হইতেন এবং বলপূর্বক কীর্তন বন্ধ করিয়া দিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে কয়েকজন মুসলমান হিন্দু-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। চৈতন্য-চরিতগ্রন্থগুলি হইতে জানা যায় যে শ্রীবাসের মুসলমান দর্জি চৈতন্যদেবের রূপ দেখিয়া প্রেমোন্মাদ হইয়া মুসলমানদের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করিয়া হরিনাম কীর্তন করিয়াছিল; উৎকল সীমান্তের মুসলমান সীমাধিকারী ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; ইতিপূর্বে-নির্যাতিত যবন হরিদাস হোসেন শাহের রাজত্বকালে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং নবদ্বীপে নগর-সঙ্কীর্তনের সময়ে সম্মুখের সারিতে থাকিতেন। তাহার পর, হোসেন শাহেরই রাজত্বকালে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান ও তাঁহার পুত্র ছুটি খান হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ মহাভারত শুনিতেন। হোসেন শাহের রাজধানীর খুব কাছেই রামকেলি, কানাই-নাটশালা প্রভৃতি গ্রামে বহু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বাস করিতেন। ত্রিপুরা-অভিযানে গিয়া হোসেন শাহের হিন্দু সৈন্যেরা গোমতী নদীর তীরে পাথরের প্রতিমা পূজা করিয়াছিল। হোসেন শাহ ধর্মোন্মাদ হইলে এ সব ব্যাপার সম্ভব হইত না।

আসল কথা, হোসেন শাহ ছিলেন বিচক্ষণ ও রাজনীতিচতুর নরপতি। হিন্দু-ধর্মের প্রতি অত্যধিক বিদ্বেষের পরিচয় দিলে অথবা হিন্দুদের মনে বেশী আঘাত দিলে তাহার ফল যে বিষময় হইবে, তাহা তিনি বুঝিতেন। তাই তাঁহার হিন্দু-বিরোধী কার্যকলাপ সংখ্যায় অল্প না হইলেও তাহা কোনদিনই একেবারে মাত্রা ছাড়াইয়া যায় নাই।

অনেকের ধারণা, হোসেন শাহই বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতান এবং তাঁহার রাজত্ব-কালে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি চরম সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই ধারণা একেবারে অমূলক নয়। তবে বাংলার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সুলতানদের সম্বন্ধে হোসেন শাহের মত এত বেশী তথ্য পাওয়া যায় না, সে কথাও মনে রাখিতে হইবে। হোসেন শাহের রাজত্বকালেই চৈতন্যদেবের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল বলিয়া চৈতন্যচরিত-গ্রন্থগুলিতে প্রসঙ্গক্রমে হোসেন শাহ ও তাঁহার আমল সম্বন্ধে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অন্য সুলতানদের রাজত্বকালে অনুরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই বলিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে এত বেশী তথ্য কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং হোসেন শাহই যে বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতান, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম তিনজন সুলতান এবং রুকনুদ্দীন বারবক শাহ কোন কোন দিক্ দিয়া তাঁহার তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারেন।

হোসেন শাহের শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, তিনি ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সম্ভবত তাহার কিছু পরে তিনি পরলোক-গমন করিয়াছিলেন। বাবরের আত্মকাহিনী হইতে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, হোসেন শাহের স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছেল।

২। নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে পিতার মৃত্যুর অন্তত তিন বৎসর পূর্বে নসরৎ শাহ যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত হন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রকাশ করিবার অধিকার লাভ করেন। কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থের মতে নসরৎ শাহ হোসেন শাহের ১৮ জন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পরে তিনি তাঁহার ভ্রাতাদের কোন অনিষ্ট না করিয়া তাঁহাদের পিতৃদত্ত বৃত্তি দ্বিগুণ করিয়া দেন।

'রিয়াজ-উস-সলাতীন' এবং অন্য কয়েকটি সূত্র হইতে জানা যায় যে, নসরৎ শাহ ত্রিহুতের রাজা কংসনারায়ণকে বন্দী করিয়া বধ করেন এবং ত্রিহুত সম্পূর্ণভাবে অধিকার করার জন্য তাঁহার ভগ্নীপতি মখদুম আলমকে নিযুক্ত করেন। ত্রিহুতে প্রচলিত একটি শ্লোকের মতে ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

হোসেন শাহের রাজ্য বাংলার সীমা অতিক্রম করিয়া বিহারের ভিতরেও অনেকখানি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল বটে, কিন্তু পাশেই পরাক্রান্ত লোদী স্থলতানদের রাজ্য থাকায় বাংলার স্থলতানকে কতকটা সশঙ্কভাবে থাকিতে হইত। নসরৎ শাহের সিংহাসনে আরোহণের দুই বৎসর পরে লোদী স্থলতানদের রাজ্যে ভাঙন ধরিল; পাটনা হইতে জৌনপুর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল প্রায় স্বাধীন হইল এবং এই অঞ্চলে লোহানী ও ফর্মুলী বংশীয় আফগান নায়করা প্রাধান্য লাভ করিলেন। নসরৎ শাহ ইহাদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন।

এদিকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবর পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন এবং দ্রুত রাজ্যবিস্তার করিতে লাগিলেন। আফগান নায়কেরা তাঁহার হাতে পরাজিত হইয়া পূর্ব ভারতে পলাইয়া গেলেন। ক্রমশ ঘর্ঘরা নদীর তীর পর্যন্ত অঞ্চল বাবরের রাজ্যভুক্ত হইল। ঘর্ঘরা নদীর এপার হইতে নসরৎ শাহের রাজ্য আরম্ভ। বাবর কর্তৃক পরাস্ত ও বিতাড়িত আফগানদের অনেকে নসরৎ শাহের কাছে আশ্রয় লাভ করিল। কিন্তু নসরৎ প্রকাশ্যে বাবরের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না। বাবর নসরতের কাছে দূত পাঠাইয়া তাঁহার মনোভাব জানিতে চাহিলেন, কিন্তু ঐ দূত নসরৎ শাহের সভায় বৎসরাধিককাল থাকা সত্ত্বেও নসরৎ শাহ খোলাখুলিভাবে কিছুই বলিলেন না। অবশেষে যখন বাবরের সন্দেহ জাগ্রত হইল, তখন নসরৎ বাবরের দূতকে ফেরৎ পাঠাইয়া নিজের দূতকে তাহার সঙ্গে দিয়া বাবরের কাছে অনেক উপহার পাঠাইয়া বন্ধুত্ব ঘোষণা করিলেন। ফলে বাবর বাংলা আক্রমণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন।

ইহার পর বিহারের লোহানী-প্রধান বহার খানের আকস্মিক মৃত্যু ঘটায় তাঁহার বালক পুত্র জলাল খান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। শের খান শূর দক্ষিণ বিহারের জায়গীর গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মাহ্‌মুদ নিজেকে ইব্রাহিমের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি জৌনপুর অধিকার করিলেন এবং বালক জলাল খান লোহানীর রাজ্য কাড়িয়া লইলেন। জলাল খান হাজীপুরে পলাইয়া গিয়া তাঁহার পিতৃবন্ধু নসরৎ শাহের কাছে আশ্রয় চাহিলেন, কিন্তু নসরৎ শাহ তাঁহাকে হাজীপুরে আটক করিয়া রাখিলেন। শের খান প্রমুখ বিহারের আফগান নায়কেরা মাহ্‌মুদের সহিত যোগ দিলেন। অতঃপর তাঁহারা বাবরের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিন্তু শের খান

শীঘ্রই বশ্যতা স্বীকার করিলেন। অন্যদের দমন করিবার জন্য বাবর সৈন্যবাহিনী সমেত বক্সারে আসিলেন। জলাল লোহানী অনুচরবর্গ সমেত কৌশলে নসরতের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বক্সারে বাবরের কাছে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য রওনা হইলেন।

'রিয়াজে'র মতে নসরৎ শাহও বাবরের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাবরের আত্মকাহিনীতে এরূপ কোন কথা পাওয়া যায় না। বাবর নসরতের নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে কোন প্রকাশ্য প্রমাণ পান নাই। তিনি তিনটি সর্তে নসরৎ শাহের সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন। এই সর্তগুলির মধ্যে একটি হইল, ঘর্ঘরা নদী দিয়া বাবরের সৈন্যবাহিনীর অবাধ চলাচলের অধিকার দিতে হইবে। কিন্তু বাবর বারবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও নসরৎ শাহ সন্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না অথবা অবিলম্বে এই প্রস্তাবের উত্তর দিলেন না। এদিকে বাবর চরের মারফৎ সংবাদ পাইলেন যে বাংলার সৈন্যবাহিনী গণ্ডক নদীর তীরে মখদুম-ই-আলমের নেতৃত্বে ২৪টি স্থানে সমবেত হইয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিতেছে এবং তাহারা বাবরের নিকট আত্মসমর্পণেচ্ছু আফগানদের আটকাইয়া রাখিয়া নিজেদের দলে টানিতেছে। বাবর নসরৎ শাহকে ঘর্ঘরা নদীর এপার হইতে সৈন্য সরাইয়া লইয়া তাঁহার পথ খুলিয়া দিতে বলিয়া পাঠাইলেন এবং নসরৎ তাহা না করিলে তিনি যুদ্ধ করিবেন, ইহাও জানাইয়া দিলেন। কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়াও যখন বাবর নসরতের কাছে কোন উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত করিলেন।

বাবর বাংলার সৈন্যদের শক্তি এবং কামান চালনায় দক্ষতার কথা জানিতেন, সেইজন্য বক্সারে খুব শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী লইয়া আসিয়াছিলেন। এই সৈন্যবাহিনী লইয়া বাবর জোর করিয়া ঘর্ঘরা নদী পার হইলেন। তাহার ফলে ১৫২৯ খ্রীঃর ২রা মে হইতে ৬ই মে পর্যন্ত বাংলার সৈন্যবাহিনীর সহিত বাবরের বাহিনীর যুদ্ধ হইল। বাংলার সৈন্যেরা প্রশংসনীয়ভাবে যুদ্ধ করিল; তাহাদের কামান-চালনার দক্ষতা দেখিয়া বাবর মুগ্ধ হইলেন; তিনি দেখিলেন বাঙালীদের কামান-চালনার হাত এত পাকা যে লক্ষ্য স্থির না করিয়া যথেচ্ছভাবে কামান চালাইয়া তাহারা শত্রুদের পর্যুদস্ত করিতে পারে। দুইবার বাঙালীরা বাবরের বাহিনীকে পরাস্ত করিল। কিন্তু তাহারা শেষ রক্ষা করিতে

পারিল না, বাবরের বাহিনীর শক্তি অধিক হওয়ায় তাহারাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হইল। যুদ্ধের শেষ দিকে বসন্ত রাও নামে বাংলার একজন বিখ্যাত হিন্দু বীর অনুচরবর্গ সমেত বাবরের সৈন্যদের হাতে নিহত হইলেন। ৬ই মে দ্বিপ্রহরের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। বাবর তাঁহার সৈন্যবাহিনী সমেত ঘর্ঘরা নদী পার হইয়া সারণে পৌছিলেন। এখানে জলাল খান লোহানী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; বাবর জলালকে বিহারে তাঁহার সামন্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

কিন্তু নসরৎ শাহ এই সময়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। ঘর্ঘরার যুদ্ধের কয়েকদিন পরে মুঙ্গেরের শাহজাদা ও লস্কর-উজীর হোসেন খান মারফৎ তিনি বাবরের কাছে দূত পাঠাইয়া জানাইলেন যে বাবরের তিনটি সর্ত মানিয়া সন্ধি করিতে তিনি সম্মত। এই সময়ে বাবরের শত্রু আফগান নায়কদের কতকাংশ পর্যুদস্ত, কতক নিহত হইয়াছিল, কয়েকজন বাবরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল এবং কয়েকজন বাংলায় আশ্রয় লইয়াছিল; তাহার উপর বর্ষাও আসন্ন হইয়া উঠিতেছিল। তাই বাবরও সন্ধি করিতে রাজী হইয়া অপর পক্ষকে পত্র দিলেন। এইভাবে বাবর ও নসরৎ শাহের সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ সমাপ্তি ঘটিল। বাবরের সহিত সংঘর্ষের ফলে নসরৎ শাহকে কিছু কিছু অঞ্চল হারাইতে হইল এবং এই অঞ্চলগুলি বাবরের রাজ্যভুক্ত হইল।

'রিয়াজ'-এর মতে বাবরের মৃত্যুর পরে যখন হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার কিছুদিন পরে নসরৎ শাহের কাছে সংবাদ আসে যে হুমায়ুন বাংলা আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন; তখন নসরৎ হুমায়ুনের শত্রু গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের কাছে অনেক উপহার সমেত দূত পাঠান—উদ্দেশ্য তাঁহার সহিত জোট বাঁধা। এই কথা সত্য বলিয়া মনে হয় এবং সত্য হইলে ইহা হইতে নসরৎ শাহের কূটনীতিজ্ঞানের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

বাবর ভিন্ন আর যেসব শক্তির সহিত নসরৎ শাহের সংঘর্ষ হইয়াছিল, তন্মধ্যে ত্রিপুরা অন্যতম। 'রাজমালা'র মতে নসরৎ শাহের সমসাময়িক ত্রিপুরারাজ দেবমাণিক্য চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে মুহম্মদ খান 'মক্তুল হোসেন' কাব্যে লিখিয়াছেন যে তাঁহার পূর্বপুরুষ হামজা খান ত্রিপুরার সহিত যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিলেন। হামজা খান সম্ভবত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন এবং সময়ের দিক্ দিয়া তিনি নসরৎ শাহের সমসাময়িক। সুতরাং নসরৎ শাহের সহিত

ত্রিপুরারাজের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যাইতেছে, তবে এই যুদ্ধে উভয়পক্ষই জয়ের দাবী করায় আসলে ইহার ফল কী হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন।

'অহোম বুরঞ্জী'তে লেখা আছে যে, নসরৎ শাহের রাজত্বকালে—১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা কর্তৃক আসাম আক্রান্ত হইয়াছিল; ঐ বৎসরে "তুরবক" নামে বাংলার সুলতানের একজন মুসলমান সেনাপতি ৩০টি হাতী, ১০০০টি ঘোড়া এবং বহু কামান লইয়া অহোম রাজ্য আক্রমণ করেন এবং তেমেনি দুর্গ জয় করিয়া সিঙ্গরি নামক দুর্ভেদ্য ঘাঁটির সম্মুখে তাঁবু ফেলিয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। বরপাত্র গোহাইন এবং রাজপুত্র সুক্লেনের নেতৃত্বে অহোমরাজের সৈন্যেরা সিঙ্গরি রক্ষা করিতে থাকে। অল্পকালের মধ্যেই দুই পক্ষে খণ্ডযুদ্ধ সুরু হইয়া গেল। কিছু দিন খণ্ডযুদ্ধ চলিবার পর সুক্লেন ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিলেন। মুসলমানরা প্রথমে তুমুল যুদ্ধের ফলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেও শেষ পর্যন্ত জয়ী হইল। এই যুদ্ধে আটজন অহোম সেনাপতি নিহত হইলেন, রাজপুত্র সুক্লেন কোনক্রমে প্রাণে বাঁচিলেও মারাত্মকভাবে আহত হইলেন, বহু অহোম সৈন্য জলে ডুবিয়া মরিল, অন্যেরা সালা নামক স্থানে পলাইয়া গেল। অহোম-রাজ সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করিয়া বরপাত্র গোহাইনের অধীনে রাখিলেন।

নসরৎ শাহের রাজত্বকালে পর্তুগীজরা আর একবার বাংলা দেশে ঘাঁটি স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা করে। সিলভেরার আগমনের পর হইতে পর্তুগীজরা প্রতি বৎসরেই বাংলাদেশে একটি করিয়া জাহাজ পাঠাইত। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে রুই-ভাজ-পেরেরার অধিনায়কত্বে এইরূপ একটি পর্তুগীজ জাহাজ চট্টগ্রামে আসে। পেরেরা চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছিয়া সেখানে অবস্থিত খাজা শিহাবুদ্দীন নামে একজন ইরানী বণিকের পর্তুগীজ রীতিতে নির্মিত একটি জাহাজ কাড়িয়া লইয়া চলিয়া যান।

১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্তিম-আফন্সো-দে-মেলোর পরিচালনাধীন একটি পর্তুগীজ জাহাজ ঝড়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বাংলার উপকূলের কাছে আসিয়া পড়ে। এখানকার কয়েক জন ধীবর ঐ জাহাজের পর্তুগীজদের চট্টগ্রামে পৌঁছাইয়া দিবার নাম করিয়া চকরিয়ায় লইয়া যায়। চকরিয়ার শাসনকর্তা খোদা বখ্‌শ্‌ খান জনৈক প্রতিবেশী ভূস্বামীর সহিত যুদ্ধে এই পর্তুগীজদের নিয়োজিত করেন, কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভের পর তিনি তাহাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মুক্তি না দিয়া সোরে শহরে বন্দী করিয়া রাখেন। ইহার পর আর এক দল পর্তুগীজ অন্য এক জাহাজে করিয়া চকরিয়ায়

আসিলেন এবং তাঁহাদের সব জিনিস খোদা বখ্‌শ্‌ খানকে দিয়া আফন্সো দে-মেলোকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু খোদা বখ্‌শ্‌ খান আরও অর্থ চাহিলেন। পর্তুগীজদের কাছে আর কিছু ছিল না। দে-মেলো সদলবদলে পলাইয়া ইহাদের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন; তাঁহার রূপবান তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্রকে ব্রাহ্মণেরা ধরিয়া দেবতার নিকট বলি দিল। অবশেষে পূর্বোক্ত খাজা শিহাবুদ্দীনের মধ্যস্থতায় আফন্সো-দে-মেলো প্রচুর অর্থের বিনিময়ে মুক্ত হন এবং পর্তুগীজরা শিহাবুদ্দীনকে তাঁহার লুণ্ঠিত জাহাজ জিনিসপত্র সমেত ফিরাইয়া দেয়। শিহাবুদ্দীন বাংলার সুলতানের সহিত একটা বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার জন্য ও ওরমুজ যাইবার জন্য পর্তুগীজ জাহাজের সাহায্য চাহেন এবং তাহার বিনিময়ে পর্তুগীজদের বাংলায় বাণিজ্য করিবার ও চট্টগ্রামে দুর্গ নির্মাণ করিবার অনুমতি দিতে নসরৎ শাহকে সম্মত করাইবার চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হন। গোয়ার পর্তুগীজ গভর্নর এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেও এ সম্বন্ধে কিছু ঘটিবার পূর্বেই নসরৎ শাহের মৃত্যু হইল।

নসরৎ শাহ ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। গৌড়ে তিনি অনেকগুলি মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বিখ্যাত বারদুয়ারী বা সোনা মসজিদ অন্যতম। অনেকের ধারণা গৌড়ের বিখ্যাত 'কদম্ রসুল' ভবনও নসরৎ শাহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন; কিন্তু আসলে এটি শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের আমলে নির্মিত হইয়াছিল। নসরৎ শাহ কেবলমাত্র এই ভবনের প্রকোষ্ঠে একটি মঞ্চ নির্মাণ করান এবং তাহার উপরে হজরৎ মুহম্মদের পদচিহ্ন-সংবলিত একটি কালো কারুকার্যখচিত মর্মর-বেদী বসান। নসরৎ শাহ অনেক প্রাসাদও নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

নসরৎ শাহের নাম সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি রচনায়—যেমন শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে এবং কবিশেখরের পদে—উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। কবিশেখর নসরৎ শাহের কর্মচারী ছিলেন।

নসরৎ শাহের রাজ্যের আয়তন খুব বেশী ছিল। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ, ত্রিহুত ও বিহারের অধিকাংশ এবং উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ নসরৎ শাহের অধিকারভুক্ত ছিল।

'রিয়াজ'-এর মতে নসরৎ শাহ শেষজীবনে জনসাধারণের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়া তাঁহার রাজত্বকে কলঙ্কিত করেন; এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ

পাওয়া যায় নাই। বিভিন্ন বিবরণের মতে নসরৎ শাহ আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন; 'রিয়াজে'র মতে তিনি পিতার সমাধিক্ষেত্র হইতে ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার দ্বারা দণ্ডিত জনৈক খোজা তাঁহাকে হত্যা করে; বুকাননের বিবরণীর মতে নসরৎ শাহ নিদ্রিতাবস্থায় প্রাসাদের প্রধান খোজার হাতে নিহত হন।

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (দ্বিতীয়)

নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ, কারণ এই নামের আর একজন সুলতান ইতিপূর্বে ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

সুলতান হইবার পূর্বে ফিরোজ শাহ যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন তাঁহার আদেশে শ্রীধর কবিরাজ নামে জনৈক কবি একখানি 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন—এইটিই প্রথম বাংলা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য; এই কাব্যটিতে শ্রীধর তাঁহার আজ্ঞাদাতা যুবরাজ "পেরোজ শাহা" অর্থাৎ ফিরোজ শাহ এবং তাঁহার পিতা নৃপতি "নসীর শাহ" অর্থাৎ নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীধর সম্ভবত চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক, কারণ তাঁহার 'কালিকামঙ্গলে'র পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চলেই পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, নসরৎ শাহের রাজত্বকালে যুবরাজ ফিরোজ শাহ চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন এবং সেই সময়েই তিনি শ্রীধর কবিরাজকে দিয়া এই কাব্যখানি লেখান।

অসমীয়া বুরঞ্জী হইতে জানা যায়, নসরৎ শাহ আসামে যে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা নসরতের মৃত্যুর পরেও চলিয়াছিল। ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে বাংলার বাহিনী আসামের ভিতর দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর বর্ষার আগমনে তাহাদের অগ্রগতি বন্ধ হয়। ১৫৩২ খ্রীঃর অক্টোবর মাসে তাহারা ঘীলাধরিতে (দরং জেলা) উপনীত হয়। অহোমরাজ বুরাই নদীর মোহানা পাহারা দিবার জন্য শক্তিশালী বাহিনী পাঠাইলেন এবং পরিখা কাটাইলেন। মুসলমানরা তখন ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে সরিয়া গিয়া সালা দুর্গ অধিকার করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু দুর্গের অধ্যক্ষ তাহাদের উপর গরম জল ঢালিয়া দিয়া তাহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। দুই মাস ইতস্তত খণ্ডযুদ্ধ চলার পর উভয় পক্ষের মধ্যে

একটি বৃহৎ স্থলযুদ্ধ হইল। অহোমরা ৪০০ হাতী লইয়া মুসলমান অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিল এবং এই যুদ্ধে তাহারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রায় এই সময়েই ফিরোজ শাহ এক বৎসর (?) রাজত্ব করিবার পর তাঁহার পিতৃব্য গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদের হস্তে নিহত হন। অতঃপর গিয়াসুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন।

৪। গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ

'রিয়াজ'-এর মতে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ নসরৎ শাহের কাছে 'আমীর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাহ্‌মুদ শাহ সম্ভবত নসরৎ শাহের রাজত্বকালে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন—মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে এই কথা মনে হয়। গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের পূর্ব নাম আবদুল বদ্‌র্। তিনি আব্‌দ্ শাহ ও বদ্‌র্ শাহ নামেও পরিচিত ছিলেন।

গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ শের শাহ ও হুমায়ুনের সমসাময়িক। তাঁহাদের সহিত মাহ্‌মুদ শাহের ভাগ্য পরিণামে এক সূত্রে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থগুলি হইতে এ সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহার সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ বিহার প্রদেশ আফগানদের নিকট হইতে জয় করিবার পরিকল্পনা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে কুৎব্ খান নামে একজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। শের খান সূর ইহার বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যর্থ প্রতিবাদ জানান, তারপর অন্যান্য আফগানদের সঙ্গে মিলিয়া কুৎব্ খানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করেন। বাংলার সুলতানের অধীনস্থ হাজীপুরের সরলস্কর মখদুম-ই-আলম (মাহ্‌মুদ শাহের ভগ্নীপতি)—মাহ্‌মুদ শাহ ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া সুলতান হওয়ার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে ত্রিহুতে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন; মখদুম-ই-আলম ছিলেন শের খানের বন্ধু। তিনি কুৎব্ খানকে সাহায্য করেন নাই, এই অপরাধে মাহ্‌মুদ শাহ তাঁহার বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী পাঠাইলেন। এই সময়ে শের খান বিহারের অধিপতি নাবালক জলাল খান লোহানীর অমাত্য ও অভিভাবক ছিলেন। শের খানের কাছে নিজের ধনসম্পত্তি জিম্মা রাখিয়া মখদুম-ই-আলম মাহ্‌মুদ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গেলেন, এই যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন।

এদিকে জলাল খান লোহানী শের খানের অভিভাবকত্ব সহ্য করিতে না পারিয়া মাহ্‌মুদের কাছে গিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাকে অনুরোধ জানাইলেন শের খানকে দমন করিতে। মাহ্‌মুদ জলাল খানের সহিত কুৎব্‌ খানের পুত্র ইব্রাহিম খানকে বহু সৈন্য, হাতী ও কামান সঙ্গে দিয়া শের খানের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। শের খানও সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। পূর্ব বিহারের সুরজগড়ে দুই পক্ষের সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল। শের খান চারিদিকে মাটির প্রাকার তৈয়ারী করিয়া ছাউনী ফেলিলেন; ঐ ছাউনী ঘিরিয়া ফেলিয়া ইব্রাহিম খান তোপ বসাইলেন এবং মাহ্‌মুদ শাহকে নূতন সৈন্য পাঠাইতে অনুরোধ জানাইলেন। প্রাকারের মধ্য হইতে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া শের খান ইব্রাহিমকে দূত মারফৎ জানাইলেন যে পর দিন সকালে তিনি আক্রমণ করিবেন; তারপর তিনি প্রাকারের মধ্যে অল্প সৈন্য রাখিয়া অন্য সৈন্যদের লইয়া উঁচু জমির আড়ালে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সকালে ইব্রাহিম খানের সৈন্যদের প্রতি একবার তীর ছুঁড়িয়া শের খানের অশ্বারোহী সৈন্যেরা পিছু হটিল; তাহারা পলাইতেছে ভাবিয়া বাংলার অশ্বারোহী সৈন্যেরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। তখন শের খান তাঁহার লুক্কায়িত সৈন্যদের লইয়া বাংলার সৈন্যদের আক্রমণ করিলেন, তাহারা স্থিরভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইল এবং ইব্রাহিম খান নিহত হইলেন। বাংলার বাহিনীর হাতী, তোপ ও অর্থ-ভাণ্ডার সব কিছুই শের খানের দখলে আসিল। ইহার পর শের খান তেলিয়া-গড়ি (সাহেবগঞ্জের নিকটে অবস্থিত) পর্যন্ত মাহ্‌মুদ শাহের অধিকারভুক্ত সমস্ত অঞ্চল অধিকার করিলেন। মাহ্‌মুদ শাহের সেনাপতিরা—বিশেষত পর্তুগীজ বীর জোআঁ-দে-ভিল্লালোবোস ও জোআঁ-কোরীআ—শের খানকে তেলিয়াগড়ি ও সকরিগলি গিরিপথ পার হইতে দিলেন না। তখন শের খান অন্য এক অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত পথ দিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিলেন এবং ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ১৬,০০০ হাতী, ২০,০০০ পদাতিক ও ৩০০ নৌকা লইয়া রাজধানী গৌড় আক্রমণ করিলেন। নির্বোধ মাহ্‌মুদ শাহ তখন ১৩ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া শের খানের সহিত সন্ধি করিলেন। শের খান তখনকার মত ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর তিনি মাহ্‌মুদ শাহেরই অর্থে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া এক বৎসর বাদে মাহ্‌মুদের কাছে "সার্বভৌম নৃপতি হিসাবে তাঁহার প্রাপ্য নজরানা বাবদ" এক বিরাট অর্থ দাবী করিলেন এবং মাহ্‌মুদ তাহা দিতে রাজী

না হওয়ায় তিনি আবার গৌড় আক্রমণ করিলেন। শের খানের পুত্র জলাল খান এবং সেনাপতি খওয়াস খানের নেতৃত্বে প্রেরিত এক সৈন্যবাহিনী গৌড় নগরীর উপর হানা দিয়া নগরীটি ভস্মীভূত করিল এবং সেখানে লুঠ চালাইয়া ষাট মণ সোনা হস্তগত করিল।

এই সময়ে হুমায়ুন শের খানকে দমন করিবার জন্য বিহার অভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন। তিনি চুনার দুর্গ জয় করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া শের খান বিচলিত হইলেন। তিনি ইতিমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা রোটাস দুর্গ জয় করিয়াছিলেন। মাহ্‌মূদ শাহ গৌড় নগরীকে প্রাকার ও পরিখা দিয়া ঘিরিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। শের খানের সেনাপতি খওয়াস খান একদিন পরিখায় পড়িয়া মারা গেলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোসাহেব খানকে 'খওয়াস খান' উপাধি দিয়া শের খান গৌড়ে পাঠাইলেন। ইনি ৬ই এপ্রিল, ১৫৩৮ খ্রীঃ তারিখে গৌড় নগরী জয় করিলেন। তখন শের খানের পুত্র জলাল খান মাহ্‌মূদের পুত্রদের বন্দী করিলেন; মাহ্‌মূদ শাহ স্বয়ং পলায়ন করিলেন, শের খান তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করায় মাহ্‌মূদ শের খানের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং এই যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হইলেন। শের খান হুমায়ুনের নিকট দূত পাঠাইলেন, কিন্তু মাহ্‌মূদ হুমায়ুনের সাহায্য চাহিলেন এবং তাঁহাকে জানাইলেন যে শের খান গৌড় নগরী অধিকার করিলেও বাংলার অধিকাংশ তাঁহারই দখলে আছে। হুমায়ুন মাহ্‌মূদের প্রস্তাবে রাজী হইয়া গৌড়ের দিকে রওনা হইলেন। শের খান বহ্‌রকুণ্ডা দুর্গে গিয়াছিলেন; তাঁহার বিরুদ্ধে হুমায়ুন এক বাহিনী পাঠাইলেন। তখন শের খান তাঁহার বাহিনীকে রোটাস দুর্গে পাঠাইয়া স্বয়ং পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। শোণ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে আহত মাহ্‌মূদ শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হুমায়ুন গৌড়ের দিকে রওনা হইলেন। জলাল খান হুমায়ুনকে তেলিয়াগড়ি গিরিপথে এক মাস আটকাইয়া রাখিয়া অবশেষে পথ ছাড়িয়া দিলেন। এই এক মাসে শের খান গৌড় নগরের লুণ্ঠনলব্ধ ধনসম্পত্তি লইয়া ঝাড়খণ্ড হইয়া রোটাস দুর্গে গমন করেন। হুমায়ুন তেলিয়াগড়ি গিরিপথ অধিকার করিবার পরেই গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের মৃত্যু হইল। অতঃপর হুমায়ুন বিনা বাধায় গৌড় অধিকার করেন (জুলাই, ১৫৩৮ খ্রীঃ)।

নসরৎ শাহের রাজত্বকালে বাংলার সৈন্যবাহিনী আসামে যে অভিযান সুরু করিয়াছিল, মাহ্‌মূদ শাহের রাজত্বকালে তাহা ব্যর্থতার মধ্য দিয়া সমাপ্ত হয়।

ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে বাংলার বাহিনী অসমীয়া বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া সালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। অসমীয়া বুরঞ্জী হইতে জানা যায়, ১৫৩৩ খ্রীঃর মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার মুসলমানরা জল ও স্থলে তিন দিন তিন রাত্রি অবিরাম আক্রমণ চালাইয়াও সালা দুর্গ অধিকার করিতে পারে নাই। ইহার পর অসমীয়া বাহিনী বুরাই নদীর মোহানায় মুসলমান নৌ-বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে। মুসলমানরা আর একবার সালা জয় করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। ইহার পর তাহারা দুইমুনিশিলার যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়; তাহাদের ২০টি জাহাজ অসমীয়ারা জয় করে এবং মুসলমানদের অন্যতম সেনাপতি ও ২৫০০ সৈন্য নিহত হয়।

ইহার পর হোসেন খানের নেতৃত্বে একদল নূতন শক্তিশালী সৈন্য যুদ্ধে যোগ দেয়। ইহাতে মুসলমানরা উৎসাহিত হইয়া অনেকদূর অগ্রসর হয়। কিছুদিন পরে ডিকরাই নদীর মোহনায় দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হইল; তাহাদের মধ্যে অনেকে নিহত হইল; অনেকে শত্রুদের হাতে ধরা পড়িল। ১৫৩৩ খ্রীঃর সেপ্টেম্বর মাসে হোসেন খান অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ভরালি নদীর কাছে অসমীয়া বাহিনীকে দুঃসাহসিকভাবে আক্রমণ করিতে গিয়া নিহত হইলেন, তাঁহার বাহিনীও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

আসাম-অভিযানে ব্যর্থতার পরে মুসলমানরা পূর্বদিক হইতে অসমীয়াদের এবং পশ্চিম দিক হইতে কোচদের চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া কামরূপও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের রাজত্বকালেই পর্তুগীজরা বাংলা দেশে প্রথম বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপন করে। পর্তুগীজ বিবরণগুলি হইতে জানা যায় যে, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ার পর্তুগীজ গভর্নর নুনো-দা-কুন্‌হা খাজা শিহাবুদ্দীনকে সাহায্য করিবার ও বাংলায় বাণিজ্য আরম্ভ করিবার জন্য মারতিম-আফন্সো-দে-মেলোকে পাঠান। পাঁচটি জাহাজ ও ১০০ লোক লইয়া চট্টগ্রামে পৌঁছিয়া দে-মেলো বাংলার সুলতানকে ১২০০ পাউণ্ড মূল্যের উপহার পাঠান। সদ্য ভ্রাতুষ্পুত্র হত্যা-কারী মাহ্‌মূদ শাহের মন তখন খুব খারাপ। পর্তুগীজদের উপহারের মধ্যে মুসলমানদের জাহাজ হইতে লুঠ করা কয়েক বাক্স গোলাপ জল আছে, আবিষ্কার করিয়া তিনি পর্তুগীজদের বধ করিতে মনস্থ করেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পর্তুগীজ দূতদের বধ না করিয়া বন্দী করেন। অন্যান্য পর্তুগীজদের বন্দী করিবার

জন্য তিনি চট্টগ্রামে একজন লোক পাঠান। এই লোকটি চট্টগ্রামে আসিয়া আফন্সো-দে-মেলো ও তাঁহার অনুচরদের নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করিল। ভোজ-সভায় একদল সশস্ত্র মুসলমান পর্তুগীজদের আক্রমণ করিল। দে-মেলো বন্দী হইলেন। তাঁহার ৪০ জন অনুচরের অনেকে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন, অন্যেরা বন্দী হইলেন; যাঁহারা নিমন্ত্রণে আসেন নাই, তাঁহারা সমুদ্রতীরে শূকর শিকার করিতেছিলেন। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া তাঁহাদের কেহ নিহত, কেহ বন্দী হইলেন। পর্তুগীজদের এক লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া হতাবশিষ্ট ত্রিশজন পর্তুগীজকে লইয়া মুসলমানরা প্রথমে অন্ধকূপের মত ঘরে বিনা চিকিৎসায় আটক করিয়া রাখিল, তাহার পর সারারাত্রি হাঁটাইয়া মাওয়া নামক স্থানে লইয়া গেল এবং তাহার পর তাহাদের গৌড়ে লইয়া গিয়া পশুর মত ব্যবহার করিয়া নরক-তুল্য স্থানে আটক করিয়া রাখিল।

পর্তুগীজ গভর্নর এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার দূত আন্তোনিও-দে-সিল্ভা-মেনেজেস ৯টি জাহাজ ও ৩৫০ জন লোক লইয়া চট্টগ্রামে আসিয়া মাহ্‌মূদ শাহের কাছে দূত পাঠাইয়া বন্দী পর্তুগীজদের মুক্তি দিতে বলিলেন; না দিলে যুদ্ধ করিবেন বলিয়াও জানাইলেন; মাহ্‌মূদ ইহার উত্তরে গোয়ার গভর্নরকে ছুতার, মণিকার ও অন্যান্য মিস্ত্রী পাঠাইতে অনুরোধ জানাইলেন, বন্দীদের মুক্তি দিলেন না। মেনেজেসের দূতের গৌড় হইতে চট্টগ্রামে ফিরিতে মাসাধিককাল দেরী হইল; ইহাতে অধৈর্য হইয়া মেনেজেস চট্টগ্রামের এক বৃহৎ অঞ্চলে আগুন লাগাইলেন এবং বহু লোককে বন্দী ও বধ করিলেন। তখন মাহ্‌মূদ মেনেজেসের দূতকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু দূত ততক্ষণে মেনেজেসের কাছে পৌঁছিয়া গিয়াছে।

ঠিক এই সময়ে শের খান সূর বাংলা আক্রমণ করেন। তাহার ফলে মাহ্‌মূদ শাহ গৌড়ের পর্তুগীজ বন্দীদের বধ না করিয়া তাঁহাদের কাছে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ চাহিলেন। ইতিমধ্যে দিয়োগো-রেবেলো নামে একজন পর্তুগীজ নায়ক তিনটি জাহাজসহ গোয়া হইতে সপ্তগ্রামে আসিয়া মাহ্‌মূদ শাহকে বলিয়া পাঠাইলেন যে পর্তুগীজ বন্দীদের মুক্তি না দিলে তিনি সপ্তগ্রামে ধ্বংসকাণ্ড বাধাইবেন। মাহমূদ তখন অন্য মানুষ। তিনি পর্তুগীজ দূতকে খাতির করিলেন এবং রেবেলোকে খাতির করিবার জন্য সপ্তগ্রামের শাসনকর্তাকে বলিয়া পাঠাইলেন। গোয়ার গভর্নরের কাছে দূত পাঠাইয়া তিনি শের খানের বিরুদ্ধে

সাহায্য চাহিলেন এবং তাহার বিনিময়ে বাংলায় পর্তুগীজদের কুঠি ও দুর্গ নির্মাণ করিতে দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রেবেলোর কাছে তিনি ২১ জন পর্তুগীজ বন্দীকে ফেরৎ পাঠাইলেন এবং আফন্সো-দে-মেলোর পরামর্শ প্রয়োজন বলিয়া তাঁহাকে রাখিয়া দিলেন। মাহ্‌মূদ ও দে-মেলো উভয়ের নিকট হইতে পত্র পাইয়া পর্তুগীজ গভর্নর মাহ্‌মূদকে সাহায্য পাঠাইয়া দিলেন। শের খানের বিরুদ্ধে জোআঁ-দে-ভিল্লালোবোস ও জোআঁ কোরীআর নেতৃত্বে দুই জাহাজ পর্তুগীজ সৈন্য যুদ্ধ করিল, তাহারা শের শাহকে "গরিজ" ('গড়ি' অর্থাৎ তেলিয়াগড়ি) দুর্গ ও "ফারান্‌ডুজ" (পাণ্ডুয়া ?) শহর অধিকার করিতে দিল না। শের খানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেও মাহ্‌মূদ পর্তুগীজদের বীরত্ব দেখিয়া খুশী হইলেন। আফন্সো-দে-মেলোকে তিনি বিস্তর পুরস্কার দিলেন। তাঁহার নিকট হইতে পর্তুগীজরা অনেক জমি ও বাড়ী পাইল এবং কুঠি ও শুল্কগৃহ নির্মাণের অনুমতি পাইল। চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে তাহারা দুইটি শুল্কগৃহ স্থাপন করিল ; চট্টগ্রামেরটি বড় শুল্কগৃহ, অপরটি ছোট। পর্তুগীজরা স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের কাছে খাজনা আদায়ের অধিকার এবং আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ করিল। সুলতান পর্তুগীজদের এত সুবিধা ও ক্ষমতা দিতেছেন দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য হইল। বলা বাহুল্য ইহার ফল ভাল হয় নাই। কারণ বাংলাদেশে এইরূপ শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করিবার পরেই পর্তুগীজরা বাংলার নদীপথে ভয়াবহ অত্যাচার করিতে সুরু করে।

পর্তুগীজরা ঘাঁটি স্থাপনের পরে দলে দলে পর্তুগীজ বাংলায় আসিতে লাগিল। কিন্তু কাম্বের সহিত পর্তুগীজদের যুদ্ধ বাধায় পর্তুগীজ গভর্নর আফন্সো-দে-মেলোকে ফেরৎ চাহিলেন এবং মাহ্‌মূদকে বলিলেন যে এখন তিনি বাংলায় সাহায্য পাঠাইতে পারিতেছেন না, পরের বৎসর পাঠাইবেন। মাহ্‌মূদ পাঁচজন পর্তুগীজকে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতির জামিন স্বরূপ রাখিয়া দে-মেলো সমেত অন্যান্যদের ছাড়িয়া দিলেন। ইহার ঠিক পরেই শের শাহ আবার গৌড় আক্রমণ ও অধিকার করেন। পর্তুগীজ গভর্নর পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মাহ্‌মূদকে সাহায্য করিবার জন্য নয় জাহাজ সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু এই নয়টি জাহাজ যখন চট্টগ্রামে পৌছিল, তাহার পূর্বেই মাহ্‌মূদ শের খানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।

গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ নিষ্ঠুরভাবে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বধ করিয়া সুলতান হইয়াছিলেন। তিনি যে অত্যন্ত নির্বোধও ছিলেন, তাহা তাঁহার সমস্ত কার্যকলাপ

হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন তিনি যৎপরোনাস্তি ইন্দ্রিয়পরায়ণও ছিলেন; সমসাময়িক পর্তুগীজ বণিকদের মতে তাঁহার ১০,০০০ উপপত্নী ছিল।

মাহ্‌মূদ শাহের কর্মচারীদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। বিখ্যাত পদকর্তা কবিশেখর-বিদ্যাপতি যে মাহ্‌মূদ শাহের কর্মচারী ছিলেন, তাহা 'বিদ্যাপতি' নামাঙ্কিত একটি পদের ভনিতা হইতে অনুমিত হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাংলার মুসলিম রাজত্বের প্রথম যুগের রাজ্যশাসনব্যবস্থা (১২০৪-১৫৩৮ খ্রীঃ)

১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় হইতে ১২২৭ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলা কার্যত স্বাধীন থাকে, যদিও বখতিয়ার ও তাঁহার কোন কোন উত্তরাধিকারী দিল্লীর সুলতানের নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সময়কার শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, বাংলার এই মুসলিম রাজ্যের দর্-উল্-মুল্ক্ (রাজধানী) ছিল কখনও লখনৌতি, কখনও দেবকোট এবং এই রাজ্য কতকগুলি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল; এই অঞ্চলগুলিকে 'ইক্তা' বলা হইত এবং এক একজন আমীর এক একটি 'ইক্তা'র 'মোক্তা' অর্থাৎ শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন। রাজ্যটি 'লখনৌতি' নামে পরিচিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে বোধ হয় আলী মর্দানই প্রথম নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন এবং নিজের নামে খুৎবা পাঠ করান। তাঁহার পরবর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ শাহ মুদ্রাও উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সে সব মুদ্রায় সুলতানের নামের সঙ্গে বাগদাদের খলিফার নামও উৎকীর্ণ আছে।

১২২৭ হইতে ১২৮৫ খ্রীঃ পর্যন্ত লখনৌতি রাজ্য মোটামুটিভাবে দিল্লীর সুলতানের অধীন ছিল, যদিও মাঝে মাঝে কোন কোন শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সময়ে সমগ্র লখনৌতিই রাজ্যই দিল্লীর অধীনে একটি 'ইক্তা' বলিয়া গণ্য হইত।

বলবন তুঘ্রিল খাঁর বিদ্রোহ দমন করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খানকে বাংলার শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (১২৮০ খ্রীঃ)। ১২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বলবনের মৃত্যুর পর বুঘরা খান স্বাধীন হন। লখনৌতি রাজ্যের এই স্বাধীনতা ১৩২২ খ্রীঃ পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। এই সময়ে সমগ্র লখনৌতি রাজ্যকে 'ইকলিম লখনৌতি' বলা হইত এবং উহা অনেকগুলি 'ইক্তা'য় বিভক্ত ছিল। পূর্ববঙ্গের যে

অংশ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাকে 'অরসহ্ বঙ্গালহ্' বলা হইত। এই সময়ে কোন কোন আঞ্চলিক শাসনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমতাবান হইয়া উঠিয়াছিলেন।

১৩২২ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ তুগলক বাংলাদেশ অধিকার করিয়া উহাকে লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও—এই তিনটি 'ইক্তায়' বিভক্ত করেন।

১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার দ্বিশতবর্ষব্যাপী স্বাধীনতা সুরু হয় এবং ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহার অবসান ঘটে। সমসাময়িক সাহিত্য, শিলালিপি ও মুদ্রা হইতে এই সময়ের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

এই সময় হইতে বাংলার মুসলিম রাজ্য 'লখনৌতি'র পরিবর্তে 'বঙ্গালহ্' নামে অভিহিত হইতে সুরু করে। এই রাজ্যের সুলতানরা ছিলেন স্বাধীন এবং সর্ব-শক্তিমান। প্রথম দিকে তাঁহারা খলীফার আনুষ্ঠানিক আনুগত্য স্বীকার করিতেন; জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ কিন্তু নিজেকেই 'খলীফৎ আল্লাহ্' (আল্লার খলীফা) বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তাঁহার পরবর্তী কয়েকজন সুলতান এ ব্যাপারে তাঁহাকে অনুসরণ করেন।

সুলতান বাস করিতেন বিরাট রাজপ্রাসাদে। সেখানেই প্রশস্ত দরবার-কক্ষে তাঁহার সভা অনুষ্ঠিত হইত। শীতকালে কখনও কখনও উন্মুক্ত অঙ্গনে সুলতানের সভা বসিত। সভায় সুলতানের পাত্রমিত্রসভাসদরা উপস্থিত থাকিতেন। চীনা বিবরণী 'শিং-ছা-শ্যং-লান' এবং কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে বাংলার সুলতানের সভার মনোরম বর্ণনা পাওয়া যায়।

সুলতানের প্রাসাদে সুলতানের 'হাজিব', সিলাহ্দার', 'শরাবদার' 'জমাদার' 'দরবান' প্রভৃতি কর্মচারীরা থাকিতেন। 'হাজিব'রা সভার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন; সিলাহ্দাররা'রা সুলতানের বর্ম বহন করিতেন; 'শরাবদার'রা সুলতানের সুরাপানের ব্যবস্থা করিতেন; 'জমাদার'রা ছিলেন তাঁহার পোষাকের তত্ত্বাবধায়ক এবং 'দরবান'রা প্রাসাদের ফটকে পাহারা দিত। ইহা ভিন্ন সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে 'ছত্রী' উপাধিধারী এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়; ইহারা সম্ভবত সভায় যাওয়ার সময় সুলতানের ছত্র ধারণ করিতেন; মালাধর বসু (গুণরাজ খান), কেশব বসু (কেশব খান) প্রভৃতি হিন্দুরা বিভিন্ন সময়ে ছত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সুলতানের চিকিৎসক সাধারণত বৈদ্য-জাতীয় হিন্দু হইতেন; তাঁহার উপাধি হইত 'অন্তরঙ্গ'।

কয়েকজন সুলতানের হিন্দু সভাপণ্ডিতও ছিল। সুলতানের প্রাসাদে অনেক ক্রীতদাস থাকিত। ইহারা সাধারণত খোজা অর্থাৎ নপুংসক হইত।

সুলতানের অমাত্য, সভাসদ ও অন্যান্য অভিজাত রাজপুরুষগণ আমীর, মালিক প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত হইতেন। ইহাদের ক্ষমতা নিতান্ত অল্প ছিল না, বহুবার ইহাদের ইচ্ছায় বিভিন্ন সুলতানের সিংহাসনলাভ ও সিংহাসনচ্যুতি ঘটিয়াছে। কোন সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁহার ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারীর সিংহাসনে আরোহণের সময়ে আমীর, মালিক ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন আবশ্যক হইত।

রাজ্যের বিশিষ্ট পদাধিকারিগণ 'উজীর' আখ্যা লাভ করিতেন। 'উজীর' বলিতে সাধারণত মন্ত্রী বুঝায়, কিন্তু আলোচ্য সময়ে অনেক সেনানায়ক এবং আঞ্চলিক শাসনকর্তাও উজীর আখ্যা লাভ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইত; তাঁহাদের উপাধি ছিল 'লস্কর-উজীর'; কখনও কখনও তাঁহারা শুধুমাত্র 'লস্কর' নামেও অভিহিত হইতেন। সুলতানের প্রধান মন্ত্রীরা (অন্তত কেহ কেহ) 'খান-ই-জহান' উপাধি লাভ করিতেন। প্রধান আমীরকে বলা হইত 'আমীর-উল-উমারা'।

সুলতানের মন্ত্রী, অমাত্য ও পদস্থ কর্মচারিগণ 'খান মজলিস', 'মজলিস-অল-আলা', 'মজলিস-আজম', মজলিস-অল-মুআজ্জম', 'মজলিস-অল-মজালিস', 'মজলিস-বারবক' প্রভৃতি উপাধি লাভ করিতেন।

সুলতানের সচিব (সেক্রেটারী)-দের বলা হইত 'দবীর'। প্রধান সেক্রেটারীকে 'দবীর খাস' (দবীর-ই-খাস) বলা হইত।

'বঙ্গালহ্' রাজ্য আলোচ্য সময়ে কতকগুলি 'ইকলিম' -এ বিভক্ত ছিল।

প্রতিটি 'ইকলিম'-এর আবার কতকগুলি উপবিভাগ ছিল, ইহাদের বলা হইত 'অর্সহ্'। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে রাজ্যের উপবিভাগগুলিকে 'মুলুক' এবং তাহাদের শাসনকর্তাদিগকে 'মুলুক-পতি' ও 'অধিকারী' বলা হইয়াছে। 'মুলুক' ও 'অরসহ্' সম্ভবত একার্থক, কিংবা হয়ত 'অর্সহ্'র উপবিভাগের নাম ছিল 'মুলুক' (মুল্‌ক্)। কোন কোন প্রাচীন বাংলা গ্রন্থে (যেমন বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে) 'মুলুক'-এর একটি উপবিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার নাম 'তকসিম'।

আলোচ্য যুগে দুর্গহীন শহরকে বলা হইত 'কস্‌বাহ্' এবং দুর্গযুক্ত শহরকে বলা হইত 'খিট্টাহ্'। সীমান্তরক্ষার ঘাঁটিকে বলা হইত 'থানা'। 'বঙ্গালহ' রাজ্যটি

অনেকগুলি রাজস্ব-অঞ্চলে বিভক্ত ছিল; এই অঞ্চলগুলিকে 'মহল' বলা হইত; কয়েকটি 'মহল' লইয়া এক একটি 'শিক' গঠিত হইত; 'শিকদার' নামক কর্মচারীরা ইহাদের ভারপ্রাপ্ত হইতেন। রাজস্ব দুই ধরণের হইত—'গনীমাহ্' অর্থাৎ লুণ্ঠন-লব্ধ অর্থ এবং 'খরজ' অর্থাৎ খাজনা। সাধারণত যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে সৈন্যেরা লুঠ করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহার চারি-পঞ্চমাংশ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বণ্টিত হইত এবং এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষে যাইত, ইহাই 'গনীমাহ্'। 'খরজ' এক বিচিত্র পদ্ধতিতে সংগৃহীত হইত। সুলতান বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির উপর ঐ অঞ্চলের 'খরজ' সংগ্রহের ভার দিতেন—যেমন হোসেন শাহ দিয়াছিলেন হিরণ্য ও গোবর্ধন মজুমদারকে, ইহারা সপ্তগ্রাম মুলুকের জন্য বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া হোসেন শাহকে বার লক্ষ টাকা দিতেন এবং বাকী আট লক্ষ টাকা নিজেদের আইনসঙ্গত প্রাপ্য হিসাবে গ্রহণ করিতেন। সুলতানের প্রাপ্য অর্থ লইয়া যাইবার জন্য রাজধানী হইতে যে কর্মচারীরা আসিত, তাহাদের 'আরিন্দা' বলা হইত। সুলতানের রাজস্ব-বিভাগের প্রধান কর্মচারীর উপাধি ছিল 'সর-ই-গুমাশ্তাহ্'। জলপথে যে সব জিনিষ আসিত, সুলতানের কর্মচারীরা তাহাদের উপর শুল্ক আদায় করিতেন, যে সব ঘাটে এই শুল্ক আদায় করা হইত, তাহাদের বলা হইত 'কুতঘাট'। বিভিন্ন শহরে ও নদীর ঘাটে সুলতানের বহু কর্মচারী রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত ছিল। সে যুগে 'হাটকর', 'ঘাটকর', 'পথকর' প্রভৃতি করও ছিল বলিয়া মনে হয়। অনেক জিনিষ অবাধে বাহির হইতে বাংলায় লইয়া আসা বা বাংলা হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া যাইত না, যেমন চন্দন। আলোচ্য সময়ে বাংলায় অমুসলমানদের নিকট হইতে 'জিজিয়া কর' আদায় করা হইত বলিয়া কোন প্রমাণ মিলে না।

রাজ্যের সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুলতান স্বয়ং। বিভিন্ন অভিযানের সময়ে যে সব বাহিনী প্রেরিত হইত, তাহাদের অধিনায়কদিগকে 'সর-ই-লস্কর' বলা হইত।

সৈন্যবাহিনী চারি ভাগে বিভক্ত ছিল—অশ্বারোহী বাহিনী, গজারোহী বাহিনী, পদাতিক বাহিনী এবং নৌবহর। বাংলার পদাতিক সৈন্যদের বিশিষ্ট নাম ছিল 'পাইক', ইহারা সাধারণত স্থানীয় লোক হইত এবং খুব ভাল যুদ্ধ করিত।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বাংলার সৈন্যেরা প্রধানত তীর-ধনুক দিয়াই যুদ্ধ করিত। ইহা ভিন্ন তাহারা বর্শা, বল্লম ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রও ব্যবহার করিত।

শর ও শূল ক্ষেপণের যন্ত্রের নাম ছিল যথাক্রমে "আরাদা" ও "মঞ্জালিক"। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে বাংলার সৈন্যেরা কামনা চালনা করিতে শিখে এবং ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই কামান-চালনায় দক্ষতার জন্য দেশবিদেশে খ্যাতি অর্জন করে।

বাংলার সৈন্যবাহিনীতে দশ জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া এক একটি দল গঠিত হইত। তাহাদের নায়কের উপাধি ছিল 'সর-ই-খেল'। বুঘরা খান তাঁহার পুত্র কায়কোবাদকে বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক খানের অধীনে দশজন মালিক, প্রত্যেক মালিকের অধীনে দশজন আমীর,প্রত্যেক আমীরের অধীনে দশজন সিপাহ্-সালার, প্রত্যেক সিপাহ্-সালারের অধীনে দশজন সর-ই-খেল এবং প্রত্যেক সর-ই-খেলের অধীনে দশজন অশ্বারোহী সৈন্য থাকিবে। এই নীতি ঠিকমত পালিত হইত কিনা, তাহা বলিতে পারা যায় না।

বাংলার নৌবহরের অধিনায়ককে বলা হইত 'মীর বহ্‌র্'। বাংলার সৈন্য-বাহিনীর শক্তি জোগাইত রণহস্তীগুলি। সে সময়ে বাংলার হস্তীর মত এত ভাল হস্তী ভারতবর্ষের আর কোথাও পাওয়া যাইত না।

সৈন্যেরা তখন নিয়মিত বেতন ও খাদ্য পাইত। সৈন্যবাহিনীর বেতনদাতার উপাধি ছিল 'আরিজ-ই-লস্কর'।

আলোচ্য সময়ের বিচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কাজীরা বিভিন্ন স্থানে বিচারের জন্য নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহারা ঐস্লামিক বিধান অনুসারে বিচার করিতেন, এইটুকু মাত্র জানা যায়। কোন কোন সুলতান স্বয়ং কোন কোন মামলার বিচার করিতেন। অপরাধীদের জন্য যে সব শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, তাদের মধ্যে প্রধান ছিল বংশদণ্ড দিয়া প্রহার ও নির্বাসন। রাজদ্রোহীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত। কোন মুসলমান হিন্দুর দেবতার নাম করিলে তাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত এবং কখনও কখনও বিভিন্ন বাজারে লইয়া গিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইত। সুলতানদের "বন্দিঘর"-ও ছিল, কখনও কখনও হিন্দু জমিদারদিগকে সেখানে আটক করা হইত।

স্বাধীন সুলতানদের আমলে শুধু মুসলমানরা নহে, হিন্দুরাও শাসনকার্যে গুরুত্ব-পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতেন। এমন কি, তাঁহারা বহু মুসলমান কর্মচারীর উপরে 'ওয়ালি' (প্রধান তত্ত্বাবধায়ক)-ও নিযুক্ত হইতেন। বাংলার সুলতানের মন্ত্রী, সেক্রেটারী, এমনকি সেনাপতির পদেও বহু হিন্দু নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হুমায়ুন ও আফগান রাজত্ব

১। হুমায়ুন

গৌড়ে প্রবেশের পর হুমায়ুন এই বিধ্বস্ত নগরীর সংস্কারসাধনে ব্রতী হন। তিনি ইহার রাস্তাঘাট, প্রাসাদ ও দেওয়ালগুলির মেরামত করিয়া এখানেই কয়েকমাস অবস্থান করেন। গৌড় নগরীর সৌন্দর্য এবং এখানকার জলহাওয়ার উৎকর্ষ দেখিয়া হুমায়ুন মুগ্ধ হইলেন। বাংলার রাজধানীর "গৌড়" নামের অর্থ ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে হুমায়ুন অবহিত ছিলেন না। তিনি ভাবিলেন যে ঐ শহরের নাম "গোর" (অর্থাৎ 'কবর')। এইজন্য তিনি "গৌড়" নগরীর নাম পরিবর্তন করিয়া 'জন্নতাবাদ' (স্বর্গীয় নগর) রাখিলেন। অবশ্য এ নাম বিশেষ চলিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। অতঃপর হুমায়ুন বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে তাঁহার কর্মচারীদের জায়গীর দান করিয়া এবং বিভিন্ন স্থানে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করিয়া বিলাসব্যসনে মগ্ন হইলেন।

কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই আফগান নায়ক শের খান স্থর দক্ষিণ বিহার অধিকার করিয়া লইলেন এবং কাশী হইতে বহ্‌রাইচ পর্যন্ত যাবতীয় মোগল অধিকারভুক্ত অঞ্চলে বারবার হানা দিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যেরা গৌড় নগরীর আশপাশের উপরেও হানা দিতে লাগিল এবং ঐ নগরীর খাদ্য-সরবরাহ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করিতে লাগিল। ইয়াকুব বেগের অধীন ৫০০০ মোগল অশ্বারোহী সৈন্যের বাহিনীকে তাহারা পরাস্ত করিল, কিন্তু শেখ বায়াজিদ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলেন। হুমায়ুনের সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের আর্দ্র জলবায়ু এবং ভোগবিলাসের ফলে ক্রমশ অকর্মণ্য হইয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে হুমায়ুনের ভ্রাতা মির্জা হিন্দাল আগ্রায় বিদ্রোহ করিলেন। হুমায়ুনের অপর ভ্রাতা আসকারি হুমায়ুনের কাছে ক্রমাগত বাংলার মসলিন, খোজা এবং হাতী চাহিয়া চাহিয়া বিরক্ত করিতে লাগিলেন এবং আসকারির অধীন কর্মচারী ও সেনানায়কেরা বর্ধিত বেতন, উচ্চতর পদ এবং নগদ অর্থ প্রভৃতির দাবী জানাইতে লাগিলেন। হুমায়ুনের অমাত্য ও সেনানায়কেরাও খুবই দুর্বিনীত হইয়া

উঠিয়াছিলেন। ইহাদের অন্যতম জাহিদ বেগকে যখন হুমায়ুন বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন, তখন জাহিদ বেগ তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

শেষ পর্যন্ত হুমায়ুন জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন এবং স্বয়ং গৌড় ত্যাগ করিলেন। মুঙ্গেরে তিনি আসকারির অধীন বাহিনীর সহিত মিলিত হইলেন এবং গঙ্গার তীর ধরিয়া মুঙ্গেরে গেলেন। চৌসায় হুমায়ুনের সহিত শের খানের যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে হুমায়ুন পরাজিত হইলেন এবং কোন রকমে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিলেন (১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)।

২। শের শাহ

হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধে সাফল্য লাভ করিবার পর আফগান বীর শের খান সুর বাংলার দিকে রওনা হইলেন এবং অবিলম্বেই গৌড় পুনরধিকার করিলেন। হুমায়ুন কর্তৃক নিযুক্ত গৌড়ের শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলী বেগ শের খানের পুত্র জলাল খান এবং হাজী খান বটনী কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হইলেন (অক্টোবর, ১৫৩৯ খ্রীঃ)। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে মোতায়েন মোগল সৈন্যদেরও শের খানের সৈন্যেরা পরাজিত করিল এবং ঐ সমস্ত অঞ্চল অধিকার করিল। চট্টগ্রাম অঞ্চল তখনও গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের কর্মচারীদের হাতে ছিল এবং ইহাদের মধ্যে দুইজন—খোদা বখ্‌শ্‌ খান ও হাম্‌জা খান (পর্তুগীজ বিবরণে কোদাবস্‌কাঁম এবং আমব্‌জাকাঁও নামে উল্লিখিত) চট্টগ্রামে অধিকার লইয়া বিবাদ করিতেছিলেন। ইহাদের বিবাদের সুযোগ লইয়া "নোগাজিল" (?) নামে শের খানের একজন সহকারী চট্টগ্রাম অধিকার করিলেন, কিন্তু পর্তুগীজ কুঠির অধ্যক্ষ নুনো ফার্নান্দেজ ফ্রীয়ার তাঁহাকে বন্দী করিলেন। "নোগাজিল" কোনক্রমে মুক্তিলাভ করিয়া পলায়ন করিলেন। চট্টগ্রাম তথা ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল আর কখনও শের খানের অধিকারভুক্ত হয় নাই। ইহার কিছুদিন পর আরাকানরাজ চট্টগ্রাম অধিকার করেন এবং ১৬৬৬ খ্রীঃ পর্যন্ত চট্টগ্রাম আরাকানরাজের অধীনেই থাকে।

বিহার ও বাংলা অধিকার করিবার পরে শের খান ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ে ফরিদুদ্দীন আবুল মুজাফফর শের শাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। প্রায় এক বৎসরকাল গৌড়ে বাস করিয়া এবং বাংলাদেশ শাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া শের শাহ হুমায়ুনের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইলেন এবং

হুমায়ুনকে কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া (১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ) ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। এই সব যুদ্ধ বাংলার বাহিরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া এখানে তাহাদের বিবরণ দান নিষ্প্রয়োজন। অতঃপর শের শাহ ভারতবর্ষের সম্রাট হইলেন এবং দিল্লীতে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত করিলেন। পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহ কালিঞ্জর দুর্গ জয়ের সময়ে অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশেরই বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহ জানিতে পারেন যে তাঁহারই দ্বারা নিযুক্ত বাংলার শাসনকর্তা খিজ্‌র্ খান গৌড়ের শেষ সুলতান গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্বাধীন সুলতানের মত আচরণ করিতেছেন এবং সিংহাসনের তুল্য উচ্চাসনে বসিতেছেন ; এই সংবাদ পাইয়া শের শাহ ত্বরিতে পঞ্জাব হইতে রওনা হইয়া গৌড়ে চলিয়া আসেন এবং খিজ্‌র্ খানকে পদচ্যুত করিয়া কাজী ফজীলৎ বা ফজীহৎকে গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

শের শাহের রাজত্বকালে বাংলাদেশ অনেকগুলি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রতি খণ্ডে একজন করিয়া আমীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তার বিদ্রোহ বন্ধ করিবার জন্যই এই পন্থা গৃহীত হইয়াছিল। শের শাহ ভারতবর্ষের শাসনপদ্ধতির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন এবং রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সমগ্র রাজ্যকে ১১৬০০টি পরগণায় বিভক্ত করিয়া তিনি প্রতিটি পরগণায় পাঁচজন করিয়া কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশও তাঁহার শাসন-সংস্কারের সুফল ভোগ করিয়াছিল। শের শাহ সিন্ধুনদের তীর হইতে পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁও পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করান*। ব্রিটিশ আমলে ঐ রাজপথ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিত হয়। তবে ঐ রাজপথের সোনারগাঁও হইতে হাওড়া পর্যন্ত অংশ অনেকদিন পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে।

৩। শের শাহের বংশধরগণ

শের শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র জলাল খান সূর ইসলাম শাহ নাম গ্রহণ করিয়া সুলতান হন এবং আট বৎসর কাল রাজত্ব করেন (১৫৪৫-৫৩ খ্রীষ্টাব্দ)।

* এই রাজপথের মধ্যের অংশ শের শাহের বহু পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল।

কালিদাস গজদানী নামে একজন বাইস বংশীয় রাজপুত ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়া স্থলেমান খান নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি ইসলাম শাহের রাজত্বকালে বাংলাদেশে আসেন এবং পূর্ববঙ্গের অংশবিশেষ অধিকার করিয়া সেখানকার স্বাধীন রাজা হইয়া বসেন। ইসলাম খান তাঁহাকে দমন করিবার জন্য তাজ খান ও দরিয়া খান নামে দুইজন সেনানায়ককে প্রেরণ করেন। ইহারা তুমুল যুদ্ধের পরে স্থলেমান খানকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই স্থলেমান আবার বিদ্রোহ করেন। তখন তাজ খান ও দরিয়া খান আবার সৈন্যবাহিনী লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং স্থলেমানকে সাক্ষাৎকারে আহ্বান করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার সহিত তাঁহাকে হত্যা করেন। অতঃপর স্থলেমান খানের দুইটি পুত্রকে তাঁহারা তুরানী বণিকদের কাছে বিক্রয় করিয়া দেন।

অসমীয়া বুরঞ্জীর মতে ইসলাম শাহের রাজত্বকালে সিকন্দর স্থরের ভ্রাতা কালাপাহাড় কামরূপ আক্রমণ করেন এবং হাজো ও কামাখ্যার মন্দিরগুলি বিধ্বস্ত করেন।

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু মাত্র কয়েকদিন রাজত্ব করার পরেই শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র মুবারিজ খান কর্তৃক নিহত হন। মুবারিজ খান মুহম্মদ শাহ আদিল নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার নিষ্ঠুর আচরণের ফলে আফগান নায়কদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং আফগানদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কলহ চরমে উঠে; অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা প্রকাশ্য সংগ্রামে লিপ্ত হন এবং অনেক প্রাদেশিক শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দুর্বল মুহম্মদ শাহ আদিল ইহাদের কোন মতেই দমন করিতে পারিলেন না।

৪। রাজনীতিক গোলযোগ

এই সময়ে (১৫৫৩ খ্রীঃ) বাংলার আফগান শাসনকর্তা ছিলেন মুহম্মদ খান। তিনি এখন স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং শামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ গাজী নাম গ্রহণ করিয়া বাংলার স্থলতান হইলেন। অতঃপর তিনি একদিকে আরাকানের উপর হানা দিলেন এবং অপরদিকে জৌনপুর অধিকার করিয়া আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মুহম্মদ শাহের হিন্দু সেনাপতি হিমু তাঁহাকে ছাপরঘাটের

যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিলেন (১৫৫৫ খ্রীঃ)। এই বিজয়ের পর মুহম্মদ শাহ আদিল শাহবাজ খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

শামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহের পুত্র খিজর্ খান পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ঝুসিতে (এলাহাবাদের পরপারে অবস্থিত) গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ নাম গ্রহণ করিয়া নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং শাহবাজ খানকে পরাভূত করিয়া এই দেশের অধিপতি হইলেন (১৫৫৬ খ্রীঃ)।

ইতিমধ্যে হুমায়ুন আফগান সুলতান সিকন্দর শাহ সূরকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও পঞ্জাব পুনরধিকার করিয়াছিলেন এবং তাহার অল্প পরেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন (২৬শে জানুয়ারী, ১৫৫৬ খ্রীঃ)। ইহার কয়েক মাস পরে হুমায়ুনের বালক পুত্র ও উত্তরাধিকারী আকবর এবং তাঁহার অভিভাবক বৈরাম খানের সহিত মুহম্মদ শাহ আদিলের সেনাপতি হিমুর পাণিপথ প্রাঙ্গণে সংগ্রাম হইল এবং তাহাতে হিমু পরাজিত ও নিহত হইলেন (৫ই নভেম্বর, ১৫৫৬ খ্রীঃ)। মুহম্মদ শাহ আদিল স্বয়ং পরাজিত হইয়া পূর্বদিকে পশ্চাদপসরণ করিলেন, কিন্তু (সুরজগড়ের ৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত) ফতেহ্‌পুরে বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও নিহত করিলেন।

অতঃপর বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু অযোধ্যায় অবস্থিত মোগল সেনাপতি খান-ই-জামান তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার শিবির লুণ্ঠন করিলেন। তখন গিয়াসুদ্দীন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন এবং বাংলা ও ত্রিহুতের অধিপতি থাকিয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন। ইহার পরবর্তী কয়েক বৎসর তিনি শান্তিতেই কাটাইলেন এবং খান-ই-জামানের সহিত পরিপূর্ণ বন্ধুত্ব রক্ষা করিলেন। তবে পূর্ব-ভারতের এখানে সেখানে ছোটখাট স্থানীয় ভূস্বামীদের অভ্যুত্থান তাঁহাকে দুই একবার বিব্রত করিয়াছিল। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা জলালুদ্দীন দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া সুলতান হইলেন (১৫৬০ খ্রীঃ)। মোগল শক্তির সহিত তিনি বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে কররানী বংশীয় আফগানরা দক্ষিণ-পূর্ব বিহার এবং পশ্চিম বঙ্গের অনেকখানি অংশ অধিকার করিয়া দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীনের নিকট স্থায়ী অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র তাঁহার

স্থলাভিষিক্ত হন। এই পুত্রের নাম জানা যায় না ; ইনি কয়েক মাস রাজত্ব করার পরে এক ব্যক্তি ইহাকে হত্যা করেন এবং তৃতীয় গিয়াসুদ্দীন নাম লইয়া সুলতান হন। ইহার এক বৎসর বাদে কররানী-বংশীয় তাজ খান তৃতীয় গিয়াসুদ্দীনকে নিহত করিয়া বাংলার অধিপতি হন।

৫। কররানী বংশ

(১) তাজ খান কররানী

কররানীরা আফগান বা পাঠান জাতির একটি প্রধান শাখা। তাহাদের আদি নিবাস বঙ্গাশে (আধুনিক কুররম)। শের খানের প্রধান প্রধান অমাত্য ও কর্মচারীদের মধ্যে কররানী বংশের অনেকে ছিলেন ; তন্মধ্যে তাজ খান অন্যতম। ইনি মুহম্মদ শাহ আদিলের সিংহাসনে আরোহণের পরে তাঁহার রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়া যান এবং বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেয় অঞ্চলের একাংশ অধিকার করেন। কিন্তু মুহম্মদ শাহ আদিল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ছিব্রামাউ-য়ের (ফরাক্কাবাদের ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত) যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন। তখন তাজ খান কররানী খওয়াসপুর টাণ্ডায় পলাইয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রাতা ইমাদ, সুলেমান ও ইলিয়াসের সহিত মিলিত হন। ইঁহারা এই অঞ্চলের জায়গীরদার ছিলেন। ইহার পর এই চারি ভ্রাতা জনসাধারণের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতে থাকেন এবং সন্নিহিত অঞ্চলের গ্রামগুলি লুঠপাট করিতে থাকেন। মুহম্মদ শাহ আদিলের এক শত হাতী ইঁহারা অধিকার করিয়া লন। বহু আফগান বিদ্রোহী ইঁহাদের দলে যোগদান করে। কিন্তু চুনারের নিকটে মুহম্মদ আদিল খানের সেনাপতি হিমু ইঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন (১৫৫৪ খ্রীঃ)। তখন তাজ খান ও সুলেমান বাংলাদেশে পলাইয়া আসেন এবং দশ বৎসর ধরিয়া অনেক জোরজবরদস্তি ও জাল-জুয়াচুরি করার পরে তাঁহারা দক্ষিণ-পূর্ব বিহার ও পশ্চিম বঙ্গের অনেকাংশ অধিকার করেন। ইহার পর তাজ খান তৃতীয় গিয়াসুদ্দীনকে নিহত করিয়া বাংলার অধিপতি হইলেন (১৫৬৪ খ্রীঃ)। কিন্তু ইহার এক বৎসরের মধ্যেই তিনি পরলোকগমন করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা সুলেমান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন।

(২) সুলেমান কররানী

সুলেমান কররানী অত্যন্ত দক্ষ ও শক্তিশালী শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের সীমাও ক্রমশ দক্ষিণে পুরী পর্যন্ত, পশ্চিমে শোন নদ পর্যন্ত, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সুর বংশের বিভিন্ন শাখা বিধ্বস্ত হইয়া যাওয়ার ফলে আফগানদের মধ্যে সুলেমানের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী এই সময়ে কেহ ছিল না। দিল্লী, অযোধ্যা, গোয়ালিয়র, এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল মোগলদের হাতে পড়ার ফলে হতাবশিষ্ট আফগান নায়কদের অধিকাংশই বাংলাদেশে সুলেমান কররানীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পাইয়া সুলেমান বিশেষভাবে শক্তিশালী হইলেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাব সহস্রাধিক উৎকৃষ্ট হস্তী ছিল বলিয়াও তাঁহার সামরিক শক্তি অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াছিল।

বাংলা দেশের অধিপতি হইয়া সুলেমান এই রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিলেন। ইহার ফলে তাঁহার রাজস্বের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইল। সুলেমান ন্যায়-বিচারক হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান আলিম ও দরবেশদের পৃষ্ঠপোষণ করিতেন। এদেশে তিনি শরিয়তের বিধান কার্যকরী করিয়াছিলেন। তিনি নিজে এই বিধান নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিতেন।

শোন নদ ছিল মোগল অধিকার ও সুলেমানের অধিকারের সীমারেখা। সুলেমান মোগল সম্রাট আকবর এবং তাঁহার অধীনস্থ (সুলেমানের রাজ্যের প্রতিবেশী অঞ্চলের) শাসনকর্তা খান-ই-জমান আলী কুলী খান ও খান-ই-খানান মুনিম খানকে উপহার দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতেন। তিনি দুই একবার ভিন্ন আর কখনও প্রকাশ্যে মোগল শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, তবে ভিতরে ভিতরে অনেকবার মোগল-বিরোধীদের সাহায্য করিয়াছেন। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে খান-ই-জমান আলী কুলী খান আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং হাজীপুরে অবস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। তিনি সুলেমান কররানীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। আকবর সুলেমানকে আলী কুলী খানের সহিত যোগদান না করিতে অনুরোধ জানাইবার জন্য হাজী মুহম্মদ খান সীস্তানী নামে একজন দূতকে প্রেরণ করেন। কিন্তু এই দূত সুলেমানের নিকট পৌঁছিতে পারেন নাই; তিনি রোটাস দুর্গের নিকটে পৌঁছিলে একদল বিদ্রোহী আফগান তাঁহাকে বন্দী করিয়া আলী কুলী খানের নিকট প্রেরণ করেন। অতঃপর সুলেমান কররানী

আলী কুলী খানের সহিত যোগ দিয়া রোটাস দুর্গ জয়ের জন্য এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। রোটাস দুর্গের পতন আসন্ন হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে আকবরের বাহিনী আসিতেছে। তখন সুলেমান রোটাস হইতে তাঁহার সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লইলেন। ইহার পর আলী কুলী খান, হাজী মুহম্মদ সীস্তানী ও খান-ই-খানান মুনিম খানের মধ্যস্থতায় আকবরের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। সন্ধিস্থাপনের পূর্বাহ্ণ পর্যন্ত সুলেমান কররানীর অন্যতম সেনাপতি কালাপাহাড় আলী কুলী খানের নিকট উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আলী কুলী খান আবার আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং আকবর কর্তৃক পরিচালিত বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত ও নিহত হন। তখন আলী কুলী খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জমানীয়া নগরের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আসাদুল্লাহ্ সুলেমান কররানীর নিকটে লোক পাঠাইয়া জমানীয়া নগর সুলেমানকে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন। সুলেমান এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং জমানীয়া নগর অধিকারের জন্য এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে খান-ই-খানান মুনিম খান দূত প্রেরণ করিয়া আসাদুল্লাহ্‌কে বশীভূত করেন; তখন সুলেমানের সেনাবাহিনী প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। সুলেমানের প্রধান উজীর লোদী খান এই সময়ে শোন নদীর তীরে উপস্থিত ছিলেন; তিনি খান-ই-খানানের সহিত সন্ধি করিলেন। ইহার পর সুলেমান কররানী খান-ই-খানান মুনিম খানের সহিত পাটনার নিকটে দেখা করিলেন এবং আকবরের নামে মুদ্রাঙ্কন করাইতে ও খুৎবা পাঠ করাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই প্রতিশ্রুতি সুলেমান বরাবর পালন করিয়াছিলেন। সুলেমানের সহিত যখন মুনিম খান সাক্ষাৎ করেন, তিনি তাঁহার লোকজন লইয়া পাটনার ৫।৬ ক্রোশ দূরে পৌঁছিলে সুলেমান স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে স্বাগত জানান এবং তাঁহার সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ হন। অতঃপর মুনিম খান সুলেমানকে নিজের শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া এক ভোজ দেন। পরদিন তিনি সুলেমানের শিবিরে যান। এই সময়ে কোন কোন আফগান নায়ক মুনিম খানকে বন্দী করিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু লোদী খানের পরামর্শ অনুসারে সুলেমান এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন; অতঃপর লোদী খান ও সুলেমানের পুত্র বায়াজিদ মুনিম খানের শিবিরে যান। ইহার পর মুনিম খান জৌনপুরে এবং সুলেমান বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। সুলেমান ইহার পর আর কখনও আকবরের অধীনতা অস্বীকার করেন নাই।

তিনি সিংহাসনেও বসেন নাই, যদিও 'আলা হজরৎ' উপাধি লইয়াছিলেন এবং সম্পূর্ণভাবে রাজার মতই আচরণ করিতেন। বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত প্রধান উজীর লোদী খানের পরামর্শের দরুণই সুলেমান কূটনৈতিক ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন এবং কোন বিপজ্জনক অভিযানে প্রবৃত্ত হন নাই। সুলেমানের আমলে গৌড় নগরী অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ায় সুলেমান টাণ্ডাতে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বাংলার প্রতিবেশী হিন্দু রাজ্য উড়িষ্যা একের পর এক শক্তিহীন রাজার সিংহাসনে আরোহণ এবং অমাত্য ও সেনানায়কদের আভ্যন্তরীণ কলহের ফলে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। হরিচন্দন মুকুন্দদেব নামে একজন মন্ত্রী এই সময়ে খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। চক্রপ্রতাপ দেব ও নরসিংহ জেনা নামে দুইজন রাজা অল্পকাল রাজত্ব করিয়া নিহত হইবার পর মুকুন্দদেব রঘুরাম জেনা নামে একজন রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাইলেন। কিন্তু ১৫৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দদেব নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং রাজ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করিলেন। ইব্রাহিম সূর নামে মুহম্মদ শাহ আদিলের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী উড়িষ্যায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। মুকুন্দদেব তাঁহাকে জমি দিয়াছিলেন এবং বাংলার সুলতানের নিকট তাঁহাকে সমর্পণ করিতে রাজী হন নাই। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দদেব আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং আকবরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, সুলেমান কররানী যদি আকবরের শত্রুতা করেন, তবে তিনি ইব্রাহিম সূরকে দিয়া বাংলা আক্রমণ করাইবেন। মুকুন্দদেব নিজে একবার পশ্চিমবঙ্গের সাতগাঁও পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং গঙ্গার কূলে একটি ঘাট নির্মাণ করান।

১৫৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে আকবর যখন চিতোর আক্রমণে লিপ্ত—সেই সময়ে সুলেমান তাঁহার পুত্র বায়াজিদ এবং ভূতপূর্ব মোগল সেনাধ্যক্ষ সিকন্দর উজবকের নেতৃত্বে উড়িষ্যায় এক সৈন্যবাহিনী পাঠাইলেন। ইঁহারা ছোটনাগপুর ও ময়ূরভঞ্জের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন। ইঁহাদের প্রতিরোধ করিবার জন্য মুকুন্দদেব ছোট রায় ও রঘুভঞ্জ নামক দুই ব্যক্তির অধীনে এক সৈন্যবাহিনী পাঠাইলেন, কিন্তু এই দুই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহারই বিরুদ্ধতা করিল। মুকুন্দদেব তখন কটসামা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং অর্থ দ্বারা বায়াজিদের অধীন একদল সৈন্যকে বশীভূত করিলেন। অতঃপর মুকুন্দদেবের সহিত বিশ্বাসঘাতকদের যুদ্ধ হইল এবং এই যুদ্ধে মুকুন্দদেব ও ছোট রায় নিহত হইলেন।

সারঙ্গগড়ের সৈন্যাধ্যক্ষ রামচন্দ্র ভঞ্জ (বা দুর্গা ভঞ্জ) উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, কিন্তু সুলেমান বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে বন্দী ও বধ করিলেন। এইভাবে তিনি ইব্রাহিম সূরকেও প্রথমে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া তাহার পর হাতের মুঠার মধ্যে পাইয়া বধ করিলেন।

জাজপুর অঞ্চল হইতে সুলেমানের অন্যতম সেনাপতি কালাপাহাড়ের* অধীনে একদল অশ্বারোহী আফগান সৈন্য পুরীর দিকে অসম্ভব দ্রুতগতিতে রওনা হইল এবং অল্পকালের মধ্যেই তাহারা একরূপ বিনা বাধায় পুরী অধিকার করিল। তাহারা জগন্নাথ-মন্দিরের ভিতর সঞ্চিত বিপুল ধনরত্ন অধিকার করিল, মন্দিরটি আংশিকভাবে বিধ্বস্ত করিল এবং মূর্তিগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নোংরা স্থানে নিক্ষিপ্ত করিল। বহু সোনার মূর্তি সমেত অনেক মণ সোনা তাহারা হস্তগত করিল। মোটের উপর, অল্প কিছু কালের মধ্যেই সমগ্র উড়িষ্যা সুলেমান কররানীর অধিকারভুক্ত হইল। এই প্রথম উড়িষ্যা মুসলমানের অধীনে আসিল।

---

* সুলেমান কর্‌রানীর সেনাপতি কালাপাহাড় হিন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান এবং হিন্দুদের মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করার জন্য ইতিহাসে খ্যাত হইয়া আছেন। ইনি প্রথম জীবনে হিন্দু ও ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরবর্তীকালে মুসলমান হইয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। কিন্তু এই কিংবদন্তীর কোন ভিত্তি নাই। আবুল ফজলের 'আকবর-নামা', বদাওনীর 'মন্ত্‌খব্‌-উৎ-তওয়ারিখ' এবং নিয়ামতুল্লাহ্‌র 'মখজান-ই-আফগানী' হইতে প্রামাণিকভাবে জানিতে পারা যায় যে, কালাপাহাড় জন্ম-মুসলমান ও আফগান ছিলেন। তিনি সিকন্দর সূরের ভ্রাতা ছিলেন; তাঁহার নামান্তর "রাজু"; শেষোক্ত বিষয়টি হইতে অনেকে কালাপাহাড়কে হিন্দু মনে করিয়াছেন, কিন্তু "রাজু" নাম হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত। এই কালাপাহাড় ইসলাম শাহের রাজত্বকাল হইতে সুরু করিয়া দাউদ কররানীর রাজত্বকাল পর্যন্ত বাংলার সৈন্য-বাহিনীর অন্যতম অধিনায়ক ছিলেন। দাউদ কররানীর মৃত্যুর সাত বৎসর পরে ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগল রাজশক্তির সহিত বিদ্রোহী মাসুম কাবুলীর যুদ্ধে কালাপাহাড় মাসুমের হইয়া সংগ্রাম করেন এবং তাহাতেই নিহত হন। ইনি ভিন্ন আরও একজন কালাপাহাড় ছিলেন, তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন। তিনি বাহ্‌লোল লোদী ও সিকন্দর লোদীর সমসাময়িক এবং তাঁহাদের রাজত্বকালে গুরুত্বপূর্ণ রাজপদসমূহে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেন এই দুইজনের "কালাপাহাড়" নাম হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন'-এর মতে কালাপাহাড় বাবরের অন্যতম আমীর ছিলেন এবং আকবরের সেনাপতিরূপে উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন; এই সব কথা একেবারে অমূলক। দুর্গাচরণ সান্যাল তাঁহার 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে কালাপাহাড় সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, সত্যের বিন্দুবাষ্পও তাহার মধ্যে নাই।

সুলেমান কররানীর রাজত্বকালের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কোচবিহারে এক নূতন রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ অত্যন্ত শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন এবং "কামতেশ্বর" উপাধিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাংলার সুলতান ও অহোম রাজার সহিত তিনি মৈত্রীর সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়ণ (রাজত্বকাল আনুমানিক ১৫৩৮-৮৭ খ্রীঃ) ও তৃতীয় পুত্র শুক্লধ্বজ (নামান্তর "চিলা রায়") এই নীতি অনুসরণ করেন নাই। তাঁহারা অহোমরাজকে কয়েকবার আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন এবং অবশেষে সুলেমান কররানীর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সুলেমানের বাহিনী তাঁহাদের পরাজিত করিল এবং শুক্লধ্বজকে বন্দী করিল। অতঃপর সুলেমানের বাহিনী কোচবিহার আক্রমণ করিল এবং সুদূর তেজপুর পর্যন্ত হানা দিল, কিন্তু কোচবিহার ও কামরূপে স্থায়ী অধিকার স্থাপন না করিয়া তাহারা কেবলমাত্র হাজো, কামাখ্যা ও অন্যান্য স্থানের মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া ফিরিয়া আসিল। কিংবদন্তী অনুসারে কালপাহাড় এই অভিযানে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। সুলেমান স্বয়ং কোচবিহারের রাজধানী অবরোধ করিয়া প্রায় জয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু উড়িষ্যায় এক অভ্যুত্থানের সংবাদ পাইয়া তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। কয়েক বৎসর বাদে লোদী খানের পরামর্শে সুলেমান শুক্লধ্বজকে মুক্ত করিয়া দেন। এই সময়ে মোগলদের বাংলা আক্রমণ আসন্ন হইয়া উঠিতেছিল ; কোচবিহারকে খুশী রাখিতে পারিলে হয় তো এই আক্রমণে তাহার সাহায্য পাওয়া যাইবে—এইরূপ চিন্তাই শুক্লধ্বজকে মুক্তি দেওয়ার কারণ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, সুলেমানের জীবদ্দশায় মোগলেরা বাংলা আক্রমণ করে নাই। সুলেমান ১৫৭২ খ্রীঃর ১১ই অক্টোবর তারিখে পরলোকগমন করেন।

(৩) বায়াজিদ কররানী

সুলেমানের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু বায়াজিদ তাঁহার উদ্ধত আচরণ ও কর্কশ ব্যবহারের জন্য অল্প সময়ের মধ্যেই অমাত্যদের নিকট অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। ফলে একদল অমাত্য —ইঁহাদের মধ্যে লোহানীরাই প্রধান—তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলেন।

সুলেমানের ভাগিনেয় ও জামাতা হনুস্থ ইহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া বায়াজিদকে হত্যা করিলেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং লোদী খান ও অন্যান্য বিশ্বস্ত অমাত্যদের হাতে বন্দী হইয়া নিহত হইলেন। বায়াজিদ কর্‌রানী স্বল্পকালীন রাজত্বের মধ্যেই আকবরের অধীনতা অস্বীকার করিয়া নিজের নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন।

(৪) দাউদ কররানী

হনুস্থকে বধ করিয়া অমাত্যেরা সুলেমানের দ্বিতীয় পুত্র দাউদকে সিংহাসনে বসাইলেন। তরুণবয়স্ক দাউদ কররানী অত্যন্ত নির্বোধ ও উত্তপ্তমস্তিষ্ক প্রকৃতির ছিলেন; উপরন্তু তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় দুশ্চরিত্র ও মদ্যপ। অমাত্যদের অপমান করিয়া এবং সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞাতিদিগকে বিশ্বাসঘাতকতার সহিত হত্যা করিয়া তিনি অনতিবিলম্বেই বহু শত্রু সৃষ্টি করিলেন। কুৎব্ খান, গুজ্‌র্‌ কররানী প্রভৃতি স্বার্থপর অমাত্যদের কুমন্ত্রণায় দাউদ লোদী খানের মত সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত মন্ত্রীর প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন এবং লোদী খানের জামাতা (তাজ খানের পুত্র) য়ুসুফকে হত্যা করিলেন। দাউদও বায়াজিদের মত আকবরের অধীনতা অস্বীকার করিয়া নিজের নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা উৎকীর্ণ করাইলেন।

দাউদ বাংলার সিংহাসনে বসিবার পর আফগানদের প্রধান সেনাপতি গুজ্‌র্‌ খান বায়াজিদের পুত্রকে বিহারের সিংহাসনে বসাইলেন। এ কথা শুনিয়া দাউদ বিহার নিজের দখলে আনিবার জন্য লোদী খানের অধীনে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী বিহারে পাঠাইলেন; ইতিমধ্যে আকবরও বিহার অধিকার করিবার জন্য খান-ই-খানান মুনিম খানকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া লোদী খান ও গুজ্‌র্‌ খান নিজেদের বিরোধ মিটাইয়া ফেলিলেন এবং মুনিম খানকে অনেক উপহার দিয়া ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়া শান্ত করিলেন।

তখন দাউদ লোদী খানের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং এক সৈন্যবাহিনী লইয়া বিহারে গেলেন; কোন কোন বিরোধিপক্ষীয় লোককে তিনি দমনও করিলেন। ইতিমধ্যে আকবর তাঁহার গুজরাট অভিযান সমাপ্ত করিয়া মুনিম খানকে আরও অনেক সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। ইহাদের পাইয়া মুনিম খান যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং ত্রিমোহনী (আরার ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত)

পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তখন দাউদ কুৎলু লোহানী ও গুজর্ খানের এবং শ্রীহরি নামে একজন হিন্দুর পরামর্শে লোদী খানের কাছে খুব করুণ ও বিনীতভাবে আবেদন জানাইয়া বলিলেন যে তাঁহার বংশের প্রতি আনুগত্য যেন তিনি ত্যাগ না করেন; লোদী খানকে তাঁহার শিবিরে আসিবার জন্য তিনি বিনীত অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু লোদী খান তাঁহার শিবিরে আসিলে দাউদ তাঁহাকে বধ করিলেন। ইহার ফলে আফগানদের মধ্যে বিরাট ভাঙন ধরিল। এদিকে মোগল বাহিনী সাবধানতার সহিত সুশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হইয়া পাটনার নিকটে পৌঁছিল। পাটনায় দাউদ প্রতিরক্ষা-ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

অতঃপর আকবর স্বয়ং বহু কামান ও বিশাল রণহস্তী সমেত এক নৌবহর লইয়া বিহারে আসিয়া মুনিম খানের সহিত যোগ দিলেন (৩রা আগস্ট, ১৫৭৪ খ্রীঃ)। আকবর দেখিলেন যে পাটনার (গঙ্গার) ওপারে অবস্থিত হাজীপুর দুর্গ অধিকার করিতে পারিলে পাটনা অধিকার করা সহজসাধ্য হইবে। তাই তিনি ৬ই আগষ্ট কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর হাজীপুর দুর্গ অধিকার করিলেন এবং তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিলেন। ইহাতে দাউদ অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেলেন এবং সেই রাত্রেই সদলবলে জলপথে বাংলায় পলাইয়া গেলেন; পলাইবার সময় অনেক আফগান জলে ডুবিয়া মরিল। দাউদের সৈন্যদের লইয়া সেনাপতি গুজর্ খান স্থলপথে বাংলায় গেলেন। মোগলেরা পর দিন সকালে পাটনার পরিত্যক্ত দুর্গ অধিকার করিল। তারপর আকবর স্বয়ং মোগল বাহিনীর নেতৃত্ব করিয়া এক দিনেই দরিয়াপুরে (পাটনা ও মুঙ্গেরের মধ্যপথে অবস্থিত) পৌঁছিলেন। ইহার পর আকবর ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু মুনিম খান ১৩ই আগস্ট তারিখে ২০,০০০ সৈন্য লইয়া বাংলার দিকে রওনা হইলেন এবং বিনা বাধায় সুরজগড়, মুঙ্গের, ভাগলপুর ও কহলগাঁও অধিকার করিয়া তেলিয়াগড়ি গিরিপথের পশ্চিমে পৌঁছিলেন। দাউদ এখানে প্রতিরোধ-ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতি খান-ই-খানান ইসমাইল খান সিলাহ্‌দার মোগল বাহিনীকে সাময়িক-ভাবে প্রতিহত করিলেন। কিন্তু মজনূন খান কাকশালের নেতৃত্বে মোগল অশ্বারোহী বাহিনী স্থানীয় জমিদারদের সাহায্যে রাজমহল পর্বতমালার মধ্য দিয়া তেলিয়াগড়িকে দক্ষিণে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। তখন আফগানরা যুদ্ধ না করিয়াই পলাইয়া গেল এবং মুনিম খান বিনা বাধায় বাংলার রাজধানী টাণ্ডায় প্রবেশ করিলেন (২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৫৭৪ খ্রীঃ)।

দাউদ কররানী তখন সাতগাঁও হইয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। মুনিম খান রাজা তোড়রমল্ল ও মুহম্মদ কুলী খান বরলাসকে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনে নিযুক্ত করিলেন। অন্যান্য আফগান নায়কেরা উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গে গিয়া সমবেত হইলেন; কালাপাহাড়, সুলেমান খান মনক্লী ও বাবুই মনক্লী ঘোড়াঘাটে গেলেন; তাঁহাদের দমন করিবার জন্য মুনিম খান মজনূন খান কাকশালকে ঘোড়াঘাটে পাঠাইলেন; মজনূন খান সুলেমান খান মনক্লীকে নিহত এবং অন্যান্য আফগানদের পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া ঘোড়াঘাট অধিকার করিলেন; পরাজিত আফগানরা কোচবিহারে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইমাদ খান কররানীর পুত্র জুনৈদ খান কররানী ইতিপূর্বে মোগলদের দলে যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন তিনি বিদ্রোহী হইলেন এবং ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া রায় বিহারমল্ল ও মুহম্মদ খান গখরকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। এদিকে মাহ্‌মূদ খান ও মুহম্মদ খান নামে দুইজন নায়ক সরকার মাহ্‌মূদাবাদের অন্তর্গত সেলিমপুর নগর অধিকার করিয়াছিলেন। রাজা তোড়রমল্ল কর্তৃক প্রেরিত একদল সৈন্য মাহ্‌মূদ খানকে পরাজিত ও মুহম্মদ খানকে নিহত করিয়া সেলিমপুর অধিকার করিল। তখন জুনৈদ খান আবার ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ মুহম্মদ কুলী খান বরলাস সাতগাঁওয়ের ৪০ মাইল দূরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আফগানরা সাতগাঁও ছাড়িয়া পলায়ন করিল। মোগল বাহিনী সাতগাঁও অধিকার করিবার পর সংবাদ আসিল যে দাউদের অন্যতম প্রধান কর্মচারী ও পরামর্শদাতা শ্রীহরি (প্রতাপাদিত্যের পিতা) "চতর" (যশোর) দেশের দিকে পলায়ন করিতেছেন; তখন মুহম্মদ কুলী খান শ্রীহরির পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বন্দী করিতে পারিলেন না। রাজা তোড়রমল্ল বর্ধমান হইতে রওনা হইয়া মান্দারণে উপস্থিত হইলেন; দাউদ ইহার ২০ মাইল দূরে দেবরাকসারী গ্রামে শিবির ফেলিয়াছিলেন। তোড়রমল্ল মুনিম খানের নিকট হইতে সৈন্য আনাইয়া মান্দারণ হইতে কোলিয়া গ্রামে গেলেন। দাউদ তখন হরিপুর (দাঁতনের ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত) গ্রামে চলিয়া গেলেন। তখন তোড়রমল্ল মেদিনীপুরে গেলেন। এখানে মুহম্মদ কুলী খান বরলাস দেহত্যাগ করিলেন, ফলে মোগল সৈন্যেরা খুব হতাশ ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তখন তোড়রমল্ল বাধ্য হইয়া মান্দারণে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া মুনিম খান নূতন একদল সৈন্য লইয়া বর্ধমান হইতে রওনা হইলেন,

তোড়রমল্লও মান্দারণ হইতে সসৈন্যে রওনা হইলেন, চেতোতে মুনিম খান ও তোড়রমল্ল মিলিত হইলেন। তাঁহাদের কাছে সংবাদ আসিল যে, দাউদ হরিপুরে পরিখা খনন, প্রতিরোধ-প্রাচীর নির্মাণ, এবং বনময় পথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি অবরুদ্ধ করিয়া প্রস্তুত হইয়া আছেন। মোগল সৈন্যেরা এই কথা শুনিয়া ভগ্ন-মনোরথ হইয়া পড়িল এবং আর যুদ্ধ করিতে চাহিল না। মুনিম খান ও তোড়রমল্ল তাহাদের অনেক করিয়া বুঝাইয়া যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন এবং স্থানীয় লোকদের সাহায্যে জঙ্গলের মধ্য দিয়া একটি ঘুর-পথ আবিষ্কার করিলেন। এই পথ চলাচলের উপযুক্ত করিয়া লইবার পরে মোগল বাহিনী ইহা দিয়া দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রসর হইল এবং নানজুর (দাঁতনের ১১ মাইল পূর্বে অবস্থিত) গ্রামে পৌঁছিল। এখন দাউদকে পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণের সুযোগ উপস্থিত হইল। দাউদ ইতিপূর্বে তাঁহার পরিবারবর্গকে কটকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি এখন উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিলেন। সুবর্ণ-রেখা নদীর নিকটে তুকরোই (দাঁতনের ৯ মাইল দূরে অবস্থিত) গ্রামের প্রান্তরে ৩রা মার্চ, ১৫৭৫ খ্রীঃ তারিখে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে দাউদের বাহিনীই প্রথমে আক্রমণ চালাইয়া আশাতীত সাফল্য অর্জন করিল। তাহারা খান-ই-জহানকে নিহত করিল ও মুনিম খানকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিল। কিন্তু দাউদের নির্বুদ্ধিতার ফলে তাঁহার বাহিনী শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইল। তাঁহার প্রধান সেনাপতি গুজর্ খান যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য সমেত নিহত হইলেন। পরাজিত হইয়া দাউদ পলাইয়া গেলেন। তাঁহার বাহিনীও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল। মোগল সৈন্যেরা তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বিনা বাধায় বেপরোয়া হত্যা ও লুণ্ঠন চালাইতে লাগিল এবং বহু আফগানকে বন্দী করিল। পরের দিন ৮২ বৎসর বয়স্ক মোগল সেনাপতি মুনিম খান অভূতপূর্ব নিষ্ঠুরতার সহিত সমস্ত আফগান বন্দীকে বধ করিয়া তাহাদের ছিন্নমুণ্ড সাজাইয়া আটটি সুউচ্চ মিনার প্রস্তুত করিলেন।

তোড়রমল্ল দাউদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। দাউদ কোথাও দাঁড়াইতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত কটকে গিয়া সেখানকার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্যলাভের কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি ১২ই এপ্রিল তারিখে কটকের দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং মুনিম খানের কাছে বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ২১শে এপ্রিল তারিখে মুনিম খান দাউদকে উড়িষ্যায় জায়গীর প্রদান করিয়া টাণ্ডায় ফিরিয়া আসিলেন।

দাউদ খান নতি স্বীকার করিলেও ইতিমধ্যে ঘোড়াঘাটে মোগল বাহিনীর শোচনীয় বিপর্যয় ঘটিয়াছিল; মুনিম খানের রাজধানী হইতে অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া কালাপাহাড় ও বাবুই মনক্লী প্রভৃতি আফগান নায়কেরা কুচবিহার হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘোড়াঘাটে অবস্থিত মোগলদের পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়াছিল। এই সংবাদ পাইয়া মুনিম খান সৈন্যবাহিনী লইয়া ঘোড়াঘাটের দিকে রওনা হইলেন। কিন্তু ঘোড়াঘাটে পৌঁছিবার পূর্বে তিনি গৌড় জয় করিলেন। বর্ষার সময় টাণ্ডার জলো জমিতে থাকার অসুবিধা হইত বলিয়া মুনিম খান ভাবিয়াছিলেন গৌড় জয় করিয়া সেখানেই রাজধানী স্থাপন করিবেন। কিন্তু গৌড় নগরী বহুকাল পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া ছিল বলিয়া সেখানকার ঘর-বাড়ীগুলি অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে কয়েকদিন থাকার ফলে মুনিম খানের লোকরা অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং কয়েক শত লোক মারা গেল। ফলে মুনিম খানের আর ঘোড়াঘাটে যাওয়া হইল না, তিনি টাণ্ডায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রত্যাবর্তনের দশদিন পরে ২৩শে অক্টোবর, ১৫৭৫ খ্রীঃ তারিখে মুনিম খান পরলোকগমন করিলেন। তাহার ফলে মোগলদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তাহাদের ঐক্যও নষ্ট হইয়া গেল। তখন শত্রুরা চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। বেগতিক দেখিয়া মোগলরা সকলে গৌড়ে সমবেত হইল এবং সেখান হইতে বাংলা দেশ ছাড়িয়া সকলেই ভাগলপুর চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া তাহারা দিল্লী ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এই সময়ে আকবর হাসান কুলী বেগ ওরফে খান-ই-জহানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তিনি ভাগলপুরে পৌঁছিয়া কিছু মুস্কিলে পড়িলেন। তিনি শিয়া বলিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী সৈন্যাধ্যক্ষেরা তাঁহার কথা শুনিতে চাহিত না। তোড়লমল্ল মধ্যস্থ হইয়া মিষ্ট বাক্য, চতুর ব্যবহার এবং অকৃপণ অর্থদানের দ্বারা তাহাদের বশীভূত করিলেন।

খান-ই-জহান সংবাদ পাইলেন যে দাউদ কররানী আবার বিদ্রোহ করিয়াছেন এবং ভদ্রক, জলেশ্বর প্রভৃতি মোগল অধিকারভুক্ত অঞ্চল জয় করার পরে সমগ্র বাংলাদেশ পুনরধিকার করিয়াছেন; ঈশা খান পূর্ব বঙ্গের নদীপথ হইতে শাহ বরদী কর্তৃক পরিচালিত মোগল নৌবহরকে বিতাড়িত করিয়াছেন; জুনৈদ কররানী দক্ষিণ-পূর্ব বিহারে দৌরাত্ম্য করিতেছেন এবং গজপতি শাহ ডাকাতি করিতেছেন, কেবলমাত্র হাজীপুরে মুজাফফর খান তুরবতী অনেক কষ্টে মোগল ঘাঁটি রক্ষা করিতেছেন।

যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক সৈন্যাধ্যক্ষদের তোড়রমল্লের সাহায্যে অনেক কষ্টে বুঝাইবার পরে খান-ই-জহান তাঁহাদের লইয়া বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন। তেলিয়াগড়ি তাঁহারা সহজেই অধিকার করিলেন এবং এখানকার আফগান সৈন্যাধ্যক্ষকে তাঁহারা বধ করিলেন। দাউদ পশ্চাদপসরণ করিয়া রাজমহলে গিয়া সেখানে পরিখা খনন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। খান-ই-জহান তাঁহার মুখোমুখি হইয়া অনেকদিন রহিলেন, কিন্তু আক্রমণ করিতে পারিলেন না। তখন আকবর বিহারের সৈন্যবাহিনীকে খান-ই-জহানের সাহায্যে যাইতে বলিলেন এবং খান-ই-জহানকে কয়েক নৌকা বোঝাই অর্থ ও যুদ্ধের সরঞ্জাম পাঠাইলেন। গজপতির ডাকাতির ফলে মোগলদের যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইতেছিল, আকবর তাঁহাকে দমন করিবার জন্য তাঁহার অন্যতম সভাসদ শাহবাজ খানকে প্রেরণ করিলেন।

১০ই জুলাই, ১৫৭৬ খ্রী: তারিখে বিহারের মোগল সৈন্যবাহিনী রাজমহলে খান-ই-জহানের সহিত যোগ দিল। ১২ই জুলাই মোগলদের সহিত আফগানদের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিবার পরে আফগানরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে জুনৈদ কর্‌রানী গোলার আঘাতে নিহত হইলেন, উড়িষ্যার শাসনকর্তা জহান খানও মারা পড়িলেন, কালাপাহাড় ও কুৎলু্ লোহানী আহত অবস্থায় পলায়ন করিলেন। দাউদ কররানী বন্দী হইলেন। খান-ই-জহান তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমীরদের নির্বন্ধে তিনি দাউদকে সন্ধিভঙ্গের অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। দাউদের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া আকবরের নিকট পাঠানো হইল।

অতঃপর খান-ই-জহান সপ্তগ্রামে গেলেন এবং যে সব আফগান সেখানে তখনও গোলযোগ বাধাইতেছিল, তাহাদের দমন করিলেন। দাউদের সম্পদ ও পরিবারের জিম্মাদার মাহ্‌মুদ খান খাস-খেল ওরফে "মাটি" তাঁহার নিকট পর্যুদস্ত হইলেন। তখন আফগানদের নিজেদের মধ্যেই বিরোধ বাধিল এবং তাহাদের অন্যতম নেতা জমশেদ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতেই নিহত হইলেন। অবশেষে দাউদের জননী নৌলাখা ও দাউদের পরিবারের অন্যান্য লোকেরা খান-ই-জহানের কাছে আত্মসমর্পণ করিলেন। "মাটি" আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়া খান-ই-জহানের আজ্ঞায় নিহত হইলেন।

বাংলার প্রথম আফগান শাসক শের শাহ এবং শেষ আফগান শাসক দাউদ

কররানী। আফগানরা সাঁইত্রিশ বৎসর এদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দাউদের পরাজয় ও নিধনের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার ইতিহাসের আফগান যুগ সমাপ্ত হইল। অবশ্য দাউদের মৃত্যুর পরেও বাংলাদেশের অনেক অংশে আফগান নায়কেরা নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্পূর্ণ-ভাবে দমন বা বশীভূত করিতে মোগল শক্তির অনেক সময় লাগিয়াছিল।*

* বর্তমান পরিচ্ছেদে উল্লিখিত বিভিন্ন তথ্য জৌহরের 'তজকিরৎ-উল-ওয়াকৎ', আবুল ফজলের 'আকবরনামা', আবদুল্লাহ্‌র 'তারিখ-ই-দাউদী' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মুঘল (মোগল) যুগ

১। মুঘল শাসনের আরম্ভ ও অরাজকতা

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দাউদ খানের পরাজয় ও নিধনের ফলে বাংলা দেশে মুঘল সম্রাটের অধিকার প্রবর্তিত হইল। কিন্তু প্রায় কুড়ি বৎসর পর্যন্ত মুঘলের রাজ্য-শাসন এদেশে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বাংলাদেশে একজন মুঘল সুবাদার ছিলেন এবং অল্প কয়েকটি স্থানে সেনানিবাস স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল রাজধানী ও এই সেনানিবাসগুলির নিকটবর্তী জনপদসমূহ মুঘল শাসন মানিয়া চলিত। অন্যত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছিয়াছিল। দলে দলে আফগান সৈন্য লুঠতরাজ করিয়া ফিরিত—মুঘল সৈন্যেরাও এইভাবে অর্থ উপার্জন করিত। বাংলার জমিদারগণ স্বাধীন হইয়া "জোর যার মুল্লুক তার" এই নীতি অনুসরণপূর্বক পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করিতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। এক কথায় বাংলা দেশে আটশত বৎসর পরে আবার মাৎস্য-ন্যায়ের আবির্ভাব হইল।

দাউদ খানকে পরাজিত ও নিহত করিবার পরে, তিন বৎসরের অধিককাল দক্ষতার সহিত শাসন করিবার পর খান-ই-জহানের মৃত্যু হইল (১৯ ডিসেম্বর, ১৫৭৮)। পরবর্তী সুবাদার মুজাফফর খান এই পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। এই সময় সম্রাট আকবর এক নূতন শাসননীতি মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রচলিত করেন—সমগ্র দেশ কতকগুলি সুবায় বিভক্ত হইল এবং প্রতি সুবায় সিপাহ্‌সালার বা সুবাদার ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষগণ দিল্লী হইতে নির্বাচিত হইয়া আসিল। রাজস্ব আদায়েরও নূতন ব্যবস্থা হইল। এতদিন পর্যন্ত প্রাদেশিক মুঘল কর্মচারিগণ যে রকম বেআইনী ক্ষমতা যথেচ্ছ পরিচালনা ও অন্যান্য রকমে অর্থ উপার্জন করিতেন তাহা রহিত হইল। ফলে সুবে বাংলা ও বিহারের মুঘল কর্মচারিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। আকবরের ভ্রাতা, কাবুলের শাসনকর্তা মীর্জা হাকিম একদল ষড়যন্ত্রকারীর প্ররোচনায় নিজে দিল্লীর সিংহাসনে বসিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার দলের লোকেরা বিদ্রোহীদের সাহায্য করিল। মুজাফফর খান বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে বধ করিল (১৯ এপ্রিল, ১৫৮০)। মীর্জা হাকিম সম্রাট বলিয়া বিঘোষিত

হইলেন। বাংলায় নূতন সুবাদার নিযুক্ত হইল। মীর্জা হাকিমের পক্ষ হইতে একজন উকীল রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইরূপে বাংলা ও বিহার মুঘল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। ইহার ফলে আবার অরাজকতা উপস্থিত হইল। আফগান বা পাঠানরা আবার উড়িষ্যা দখল করিল।

এক বৎসরের মধ্যেই বিহারের বিদ্রোহ অনেকটা প্রশমিত হইল। ১৫৮২ খ্রীঃর এপ্রিল মাসে আকবর খান-ই-আজমকে সুবাদার নিযুক্ত করিয়া বাংলায় পাঠাইলেন। তিনি তেলিয়াগড়ির নিকট যুদ্ধে মাসুম কাবুলীর অধীনে সম্মিলিত পাঠান বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করিলেন (২৪ এপ্রিল, ১৫৮৩)। কিন্তু বিদ্রোহ একেবারে দমিত হইল না। মাসুম কাবুলী ঈশা খানের সঙ্গে যোগ দিলেন। পরবর্তী সুবাদার শাহবাজ খান বহুদিন যাবৎ ঈশা খানের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া রাজধানী টাণ্ডায় ফিরিয়া গেলেন। সুযোগ বুঝিয়া মাসুম ও অন্যান্য পাঠান নায়কেরা মালদহ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। উড়িষ্যায় পাঠান কুৎলু খান লোহানী বিদ্রোহ করিয়া প্রায় বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন—কিন্তু পরাজিত হইয়া মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিলেন (জুন, ১৫৮৪)।

১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য আকবর অনেক নূতন ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। অবশেষে শাহবাজ খান যুদ্ধের পরিবর্তে তোষণ-নীতি অবলম্বন ও উৎকোচ প্রদান দ্বারা বহু পাঠান বিদ্রোহী নায়ককে বশীভূত করিলেন। ঈশা খান ও মাসুম কাবুলী উভয়েই মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিলেন (১৫৮৬ খ্রীঃ)। কিন্তু পাঠান নায়ক কুৎলু উড়িষ্যায় নিরুপদ্রবে রাজ্য করিতে লাগিলেন। তিনিও বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন না—শাহবাজ খানও তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন না। সুতরাং ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় মুঘল আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৫৮৭ খ্রীঃর শেষভাগে বাংলা দেশে অন্যান্য সুবার ন্যায় নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত হইল এবং প্রত্যেক বিভাগ নির্দিষ্ট একজন কর্মচারীর অধীনস্থ হইল। সর্বোপরি সিপাহ্‌সালার (পরে সুবাদার নামে অভিহিত) এবং তাঁহার অধীনে দিওয়ান (রাজস্ব বিভাগ), বখ্‌শী (সৈন্য বিভাগ), সদর ও কাজী (দিওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার), কোতোয়াল (নগর রক্ষা) প্রভৃতি অধ্যক্ষগণ নিযুক্ত হইলেন।

নূতন ব্যবস্থা অনুসারে ওয়াজির খান প্রথম সিপাহসালার নিযুক্ত হইলেন—কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইলে (অগস্ট, ১৫৮৭) সৈয়দ খান ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ শাসনকালে (১৫৮৭-১৫৯৪) বাংলাদেশে আবার পাঠানরা ও জমিদারগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

২। মানসিংহ ও বাংলাদেশে মুঘল রাজ্যের গোড়াপত্তন

১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। পাঁচ হাজার মুঘল সৈন্যকে বাংলাদেশে জায়গীর দিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হইল। রাজধানী টাণ্ডায় পেঁ ৗছিয়াই তিনি বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্য চতুর্দিকে সৈন্য পাঠাইলেন। তাঁহার পুত্র হিম্মৎসিংহ ভূষণা দুর্গ দখল করিলেন (এপ্রিল, ১৫৯৫)। ১৫৯৫ খ্রীঃর ৭ই নভেম্বর মানসিংহ রাজমহলে নূতন এক রাজধানীর পত্তন করিয়া ইহার নাম দিলেন আকবরনগর। শীঘ্রই এই নগরী সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। অতঃপর তিনি ঈশা খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং পাঠানদিগকে ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিলেন। ঈশা খানের জমিদারীর অধিকাংশ মুঘল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। অন্যান্য স্থানেও বিদ্রোহীরা পরাজিত হইল। ১৫৯৬ খ্রীঃর বর্ষাকালে মানসিংহ ঘোড়াঘাটের শিবিরে গুরুতররূপে পীড়িত হন। এই সংবাদ পাইয়া মাসুম খান ও অন্যান্য বিদ্রোহীরা বিশাল রণতরী লইয়া অগ্রসর হইল। মুঘলদের রণতরী না থাকায় বিদ্রোহীরা বিনা বাধায় ঘোড়াঘাটের মাত্র ২৪ মাইল দূরে আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে জল কমিয়া যাওয়ায় তাহারা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। মানসিংহ সুস্থ হইয়াই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা বিতাড়িত হইয়া এগারসিন্দুরের (ময়মনসিংহ) জঙ্গলে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল।

অতঃপর ঈশা খান নূতন এক কূটনীতি অবলম্বন করিলেন। শ্রীপুরের জমিদার—বারো ভূঞার অন্যতম কেদার রায়কে ঈশা খান আশ্রয় দিলেন। কুচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মুঘলের পক্ষে ছিলেন। তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা রঘুদেবের সঙ্গে একযোগে ঈশা খান কুচবিহার আক্রমণ করিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ১৫৯৬ খ্রীঃর শেষভাগে মানসিংহ সৈন্য লইয়া অগ্রসর হওয়ায় ঈশা খান পলায়ন করিলেন। কিন্তু মুঘল সৈন্য ফিরিয়া গেলে আবার রঘুদেব ও ঈশা খান কুচবিহার আক্রমণ করিলেন। ইহার প্রতিরোধের জন্য মানসিংহ তাঁহার পুত্র দুর্জনসিংহের অধীনে ঈশা খানের বাসস্থান কত্রাভু দখল করিবার জন্য

স্থলপথে ও জলপথে সৈন্য পাঠাইলেন। ১৫৯৭ খ্রীঃর ৫ই সেপ্টেম্বর ঈশা খান ও মাসুম খানের সমবেত বিপুল রণতরী মুঘল রণতরী ঘিরিয়া ফেলিল। দুর্জনসিংহ নিহত হইলেন এবং অনেক মুঘল সৈন্য বন্দী হইল। কিন্তু চতুর ঈশা খান বন্দীদিগকে মুক্তি দিয়া এবং কুচবিহার আক্রমণ বন্ধ করিয়া মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার পূর্বক সন্ধি করিলেন। ইহার দুই বৎসর পর ঈশা খানের মৃত্যু হইল (সেপ্টেম্বর, ১৫৯৯)।

ভূষণা-বিজেতা মানসিংহের বীর পুত্র হিম্মৎসিংহ কলেরায় প্রাণত্যাগ করেন (মার্চ, ১৫৯৭)। ছয় মাস পরে দুর্জনসিংহের মৃত্যু হইল। দুই পুত্রের মৃত্যুতে শোকাতুর মানসিংহ সম্রাটের অনুমতিক্রমে বিশ্রামের জন্য ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আজমীর গেলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎসিংহ তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে আগ্রায় তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার বালক পুত্র মহাসিংহ মানসিংহের অধীনে বাংলার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সুযোগে বাংলা দেশে পাঠান বিদ্রোহীরা আবার মাথা তুলিল এবং একাধিকবার মুঘল সৈন্যকে পরাজিত করিল। উড়িষ্যার উত্তর অংশ পর্যন্ত পাঠানের হস্তগত হইল।

এই সমুদয় বিপর্যয়ের ফলে মানসিংহ বাংলায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহীরা গুরুতর রূপে পরাজিত হইল (ফেব্রুয়ারী, ১৬০১)। পরবর্তী বৎসর মানসিংহ ঢাকা জিলায় শিবির স্থাপন করিলেন। শ্রীপুরের জমিদার কেদার রায় বশ্যতা স্বীকার করিলেন। মানসিংহের পৌত্র মালদহের বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিলেন। এদিকে উড়িষ্যার পরলোকগত পাঠান নায়ক কুৎলু খানের ভ্রাতুষ্পুত্র উসমান ব্রহ্মপুত্র নদী পার হইয়া মুঘল থানাদারকে পরাজিত করিয়া ভাওয়ালে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিলেন। মানসিংহ তৎক্ষণাৎ ভাওয়াল যাত্রা করিলেন এবং উসমান গুরুতররূপে পরাজিত হইলেন। অনেক পাঠান নিহত হইল এবং বহুসংখ্যক পাঠান রণতরী ও গোলাবারুদ মানসিংহের হস্তগত হইল। ইতিমধ্যে কেদার রায় বিদ্রোহী হইয়া ঈশা খানের পুত্র মুসা খান, কুৎলু খানের উজীরের পুত্র দাউদ খান এবং অন্যান্য জমিদারগণের সহিত যোগ দিলেন। মানসিংহ ঢাকায় পৌঁছিয়াই ইহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত তাহারা ইছামতী নদী পার হইতে না পারায় মানসিংহ স্বয়ং শাহপুরে উপস্থিত হইয়া নিজের হাতী ইছামতীতে নামাইয়া দিলেন। মুঘল সৈনিকেরা ঘোড়ায়

চড়িয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। এইরূপ অসম সাহসে নদী পার হইয়া মানসিংহ বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া বহুদূর পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন (ফেব্রুয়ারী, ১৬০২)।

এই সময় আরাকানের মগ জলদস্যুরা জলপথে ঢাকা অঞ্চলে বিষম উপদ্রব সৃষ্টি করিল এবং ডাঙ্গায় নামিয়া কয়েকটি মুঘল ঘাঁটি লুঠ করিল। মানসিংহ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইয়া বহুকষ্টে তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন এবং তাহারা নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেদার রায় তাঁহার নৌবহর লইয়া মগদের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং শ্রীনগরের মুঘল ঘাঁটি আক্রমণ করিলেন। মানসিংহও কামান ও সৈন্য পাঠাইলেন। বিক্রমপুরের নিকট এক ভীষণ যুদ্ধে কেদার রায় আহত ও বন্দী হইলেন। তাঁহাকে মানসিংহের নিকট লইয়া যাইবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল (১৬০৩)। তাঁহার অধীনস্থ বহু পর্তুগীজ জলদস্যু ও বাঙ্গালী নাবিক হত হইল। অতঃপর মানসিংহ মগ রাজাকে নিজ দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। তারপর তিনি উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। উসমান পলাইয়া গেলেন। এইরূপে বাংলাদেশে অনেক পরিমাণে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল।

৩। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রারম্ভে বাংলা দেশের অবস্থা

মুঘল সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সেলিম 'জাহাঙ্গীর' নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৬০৫)। এই সময় শের আফকান ইস্তলজু নামক একজন তুর্কী জায়গীরদার বর্ধমানে বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী অসামান্য রূপবতী ছিলেন। কথিত আছে, জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিবাহের পূর্বেই দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সম্ভবত এই নারীরত্ন হস্তগত করিবার জন্যই মানসিংহকে সরাইয়া জাহাঙ্গীর তাঁহার বিশ্বস্ত ধাত্রী-পুত্র কুৎবুদ্দীন খান কোকাকে বাংলা দেশের সুবাদার নিযুক্ত করিলেন। কুৎবুদ্দীন খান বর্ধমানে শের আফকানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মধ্যে বচসা ও বিবাদ হয় এবং উভয়েই নিহত হন (১৬০৭)। শের আফকানের পত্নী আগ্রায় মুঘল হারেমে কয়েক বৎসর অবস্থান করার পর জাহাঙ্গীরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং পরে নূরজাহান নামে তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হন।

কুৎবুদ্দীনের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর কুলী খান বাংলা দেশের সুবাদার হইয়া

আসেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার স্থলে ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হইয়া ১৬০৮ খ্রীঃর জুন মাসে কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার কার্যকাল মাত্র পাঁচ বৎসর—কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি মানসিংহের আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিয়া বাংলা দেশে মুঘলরাজের ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইসলাম খানের সুবাদারীর প্রারম্ভে বাংলা দেশ নামত মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও প্রকৃতপক্ষে রাজধানী রাজমহল, মুঘল ফৌজদারদের অধীনস্থ অল্প কয়েকটি থানা অর্থাৎ সুরক্ষিত সৈন্যের ঘাঁটি ও তাহার চতুর্দিকে বিস্তৃত সামান্য ভূখণ্ডেই মুঘলরাজের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার বাহিরে অসংখ্য বড় ও ছোট জমিদার এবং বিদ্রোহী পাঠান নায়কেরা প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজ্য পরিচালনা করিতেন। মুঘল থানার মধ্যে করতোয়া নদীর তীরবর্তী ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর জিলা), আলপসিংও সেরপুর অতাই (ময়মনসিংহ), ভাওয়াল (ঢাকা), ভাওয়ালের ২২ মাইল উত্তরে অবস্থিত টোক এবং পদ্মা, লক্ষ্যা ও মেঘনা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বর্তমান নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী ত্রিমোহানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যে সকল জমিদার মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিলেও সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই বিদ্রোহী হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে ইহারা সমধিক শক্তিশালী ছিলেন।

১। পূর্বোক্ত ঈশা খানের পুত্র মুসা খান—বর্তমান ঢাকা ও ত্রিপুরা জিলার অর্ধেক, প্রায় সমগ্র মৈমনসিংহ জিলা এবং রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জিলার কতকাংশ তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলা দেশের তৎকালীন জমিদারগণ বারো ভুঞা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, যদিও সংখ্যায় তাঁহারা ঠিক বারো জন ছিলেন না। মুসা খান ছিলেন ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও অনেকেই তাঁহাকে নেতা বলিয়া মানিত। এই সকল সহায়ক জমিদারের মধ্যে ভাওয়ালের বাহাদুর গাজী, সরাইলের সুনা গাজী, চাটমোহরের মীর্জা মুমিন (মাসুম খান কাবুলীর পুত্র), খলসির মধু রায়, চাঁদ প্রতাপের বিনোদ রায়, ফতেহাবাদের (ফরিদপুর) মজলিস কুৎব্ এবং মাতঙ্গের জমিদার পলওয়ানের নাম করা যাইতে পারে।

২। ভূষণার জমিদার সত্রাজিৎ এবং সুসঙ্গের জমিদার রাজা রঘুনাথ—ইহারা সহজেই মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং অন্যান্য জমিদারদের বিরুদ্ধে মুঘল সৈন্যের সহায়তা করেন। সত্রাজিতের কাহিনী পরে বলা হইবে।

৩। রাজা প্রতাপাদিত্য—বর্তমান যশোহর, খুলনা ও বাখরগঞ্জ জিলার অধিকাংশই তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বর্তমান যমুনা ও ইছামতী নদীর সঙ্গমস্থলে ধূমঘাট নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে তাঁহার শক্তি, বীরত্ব ও দেশভক্তির যে উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশেরই কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

৪। বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বাকলার জমিদার রামচন্দ্র—ইনি রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রতিবেশী ও সম্পর্কে জামাতা ছিলেন। ইনি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথ "বৌঠাকুরাণীর হাট" নামক উপন্যাসে তাঁহার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অনৈতিহাসিক।

৫। ভুলুয়ার জমিদার অনন্তমাণিক্য—বর্তমান নোয়াখালি জিলা তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইনি লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্র।

৬। আরও অনেক জমিদার—তাঁহাদের কথা প্রসঙ্গক্রমে পরে বলা হইবে।

৭। বিদ্রোহী পাঠান নায়কগণ—বর্তমান শ্রীহট্ট (সিলেট) জিলাই ছিল ইহাদের শক্তির প্রধান কেন্দ্রস্থল। ইহাদের মধ্যে বায়াজিদ কররানী ছিলেন সর্ব-প্রধান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পাঠান নায়কই তাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিত। তাঁহার প্রধান সহযোগী ছিলেন খাজা উসমান। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে ইহাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। উসমানের পিতা খাজা ঈশা উড়িষ্যার শেষ পাঠান রাজা কুৎলু খানের ভ্রাতা ও উজীর ছিলেন এবং মানসিংহের সহিত সন্ধি করিয়া-ছিলেন। সন্ধির পূর্বেই কুৎলু খানের মৃত্যু হইয়াছিল। খাজা ঈশার মৃত্যুর পর পাঠানেরা আবার বিদ্রোহী হইল। মানসিংহ তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য তিনি উসমান ও অন্য কয়েকজন পাঠান নায়ককে উড়িষ্যা হইতে দূরে রাখিবার জন্য পূর্ব বাংলায় জমিদারি দিলেন; পরে উড়িষ্যার এত নিকটে তাহাদিগকে রাখা নিরাপদ মনে না করিয়া এই আদেশ নাকচ করিলেন। ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া তাহারা সাতগাঁওয়ে লুঠপাট করিতে আরম্ভ করিল, সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়া ভূষণা লুঠ করিল এবং ঈশা খানের সঙ্গে যোগ দিল। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে বর্তমান মৈমনসিংহ জিলার অন্তর্গত বোকাই নগরে উসমান দুর্গ নির্মাণ করিলেন। তিনি আজীবন ঈশা খান ও মুসা খানের সহায়তায় মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। পাঠান নায়ক পূর্বোক্ত বায়াজিদ, বানিয়াচঙ্গের আনওয়ার খান ও শ্রীহট্টের অন্যান্য পাঠান নায়কদের

সঙ্গে উসমানের বন্ধুত্ব ছিল। এইরূপে উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত হইয়া পাঠান শক্তি ব্রহ্মপুত্রের পূর্বভাগে প্রতিষ্ঠিত হইল।

বাংলাদেশের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত রাজধানী রাজমহল হইতে পূর্বে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের অধিকাংশই মুঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধবাদী বিদ্রোহী নায়কদের অধীন ছিল। রাজমহলের দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে তিনজন বড় জমিদার ছিলেন—মল্লভূম ও বাঁকুড়ার বীর হাম্বীর, ইহার দক্ষিণ পশ্চিমে পাঁচেতে শাম্‌স্ খান এবং ইহার দক্ষিণ-পূর্বে হিজলীতে সেলিম খান। ইহারা মুখে মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিতেন, কিন্তু কখনও সুবাদার ইসলাম খানের দরবারে উপস্থিত হইতেন না।

৪। ইসলাম খানের কার্যকলাপ—বিদ্রোহী জমিদারদের দমন

সুবাদার ইসলাম খান রাজমহলে পৌঁছিবার অল্পকাল পরেই সংবাদ আসিল যে পাঠান উসমান খান সহসা আক্রমণ করিয়া মুঘল থানা আলপসিং অধিকার করিয়াছেন ও থানাদারকে বধ করিয়াছেন। ইসলাম খান অবিলম্বে সৈন্য পাঠাইয়া থানাটি পুনরুদ্ধার করিলেন এবং বাংলাদেশে মুঘল প্রভুত্বের স্বরূপ দেখিয়া ইহা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিলেন।

ইসলাম খান প্রথমেই মুসা খানকে দমন করিবার জন্য একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও ব্যাপক আয়োজন করিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে উপঢৌকনসহ ইসলাম খানের দরবারে পাঠাইলেন। স্থির হইল তিনি সৈন্যসামন্ত ও যুদ্ধের সরঞ্জাম লইয়া স্বয়ং আলাইপুরে গিয়া ইসলাম খানের সহিত সাক্ষাৎ এবং মুসা খানের বিরুদ্ধে অভিযানে যোগদান করিবেন। জামিন স্বরূপ সংগ্রামাদিত্য ইসলাম খানের দরবারে রহিল। বর্ষা শেষ হইলে ইসলাম খান এক বৃহৎ সৈন্যদল, বহুসংখ্যক রণতরী ও বড় বড় ভারবাহী নৌকায় কামান বন্দুক লইয়া রাজমহল হইতে ভাটি অর্থাৎ পূর্ব বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন। মালদহ জিলায় গৌড়ের নিকট পৌঁছিয়া ইসলাম খান পশ্চিম বাংলার পূর্বোক্ত তিনজন জমিদারের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন। বীর হাম্বীর ও সেলিম খান বিনা যুদ্ধে এবং শাম্‌স্ খান পক্ষাধিক কাল গুরুতর যুদ্ধ করার পর মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। মালদহ হইতে দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ জিলায়

মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া ইসলাম খান পদ্মা নদী পার হইলেন এবং রাজসাহী জিলার অন্তর্গত পদ্মা-তীরবর্তী আলাইপুরে পৌঁছিলেন (১৬০৯)। নিকটবর্তী পুঁটিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জমিদার পীতাম্বর, ভাতুড়িয়া রাজ-পরগণার অন্তর্গত চিলাজুয়ারের জমিদার অনন্ত ও আলাইপুরের জমিদার ইলাহ্ বখ্শ্ ইসলাম খানের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

আলাইপুরে অবস্থানকালে ইসলাম খান ভূষণার জমিদার রাজা সত্রাজিতের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন। সত্রাজিতের পিতা মুকুন্দলাল পার্শ্ববর্তী ফতেহাবাদের (ফরিদপুর) মুঘল ফৌজদারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণকে হত্যা করিয়া উক্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মানসিংহের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেও তিনি স্বাধীন রাজার ন্যায় আচরণ করিতেন। তিনি ভূষণা দুর্গ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। মুঘল সৈন্য আক্রমণ করিলে সত্রাজিৎ প্রথমে বীর বিক্রমে তাহাদিগকে বাধা দিলেন, কিন্তু পরে মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং ইসলাম খানের সৈন্যের সঙ্গে যোগ দিয়া পাবনা জিলার কয়েকজন জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন।

পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত রাজা প্রতাপাদিত্য আত্রাই নদীর তীরে ইসলাম খানের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। স্থির হইল তিনি নিজ রাজ্যে ফিরিয়াই চারিশত রণতরী পাঠাইবেন। পুত্র সংগ্রামাদিত্যের অধীনে মুঘল নৌ-বহরের সহিত একত্র মিলিত হইয়া তাহারা যুদ্ধ করিবে। তারপর ইসলাম খান যখন পশ্চিমে ঘোড়াঘাট হইতে মুসা খানের রাজ্য আক্রমণ করিবেন, সেই সময় প্রতাপাদিত্য আড়িয়াল খাঁ নদীর পাড় দিয়া ২০,০০০ পাইক, ১,০০০ ঘোড়সওয়ার এবং ১০০ রণতরী লইয়া ঈশা খানের রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত শ্রীপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণ করিবেন।

বর্ষাকাল শেষ হইলে ইসলাম খান প্রধান মুঘল বাহিনী সহ করতোয়ার তীর দিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া পদ্মা, ধলেশ্বরী ও ইছামতী নদীর সঙ্গমস্থল কাটাসগড়ে উপস্থিত হইলেন—মুঘল নৌ-বাহিনীও তাঁহার অনুসরণ করিল। ইহার নিকটবর্তী যাত্রীপুরে ইছামতীর তীরে মুসা খানের এক সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। এই দুর্গ আক্রমণ করাই মুঘল বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু মুসা খানকে বিপথে চালিত করিবার জন্য ক্ষুদ্র একদল সৈন্য ও রণতরী ঢাকা নগরীর দিকে পাঠানো হইল।

মুসা খান যাত্রীপুর রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত ১০।১২ জন জমিদারের সঙ্গে ৭০০ রণতরী লইয়া কাটাসগড়ে মুঘলের শিবির আক্রমণ করিলেন। প্রথম দিন যুদ্ধের পর মুসা খান রাতারাতি নিকটবর্তী ডাকচেরা নামক স্থানে পরিখাবেষ্টিত

একটি সুরক্ষিত মাটির দুর্গ নির্মাণ করিলেন এবং পর পর দুই দিন প্রভাতে এই দুর্গ হইতে বাহির হইয়া ভীমবেগে মুঘল সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। গুরুতর যুদ্ধে উভয় পক্ষেই বহু সৈন্য হতাহত হইল। অবশেষে মুসা খান ডাকচেরা ও যাত্রীপুর দুর্গে আশ্রয় লইলেন। মুঘল সৈন্য পুনঃ পুনঃ ডাকচেরা দুর্গ আক্রমণ করিয়াও অধিকার করিতে পারিল না। কিন্তু যখন মুসা খান ডাকচেরা রক্ষায় ব্যাপৃত তখন অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া ইসলাম খান যাত্রীপুর দুর্গ দখল করিলেন। তারপর অনেকদিন যুদ্ধের পর বহু সৈন্য ক্ষয় করিয়া ডাকচেরা দুর্গও দখল করিলেন। এই দুর্গ দখলের ফলে মুসা খানের শক্তি ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট হ্রাস পাইল। ঢাকা নগরীও মুঘল বাহিনী দখল করিল। ইসলাম খান ঢাকায় পৌছিয়া শ্রীপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণের জন্য সৈন্য পাঠাইলেন। মুসা খান রাজধানী রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লক্ষ্যা নদীতে তাঁহার রণতরী সমবেত করিলেন। এই নদীর অপর তীরে শত্রুদলের সম্মুখীন হইয়া কিছুদিন থাকিবার পর মুঘল সৈন্য রাত্রিকালে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া মুসা খানের পৈত্রিক বাসস্থান কত্রাভু এবং পর পর আরও কয়েকটি দুর্গ দখল করায় মুসা খান পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহার রাজধানী সোনারগাঁও সহজেই মুঘলের করতলগত হইল। মুসা খান ইহার পরও মুঘলদের কয়েকটি থানা আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া মেঘনা নদীর একটি দ্বীপে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার পক্ষের জমিদারেরাও একে একে মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

অতঃপর ইসলাম খান ভুলুয়ার জমিদার অনন্তমাণিক্যের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন। আরাকানের রাজা অনন্তমাণিক্যকে সাহায্য করিলেন। অনন্তমাণিক্য একটি সুদৃঢ় দুর্গের আশ্রয়ে থাকিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। মুঘল সৈন্য ঐ দুর্গ দখল করিতে না পারিয়া উৎকোচদানে ভুলুয়ার একজন প্রধান কর্মচারীকে হস্তগত করিল। ফলে অনন্তমাণিক্যের পরাজয় হইল। তিনি আরাকান রাজ্যে পলাইয়া গেলেন। এখন তাঁহার রাজ্য ও সম্পদ সকলই মুঘলের হস্তগত হইল।

অনন্তমাণিক্যের পরাজয়ে মুসা খান নিরাশ হইয়া মুঘলের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। ইসলাম খান মুসা খান ও তাঁহার মিত্রগণের রাজ্য তাঁহাদিগকে জায়গীর রূপে ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু মুঘল সৈন্য এই সকল জায়গীর রক্ষায় নিযুক্ত হইল, জায়গীরদারদের রণতরী মুঘল নৌ-বহরের অংশ হইল এবং সৈন্যদের বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। মুসা খানকে ইসলাম খানের দরবারে নজরবন্দী করিয়া রাখা

হইল। এইরূপে এক বৎসরের (১৬১০-১১) যুদ্ধের ফলে বাংলা দেশে মুঘলের প্রধান শত্রু দূরীভূত হইল।

মূসা খানের সহিত যুদ্ধ শেষ হইবার পরেই ইসলাম খান পাঠান উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। উসমান পদে পদে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও মুঘল বাহিনী তাঁহার রাজধানী বোকাইনগর দখল করিল (নভেম্বর, ১৬১১)। উসমান শ্রীহট্টের পাঠান নায়ক বায়াজিদ কররানীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বিদ্রোহী পাঠান নায়কেরাও মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিল। কিন্তু পাঠান বিদ্রোহী-দের সমূলে ধ্বংস করা আপাতত স্থগিত রাখিয়া ইসলাম খান যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে অগ্রসর হইলেন।

প্রতাপাদিত্য ইসলাম খানকে কথা দিয়াছিলেন যে তিনি সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া মূসা খানের বিরুদ্ধে যোগ দিবেন। কিন্তু তিনি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই। সুতরাং ইসলাম খান তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিলেন। মূসা খান ও অন্যান্য জমিদারদের পরিণাম দেখিয়া প্রতাপাদিত্য ভীত হইলেন এবং ৮০টি রণতরী সহ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য ইসলাম খানের নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু ইসলাম খান ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া উক্ত রণতরীগুলি ধ্বংস করিলেন।

প্রতাপাদিত্য খুব শক্তিশালী রাজা ছিলেন; সুতরাং ইসলাম খান এক বিরাট সৈন্যদলকে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের জামাতা বাকলার রাজা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সময় চিলাজুয়ারের জমিদার অনন্ত ও পীতাম্বর বিদ্রোহ করায় যশোহর-অভিযানে কিছু বিলম্ব ঘটিল। কিন্তু ঐ বিদ্রোহ দমনের পরেই জলপথে ও স্থলপথে মুঘল সৈন্য অগ্রসর হইল। মুঘল নৌবাহিনী পদ্মা, জলঙ্গী ও ইছামতী নদী দিয়া বনগাঁর দশ মাইল দক্ষিণে যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলের নিকট শালকা (বর্তমান টিবি নামক স্থানে পৌঁছিল। এইখানে প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্য একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিয়া তাঁহার সৈন্যের অধিকাংশ, বহু হস্তী, কামান এবং ৫০০ রণতরী সহ অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সহসা মুঘলের রণতরী আক্রমণ করিয়া ইহাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু ইছামতীর দুই তীর হইতে স্থল বাহিনীর গোলা ও বাণ বর্ষণে উদয়াদিত্যের নৌবহর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না এবং ইহার অধ্যক্ষ খ্বাজা কামালের মৃত্যুতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

উদয়াদিত্য শালকার দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। অধিকাংশ রণতরী, গোলাগুলি প্রভৃতি মুঘলের হস্তগত হইল।

ইতিমধ্যে বাকলার বিরুদ্ধে অভিযান শেষ হইয়াছিল। বাকলার অল্পবয়স্ক রাজা রামচন্দ্র মাতার অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুঘল বাহিনীর সহিত সাতদিন পর্যন্ত একটি দুর্গের আশ্রয়ে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মুঘলেরা ঐ দুর্গ অধিকার করিলে রামচন্দ্রের মাতা পুত্রকে বলিলেন মুঘলের সঙ্গে সন্ধি না করিলে তিনি বিষ পান করিবেন। রামচন্দ্র আত্মসমর্পণ করিলেন। ইসলাম খান তাঁহাকে ঢাকায় বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং বাকলা মুঘল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। বাকলার যুদ্ধ শেষ করিয়া মুঘল বাহিনী পূর্বদিক হইতে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল।

এই নূতন বিপদের সম্ভাবনায়ও বিচলিত না হইয়া প্রতাপাদিত্য পুনরায় রাজধানীর পাঁচ মাইল উত্তরে কাগরঘাটায় একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া মুঘল-বাহিনীকে বাধা দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মুঘল সেনানায়কগণ অপূর্ব সাহস ও কৌশলের বলে এই দুর্গটিও দখল করিল। প্রতাপাদিত্য তখন মুঘলের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। স্থির হইল যে মুঘল সেনাপতি গিয়াস খান নিজে তাঁহাকে ইসলাম খানের নিকট লইয়া যাইবেন, এবং যতদিন ইসলাম খান কোন আদেশ না দেন, ততদিন পর্যন্ত মুঘল বাহিনী কাগরঘাটায় এবং উদয়াদিত্য রাজধানী ধূমঘাটে থাকিবেন। ইসলাম খান প্রতাপাদিত্যকে বন্দী এবং তাঁহার রাজ্য দখল করিলেন। প্রবাদ এই যে, প্রতাপাদিত্যকে ঢাকায় একটি লোহার খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং পরে বন্দী অবস্থায় দিল্লী পাঠান হয়, কিন্তু পথিমধ্যে বারাণসীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রতাপাদিত্য যথেষ্ট শক্তি ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন—এবং শেষ অবস্থায় মুঘলদের সহিত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁহাকে যে প্রকার বীর ও স্বাধীনতাপ্রিয় দেশভক্তরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, উল্লিখিত কাহিনী তাহার সমর্থন করে না।

এক মাসের মধ্যেই (ডিসেম্বর, ১৬১১—জানুয়ারী, ১৬১২) যশোহর ও বাকলার যুদ্ধ শেষ হইল। কিন্তু শ্রীপুর, বিক্রমপুর ও ভুলুয়া ছাড়িয়া মুঘল বাহিনী চলিয়া আসায় সুযোগ পাইয়া আরাকানের মগ দস্যুগণ এই সমুদয় অঞ্চল আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিল। ইসলাম খান তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু সৈন্য পৌঁছিবার পূর্বেই তাহারা পলায়ন করিল।

অতঃপর ইসলাম খান পাঠান উসমানের বিরুদ্ধে এক বিপুল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। শ্রীহট্টের অন্তর্গত দৌলম্বাপুরে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে উসমানের অপূর্ব বীরত্ব ও রণকৌশলে মুঘল বাহিনী পরাস্ত হইয়া নিজ শিবিরে প্রস্থান করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উসমান এই যুদ্ধে নিহত হন এবং রাত্রে তাঁহার সৈন্যেরা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে (১২ই মার্চ, ১৬১২)। উসমানের পুত্র ও ভ্রাতাগণ প্রথমে যুদ্ধ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু পাঠান নায়কদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের ফলে তাহা হইল না—তাঁহারা মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ইসলাম খান উসমানের রাজ্য দখল করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রগণকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। শ্রীহট্টের অন্যান্য পাঠান নায়কদের বিরুদ্ধেও ইসলাম খান সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে মুঘল বাহিনীকে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু উসমানের পরাজয় ও মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। শ্রীহট্ট সুবে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হইল এবং প্রধান প্রধান পাঠানদের বন্দী করিয়া রাখা হইল। অতঃপর ইসলাম খান কাছাড়ের রাজা শত্রুদমনের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। শত্রুদমন কিছুদিন যুদ্ধ করার পর বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং মুঘল সম্রাটকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন (১৬১২)।

এইরূপে ইসলাম খান সমগ্র বাংলা দেশে মুঘল শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সমুদয় অভিযানের সময় ইসলাম খান অধিকাংশ সময় ঢাকা নগরীতেই বাস করিতেন, কারণ তিনি নিজে কখনও সৈন্য চালনা অর্থাৎ যুদ্ধ করিতেন না। মানসিংহও প্রায় দুই বৎসর ঢাকায় ছিলেন (১৬০২-৪) এবং ইহাকে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। ইসলাম খান ঢাকায় একটি নূতন দুর্গ ও ভাল ভাল রাস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ওদিকে গঙ্গানদীর স্রোত পরিবর্তনে রাজধানী রাজমহলে আর বড় বড় রণতরী যাইতে পারিত না। আরাকানের মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যও ঢাকা রাজমহল অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী স্থান ছিল। এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া ১৬১২ খ্রীঃর এপ্রিল মাসে ইসলাম খান রাজমহলের পরিবর্তে ঢাকায় সুবে বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সম্রাটের নামানুসারে এই নগরীর নূতন নাম রাখিলেন জাহাঙ্গীরনগর।

বাংলা দেশে মুঘল রাজ্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইসলাম খান অতঃপর কামরূপ রাজ্য জয়ের আয়োজন করিলেন। কামরূপে পূর্বে যে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়, পরে কুচবিহারের হিন্দু রাজা উহা দখল করেন। কুচবিহার

রাজবংশের এক শাখা কামরূপে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহা পশ্চিমে সঙ্কোশ হইতে পূর্বে বরা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ইহার অধিপতি পরীক্ষিৎ নারায়ণের বহু সৈন্য, হস্তী ও রণতরী ছিল। তিনি মুঘলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। ইসলাম খান তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া কামরূপ রাজ্য সুবেবাংলার অন্তর্ভুক্ত করিলেন (১৬১৩)।

ইসলাম খান মুঘলের আশ্রিত কুচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ইহার কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন এবং মুঘলের অধীনস্থ সুসঙ্গের রাজার পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়াছিলেন। এখন সুসঙ্গের রাজার অনুরোধে ইসলাম খান কামরূপ আক্রমণ করিলেন। কুচবিহারের রাজা পরীক্ষিৎনারায়ণ তাঁহাকে সাহায্য করিলেন।

ইহাই ইসলাম খানের শেষ বিজয়। কামরূপ জয়ের অনতিকাল পরেই ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়ালে তাঁহার মৃত্যু হয় (অগস্ট, ১৬১৩)। মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইসলাম খান সমগ্র বাংলা দেশে মুঘল রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুশাসনের প্রবর্তন করিয়া অদ্ভুত দক্ষতা, সাহস ও রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন। আকবরের সময় মুঘলেরা বাংলাদেশ জয় করিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলা জয়ের গৌরব ইসলাম খানেরই প্রাপ্য এবং তিনিই বাংলাদেশের মুঘল সুবাদারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। অবশ্য ইহাও সত্য যে মানসিংহই তাঁহার সাফল্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন।

৫। সুবাদার কাশিম খান ও ইব্রাহিম খান

ইসলাম খানের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশিম খান তাঁহার স্থানে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠের বুদ্ধি ও যোগ্যতার বিন্দুমাত্রও তাঁহার ছিল না। তিনি স্বীয় কর্মচারী ও পরাজিত রাজাদিগের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিতেন। কুচবিহার ও কামরূপের দুই রাজাকে, ইসলাম খান যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা ভঙ্গ করিয়া কাশিম খান তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন। ইহার ফলে উভয় রাজ্যেই বিদ্রোহ উপস্থিত হইল এবং তাহা দমন করিতে কাশিম খানকে বেগ পাইতে হইল। অতঃপর কাশিম খান কাছাড়ের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন। সম্ভবত কাছাড়ের রাজা শত্রুদমন মুঘলের অধীনতা অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কিন্তু সেখান হইতে মুঘল সৈন্য ব্যর্থ হইয়া

ফিরিয়া আসিল—শত্রুদমন বহুদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিলেন। বীরভূমের জমিদারগণও সম্ভবতঃ মুঘলের অধীনতা অস্বীকার করিয়াছিলেন। কাশিম খান তাঁহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্তু বিশেষ কোন ফল লাভ হইল না। আরাকানের মগ রাজা ও সন্দীপের অধিপতি পর্তুগীজ জলদস্যু সিবাষ্টিয়ান গোঞ্জালেস একযোগে আক্রমণ করিয়া ভুলুয়া প্রদেশ বিধ্বস্ত করিলেন (১৬১৩)। পর বৎসর আরাকানরাজ পুনরায় আক্রমণ করিলেন, কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে মুঘলের হস্তে বন্দী হইলেন এবং নিজের সমস্ত লোকজন ও ধনসম্পত্তি মুঘলদের হাতে সমর্পণ করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন।

কাশিম খান আসাম জয় করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা অহোম্‌রাজ কর্তৃক পরাস্ত হইল। চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে প্রেরিত মুঘল বাহিনীও পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল। এইরূপে কাশিম খানের আমলে (১৬১৪-১৭) বাংলায় মুঘল শাসন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল।

পরবর্তী সুবাদার ইব্রাহিম খান ফতেহ্‌ জঙ্গ ত্রিপুরা দেশ জয় করিয়া ত্রিপুরার রাজাকে সপরিবারে বন্দী করেন। এদিকে আরাকানরাজ মেঘনার তীরবর্তী গ্রামগুলি আক্রমণ করেন কিন্তু ইব্রাহিম তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। মোটের উপর ইব্রাহিম খানের আমলে বাংলা দেশে সুখ ও শান্তি বিরাজ করিত এবং মুঘলরাজের শক্তি ও প্রতিপত্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কিন্তু এই সময়ে এক অদ্ভুত ব্যাপারে বাংলা দেশের সুবাদার ইব্রাহিম খান এক জটিল সমস্যায় পড়িলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন এবং পরাজিত হইয়া বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শাহজাহান বাংলার পুরাতন বিদ্রোহী মুসা খানের পুত্র এবং শত্রু আরাকানরাজ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের সহায়তায় বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইব্রাহিম প্রভু-পুত্রের সহিত বিবাদ করিতে প্রথমত ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে শাহজাহান রাজমহল দখল করিলে দুই পক্ষে যুদ্ধ হইল। ইব্রাহিম পরাজিত ও নিহত হইলেন এবং শাহজাহান রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর অধিকার করিয়া স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন (এপ্রিল, ১৬২৪)। তিনি পূর্বেই উড়িষ্যা অধিকার করিয়াছিলেন। এবার তিনি বিহার ও অযোধ্যা অধিকার করিলেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই বাদশাহী ফৌজের হস্তে পরাজিত হইয়া তিনি বাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া

দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলেন (অক্টোবর, ১৬২৪)। ইহার চারি বৎসর পরে পিতার মৃত্যুর পর শাহজাহান সম্রাট হইলেন।

৬। সম্রাট শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের আমলে বাংলা দেশের অবস্থা

সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণ (১৬২৮) হইতে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু (১৭০৭) পর্যন্ত বাংলা দেশে মুঘল শাসন মোটামুটি শান্তিতেই পরিচালিত হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তিনজন সুবাদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (১) শাহজাহানের পুত্র শুজা (১৬৩৯-১৬৫৯), (২) শায়েস্তা খান (১৬৬৪-১৬৮৮) এবং (৩) আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুস্‌সান (১৬৯৮-১৭০৭)। এই যুগে বাংলার কোন স্বতন্ত্র ইতিহাস ছিল না। ইহা মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসেরই অংশে পরিণত হইয়াছিল এবং ইহার শাসনপ্রণালীও মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যান্য সুবার ন্যায় নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হইত।

শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম ভাগে হুগলী বন্দর হইতে পর্তুগীজদিগকে বিতাড়িত করা হয় (১৬৩২)। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হইবে। অহোম্‌দিগের সহিতও পুনরায় যুদ্ধ হয়। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সৈন্য অহোম্ রাজার হস্তে পরাজিত হয়। কামরূপের রাজা পরীক্ষিৎনারায়ণ কাশিম খানের হস্তে বন্দী হওয়ায় যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিনারায়ণ মুঘল-বিজয়ী অহোম্ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার ফলে অহোম্ রাজ ও বাংলার মুঘল সুবাদারের মধ্যে বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলে। বলিনারায়ণ মুঘল সৈন্যদের পরাজিত করিয়া কামরূপের ফৌজদারকে বন্দী করেন। বহুদিন যুদ্ধের পর অবশেষে মুঘলদেরই জয় হইল। মুঘলেরা কামরূপ জয় করিয়া অহোম্ রাজার সহিত সন্ধি করিল (১৬৩৮)। উত্তরে বরা নদী ও দক্ষিণে অসুরালি দুই রাজ্যের সীমানা নির্দিষ্ট হইল।

অতঃপর শুজার সুদীর্ঘ শান্তিপূর্ণ শাসনের ফলে বাংলা দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি হয় (১৬৩৯-৫৯)। কিন্তু সিংহাসন লাভের জন্য ভ্রাতা ঔরঙ্গজেবের সহিত বিবাদের ফলে শুজা খাজুয়ার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন

(জানুয়ারী, ১৬৫৯)। মুঘল সেনাপতি মীরজুমলা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ঢাকা নগরী দখল করেন (মে, ১৬৬০)। শুজা আরাকানে পলাইয়া গেলেন। দুই বৎসর পরে আরাকানরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অভিযোগে তিনি নিহত হইলেন।

অতঃপর মীরজুমলা বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হইলেন (জুন, ১৬৬০)। শুজা যখন ঔরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন সুযোগ বুঝিয়া কুচবিহারের রাজা কামরূপ ও অহোম্‌রাজ গৌহাটি অধিকার করিলেন (মার্চ, ১৬৫৯)। তার পর এই দুই রাজার মধ্যে বিবাদের ফলে অহোম্ রাজ কুচবিহার-রাজকে বিতাড়িত করিয়া কামরূপ অধিকার করেন (মার্চ, ১৬৬০)।

মীরজুমলা সুবাদার নিযুক্ত হইয়াই কুচবিহার ও কামরূপের বিরুদ্ধে এক বিপুল অভিযান প্রেরণ করিলেন (১৬৬১)। কুচবিহাররাজ পলায়ন করায় বিনা যুদ্ধে মীরজুমলা এই রাজ্য অধিকার করিলেন এবং অহোম্‌রাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। অহোম্‌রাজও পলায়ন করিলেন এবং তাঁহার রাজধানী মীরজুমলার হস্তগত হইল (মার্চ, ১৬৬২)। বর্ষা আসিলে সমস্ত দেশ জলে ডুবিয়া যাওয়ায় মুঘল ঘাঁটিগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং খাদ্য সরবরাহেরও কোন উপায় রহিল না। মুঘল শিবির জলে ডুবিয়া গেল, খাদ্যাভাবে বহু অশ্ব মারা গেল, সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিল এবং বহু সৈন্যের মৃত্যু হইল। সুযোগ বুঝিয়া অহোম্ সৈন্য পুনঃপুনঃ মুঘল শিবির আক্রমণ করিল। অবশেষে বর্ষার শেষ হইলে এই দুঃখকষ্টের অবসান হইল। মীরজুমলা সৈন্যসহ অহোম্ রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন অহোম্‌রাজের সহিত সন্ধি করিয়া মুঘল সৈন্য বাংলা দেশে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ঢাকায় পৌঁছিবার পূর্বে মাত্র কয়েক মাইল দূরে তাঁহার মৃত্যু হইল (মার্চ, ১৬৬৩)। এই সমুদয় গোলযোগের মধ্যে কুচবিহারের রাজা তাঁহার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন।

মীরজুমলার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রায় এক বৎসর যাবৎ বাংলা দেশের শাসনকার্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ১৬৬৪ খ্রীঃর মার্চ মাসে শায়েস্তা খান বাংলা দেশের সুবাদার হইয়া আসিলেন। মাঝখানে এক বৎসর বাদ দিয়া মোট ২২ বৎসর তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। শায়েস্তা খান রাজোচিত ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকের সহিত নিরুদ্বেগে জীবন কাটাইতেন এবং সম্রাটকে বহু অর্থ পাঠাইয়া খুসী রাখিতেন। বলা বাহুল্য নানা উপায়ে প্রজার রক্ত শোষণ

করিয়াই এই টাকা আদায় হইত। একচেটিয়া ব্যবসায়ের দ্বারাও অনেক টাকা আয় হইত। সমসাময়িক ইংরেজদের রিপোর্টে শায়েস্তা খানের অর্থগৃধ্নুতার উল্লেখ আছে। তাঁহার সুবাদারীর প্রথম ১৩ বৎসরে তিনি ৩৮ কোটি টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার দৈনিক আয় ছিল দুই লক্ষ টাকা আর ব্যয় ছিল এক লক্ষ টাকা।

বৃদ্ধ শায়েস্তা খান নিজে যুদ্ধে যাইতেন না এবং হারেমে আরামে দিন কাটাইতেন, কিন্তু উপযুক্ত কর্মচারীর সাহায্যে তিনি কঠোর হস্তে ও শৃঙ্খলার সহিত দেশ শাসন করিতেন। তিনি কুচবিহারের বিদ্রোহী রাজাকে তাড়াইয়া পুনরায় ঐ রাজ্য মুঘলের অধীনে আনয়ন করিলেন এবং ছোটখাট বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করিলেন। তাঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা চট্টগ্রাম বিজয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরাকানের রাজা চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন এবং ইহা মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইহারা বাংলা দেশ হইতে বহু লোক বন্দী করিয়া নিত, তাহাদের হাতে ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্য দিয়া বেত চালাইয়া, অনেককে এক সঙ্গে বাঁধিয়া নৌকার পাটাতনের নীচে ফেলিয়া রাখিত —প্রতিদিন উপর হইতে কিছু চাউল তাহাদের আহারের জন্য ফেলিয়া দিত। পর্তুগীজরা ইহাদিগকে নানা বন্দরে বিক্রী করিত—মগেরা তাহাদিগকে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর ন্যায় ব্যবহার করিত। শায়েস্তা খান প্রথমে সন্দীপ অধিকার করিলেন (নভেম্বর, ১৬৬৫)। এই সময় চট্টগ্রামে মগ ও পর্তুগীজদের মধ্যে বিবাদ বাধিল এবং শায়েস্তা খান অর্থ ও আশ্রয় দান করিয়া পর্তুগীজদিগকে হাত করিলেন। প্রধানতঃ তাহাদের সাহায্যেই তিনি চট্টগ্রাম জয় করিলেন (জানুয়ারী, ১৬৬৬)। ঔরঙ্গজেবের আজ্ঞায় চট্টগ্রামের নূতন নামকরণ হইল ইসলামাবাদ এবং এখানে একজন মুঘল ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন। নানা কারণে ইংরেজ বণিকদের সহিত শায়েস্তা খানের বিবাদ হয়। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে তাঁহার সুবাদারী শেষ হয়।

শায়েস্তা খানের নাম বাংলাদেশে এখনও খুব পরিচিত। তাঁহার সময় বাংলা দেশে টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের চাউলের দাম ছিল টাকায় পাঁচ মণ। পূর্ববঙ্গে বহু চাউল উৎপন্ন হয় সুতরাং ঢাকায় চাউল আরও সস্তা হইবার কথা। এই চাউলের দামের কথা স্মরণ রাখিলে শায়েস্তা খানের দৈনিক আয় দুই লক্ষ আর দৈনিক ব্যয় এক লক্ষ টাকার প্রকৃত তাৎপর্য

বোঝা যাইবে। এই এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের পশ্চাতে যে দালান-ইমারত নির্মাণ, জাঁকজমক, দান-দক্ষিণা, আশ্রিত-পোষণ প্রভৃতি ছিল তাহাই সম্ভবত শায়েস্তা খানের লোকপ্রিয়তার কারণ।

শায়েস্তা খানের পর ঔরঙ্গজেবের ধাত্রীপুত্র অপদার্থ খান-ই-জহান বাহাদুর বাংলার সুবাদার হইলেন। এক বৎসর পরেই এই অপদার্থকে পদচ্যুত করা হইল। কিন্তু তিনি যাওয়ার সময় দুই কোটি টাকা লইয়া গেলেন। তাঁহার পর আসিলেন ইব্রাহিম খান। ইহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ঘাটালের চন্দ্রকোণা বিভাগের একজন সাধারণ জমিদার শোভাসিংহের বিদ্রোহ। রাজা কৃষ্ণরাম নামে একজন পাঞ্জাবী বর্ধমান জিলার রাজস্ব আদায়ের ইজারা লইয়াছিলেন। শোভা সিংহ পার্শ্ববর্তী স্থানে লুঠতরাজ আরম্ভ করিলে কৃষ্ণরাম তাঁহাকে বাধা দিতে গিয়া নিহত হন (জানুয়ারী, ১৬৯৬) এবং শোভারাম বর্ধমান দখল করেন। এইরূপে অর্থসংগ্রহ করিয়া শোভাসিংহ অনুচরের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং রাজা উপাধি ধারণ করেন। উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খান তাঁহার সহিত যোগদান করায় তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরে হুগলীর উত্তর ও দক্ষিণে ১৮০ মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ড তাঁহার হস্তগত হয়। সুবাদার ইব্রাহিম খান এই বিদ্রোহের ব্যাপারে কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া পশ্চিম বাংলার ফৌজদারকে বিদ্রোহ দমন করিতে আদেশ দিলেন। উক্ত ফৌজদার প্রথমে হুগলী দুর্গে আশ্রয় লইলেন, পরে বেগতিক দেখিয়া এক রাত্রে পলায়ন করিলেন। শোভাসিংহের সৈন্য হুগলীতে প্রবেশ করিয়া শহর লুঠ করিল। ওলন্দাজ বণিকেরা পলায়মান ফৌজদার ও হুগলীর লোকদের কাতর প্রার্থনায় একদল সৈন্য পাঠাইলে শোভাসিংহ হুগলী ত্যাগ করিয়া বর্ধমানে গেলেন। তিনি রাজা কৃষ্ণরামের কন্যার উপর বলাৎকার করিতে উদ্যত হইলে এই তেজস্বিনী নারী প্রথমে ছুরিকা দ্বারা শোভাসিংহকে হত্যা করেন—তারপর নিজের বুকে ছুরি বসাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। শোভাসিংহের পর তাঁহার ভ্রাতা হিম্মৎসিংহ দলের কর্তা হইলেন; কিন্তু সৈন্যেরা রহিম খানকেই নায়ক মনোনীত করিল। রহিম খান রহিম শাহ নাম ধারণ করিয়া নিজেকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। চারিদিক হইতে নানা শ্রেণীর লোক দলে দলে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিল এবং ক্রমে তিনি দশ সহস্র ঘোড়সওয়ার ও ৬০,০০০ পদাতিক সংগ্রহ করিয়া নদীয়ার মধ্য দিয়া মখসুদাবাদ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ)

অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে একজন জায়গীরদার ও পাঁচ হাজার মুঘল সৈন্যকে পরাজিত করিয়া তিনি মখ্‌সুদাবাদ লুণ্ঠন করিলেন এবং রাজমহল ও মালদহ অধিকার করিলেন। তাঁহার অনুচরেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া চারিদিকে লুঠপাট করিয়া ফিরিতে লাগিল (১৬৯৬-৯৭)।

এই সংবাদ পাইয়া ঔরঙ্গজেব ইব্রাহিম খানকে পদচ্যুত করিয়া পরবর্তীকালে আজিমুস্‌সান নামে পরিচিত নিজের পৌত্র আজিমুদ্দীনকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করিলেন এবং রহিম খানের পুত্র জবরদস্ত খানকে অবিলম্বে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। জবরদস্ত খান বিদ্রোহী রহিম শাহকে পরাজিত করিয়া রাজমহল, মালদহ, মখ্‌সুদাবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি স্থান অধিকার করিলেন। রহিম শাহ পলাইয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন।

আজিমুস্‌সান বাংলাদেশে পৌঁছিয়া জবরদস্ত খানের কৃতিত্বের সম্মান করা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইলেন। ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া জবরদস্ত খান বাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ফলে রহিম শাহ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আবার লুঠপাট আরম্ভ করিলেন এবং বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হইয়া সন্ধির প্রস্তাব আলোচনার ছলে সুবাদারের প্রধান মন্ত্রীকে হত্যা করিলেন। তখন আজিমুস্‌সান তাঁহার বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী পাঠাইলেন। এই বাহিনীর সহিত যুদ্ধে রহিম শাহ পরাজিত ও নিহত হইলেন। বিদ্রোহীদের দল ভাঙ্গিয়া গেল (আগষ্ট, ১৬৯৮)।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ ভাগে বাংলা (ও অন্যান্য) সুবার শাসনপ্রণালীর কিরূপ অবনতি হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য শোভাসিংহের বিদ্রোহ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইল। আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্রোহের সময় কলিকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়ার ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকেরা সুবাদারের অনুমতি লইয়া নিজেদের বাণিজ্য-কুঠিগুলি দুর্গের ন্যায় সুরক্ষিত করিল এবং এই সমস্ত স্থানই এই ঘোর দুর্দিনে বাঙ্গালীর একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল। বাংলার ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ইহার প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছিল।

আজিমুস্‌সান ১৬৯৭ হইতে ১৭১২ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন। শেষ দশ বৎসর তিনি বিহারেরও সুবাদার ছিলেন এবং ১৭০৪ খ্রীঃ হইতে পাটনায় বাস করিতেন। তিনি জানিতেন যে বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যু হইলেই সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ বাধিবে এবং এই জন্যই তিনি নানা অবৈধ উপায়ে এবং অনেক সময় প্রজাদের

উৎপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু দিওয়ান মুর্শিদ কুলী খান খুব দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মচারী ছিলেন। তিনি আজিমুস্সানের অবৈধ অর্থসংগ্রহের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আজিমুস্সান মুর্শিদ কুলী খানকে হত্যা করিবার জন্ত ষড়যন্ত্র করিলেন। ইহা ব্যর্থ হইল, কিন্তু মুর্শিদ কুলী খান সমস্ত ব্যাপার সম্রাটকে জানাইয়া অবিলম্বে দিওয়ানী বিভাগ মথ্সুদাবাদে সরাইয়া নিলেন। বহু বৎসর পরে সম্রাটের অনুমতিক্রমে মুর্শিদ কুলীর নাম অনুসারে এই নগরীর নাম হয় মুর্শিদাবাদ।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ সম্রাট হইলেন (১৭০৭ খ্রীঃ)। পুত্র আজিমুস্সানের প্ররোচনায় সম্রাট মুর্শিদ কুলী খানকে দাক্ষিণাত্যের দিওয়ান করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু বাংলার নূতন দিওয়ান বিদ্রোহী সেনার হস্তে নিহত হওয়ায় মুর্শিদকুলী খান পুনরায় বাংলার দিওয়ান নিযুক্ত হইলেন (১৭১০ খ্রীঃ)।

নবম পরিচ্ছেদ

নবাবী আমল

১। মুর্শিদকুলী খান

১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খান বাংলার সুবাদার বা নবাব নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে দিল্লীর অকর্মণ্য সম্রাটগণের দুর্বলতায় ও আত্মকলহে মুঘল সাম্রাজ্য চরম দুর্দশায় পৌছিয়াছিল। সুতরাং এখন হইতে বাংলার সুবাদারেরা প্রায় স্বাধীন ভাবেই কার্য করিতে লাগিলেন এবং বংশানুক্রমে সুবাদার বা নবাবের পদ অধিকার করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে বাংলায় নবাবী আমল আরম্ভ হইল। কিন্তু বাংলা হইতে দিল্লী দরবারে রাজস্ব পাঠান হইত এবং বাদশাহী সনদের বলেই সুবাদারী-পদে নূতন নিয়োগ হইত।

মুর্শিদকুলী খান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বাল্যকালে একজন মুসলমান তাঁহাকে ক্রয় করিয়া পুত্রবৎ পালন করেন এবং পারস্য দেশে লইয়া যান। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া মুর্শিদকুলী খান বহু উচ্চ পদ অধিকার করেন এবং অবশেষে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। মুর্শিদকুলী বহুকাল সুযোগ্যতার সহিত দিওয়ানী কার্য করিয়াছিলেন, সুতরাং সুবাদার হইয়াও রাজস্ব-বিভাগের দিকে তিনি খুব বেশী ঝোঁক দিতেন। পরে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে। তাঁহার সময়ে দেশে শান্তি বিরাজ করিত এবং ছোটখাট বিদ্রোহ সহজেই দমিত হইত। এইরূপ ঘটনার মধ্যে সীতারাম রায়ের সহিত যুদ্ধই প্রধান। ইহাও পরে আলোচিত হইবে। মুর্শিদকুলী খানের শাসনকালে আর কোনও উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে নাই।

২। শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান

মুর্শিদ কুলী খানের কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান মুর্শিদকুলীর দৌহিত্র ও মনোনীত উত্তরাধিকারী সরফরাজ খানকে না মানিয়া নিজেই বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদারের পদে অধিষ্ঠিত

হইলেন (জুন, ১৭২৭)। হাজী আহ্‌মদ এবং আলীবর্দী নামক দুই ভ্রাতা, রাজস্ব-বিভাগের বিচক্ষণ কর্মচারী আলমচাঁদ এবং বিখ্যাত ধনী জগৎশেঠ ফতেচাঁদ তাঁহার সভায় খুব প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

শুজাউদ্দীনের অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তিনি বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়ায় ক্রমে রাজকার্য বিশেষ কিছু দেখিতেন না এবং উপরোক্ত চারিজনের উপরই নির্ভর করিতেন। দিল্লীর বাদশাহও প্রাদেশিক ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতেন না। সুতরাং নবাবের অনুগ্রহভাজন 'বিশ্বস্ত' কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থ সাধন করার প্রচুর সুযোগ পাইলেন এবং ইহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিলেন। নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইহারা নবাবের সহিত তাহার পুত্রদ্বয়ের কলহ ঘটাইতেন।

১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিহার প্রদেশ বাংলা সুবার সহিত যুক্ত হইল। তখন শুজাউদ্দীন বাংলাকে দুই ভাগ করিয়া পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বাংলার কতক অংশের শাসনভার নিজের হাতে রাখিলেন ; পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর বাংলার অবশিষ্ট অংশের জন্য ঢাকায় একজন এবং বিহার ও উড়িষ্যা শাসনের জন্য আরও দুইজন নায়েব নাজিম নিযুক্ত হইলেন। আলীবর্দী খান বিহারের প্রথম নায়েব নাজিম হইলেন। মীর হবীর নামে ঢাকার নায়েব নাজিমের একজন দক্ষ কর্মচারী ত্রিপুরার রাজপরিবারের অন্তর্কলহের সুযোগ লইয়া সহসা ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া রাজধানী চণ্ডীগড় ও রাজ্যের অন্যান্য অংশ দখল ও বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনিলেন। বীরভূমের আফগান জমিদার বদিউজ্জমান বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। শুজাউদ্দীনের শাসনকালে ঢাকায় চাউলের দর আবার টাকায় আট মণ হইয়াছিল।

৩। সরফরাজ খান

শুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খান বাংলার নবাব হইলেন (মার্চ, ১৭৩৯)। সরফরাজ একেবারে অপদার্থ এবং নবাবী পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন এবং অধিকাংশ সময়ই হারেমে কাটাইতেন। সুতরাং শাসন কার্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল এবং নানা প্রকার ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইল। হাজী আহমদ ও আলীবর্দী খান এই সুযোগে বাংলাদেশে প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হাজী আহমদ মুর্শিদাবাদ দরবারে নবাবের বিশ্বস্ত কর্মচারীরূপে তাঁহাকে

স্তোকবাক্যে তুষ্ট রাখিলেন—ওদিকে আলীবর্দী খান পাটনা হইতে সসৈন্যে বাংলার দিকে যাত্রা করিলেন (মার্চ, ১৭৪০)। হাজী আহমদ মিথ্যা আশ্বাসে নবাবকে ভুলাইয়া অবশেষে সপরিবারে আলীবর্দীর সঙ্গে যোগ দিলেন।

সরফরাজ খান সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া বর্তমান সুতীর নিকটে গিরিয়াতে পেঁাছিলেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল গিরিয়াতে দুই পক্ষের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলেন। দুই তিন দিন পরে আলীবর্দী মুর্শিদাবাদ অধিকার করিলেন। তিনি মৃত নবাবের পরিবারবর্গের প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করিলেন এবং তাঁহারা যাহাতে যথোচিত মর্যাদার সহিত জীবন যাপন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। আলীবর্দী তাঁহার উপকারী প্রভুর পুত্রকে হত্যা করিয়া মহাপাপ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তিনিও তাহা স্বীকার করিয়া সরফরাজের আত্মীয় স্বজনের নিকট দুঃখ ও অনুতাপ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার দুষ্কর্মের জন্য তাঁহার প্রতি জনসাধারণের বিরাগ ও অশ্রদ্ধা দূর করিতে তিনি সকলের সহিত সদয় ব্যবহার ও অনেককে অর্থ দিয়া তুষ্ট করিলেন। দিল্লীর বাদশাহ এবং তাঁহার প্রধান সভাসদগণকে প্রচুর উৎকোচ প্রদান করিয়া তিনি সুবাদারী পদের বাদশাহী সনদ পাইলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের যে কতদূর অবনতি ঘটিয়াছিল ইহা হইতেই তাহা বুঝা যায়।

৪। আলিবর্দী খান

আলীবর্দী খানও সুখে বা শান্তিতে বাংলার নবাবী করিতে পারেন নাই। নবাব শুজাউদ্দীনের জামাতা রুস্তম জং উড়িষ্যার নায়েব নাজিম ছিলেন—তিনি সসৈন্যে কটক হইতে বাংলা দেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন (ডিসেম্বর, ১৭৪০)। আলীবর্দী নিজে তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া বালেশ্বরের অনতিদূরে ফলওয়ারির যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিলেন (মার্চ, ১৭৪১)। আলীবর্দী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম নিযুক্ত করিয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিলেন। কিন্তু এই নূতন নায়েব নাজিমের অযোগ্যতা ও দুর্ব্যবহারে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হওয়ায় রুস্তম জং একদল মারাঠা সৈন্যের সাহায্যে পুনরায় উড়িষ্যা দখল করিলেন। নূতন নায়েব নাজিম সপরিবারে বন্দী হইলেন (আগষ্ট, ১৭৪১)। আলিবর্দী আবার উড়িষ্যায় গিয়া রুস্তম জংয়ের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিলেন (ডিসেম্বর, ১৭৪১)।

মুর্শিদাবাদ ফিরিবার পথে আলিবর্দী সংবাদ পাইলেন যে নাগপুর হইতে ভোঁসলা-রাজের মারাঠা সৈন্য বাংলা দেশের অভিমুখে আসিতেছে।

মারাঠা সৈন্য পাঁচেতের মধ্য দিয়া বর্ধমান জিলায় পৌছিয়া লুঠপাট আরম্ভ করিল। নবাব দ্রুতগতিতে বর্ধমানে পৌছিলেন (এপ্রিল, ১৭৪২), কিন্তু অসংখ্য মারাঠা সৈন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাঁহার সঙ্গে ছিল মাত্র তিন হাজার অশ্বারোহী ও এক হাজার পদাতিক—বাকী সৈন্য পূর্বেই মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া গিয়াছিল। আলীবর্দী বর্ধমানে অবরুদ্ধ হইয়া রহিলেন এবং মারাঠারা তাঁহার রসদ সরবরাহ বন্ধ করিয়া ফেলিল। অবশেষে কোন মতে মারাঠা ব্যূহ ভেদ করিয়া বহু কষ্টে তিনি কাটোয়ায় পৌছিলেন। মারাঠা বাহিনীর নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু পরাজিত ও বিতাড়িত রুস্তম জংয়ের বিচক্ষণ নায়েব মীর হবীরের পরামর্শে ও সাহায্যে পুনরায় যুদ্ধ চালাইলেন। একদল মারাঠা নবাবের পশ্চাদ্ধাবন করিল—বাকী মারাঠারা চতুর্দিকে গ্রাম জ্বালাইয়া ধন-সম্পত্তি লুঠ করিয়া ফিরিতে লাগিল। মীর হবীরের সহায়তায় মারাঠা নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত এক রাত্রির মধ্যে ৭০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ ৪০ মাইল পার হইয়া মুর্শিদাবাদ শহর আক্রমণ করিয়া সারাদিন লুঠ করিলেন—পরদিন সকালে (৭ মে, ১৭৪২) আলীবর্দী মুর্শিদাবাদে পৌছিলে, মারাঠা সৈন্য কাটোয়া অধিকার করিল এবং ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড মারাঠাদের শাসনাধীন হইল। এই অঞ্চলে মারাঠারা অকথ্য অত্যাচার করিতে লাগিল। ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্প লোপ পাইল। লোকেরা ধন, প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য দলে দলে ভাগীরথীর পূর্ব দিকে পলাইতে লাগিল। সমসাময়িক ইংরেজ ও বাঙ্গালী লেখকেরা এই বীভৎস অত্যাচারের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা চিরদিন মারাঠা জাতির ইতিহাসে কলঙ্কের বিষয় হইয়া থাকিবে। বাঙালীরা মারাঠা সৈন্যদিগকে 'বর্গী' বলিত। বাংলা দেশে মারাঠা সৈন্যদের মধ্যে এক শ্রেণীর নাম ছিল শিলাদার। ইহারা নিজেদের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিত। নিম্ন-শ্রেণীর যে সমুদয় সৈন্যদের অশ্ব ও অস্ত্র মারাঠা সরকার- দিতেন তাহাদের নাম ছিল বার্গীর! 'বর্গী' এই 'বার্গীরে'রই অপভ্রংশ। বর্গীদের অত্যাচার সম্বন্ধে সমসাময়িক গঙ্গারাম কর্তৃক রচিত মহারাষ্ট্র পুরাণ হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :

"ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল।
বরগির ভয়ে (তারা) সব পলাইল॥

চারদিকে লোক পলায় ঠাঁই ঠাঁই।
ছত্রিশ বর্ণের লোক পলায় তার অন্ত নাই ॥
এই মতে সব লোক পলাইয়া যাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিল আইসা তাথে ॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোণা রূপা লুটে নেয় আর সব ছাড়া ॥
কারও হাত কাটে কারও কাটে নাক কান।
একই চোটে কারও বধয়ে পরাণ ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক যত ধইরা লইয়া যায়।
আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বান্ধি দেয় তার গলায় ॥
একজনা ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমণের ভরে (তারা) ত্রাহি শব্দ করে ॥
এই মতে বরগি কত পাপ কর্ম্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোকে যত দেয় সব ছাইড়া ॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধায়।
বড় বড় ঘরে আইসা আগুন লাগায় ॥
বাঙ্গালা চৌয়ারি যত বিষ্ণু মণ্ডপ।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব ॥
এইমতে যত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দ্দিকে বরগি বেড়ায় লুটিয়া ॥
কাউকে বাঁধে বরগি দিয়া পিঠ মোড়া।
চিৎ কইরা মারে লাথি পায়ে জুতা চড়া ॥
রূপি দেহ রূপি দেহ বলে বারে বারে।
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে ॥
কাউকে ধরিয়া বরগী পখইরে (পুকুরে) ডুবায়।
ফাফর হইয়া তবে কারু প্রাণ যায় ॥"

—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, সন ১৩১৩, ২২৩-২৪ পৃষ্ঠা (কয়েকটি শব্দের বানান ঈষৎ পরিবর্তিত করা হইয়াছে।)

আলীবর্দী নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বর্ষাকালে পাটনা ও পূর্ণিয়া হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বর্ষাশেষে তিনি কাটোয়া আক্রমণ করিলেন। মারাঠারা লুঠ-পাটের টাকায় খুব ধুমধামের সহিত দুর্গা পূজা করিতেছিল—কিন্তু সারারাত্রি চলিয়া ঘোরাপথে আসিয়া আলীবর্দীর সৈন্য সহসা নবমী পূজার দিন সকালবেলা নিদ্রিত মারাঠা সৈন্যকে আক্রমণ করিল। মারাঠারা বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল। ভাস্কর পণ্ডিত পলাতক মারাঠা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চল লুঠিতে লাগিলেন এবং কটক অধিকার করিলেন। আলীবর্দী সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া কটক পুনরধিকার করিলেন এবং মারাঠারা চিল্‌কা হ্রদের দক্ষিণে পলাইয়া গেল। (ডিসেম্বর, ১৭৪২)।

ইতিমধ্যে দিল্লীর বাদশাহ মারাঠরাজ সাহুকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় চৌথ আদায় করিবার অধিকার দিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং সাহু নাগপুরের মারাঠারাজ রঘুজী ভোঁসলাকে ঐ অধিকার দান করিয়াছিলেন। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহ এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পেশোয়া বালাজী রাওর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বালাজী ও রঘুজীর মধ্যে বিষম শত্রুতা ছিল। সুতরাং বালাজী অভয় দিলেন যে ভোঁসলার মারাঠা সৈন্যদের তিনি বাংলা দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন (নভেম্বর, ১৭৪২)।

১৭৪৩ খ্রীঃর প্রথম ভাগে রঘুজী ভোঁসলা ভাস্কর পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া বাংলা দেশ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং মার্চ মাসে কাটোয়ায় পৌঁছিলেন। ওদিকে পেশোয়া বালাজী রাও বিহারের মধ্য দিয়া বাংলা দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। সারা পথ তাঁহার সৈন্যেরা লুঠপাঠ ও ঘর-বাড়ী-গ্রাম জ্বালাইতে লাগিল—যাঁহারা পেশোয়াকে টাকা-পয়সা বা মূল্যবান উপঢৌকন দিয়া খুসী করিতে পারিল, তাহারাই রক্ষা পাইল।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বহরমপুরের দশ মাইল দক্ষিণে নবাব আলীবর্দী ও পেশোয়া বালাজী রাওয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হইল (৩০ মার্চ, ১৭৪৩)। স্থির হইল যে বাংলার নবাব মারাঠারাজ সাহুকে চৌথ দিবেন এবং বালাজী রাওকে তাঁহার সামরিক অভিযানের ব্যয় বাবদ ২২ লক্ষ টাকা দিবেন। পেশোয়া কথা দিলেন যে ভোঁসলার অত্যাচার হইতে বাংলা দেশকে তিনি রক্ষা করিবেন।

রঘুজী ভোঁসলা এই সংবাদ পাইয়া কাটোয়া পরিত্যাগ করিয়া বীরভূমে গেলেন। বালাজী রাও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং রঘুজীকে বাংলা

দেশের সীমার বাহিরে তাড়াইয়া দিলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার বণিকগণ ২৫,০০০ টাকা চাঁদা তুলিয়া কলিকাতা রক্ষার জন্য 'মারাঠা ডিচ' নামে খ্যাত পয়ঃপ্রণালী কাটাইয়াছিলেন। ১৭৪৩ খ্রীঃর জুন মাস হইতে পরবর্তী ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বাংলা দেশ মারাঠা উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইল।

ইতিমধ্যে মারাঠা রাজ সাহু ভোঁসলা ও পেশোয়াকে ডাকাইয়া উভয়ের মধ্যে গোলমাল মিটাইয়া দিলেন (৩১ আগষ্ট, ১৭৪৩)। বাংলার চৌথ আদায়ের বাঁটোয়ারা হইল। বিহারের পশ্চিম ভাগ পড়িল পেশোয়ার ভাগে, আর বাংলা, উড়িষ্যা ও বিহারের পূর্বভাগ পড়িল ভোঁসলার ভাগে। স্থির হইল যে, উভয়ে নিজেদের অংশে যথেচ্ছ লুঠতরাজ করিতে পারিবেন। একজন অপরজনকে বাধা দিতে পারিবেন না।

এই বন্দোবস্তের ফলে ভাস্কর পণ্ডিত পুনরায় মেদিনীপুরে প্রবেশ করিলেন (মার্চ, ১৮৪৪)। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া আলীবর্দী প্রমাদ গণিলেন। বালাজী রাওকে যে উদ্দেশ্যে তিনি টাকা দিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল এবং আবার মারাঠাদের অত্যাচার আরম্ভ হইল। এদিকে তাঁহার রাজকোষ শূন্য; পুনঃ পুনঃ বর্গীর আক্রমণে দেশ বিধ্বস্ত এবং সৈন্যদল অবসাদগ্রস্ত তখন নবাব আলীবর্দী 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' এই নীতি অবলম্বন করিলেন। তিনি চৌথ সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিবার জন্য ভাস্কর পণ্ডিতকে তাঁহার শিবিরে আমন্ত্রণ করিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের তাঁবুতে পৌঁছিলে তাঁহার ২১ জন সেনানায়ক ও অনুচর সহ তাঁহাকে হত্যা করা হইল (৩১ মার্চ, ১৭৪৪)। অমনি মারাঠা সৈন্য বাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

নবাব আলীবর্দীর অধীনে ৯০০০ অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক আফগান সৈন্য ছিল। এই সৈন্যদলের অধ্যক্ষ গোলাম মুস্তাফা খান নবাবের অনুগত ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শে ও সাহায্যে ভাস্কর পণ্ডিতকে নবাবের তাঁবুতে আনা সম্ভবপর হইয়াছিল। ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইতস্তত করিলে মুস্তাফা কোরানের শপথ করিয়া তাঁহাকে অভয় দেন এবং সঙ্গে করিয়া নবাবের তাঁবুতে আনিয়া হত্যা করেন। নবাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে মুস্তাফা ভাস্কর পণ্ডিত ও মারাঠা সেনানায়কদের হত্যা করিতে পারিলে তাঁহাকে বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিবেন। নবাব এই প্রতিশ্রুতি পালন না করায় মুস্তাফা বিহারে বিদ্রোহ করেন (ফেব্রুয়ারী, ১৭৪৫) এবং রঘুজী

ভোঁসলাকে বাংলা দেশ আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করেন। মুস্তাফা পাটনার নিকট পরাজিত হন কিন্তু রঘুজী বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসর হন।

বর্ধমানে রাজকোষের সাত লক্ষ টাকা লুঠ করিয়া রঘুজী বীরভূমে বর্ষাকাল যাপন করেন এবং সেপ্টেম্বর মাসে বিহারে গিয়া বিদ্রোহী মুস্তাফার সঙ্গে যোগ দেন। নবাবের সৈন্য যখন বিহারে তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন, তখন উড়িষ্যার ভূতপূর্ব নায়েব মীর হবীবের সহযোগে মারাঠা সৈন্য মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে (২১ ডিসেম্বর, ১৭৪৫)। আলীবর্দী বহু কষ্টে দ্রুতগতিতে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলে রঘুজী কাটোয়ায় প্রস্থান করেন ও আলীবর্দীর হস্তে পরাজিত হন। পরে তিনি নাগপুরে ফিরিয়া যান কিন্তু মীর হবীর মারাঠা সৈন্যসহ কাটোয়াতে অবস্থান করেন। পরে আলীবর্দী তাঁহাকেও পরাজিত করেন (এপ্রিল, ১৭৪৬)। এই সব গোলমালের সময় আলীবর্দীর আরও দুইজন আফগান সেনানায়ক মারাঠাদের সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করায় নবাব তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া বাংলা দেশের সীমানার বাহিরে বিতাড়িত করেন।

বিতাড়িত আফগান সৈন্যের পরিবর্তে নূতন সৈন্য নিযুক্ত করিয়া আলীবর্দী উড়িষ্যা পুনরধিকার করিবার জন্য সেনাপতি মীর জাফরকে প্রেরণ করেন। মীর জাফর মীর হবীরের এক সেনা নায়ককে মেদিনীপুরের নিকট পরাজিত করেন (ডিসেম্বর, ১৭৪৬)। কিন্তু বালেশ্বর হইতে মীর হবীব একদল মারাঠা সৈন্য সহ অগ্রসর হইলে মীর জাফর বর্ধমানে পলাইয়া যান। অতঃপর মীর জাফর ও রাজ-মহলের ফৌজদার নবাব আলীবর্দীকে গোপনে হত্যা করিবার চক্রান্ত করেন এবং নবাব উভয়কেই পদচ্যুত করেন। তারপর ৭১ বৎসরের বৃদ্ধ নবাব স্বয়ং অগ্রসর হইয়া মারাঠা সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিলেন এবং বর্ধমান জিলা মারাঠাদের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন (মার্চ, ১৭৪৭)। কিন্তু উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর মারাঠাদের হস্তেই রহিল।

১৭৪৮ খ্রীঃর আরম্ভে আফগান অধিপতি আহমদ শাহ দুররাণী পঞ্জাব আক্রমণ করেন। এই সুযোগে আলিবর্দীর পদচ্যুত ও বিদ্রোহী আফগান সৈন্যদল তাহাদের বাসস্থান দ্বারভাঙ্গা জিলা হইতে অগ্রসর হইয়া পাটনা অধিকার করে। আলীবর্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহমদের পুত্র জৈনুদ্দীন আহমদ (ইনি আলীবর্দীর জামাতাও) বিহারের নায়েব নাজিম ছিলেন। বিদ্রোহী আফগানেরা জৈনুদ্দীন ও হাজী আহম্মদ উভয়কেই বধ করে এবং আলীবর্দীর কন্যাকে বন্দী করে। দলে দলে

আফগান সৈন্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। উড়িষ্যা হইতে মীর হবীবের অধীনে একদল মারাঠা সৈন্যও পাটনার দিকে অগ্রসর হয়। আলীবর্দী অগ্রসর হইয়া ভাগলপুরের নিকটে মীর হবীবকে এবং পাটনার ২৬ মাইল পূর্বে গঙ্গার তীরবর্তী কালাদিয়ারা নামক স্থানে আফগানদের ও তাহাদের সাহায্যকারী মারাঠা সৈন্যদের পরাজিত করিয়া পাটনা অধিকার করেন এবং বন্দিনী কন্যাকে মুক্ত করেন (এপ্রিল, ১৭৪৮)।

১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে আলীবর্দী উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং এক প্রকার বিনা বাধায় তাহা পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি ফিরিয়া আসিলেই মীর হবীবের মারাঠা সৈন্যরা পুনরায় উহা অধিকার করে।

অতঃপর উড়িষ্যা হইতে মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য আলীবর্দী স্থায়িভাবে মেদিনীপুরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন (অক্টোবর, ১৭৪৯)। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মীর হবীব পরবর্তী ফেব্রুয়ারী মাসে আবার বাংলাদেশে লুঠপাট আরম্ভ করিলেন এবং রাজধানী মুর্শিদাবাদের নিকটে পৌঁছিলেন। নবাব সেদিকে অগ্রসর হইলেই মীর হবীব পলাইয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন—আলীবর্দী মেদিনীপুরে ফিরিয়া গেলেন (এপ্রিল, ১৭৫০) এবং সেখানে স্থায়িভাবে বসবাসের বন্দোবস্ত করিলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে মৃত জৈনুদ্দীনের পুত্র এবং নবাবের দৌহিত্র সিরাজ-উদ্দৌল্লা পাটনা দখল করিবার জন্য সেখানে পৌঁছিয়াছেন। আলীবর্দী পাটনায় ছুটিয়া গেলেন, এবং গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিলেন। কিন্তু মারাঠা আক্রমণের ভয়ে—সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্বেই আবার তাঁহাকে কাটোয়া যাইতে হইল (ফেব্রুয়ারী, ১৭৫১)।

বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মুর্শিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করার পর হইতেই উড়িষ্যার আধিপত্য লইয়া ভূতপূর্ব নবাবের জামাতা রুস্তম জঙ্গের সহিত আলীবর্দীর সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। মারাঠা আক্রমণকে তাহার অবান্তর ফল বলা যাইতে পারে, কারণ রুস্তম জঙ্গের নায়েব মীর হবীবের সাহায্য ও সহযোগিতার ফলেই তাহারা নির্বিঘ্নে মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া বাংলা দেশে আসিত। সুতরাং বিগত দশ বৎসর যাবৎ আলীবর্দীকে মীর হবীব ও মারাঠাদের সঙ্গে যে অবিশ্রাম যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা তাঁহার পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত বলা যাইতে পারে। অবশ্য আলীবর্দী যে অপূর্ব সাহস, অধ্যবসায় ও রণকৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সর্বথা প্রশংসনীয়। কিন্তু ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ আর যুদ্ধ চালাইতে পারিলেন না।

মারাঠারাও রণক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি শর্তে এক সন্ধি হইল।

১। মীর হবীব আলীবর্দীর অধীনে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম হইবেন—কিন্তু এই প্রদেশের উদ্বৃত্ত রাজস্ব মারাঠা সৈন্যের ব্যয় বাবদ রঘুজী ভোঁসলে পাইবেন।

২। ইহা ছাড়া চৌথ বাবদ বাংলার রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর ১২ লক্ষ টাকা রঘুজীকে দিতে হইবে।

৩। মারাঠা সৈন্য কখনও সুবর্ণরেখা নদী পার হইয়া বাংলা দেশে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

সন্ধি হইবার এক বৎসর পরেই জনোজী ভোঁসলের মারাঠা সৈন্যরা মীর হবীবকে বধ করিয়া রঘুজীর এক সভাসদকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম পদে বসাইল (২৪শে আগষ্ট, ১৭৫২)। সুতরাং উড়িষ্যা মারাঠা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

বাংলা দেশে আবার শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহী হইতে স্বাধীনতার প্রথম ফলস্বরূপ বিগত দশ বারো বৎসরের যুদ্ধ বিগ্রহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে বাংলার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। আলীবর্দী শাসন-সংক্রান্ত অনেক ব্যবস্থা করিয়াও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তারপর ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার এক দৌহিত্র ও পর বৎসর তাঁহার দুই জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু হইল। আশী বৎসরের বৃদ্ধ নবাব এই সকল শোকে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হইল।

৫। বাংলায় ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পর্তুগীজদেশীয় ভাস্কো-দা-গামা আফ্রিকার পশ্চিম ও পূর্ব উপকূল ঘুরিয়া বরাবর সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কার করেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই পর্তুগীজ বণিকগণ বাংলাদেশের সহিত বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা চট্টগ্রামে ও সপ্তগ্রামে বাণিজ্য কুঠি তৈয়ারী করিবার অনুমতি পায়। ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর ভাগীরথী-তীরে হুগলী নামক একটি নগণ্য গ্রামে পর্তুগীজদিগকে কুঠি তৈয়ারী করিবার অনুমতি দেন এবং ইহাই ক্রমে একটি সমৃদ্ধ সহর ও বাংলায়

পর্তুগীজদের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া বাংলায় হিজলী, শ্রীপুর, ঢাকা, যশোহর, বরিশাল ও নোয়াখালি জিলার বহুস্থানে পর্তুগীজদের বাণিজ্য চলিত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে চট্টগ্রাম ও ডিয়াঙ্গা এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে সন্দ্বীপ, দক্ষিণ শাহবাজপুর প্রভৃতি স্থান পর্তুগীজদের অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু বাংলায় পর্তুগীজ প্রভাব বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কারণ পর্তুগীজদের বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইটি জিনিষ বাংলায় আমদানী হয়—খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারক এবং জলদস্যু। এই উভয়ই বাঙ্গালীর আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। আরাকানের রাজা ডিয়াঙ্গা পর্তুগীজদের হত্যা করিয়া সন্দ্বীপ অধিকার করেন। পর্তুগীজদের আগ্নেয় অস্ত্র ও নৌবহর কেবল বাংলার নহে মুঘল বাদশাহেরও ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ এই দুই শক্তির বলে তাহারা দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়া স্বাধীন জাতির ন্যায় আচরণ করিত। শাহ্‌জাহান যখন বিদ্রোহী হইয়া বাংলা দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন পর্তুগীজরা প্রথমে নৌবহর লইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়; কিন্তু পরে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করে। ফিরিবার পথে তাহারা শাহ্‌জাহানের বেগম মমতাজমহলের দুইজন বাঁদীকে ধরিয়া অকথ্য অত্যাচার করে। এই সমুদয় কারণে শাহ্‌জাহান সম্রাট হইয়া কাশিম খানকে বাংলাদেশের সুবাদার নিযুক্ত করার সময় এই নির্দেশ দিলেন যে অবিলম্বে হুগলী দখল করিয়া পর্তুগীজ শক্তি সমূলে ধ্বংস করিতে হইবে এবং যাবতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষ, স্ত্রী, শিশু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত অথবা ক্রীতদাসরূপে সম্রাটের দরবারে প্রেরিত হইবে। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাশিম খান হুগলী অধিকার করিলেন। ৪০০ ফিরিঙ্গি স্ত্রী-পুরুষকে বন্দী করিয়া আগ্রায় পাঠানো হইল। তাহাদিগকে বলা হইল যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহারা মুক্তি পাইবে। নচেৎ আজীবন ক্রীতদাসরূপে বন্দী হইয়া থাকিতে হইবে। অধিকাংশই মুসলমান হইতে আপত্তি করিল এবং আমরণ বন্দী হইয়াই রহিল। হুগলীর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে পর্তুগীজ প্রাধান্যের শেষ হইল।

পর্তুগীজদের পরে আরও কয়েকটি ইউরোপীয় বণিকদল বাংলাদেশে বাণিজ্য বিস্তার করে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ওলন্দাজেরা বাংলায় বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর নিকটবর্তী চুঁচুড়ায় তাহাদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার অধীনে কাশিমবাজার ও

পাটনায় আরও দুইটি কুঠি স্থাপিত হয়। দিল্লীর বাদশাহ ফারুখশিয়র ওলন্দাজদিগকে শতকরা সাড়ে তিন টাকার পরিবর্তে আড়াই টাকা শুল্ক দিয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করেন। ফরাসী বণিকেরাও সম্রাটকে ৪০,০০০ টাকা এবং বাংলার নবাবকে ১০,০০০ টাকা ঘুস দিয়া ঐ সুবিধা লাভ করেন। কিন্তু ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তাঁহারা বাংলায় বাণিজ্যের সুবিধা করিতে পারেন নাই। হুগলীর নিকটবর্তী চন্দননগরে তাঁহাদের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল।

ইংরেজ বণিকেরা প্রথমে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকদের প্রতিযোগিতায় বাংলা দেশে বাণিজ্যে বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা নবাবের নিকট হইতে বাংলা দেশে বাণিজ্য করিবার সনদ পান এবং পরবর্তী বৎসর হুগলীতে কুঠি স্থাপন করেন। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা এবং অনতিকাল পরেই রাজমহল এবং মালদহেও তাঁহাদের কুঠি স্থাপিত হয়। এই সমুদয় অঞ্চলে তাঁহাদের বাণিজ্যের খুব সুবিধা হয়। ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার সুজা ইংরেজদিগকে বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিনা শুল্কে বাংলায় বাণিজ্য করিবার অধিকার দেন। কিন্তু বাংলার মুঘল কর্মচারীরা নানা অজুহাতে এই সুবিধা হইতে ইংরেজদিগকে বঞ্চিত করে। ইংরেজ বণিকগণ শায়েস্তা খান ও সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতেও ফরমান আদায় করেন; কিন্তু তাহাতেও কোন সুবিধা হয় না। ইংরেজরা তখন নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে হুগলীর মুঘল শাসনকর্তা ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইংরেজদের কুঠি আক্রমণ করিলেন। ইংরেজরা বাধা দিতে সমর্থ হইলেও ইংরেজ এজেণ্ট জব চার্ণক সেখানে থাকা নিরাপদ মনে না করিয়া, প্রথমে সুতানুটি (বর্তমান কলিকাতার অন্তর্গত), পরে হিজলীতে তাহাদের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপিত করিলেন এবং তাঁহাদের ক্ষতির প্রতিশোধস্বরূপ বালেশ্বর সহরটি পোড়াইয়া দিলেন। মুঘল সৈন্য হিজলী অবরোধ করিলে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হইল এবং ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা সুতানুটিতে ফিরিয়া গেলেন (সেপ্টেম্বর, ১৬৮৯)। কিন্তু লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলায় একটি সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত স্থান অধিকার দ্বারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিলেন। জব চার্ণকের আপত্তি সত্ত্বেও ইংরেজরা সুতানুটি হইতে বাণিজ্য কেন্দ্র উঠাইয়া, সমস্ত ইংরেজ অধিবাসী ও বাণিজ্য-দ্রব্য জাহাজে বোঝাই করিয়া জলপথে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হইয়া মাদ্রাজে (১৬৮৮) ফিরিয়া

গেলেন। আবার উভয় পক্ষে সন্ধি হইল। বাংলার সুবাদার বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজদিগকে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিলেন। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইংরেজরা আবার সুতানুটিতে ফিরিয়া আসিয়া সেখানে ঘরবাড়ী নির্মাণ করিলেন। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শোভাসিংহের বিদ্রোহ উপলক্ষে কলিকাতার দুর্গ দৃঢ় করা হইল এবং ইংলণ্ডের রাজার নাম অনুসারে ইহার নাম রাখা হইল ফোর্ট উইলিয়ম। বার্ষিক ১২,০০০ টাকায় সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর, এই তিনটি গ্রামের ইজারা লওয়া হইল। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ হইতে পৃথকভাবে বাংলা একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সীতে পরিণত হইল। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকগণের প্রতিনিধি সুরম্যানকে সম্রাট ফারুখশিয়র এই মর্মে এক ফরমান প্রদান করেন যে ইংরেজগণ শুল্কের পরিবর্তে মাত্র বার্ষিক তিন হাজার টাকা দিলে সারা বাংলায় বাণিজ্য করিতে পারিবেন, কলিকাতার নিকটে জমি কিনিতে পারিবেন এবং যেখানে খুসী বসবাস করিতে পারিবেন। বাংলার সুবাদার ইহা সত্ত্বেও নানারকমে ইংরেজ বণিকগণের প্রতিবন্ধকতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি কলিকাতা ক্রমশই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। ইহার ফলে মারাঠা আক্রমণের সময় দলে দলে লোক কলিকাতায় নিরাপদ আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। ইহাও কলিকাতার উন্নতিব অন্যতম কারণ।

কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পরে যখন মুর্শিদ কুলী খান স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন তখন নবাব ও তাঁহার কর্মচারীরা সমৃদ্ধ ইংরেজ বণিকদিগের নিকট হইতে নানা উপায়ে অর্থ আদায় করিতে লাগিলেন। নবাবদের মতে ইংরেজদের বাণিজ্য বহু বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাঁহাদের কর্মচারীরাও বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতেছে, সুতরাং তাঁহাদের বার্ষিক টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। ইহা লইয়া প্রায়ই বিবাদ-বিসংবাদ হইত আবার পরে গোলমাল মিটিয়া যাইত। কারণ বাংলার নবাব জানিতেন যে ইংরেজের বাণিজ্য হইতে তাঁহার যথেষ্ট লাভ হয়—ইংরেজরাও জানিতেন যে নবাবের সহিত শত্রুতা করিয়া বাণিজ্য করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং কোন পক্ষই বিবাদ-বিসংবাদ চরমে পৌঁছিতে দিতেন না। নবাব কখনও কখনও টাকা না পাইলে ইংরেজদের মাল বোঝাই নৌকা আটকাইতেন। ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এইরূপ একবার নৌকা আটকানো হয়। কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিয়ালরা ৫৫,০০০ টাকা দিলে নবাব নৌকা ছাড়িয়া দেন।

নবাব আলীবর্দী ইউরোপীয় বণিকদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন এবং তাঁহাদের প্রতি যাহাতে কোন অন্যায় বা অত্যাচার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতেন। কারণ ইহাদের ব্যবসায় বজায় থাকিলে যে বাংলা সরকারের বহু অর্থাগম হইবে, তাহা তিনি খুব ভাল করিয়াই জানিতেন। তবে অভাবে পড়িলে টাকা আদায়ের জন্য তিনি অনেক সময় কঠোরতা অবলম্বন করিতেন। মারাঠা আক্রমণের সময়ে তিনি ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকদের নিকট হইতে টাকা আদায় করেন। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্যের মাহিনা বাকী পড়ায় তিনি ইংরেজদের নিকট হইতে ত্রিশ লক্ষ টাকা দাবী করেন এবং তাহাদের কয়েকটি কুঠি আটক করেন। পরে অনেক কষ্টে ইংরেজরা মোট প্রায় চারি লক্ষ টাকা দিয়া রেহাই পান। ইংরেজরা বাংলার কয়েকজন আর্মেনিয়ান ও মুঘল বণিকের জাহাজ আটকাইবার অপরাধে আলীবর্দ্দী তাঁহাদিগকে ক্ষতিপূরণ করিতে আদেশ দেন ও দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা করেন।

দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকেরা যেমন স্থানীয় রাজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হইতেছিলেন, বাংলাদেশে যাহাতে সেরূপ না হইতে পারে সে দিকে আলীবর্দীর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ইউরোপে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি ফরাসী, ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহার রাজ্যের মধ্যে যেন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয়। তিনি ইংরেজ ও ফরাসীদিগকে বাংলায় কোন দুর্গ নির্মাণ করিতে দিতেন না, বলিতেন "তোমরা বাণিজ্য করিতে আসিয়াছ,—তোমাদের দুর্গের প্রয়োজন কি? তোমরা আমার রাজ্যে আছ, আমিই তোমাদের রক্ষা করিব।" ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দিনেমার (ডেনমার্ক দেশের অধিবাসী) বণিকগণকে শ্রীরামপুরে বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করিতে অনুমতি দেন।

৬। সিরাজউদ্দৌল্লা

নবাব আলীবর্দীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁহার তিন কন্যার সহিত তাঁহার তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের (হাজী আহমদের পুত্র) বিবাহ হইয়াছিল। এই তিন জামাতা যথাক্রমে ঢাকা, পুর্ণিয়া ও পাটনার শাসনকর্তা ছিলেন। আলীবর্দ্দীর জীবদ্দশায়ই তিন জনের মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠা কন্যা মেহের্-উন্-নিসা ঘসেটি বেগম

নামেই সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না কিন্তু বহু ধন-সম্পত্তি ছিল এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ঢাকা হইতে আসিয়া মুর্শিদাবাদে মতিঝিল নামে সুরক্ষিত বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া সেখানেই থাকিতেন। মধ্যমা কন্যার পুত্র শওকৎ জঙ্গ পিতার মৃত্যুর পর পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা হন।

কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌল্লা মুর্শিদাবাদে মাতামহের কাছেই থাকিতেন। তাঁহার জন্মের পরেই আলীবর্দ্দী বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সুতরাং এই নবজাত শিশুকেই তাঁহার সৌভাগ্যের মূল কারণ মনে করিয়া তিনি ইহাকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার আদরের ফলে সিরাজের লেখাপড়া কিছুই হইল না, এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দুর্দান্ত, স্বেচ্ছাচারী, কামাসক্ত, উদ্ধত, দুর্বিনীত ও নিষ্ঠুর যুবকে পরিণত হইলেন। কিন্তু তথাপি আলীবর্দ্দী সিরাজকেই নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। আলীবর্দ্দীর মৃত্যুর পর সিরাজ বিনা বাধায় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

ঘসেটি বেগম ও শওকৎজঙ্গ উভয়েই সিরাজের সিংহাসনে আরোহণের বিরুদ্ধে ছিলেন। নবাব-সৈন্যের সেনাপতি মীরজাফর আলী খানও সিংহাসনের স্বপ্ন দেখিতেন। আলীবর্দ্দীর ন্যায় মীরজাফরও নিঃস্ব অবস্থায় ভারতে আসেন এবং আলীবর্দ্দীর অনুগ্রহেই তাঁহার উন্নতি হয়। মীরজাফর আলীবর্দীর বৈমাত্রেয় ভগিনীকে বিবাহ করেন এবং ক্রমে সেনাপতির পদ লাভ করেন। আলীবর্দী প্রতিপালক প্রভুর পুত্রকে হত্যা করিয়া নবাবী লাভ করিয়াছিলেন। মীরজাফরও তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সিরাজকে পদচ্যুত করিয়া নিজে নবাব হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করিতেন।

ঘসেটি বেগমের সহিত সিরাজের বিরোধিতা আলীবর্দীর মৃত্যুর পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার স্বামী ঢাকার শাসনকর্তা ছিলেন, কিন্তু তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য ও অতিশয় দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন, বুদ্ধিশুদ্ধিও তেমন ছিল না। সুতরাং ঘসেটি বেগমের হাতেই ছিল প্রকৃত ক্ষমতা এবং তিনিই তাঁহার অনুগ্রহভাজন দিওয়ান হোসেন কুলী খানের সাহায্যে দেশ শাসন করিতেন। হোসেন কুলীর শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধিতে সিরাজ ভীত হইয়া উঠিলেন এবং একদিন প্রকাশ্য দরবারে আলীবর্দীর নিকট অভিযোগ করিলেন যে হোসেন কুলী তাঁহার (সিরাজের) প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। আলীবর্দী প্রিয় দৌহিত্রকে কোনমতে বুঝাইয়া প্রকাশ্যে কোন হঠকারিতা করিতে নিরস্ত করিলেন। ঘসেটি

বেগমের সহিত হোসেন কুলীর অবৈধ প্রণয়ের কথাও সম্ভবত সিরাজ ও আলীবর্দী উভয়েরই কানে গিয়াছিল। সম্ভবত সেইজন্যই আলীবর্দী সিরাজকে তাঁহার দুরভিসন্ধি হইতে একেবারে নিবৃত্ত করেন নাই। পিতামহের উপদেশ সত্ত্বেও সিরাজ প্রকাশ্য রাজপথে হোসেন কুলি খানকে বধ করিলেন (এপ্রিল, ১৭৫৪)। অতঃপর ঘসেটি বেগম রাজবল্লভ নামে বিক্রমপুরের একজন হিন্দুকে দিওয়ান নিযুক্ত করিলেন। রাজবল্লভ সামান্য কেরানীর পদ হইতে নিজের যোগ্যতার বলে নাওয়ারা (নৌবহর) বিভাগের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। হোসেন কুলীর মৃত্যুর পর তিনিই ঘসেটির 'দক্ষিণ হস্ত এবং ঢাকায় সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন। সিরাজ ইহাকেও ভালচক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং ঘসেটি বেগমের স্বামীর মৃত্যুর পরই সিরাজ রাজবল্লভকে তহবিল তছরুপের অপরাধে বন্দী করিলেন এবং তাঁহার নিকট হিসাব-নিকাশের দাবী করিলেন (মার্চ, ১৭৫৬)। বৃদ্ধ আলীবর্দী তখন মৃত্যুশয্যায়, তথাপি তিনি রাজবল্লভকে তখনই বধ না করিয়া হিসাব-নিকাশ পর্যন্ত তাঁহার প্রাণ রক্ষার আদেশ করিলেন। সিরাজ রাজবল্লভকে কারাগারে রাখিলেন এবং রাজবল্লভের পরিবারবর্গকে বন্দী ও তাঁহার ধনসম্পত্তি লুঠ করিবার জন্য রাজবল্লভের বাসভূমি রাজনগরে (ঢাকা জিলায়) একদল সৈন্য পাঠাইলেন। সৈন্যদল রাজনগরে পৌঁছিবার পূর্বেই রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সপরিবারে ও সমস্ত ধনরত্নসহ পুরীতে তীর্থযাত্রার নাম করিয়া জলপথে কলিকাতায় পৌঁছিলেন এবং কলিকাতার গভর্নর ড্রেককে ঘুষ দিয়া কলিকাতা দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সম্ভবত ঘসেটি বেগমের ধনরত্নও এইরূপে কলিকাতায় সুরক্ষিত হইল।

ঘসেটি বেগম ও মীরজাফর উভয়েই আলীবর্দীর মৃত্যুর পর শওকৎ জঙ্গকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়া মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করিলেন। কিন্তু এই উৎসাহ বা প্ররোচনার আবশ্যক ছিল না। শওকৎ জঙ্গ আলীবর্দীর মধ্যমা কন্যার পুত্র, সুতরাং কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র সিরাজ অপেক্ষা সিংহাসনে তাঁহারই দাবী তিনি বেশী মনে করিতেন এবং তিনি দিল্লীতে বাদশাহের দরবারে তাঁহার নামে সুবেদারীর ফরমানের জন্য আবেদন করিলেন।

সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাঁহার অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের কথা সম্ভবত তিনি জানিতেন না। ঘসেটি বেগম ও শওকৎ জঙ্গকেই প্রধান শত্রু জ্ঞান করিয়া তিনি প্রথমে ইহাদিগকে দমন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। মতিঝিল আক্রমণ করিয়া সিরাজ ঘসেটি বেগমকে

বন্দী করিলেন ও তাঁহার ধনরত্ন লুঠ করিলেন। তারপর তিনি সসৈন্যে শওকৎ জঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু দুইটি কারণে ইংরেজদের প্রতিও তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। প্রথমত, তাহারা রাজবল্লভের পুত্রকে আশ্রয় দিয়াছে। দ্বিতীয়ত, তিনি শুনিতে পাইলেন ইংরেজরা তাঁহার অনুমতি না লইয়াই কলিকাতা দুর্গের সংস্কার ও আয়তনবৃদ্ধি করিতেছে। শওকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার পূর্বে তিনি কলিকাতার গভর্নর ড্রেকের নিকট নারায়ণ দাস নামক একজন দূত পাঠাইয়া আদেশ করিলেন যেন তিনি অবিলম্বে নবাবের প্রজা কৃষ্ণদাসকে পাঠাইয়া দেন। কলিকাতার দুর্গের কি কি সংস্কার ও পরিবর্তন হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্যও দূতকে গোপনে আদেশ দেওয়া হইল।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে সিরাজ মুর্শিদাবাদ হইতে সসৈন্যে শওকৎ জঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। ২০শে মে রাজমহলে পৌঁছিয়া তিনি সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার প্রেরিত দূত গোপনে কলিকাতা সহরে প্রবেশ করে, কিন্তু কলিকাতার কর্তৃপক্ষের নিকট দৌত্য কার্যের উপযুক্ত দলিল দেখাইতে না পারায় গুপ্তচর মনে করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অজুহাতটি মিথ্যা বলিয়াই মনে হয়। কলিকাতার গভর্নর ড্রেক সাহেব ঘুষ লইয়া কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিশ্বাস ছিল পরিণামে ঘসেটি বেগমের পক্ষই জয়লাভ করিবে। এই জন্যই তিনি সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ভরসা পাইয়াছিলেন।

কলিকাতার সংবাদ পাইয়া সিরাজ ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন এবং ইংরেজদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য তিনি রাজমহল হইতে ফিরিয়া ইংরেজদিগের কাশিমবাজার কুঠি লুঠ ও কয়েকজন ইংরেজকে বন্দী করিলেন। ৫ই জুন তিনি কলিকাতা আক্রমণের জন্য যাত্রা করিলেন এবং ১৬ই জুন কলিকাতার উপকণ্ঠে পৌঁছিলেন। কলিকাতা দুর্গের সৈন্য সংখ্যা তখন খুবই অল্প ছিল—কার্যক্ষম ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা তিন শতেরও কম ছিল এবং ১৫০ জন আর্মেনিয়ান ও ইউরেশিয়ান সৈন্য ছিল। সুতরাং নবাব সহজেই কলিকাতা অধিকার করিলেন। গভর্নর নিজে ও অন্যান্য অনেকেই নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন এবং ফলতায় আশ্রয় লইলেন। ২০শে জুন কলিকাতার নূতন গভর্নর হলওয়েল আত্মসমর্পণ করিলেন এবং বিজয়ী সিরাজ কলিকাতা দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

সিরাজের সৈন্যেরা ইউরোপীয় অধিবাসীদের বাড়ী লুঠ করিয়াছিল; কিন্তু

কাহারও প্রতি অত্যাচার করে নাই। সিরাজও হলওয়েলকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় কয়েকজন ইউরোপীয় সৈন্য মাতাল হইয়া এ-দেশী লোককে আক্রমণ করে। তাহারা নবাবের নিকট অভিযোগ করিলে নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন—এইরূপ দুর্বৃত্ত মাতাল সৈন্যকে সাধারণত কোথায় আটকাইয়া রাখা হয়? তাহারা বলিল—অন্ধকূপ (Black Hole) নামক কক্ষে। সিরাজ হুকুম দিলেন যে, ঐ সৈন্যদিগকে সেখানেই রাত্রে আটক রাখা হউক। ১৮ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রশস্ত এই কক্ষটিতে ঐ সমুদয় বন্দীকে আটক রাখা হইল। পরদিন প্রভাতে দেখা গেল দম বন্ধ হইয়া অথবা আঘাতের ফলে তাহাদের অনেকে মারা গিয়াছে।

এই ঘটনাটি অন্ধকূপ-হত্যা নামে কুখ্যাত। প্রচলিত বিবরণ মতে মোট কয়েদীর সংখ্যা ছিল ১৪৬, তাহার মধ্যে ১২৩ জনই মারা গিয়েছিল। এই সংখ্যাটি যে অতিরঞ্জিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সম্ভবত ৬০ কি ৬৫ জনকেই ঐ কক্ষে আটক করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কত জনের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ২১ জন যে বাঁচিয়াছিল, ইহা নিশ্চিত।

ইতিমধ্যে শওকৎ জঙ্গ বাদশাহের উজীরকে এক কোটি টাকা ঘুস দিয়া সুবাদারীর ফরমান এবং সিরাজকে বিতাড়িত করিবার জন্য বাদশাহের অনুমতি পাইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। সিরাজও কলিকাতা জয় সমাপ্ত করিয়া ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের শেষে সসৈন্যে পূর্ণিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১৬ই অক্টোবর নবাবগঞ্জের নিকট মনিহারী গ্রামে দুই দলে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে শওকৎ জঙ্গ পরাজিত ও নিহত হইলেন।

অল্পবয়স্ক হইলেও সিরাজ মাতামহের মৃত্যুর ছয়মাসের মধ্যেই ঘসেটি বেগম, ইংরেজ ও শওকৎ জঙ্গের ন্যায় তিনটি শত্রুকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—ইহা তাঁহার বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সাফল্যলাভের পর তাঁহার সকল উদ্যম ও উৎসাহ যেন শেষ হইয়া গেল।

কলিকাতা জয়ের পর ইহার রক্ষার জন্য উপযুক্ত কোন বন্দোবস্ত করা হইল না। ইংরেজের সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করিবার পর যাহাতে তাহারা পুনরায় বাংলা দেশে শক্তি ও প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে না পারে, তাহার সুব্যবস্থা করা অবশ্য

কর্তব্য ছিল; কিন্তু তাহাও করা হইল না। ইংরেজ কোম্পানী মাদ্রাজ হইতে ক্লাইবের অধীনে একদল সৈন্য ও ওয়াটসনের অধীনে এক নৌবহর কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য পাঠাইল। নবাবের কর্মচারী মাণিকচাঁদ কলিকাতার শাসন-কর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্লাইব ও ওয়াটসন বিনা বাধায় ফলতায় উদ্বাস্তু ইংরেজদের সহিত মিলিত হইলেন (১৫ ডিসেম্বর, ১৭৫৬)। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর ইংরেজ সৈন্য ও নৌবহর কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল। নবাবের বজবজে একটি ও তাহার নিকটে আর একটি দুর্গ ছিল। মাণিকচাঁদ এই দুইটি দুর্গ রক্ষার্থে অগ্রসর হইতেছিলেন—পথে ক্লাইবের সৈন্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সহসা আক্রমণের ফলে ইংরেজদের কিছু সৈন্য মারা গেল। কিন্তু মাণিকচাঁদের পাগড়ীর পাশ দিয়া একটি গুলি যাওয়ার শব্দে ভীত হইয়া তিনি পলায়ন করিলেন। ইংরেজরা বজবজ দুর্গ ধ্বংস করিল এবং বিনা যুদ্ধে কলিকাতা অধিকার করিল (২রা জানুয়ারী, ১৭৫৭)। ইংরেজরা যে পূর্বেই ঘুষ দিয়া মাণিকচাঁদকে হাত করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। মাণিকচাঁদের সহিত ক্লাইবের পত্র বিনিময় হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কলিকাতা হইতে ইংরেজরা বিতাড়িত হইয়া ফলতায় আশ্রয় গ্রহণের পরেই মাণিকচাঁদ নবাবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গোপনে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেন। অর্থের প্রভাব ছাড়া ইহার আর কোন কারণ দেখা যায় না। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মাণিক-চাঁদের পুত্রকে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন—এই প্রসঙ্গে কাগজ-পত্রে লেখা আছে যে মাণিকচাঁদ ত্রিশ বৎসর যাবৎ ইংরেজের অনেক উপকার করিয়াছেন।

কলিকাতা অধিকার করিয়াই ইংরেজরা সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (৩রা জানুয়ারী, ১৭৫৭)। ওদিকে সিরাজও কলিকাতা অধিকারের সংবাদ পাইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ১০ই জানুয়ারী ক্লাইব হুগলী অধিকার করিয়া সহরটি লুঠ করিলেন এবং নিকটবর্তী অনেক গ্রাম পোড়াইয়া দিলেন। সিরাজ ১৯শে জানুয়ারী হুগলী পৌছিলে ইংরেজরা কলিকাতায় প্রস্থান করিল। ৩রা ফেব্রুয়ারী সিরাজ কলিকাতার সহরতলীতে পৌছিয়া আমীরচাঁদের বাগানে শিবির স্থাপন করিলেন।

৪ঠা জুন ইংরেজরা সন্ধি প্রস্তাব করিয়া দুই জন দূত পাঠাইলেন। নবাব সন্ধ্যার সময় তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিলেন কিন্তু পরদিন পর্যন্ত আলোচনা মুলতুবী

রহিল। কিন্তু ইংরেজ দূতেরা রাত্রে গোপনে নবাবের শিবির হইতে চলিয়া গেল। শেষ রাত্রে ক্লাইব অকস্মাৎ নবাবের শিবির আক্রমণ করিলেন। অতর্কিত আক্রমণে নবাবের পক্ষের প্রায় ১৩০০ লোক হত হইল, কিন্তু প্রাতঃকালে নবাবের একদল সৈন্য সুসজ্জিত হওয়ায় ক্লাইভ প্রস্থান করিলেন। মনে হয়, ইংরেজ দূতেরা নবাবের শিবিরের সন্ধান লইতেই আসিয়াছিল এবং তাহাদের নিকট সংবাদ পাইয়া ক্লাইব অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া নবাবকে হত অথবা বন্দী করার জন্যই এই আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কুয়াসায় পথ ভুল করিয়া নবাবের তাঁবুতে পৌছিতে অনেক দেরী হইল এবং নবাব এই সুযোগে ঐ তাঁবু ত্যাগ করিয়া গেলেন।

এই নৈশ আক্রমণের ফলে ইংরেজরা যে সব দাবী করিয়াছিল নবাব তাহা সকলই মানিয়া লইয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করিলেন (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭)। নবাবের সৈন্যসংখ্যা ৪৫০০০ ও কামান ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তথাপি তিনি এইরূপ হীনতা স্বীকার করিয়া ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিলেন কেন, ইহার কোন সুসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে দুইটি ঘটনা নবাবকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল। প্রথমত, এই সময়ে সংবাদ আসিয়াছিল যে আফগানরাজ আহমদ শাহ আবদালী দিল্লী, আগ্রা, মথুরা প্রভৃতি বিধ্বস্ত করিয়া বিহার ও বাংলা দেশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে নবাব অতিশয় ভীত হইলেন এবং যে কোন উপায়ে ইংরেজদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

দ্বিতীয়ত, নবাবের কর্মচারী ও পরামর্শদাতারা প্রায় সকলেই সন্ধি করিতে উপদেশ দিলেন। ইহারা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন এবং সম্ভবত নবাব তাহার কিছু কিছু আভাসও পাইয়াছিলেন। কারণ যাহাই হউক এই সন্ধির ফলে নবাবের প্রতিপত্তি অনেক কমিয়া গেল এবং ইংরেজের শক্তি, প্রতিপত্তি ও ঔদ্ধত্য যে অনেক বাড়িয়া গেল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কতকটা ইহারই ফলে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন।

সিরাজ নবাব হইয়া সেনাপতি মীরজাফর ও দিওয়ান রায়দুর্লভকে পদচ্যুত করেন এবং জগৎশেঠকে প্রকাশ্যে অপমানিত করেন। এই তিন জনই ছিলেন সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা। সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগমের

যথেষ্ট আক্রোশের কারণ ছিল—সুতরাং তিনিও অর্থ দিয়া ইহাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। উমিচাঁদ নামক এক জন ধনী বণিক সিরাজের বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তিনিও ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন।

এই সময় ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংরেজরা ফরাসীদের প্রধান কেন্দ্র চন্দননগর অধিকার করিয়া বাংলার ফরাসী শক্তি নির্মূল করিতে মনস্থ করিল। সিরাজউদ্দৌল্লা ইহাতে আপত্তি করিলেন এবং হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারকে ইংরেজরা চন্দননগর আক্রমণ করিলে তাহাদিগকে বাধা দিতে আদেশ করিলেন। উমিচাঁদ ইংরেজদের পক্ষ হইতে ঘুষ দিয়া নন্দকুমারকে হাত করিলেন এবং ক্লাইব চন্দননগর অধিকার করিলেন (২৩শে মার্চ, ১৭৫৭)।

এই সময় হইতে সিরাজউদ্দৌল্লার চরিত্রে ও আচরণে গুরুতর পরিবর্তন লক্ষিত হয়। তিনি ক্লাইবকে ভয় দেখাইয়াছিলেন যে ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা যুদ্ধ করিলে তিনি নিজে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন। ক্লাইব তাহাতে বিচলিত না হইয়া চন্দননগর আক্রমণ করিলেন। চন্দননগর আক্রমণের সময় রায়দুর্লভ, মাণিকচাঁদ ও নন্দকুমারের অধীনে প্রায় বিশ হাজার সৈন্য ছিল। তাঁহারা কোন বাধা দিলেন না এবং নবাবও ইহার জন্য কোন কৈফিয়ৎ তলব করিলেন না। তিনি নিজে তো ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেনই না, বরং চন্দননগরের পতন হইলে ক্লাইবকে অভিনন্দন জানাইলেন। তারপর ক্লাইব যখন নবাবকে অনুরোধ করিলেন যে পলাতক ফরাসীদের ও তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি ইংরেজদের হাতে দিতে হইবে, তখন তিনি প্রথমত ঘোরতর আপত্তি করিলেন। এবং কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ জঁ্যা ল সাহেবকে অনুচরসহ সাদর অভ্যর্থনা করিয়া আশ্রয় দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁহার বিশ্বাসঘাতক অমাত্যদের পরামর্শে জঁ্যা ল সাহেবকে বিদায় দিলেন। সম্ভবতঃ ইহার অন্য কারণও ছিল। সিরাজ জানিতেন যে ফরাসীরা দাক্ষিণাত্যে নিজামের রাজ্যে কর্তা হইয়া বসিয়াছে। বাংলা দেশে যাহাতে ইংরেজ বা ফরাসী কোন পক্ষই ঐরূপ প্রভুত্ব করিতে না পারে, তাহার জন্য তিনি ইহাদের একটির সাহায্যে অপরটিকে দমনে রাখিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। এই জন্য তিনি যখন শুনিলেন যে ফরাসী সেনাপতি বুসী দাক্ষিণাত্য হইতে একদল সৈন্য লইয়া বাংলার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, তখন তিনি ইংরেজ কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। আবার ইংরেজ যখন ফরাসীদের চন্দননগর অধিকার করিল, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া একদল সৈন্য পাঠাইলেন এবং বুসীকে

দুই হাজার সৈন্য পাঠাইতে লিখিলেন। এই সময়ে (১০ই মে, ১৭৫৭) পেশোয়া বালাজী রাও ইংরেজ কোম্পানীর কলিকাতার গভর্নরকে লিখিলেন যে তিনি ইংরেজকে ১,২০,০০০ সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবেন এবং বাংলা দেশকে দুই ভাগ করিয়া ইংরেজ ও পেশোয়া এক এক ভাগ দখল করিবেন। ক্লাইব সিরাজকে ইহা জানাইলে তিনি ইংরেজের প্রতি খুসী হইয়া সৈন্য ফিরাইয়া আনিলেন।

বেশ বোঝা যায় যে ইহার পূর্বেই সিরাজের বিরুদ্ধে গুরুতর ষড়যন্ত্র চলিতেছিল এবং ষড়যন্ত্রকারীরা ইংরেজের সহায়তায় সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য তাঁহাদের স্বার্থ অনুযায়ী নবাবকে পরামর্শ দিতেছিলেন। সিরাজ কূটরাজনীতি এবং লোকচরিত্র এই উভয় বিষয়েই বিশেষ অনভিজ্ঞ ছিলেন। যদিও মীরজাফরকে তিনি সন্দেহ করিতেন, তথাপি তাঁহাকে বন্দী করিতে সাহস করিতেন না। নবাব একবার ক্রুদ্ধ হইয়া মীরজাফরকে লাঞ্ছিত করিতেন আবার তাঁহার স্তোক বাক্যে ভুলিয়া তাঁহার সহিত আপোষ করিতেন। রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকদের কথায় তিনি ফরাসীদের বিদায় করিয়া দিলেন অর্থাৎ একমাত্র যাহারা তাঁহাকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে পারিত তাহাদিগকে দূর করিয়া দিয়া তিনি চক্রান্তকারীদের সাহায্য করিলেন।

সিরাজের অস্থিরমতিত্ব, অদূরদর্শিতা, লোকচরিত্রে অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি ছাড়াও তাঁহার চরিত্রে আরও অনেক দোষ ছিল। তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য যাহারা ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহাদের বিচার করিবার পূর্বে সিরাজের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী মত দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা তাঁহার চরিত্রে বহু কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়াছে। ইহা যে অন্তত কতক পরিমাণে সিরাজের প্রতি তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার সাফাই স্বরূপ লিখিত, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন যে সিরাজের চপলমতিত্ব, দুশ্চরিত্রতা, অপ্রিয়ভাষণ ও নিষ্ঠুরতার জন্য সভাসদেরা সকলেই তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এই বর্ণনাও কতকটা পক্ষপাতদুষ্ট হইতে পারে। কিন্তু বাংলা দেশের কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে সিরাজের যে কলঙ্কময় চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাও যেমন অতিরঞ্জিত, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও সিরাজউদ্দৌল্লাকে যে প্রকার স্বদেশবৎসল ও মহানুভব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও ঠিক তদ্রূপ। সিরাজের চরিত্রের

বিরুদ্ধে বহু কাহিনী এদেশে প্রচলিত আছে তাহাও নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু ফরাসী অধ্যক্ষ জ্যঁা ল সিরাজের বন্ধু ছিলেন, সুতরাং তিনি সিরাজের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। তিনি এ-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই: "আলীবর্দীর মৃত্যুর পূর্বেই সিরাজ অত্যন্ত দুশ্চরিত্র বলিয়া কুখ্যাত ছিলেন। তিনি যেমন কামাসক্ত তেমনই নিষ্ঠুর ছিলেন। গঙ্গার ঘাটে যে সকল হিন্দু মেয়েরা স্নান করিতে আসিত তাহাদের মধ্যে সুন্দরী কেহ থাকিলে সিরাজ তাঁহার অনুচর পাঠাইয়া ছোট ডিঙ্গিতে করিয়া তাহাদের ধরিয়া আনিতেন। লোক-বোঝাই ফেরী নৌকা ডুবাইয়া দিয়া জলমগ্ন পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুদের অবস্থা দেখিয়া সিরাজ আনন্দ অনুভব করিতেন। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বধ করিবার প্রয়োজন হইলে আলীবর্দী একাকী সিরাজের হাতে ইহার ভার দিয়া নিজে দূরে থাকিতেন, যাহাতে কোন আর্তনাদ তাঁহার কানে না যায়। সিরাজের ভয়ে সকলের অন্তরাত্মা কাঁপিত এবং তাঁহার জঘন্য চরিত্রের জন্য সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিত।"

সুতরাং সিরাজের কলুষিত চরিত্রই যে তাঁহার প্রতি লোকের বিমুখতার অন্যতম কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে ষড়যন্ত্রকারীদের অধিকাংশ প্রধানত ব্যক্তিগত কারণেই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। এরূপ ষড়যন্ত্র নূতন নহে। সতের বৎসর পূর্বে আলীবর্দী এইরূপ ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বাংলার নবাব হইয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌল্লা নিজের দুষ্কৃতি ও মাতামহের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার গোপন পরামর্শ মুর্শিদাবাদে অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে নবাবের একজন সেনানায়ক ইয়ার লতিফকে সিরাজের পরিবর্তে নবাব করা হইবে। লতিফ ইংরেজদের সাহায্য লাভের জন্য গোপনে দূত পাঠাইলেন। ইংরেজরা এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করিল কারণ তাহাদের বরাবর বিশ্বাস ছিল যে সিরাজ ইংরেজের শত্রু। সিরাজ ফরাসীদের সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজকে বাংলা দেশ হইতে তাড়াইবেন, ইংরেজদের সর্বদাই এই ভয় ছিল। সিরাজ তাহাদিগকে খুশী করিবার জন্য আশ্রিত জ্যঁা ল সাহেবকে বিদায় দিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ল সাহেবের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইল। সিরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন এবং পলাশীতে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। এই ঘটনায়

ইংরেজদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে সিরাজের রাজত্বে তাহারা বাংলায় নিরাপদে বাণিজ্য করিতে পারিবে না। সুতরাং সিরাজকে তাড়াইয়া ইংরেজের অনুগত কোন ব্যক্তিকে নবাব করিতে পারিলে তাহারা বাংলা দেশে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবে। ইংরেজদের এই মনোভাব জানিতে পারিয়া মীরজাফর স্বয়ং নবাবপদের প্রার্থী হইলেন। তিনি নবাবের সেনাপতি; সুতরাং তিনিই ইংরেজদিগকে বেশী সাহায্য করিতে পারিবেন, এই জন্য ইংরেজরাও তাঁহাকেই মনোনীত করিল।

নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের প্রথম সর্গে এই ষড়যন্ত্রের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। সাত আটজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাত্রিযোগে সম্মিলিত হইয়া অনেক বাদানুবাদের পর অবশেষে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, ইহা সর্বৈব মিথ্যা। রানী ভবানী, কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজবল্লভের মুখে নবীনচন্দ্র বড় বড় বক্তৃতা দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা এ ষড়যন্ত্রে একেবারেই লিপ্ত ছিলেন না। প্রধানতঃ মীরজাফর ও জগৎশেঠ কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স্ সাহেবের মারফৎ কলিকাতার ইংরেজ কাউনসিলের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করেন। উমিচাঁদ আর রায়দুর্লভও ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতেন এবং ইহার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে কলিকাতার ইংরেজ কমিটি অনেক বাদানুবাদ ও আলোচনার পর মীরজাফরের সঙ্গে গোপন সন্ধি করা স্থির করিল এবং সন্ধির শর্তগুলি ওয়াট্‌স্ সাহেবের নিকট পাঠানো হইল। সন্ধির শর্তগুলি মোটামুটি এই :—

১। ফরাসীদিগকে বাংলাদেশ হইতে তাড়াইতে হইবে।

২। সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণের ফলে কোম্পানীর ও কলিকাতার অধিবাসীদের যাহা ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা পূরণ করিতে হইবে। ইহার জন্য কোম্পানীকে এক কোটি, ইংরেজ অধিবাসীদিগকে পঞ্চাশ লক্ষ ও অন্যান্য অধিবাসীদিগকে সাতাশ লক্ষ টাকা দিতে হইবে।

৩। সিরাজউদ্দৌলার সহিত সন্ধির সব শর্ত এবং পূর্বেকার নবাবদের ফরমানে ইংরেজ বণিকদিগকে যে সমুদয় সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বলবৎ থাকিবে।

৪। কলিকাতার সীমানা ৬০০ গজ বাড়ানো হইবে এবং এই বৃহত্তর কলিকাতার অধিবাসীরা সর্ব বিষয়ে কোম্পানীর শাসনাধীন হইবে। কলিকাতা হইতে দক্ষিণে কুলপি পর্যন্ত ভূখণ্ডে ইংরেজ জমিদার-স্বত্ব লাভ করিবে।

৫। ঢাকা ও কাশিমবাজারের কুঠি ইংরেজ কোম্পানী ইচ্ছামত সুদৃঢ় করিতে এবং সেখানে যত খুশী সৈন্য রাখিতে পারিবে।

৬। সুবে বাংলাকে ফরাসী ও অন্যান্য শত্রুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোম্পানী উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত করিবে এবং তাহার ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত জমি কোম্পানীকে দিতে হইবে।

৭। কোম্পানীর সৈন্য নবাবকে সাহায্য করিবেন। যুদ্ধের অতিরিক্ত ব্যয়-ভার নবাব দিতে বাধ্য থাকিবেন।

৮। কোম্পানীর একজন দূত নবাবের দরবারে থাকিবেন, তিনি যখনই প্রয়োজন বোধ করিবেন নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন এবং তাঁহাকে যথোচিত সম্মান দেখাইতে হইবে।

৯। ইংরেজের মিত্র ও শত্রু নবাবের মিত্র ও শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবে।

১০। হুগলীর দক্ষিণে গঙ্গার নিকটে নবাব কোন নূতন দুর্গ নির্মাণ করিতে পারিবেন না।

১১। মীরজাফর যদি উপরোক্ত শর্তগুলি পালন করিতে স্বীকৃত হন, তবে ইংরেজরা তাঁহাকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিবে।

সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে উমিচাঁদ বলিলেন যে মুর্শিদাবাদের রাজকোষে যত টাকা আছে তাহার শতকরা পাঁচ ভাগ তাঁহাকে দিতে হইবে নচেৎ তিনি এই গোপন সন্ধির কথা নবাবকে বলিয়া দিবেন। তাঁহাকে নিরস্ত করার জন্য এক জাল সন্ধি প্রস্তুত হইল, তাহাতে ঐরূপ শর্ত থাকিল—কিন্তু মূল সন্ধিতে সেরূপ কোন শর্ত রহিল না। ওয়াট্‌সন্ এই জাল সন্ধি স্বাক্ষর করিতে রাজী না হওয়ায় ক্লাইব নিজে ওয়াটসনের নাম স্বাক্ষর করিলেন।

যতদিন এইরূপ ষড়যন্ত্র চলিতেছিল ততদিন ক্লাইব বন্ধুত্বের ভান করিয়া নবাবকে চিঠি লিখিতেন, যাহাতে নবাবের মনে কোন সন্দেহ না হয়। কিন্তু মীরজাফর কোরান-শপথ করিয়া সন্ধির শর্ত পালন করিবেন এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া ক্লাইব নিজমূর্তি ধারণ করিলেন। নবাবও মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের বিষয় কিছু কিছু জানিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিতে মনস্থির করিয়া একদল সৈন্য ও কামান সহ মীরজাফরের বাড়ী ঘেরাও করিলেন। মীরজাফর

ক্লাইবকে এই বিপদের সংবাদ জানাইয়া লিখিলেন যে তিনি যেন অবিলম্বে যুদ্ধ-যাত্রা করেন। মীরজাফর গোপনে ওয়াট্‌স্‌কে লিখিলেন তিনি যেন অবিলম্বে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করেন। ওয়াট্‌স্‌ এই চিঠি পাইয়া ১৩ই জুন অনুচরসহ মুর্শিদাবাদ হইতে চলিয়া গেলেন। ক্লাইবও মীরজাফরের চিঠি পাইয়া নবাবকে ঐ তারিখে চিঠি লিখিয়া জানাইলেন যে তাঁহার সহিত ইংরেজদের যে সকল বিষয়ে বিরোধ আছে, নবাবের পাঁচ জন কর্মচারীর উপর তাহার মীমাংসার ভার দেওয়া হউক এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিতেছেন। তিনি যে পাঁচ জন কর্মচারীর নাম করিলেন, তাহারা সকলেই বিশ্বাসঘাতক এবং ইংরেজের পক্ষভুক্ত। এই চিঠি পাইয়া এবং ওয়াট্‌সের পলায়নের সংবাদ পাইয়া সিরাজ ইংরেজের প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। এবং এতদিন পরে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন। মোহন-লাল, মীরমদান প্রভৃতি বিশ্বস্ত অনুচরেরা পরামর্শ দিল যে মীরজাফরকে অবিলম্বে হত্যা করা হউক। বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীরা নবাবকে মীরজাফরের সহিত মিটমাট করিবার উপদেশ দিলেন। এই বিষম সঙ্কটের সময় সিরাজ তাঁহার অস্থিরমতিত্ব, কূটরাজনীতিজ্ঞান ও দূরদর্শিতার অভাব এবং লোকচরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন। মীরজাফরের বাড়ী ঘেরাও করিয়া তিনি তাঁহাকে পরম শত্রুতে পরিণত করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ তিনি ভাবিলেন যে অনুনয় বিনয় করিয়া মীরজাফরকে নিজের পক্ষে আনিতে পারা যাইবে। মীরজাফরের বাড়ীর চারিদিকে তিনি যে কামান ও সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া আনিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ মীরজাফরকে সাক্ষাতের জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। যখন মীরজাফর কিছুতেই নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না, তখন নবাব সমস্ত মানমর্যাদা বিসর্জন দিয়া স্বয়ং মীরজাফরের বাটিতে গমন করিলেন। মীরজাফর কোরান-স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত তিনটি শর্তে নবাবের পক্ষে থাকিতে রাজী হইলেন।

১। সমূহ বিপদ কাটিয়া গেলে মীরজাফর নবাবের অধীনে চাকুরী করিবেন না।

২। তিনি দরবারে যাইবেন না।

৩। আসন্ন যুদ্ধে তিনি কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সিরাজ এই সমুদয় শর্ত মানিয়া লইলেন এবং উপরোক্ত তৃতীয় শর্তটি সত্ত্বেও মীরজাফরকেই সেনাপতি করিয়া তাঁহার অধীনে এক বিপুল

সৈন্যদল সহ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পলাশির প্রান্তরে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২২শে জুন তারিখে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইব ও নবাবের সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল। ক্লাইবের সৈন্য সংখ্যা ছিল মোট তিন হাজার—২২০০ সিপাহী, ৮০০ ইউরোপীয়ান—পদাতিক ও গোলন্দাজ। নবাবের মোট সৈন্য ছিল ৫০,০০০—১৫,০০০ অশ্বারোহী এবং ৩৫,০০০ পদাতিক। নবাবের মোট ৫৩টি কামান ছিল। সিনফ্রেঁ নামক একজন ফরাসী সেনানায়কের অধীনেও কয়েকটি কামান ছিল। মোহনলাল ও মীরমদানের অধীনে ৫,০০০ অশ্বারোহী ও ৭,০০০ পদাতিক সৈন্য ছিল। ২৩শে জুন প্রাতঃকালে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নবাবের পক্ষে সিনফ্রেঁ গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ইংরেজ সৈন্যও গোলাবর্ষণ করিল এবং আম্রকাননের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া সিনফ্রেঁ, মোহনলাল ও মীরমদান তাঁহাদের সৈন্য লইয়া ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করিলেন। মীরজাফর, ইয়ার লতিফ ও রায়দুর্লভের অধীনস্থ বৃহৎ সৈন্যদল দর্শকের ন্যায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নবাবের ক্ষুদ্র সেনাদল বীর বিক্রমে অগ্রসর হইয়া ইংরেজ সৈন্যদের বিপন্ন করিয়া তুলিল। এই সময় অকস্মাৎ একটি গোলার আঘাতে মীরমদানের মৃত্যু হইল। ইহাতে নবাব অতিশয় বিচলিত ও মতিচ্ছন্ন হইয়া মীরজাফরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীরজাফর প্রথমে আসেন নাই, কিন্তু পুনঃ পুনঃ আহ্বানের ফলে সশস্ত্র দেহরক্ষী সহ নবাবের শিবিরে আসিলেন। নবাব দীনভাবে নিজের পাগড়ী খুলিয়া মীরজাফরের সম্মুখে রাখিলেন এবং আলীবর্দীর উপকারের কথা স্মরণ করাইয়া নিজের প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য মীরজাফরের নিকট করুণ নিবেদন জানাইলেন। মীরজাফর আবার কোরাণ-স্পর্শ করিয়া নবাবকে অভয় দিলেন এবং বলিলেন "সন্ধ্যা আগত প্রায়—আজ আর যুদ্ধের সময় নাই। আপনি মোহনলালকে ফিরিয়া আসিতে আজ্ঞা করুন। কাল প্রাতে আমি সমস্ত সৈন্য লইয়া ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করিব।" নবাব মোহনলালকে ফিরিতে আদেশ দিলেন। মোহনলাল ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে "এখন ফিরিয়া যাওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। এখন ফিরিলেই সমস্ত সৈন্য হতাশ হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিবে।" নবাবের তখন আর হিতাহিতজ্ঞান বা কোন রকম বুদ্ধি বিবেচনা ছিল না। তিনি মীরজাফরের দিকে চাহিলেন। মীরজাফর বলিলেন, "আমি যাহা ভাল মনে করি তাহা বলিয়াছি, এখন আপনার যেরূপ বিবেচনা হয় সেইরূপ করুন।" নির্বোধ নবাব মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার স্পষ্ট

প্রমাণ পাইয়াও তাঁহার মতই গ্রহণ করিলেন, একমাত্র বিশ্বস্ত অনুচর মোহন-লালের উপদেশ গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ মোহনলালকে ফিরিবার আদেশ পাঠাইলেন। মোহনলাল অগত্যা ফিরিতে বাধ্য হইলেন। মোহনলালের কথাই ফলিল। নবাবের সৈন্যরা ভাবিল তাহাদের পরাজয় হইয়াছে এবং তাহারা চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। এই সংবাদ পাইয়া নবাব অবশিষ্ট সৈন্যগণকে যুদ্ধ-ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন এবং দুই হাজার অশ্বারোহী সহ নিজেও মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইবার মীরজাফর তাঁহার বিরাট সৈন্যদল লইয়া ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মোহনলাল ও সিনফ্রেঁ বেলা পাঁচটা পর্যন্ত যুদ্ধ করিলেন, তারপর যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। ইংরেজ সৈন্য নবাবের শিবির লুঠ করিল। এইরূপে পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইবের সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল। এই যুদ্ধে ইংরেজদের ২৩জন সৈন্য নিহত ও ৪৯জন আহত হইয়াছিল। নবাবের ৫০০ সৈন্য হত হইয়াছিল।

পরদিন (২৪শে জুন) দাউদপুরের ইংরেজ শিবিরে মীর জাফর ক্লাইবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ক্লাইব তাঁহাকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া সংবর্ধনা করিলেন। মীরজাফর মুর্শিদাবাদ পৌছিয়া শুনিলেন সিরাজ পলায়ন করিয়াছেন। অমনি চতুর্দিকে তাঁহার সন্ধানের ব্যবস্থা হইল। ২৬শে জুন মুর্শিদাবাদে মীরজাফরের অভিষেক হইল। ২৯শে জুন ক্লাইভ ২০০ ইউরোপীয়ান ও ৫০০ দেশীয় সৈন্য লইয়া বিজয়গর্বে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিলেন। ক্লাইভ লিখিয়াছেন যে এই উপলক্ষে বহু লক্ষ দর্শক উপস্থিত ছিল। তাহারা ইচ্ছা করিলে শুধু লাঠি ও ঢিল দিয়াই ইউরোপীয় সৈন্যদের মারিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু বাঙ্গালীরা তাহা করে নাই। কারণ তাহারা এই মাত্র জানিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল যে—

এক রাজা যাবে পুনঃ অন্য রাজা হবে।
বাংলার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।

৩০শে জুন সিরাজউদ্দৌল্লা রাজমহলের নিকট ধরা পড়িলেন। ২রা জুলাই রাত্রে গোপনে তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে আনা হইল। তাঁহার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করা যায় স্থির করিতে না পারিয়া মীরজাফর তাঁহাকে পুত্র মীরনের হেফাজতে রাখিলেন। মীরন সেই রাত্রেই তাঁহাকে হত্যা করাইল। তাঁহার মৃতদেহ যখন হস্তিপৃষ্ঠে করিয়া পরদিন নগরের রাজপথে ঘোরান হইল তখনও বাঙ্গালী দর্শকরা কোনরূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে নাই।

৭। মীরজাফর

২৯শে জুন প্রাতে ক্লাইব মুর্শিদাবাদে পৌছিলেন। সেইদিনই সন্ধ্যার সময় দরবারে উপস্থিত হইয়া ক্লাইব মীরজাফরকে মসনদে বসিতে অনুরোধ করিলেন। মীরজাফর ইতস্তত করায় ক্লাইব নিজে তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে মসনদে বসাইলেন এবং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার বলিয়া অভিবাদন করিলেন। দিল্লীর বাদশাহও ইহা অনুমোদন করিলেন।

মীরজাফর ইংরেজদিগকে যে টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, দেখা গেল রাজকোষে তত টাকা নাই। জগৎশেঠের মধ্যস্থতায় স্থির হইল যে আপাতত দাবীর অর্ধেক টাকা দেওয়া হইবে। বাকী অর্ধেক তিন বছরে সমান কিস্তিতে শোধ দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে ১৭৫৭ হইতে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মীরজাফর ইংরেজ কোম্পানীকে নগদ দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা এবং প্রধান প্রধান ইংরেজ কর্মচারীকে আটান্ন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা দিয়াছিলেন। ক্লাইবকে ব্যক্তিগতভাবে যে জমিদারী দেওয়া হইয়াছিল তাহার বার্ষিক আয় ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। (৩রা জুলাই, ১৭৫৭) সামরিক বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া প্রথম কিস্তির টাকা দুইশত নৌকায় বোঝাই করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইল। ঐ দিনই সিরাজউদ্দৌল্লার শবদেহ হস্তিপৃষ্ঠে চড়াইয়া আর একদল লোক শোভাযাত্রা করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিল।

তিন জন জমিদার ব্যতীত আর সকলেই মীরজাফরকে নবাব বলিয়া মানিয়া লইল। মেদিনীপুরের রাজা রামসিংহ সিরাজের অনুগত ছিলেন। তিনি প্রথমে মীরজাফরের আধিপত্য স্বীকার করেন নাই; কিন্তু শীঘ্রই আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। পূর্ণিয়ায় হাজীর আলী খাঁ নিজেকে স্বাধীন নবাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন, কিন্তু নবাবের সৈন্য তাঁহাকে পরাজিত করিল। পাটনার শাসনকর্তা রামনারায়ণ মীরজাফরের নবাবী স্বীকার না করায় তাঁহার বিরুদ্ধে নবাব স্বয়ং সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রামনারায়ণ ক্লাইবের শরণাপন্ন হওয়ায় নবাব তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। রামনারায়ণকে তিনি পূর্ব পদেই বহাল রাখিলেন। মীরজাফর সংবাদ পাইলেন যে উল্লিখিত তিনটি বিদ্রোহেরই মূলে ছিলেন রায়দুর্লভ। কারণ যদিও তিনি রায়দুর্লভের সঙ্গে চক্রান্ত করিয়াই সিরাজের সর্বনাশ করিয়াছিলেন তথাপি নবাব হইয়া তাঁহার সন্দেহ হইল যে ভবিষ্যতে অন্যান্য হিন্দু ও ইংরেজের সাহায্যে রায়দুর্লভ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে

পারে। সুতরাং তিনি রায়দুর্লভকে হত্যা করার ব্যবস্থা করিলেন। রায়দুর্লভকেও ক্লাইব রক্ষা করিলেন। চতুর ক্লাইব জানিতেন যে মীরজাফর ইংরেজের সহায়তায় নবাব হইলেও তিনি ইংরেজের কর্তৃত্ব খর্ব করিতে চেষ্টা করিবেন। সুতরাং তিনিও রায়দুর্লভ, রামনারায়ণ প্রভৃতিকে লইয়া স্বপক্ষীয় একটি দল গড়িতে চেষ্টা করিলেন। ক্লাইব মুর্শিদাবাদ হইতে চলিয়া গেলেই মীরজাফরের পুত্র মীরন রায়দুর্লভকে দেওয়ানের পদ হইতে বরখাস্ত করিয়া রাজবল্লভকে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করিলেন। রায়দুর্লভ কলিকাতায় ক্লাইবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই সমুদয় বিদ্রোহ থামিতে না থামিতেই মীরজাফরের সৈন্যদল বিদ্রোহ করিল। তাহাদের অনেক দিনের বেতন বাকী ছিল সুতরাং তাহারা পুনঃ পুনঃ ইহা পরিশোধ করিবার জন্য নবাবের নিকট আবেদন করিল। নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক সৈন্য বরখাস্ত করিলেন। ইহার ফলে সৈন্যেরা তাঁহার প্রাসাদ অবরোধ করিল। নবাবের দুর্ব্যবহারে বিহারের দুইজন জমিদার সুন্দর সিংহ ও বলবন্ত সিংহ বিদ্রোহ করিলেন।

ইতিমধ্যে আর এক গুরুতর সংকট উপস্থিত হইল। এই সময়ে দিল্লীর সাম্রাজ্য নামে মাত্র পর্যবসিত হইয়াছিল। দিল্লীর নামসর্বস্ব বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর মাত্র দিল্লী ও তাহার চতুর্দিকের সামান্য ভূখণ্ডে রাজত্ব করিতেন কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল তাঁহার উজীরের হস্তে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আফগান সুলতান আহমদ শাহ্ আবদালী দিল্লী আক্রমণ করিলেন এবং উজীর গাজীউদ্দীন ইমাদ্-উল-মুল্‌ক্ আত্মসমর্পণ করিলেন। (জানুয়ারী, ১৭৫৭) আবদালী রুহেলা নায়ক নাজীবউদ্দৌল্লাকে দিল্লীতে তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আবদালীর এই আক্রমণে ভীত হইয়াই সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদিগের সহিত ফেব্রুয়ারী মাসে সন্ধি করিয়াছিলেন।

আবদালীর প্রস্থানের পরই মারাঠাগণ দিল্লী আক্রমণ করিল (আগষ্ট, ১৭৫৭) এবং নাজীবউদ্দৌল্লাকে সরাইয়া আবার গাজীউদ্দীনকে উজীর নিযুক্ত করিল। গাজীউদ্দীন বাদশাহ ও তাঁহার পুত্র (বাদশাহজাদা) উভয়ের সঙ্গেই খুব দুর্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য বাদশাহজাদা দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া নাজীবউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন (মে, ১৭৫৮) বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর তাঁহার পুত্রকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাংলার নবাব পরিবর্তন এবং আভ্যন্তরিক অসন্তোষ ও

বিদ্রোহের সুযোগে অকর্মণ্য মীর জাফরকে পদচ্যুত করিয়া বাংলার মসনদে বাদশাহজাদাকে বসাইবার জন্য এলাহাবাদের সুবাদার মুহম্মদ কুলী খান ও অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌলা বাদশাহজাদাকে সম্মুখে রাখিয়া বিহার আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। পূর্বোক্ত বিহারের বিদ্রোহী জমিদার দুইজনও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

এই আক্রমণের সংবাদে মীরজাফর অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, কারণ তাঁহার সৈন্যেরা পূর্ব হইতেই বিদ্রোহী ছিল। শাহজাদার সংবাদ শুনিয়া জমিদারদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে মনস্থ করিল। নবাব অনন্যোপায় হইয়া সোনা-রূপার তৈজসপত্র প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া সৈন্যগণের বাকী বেতন কতকটা শোধ করিলেন এবং ইংরেজ সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শাহজাদাও ক্লাইবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইতিমধ্যে বাদশাহ উজীরের চাপে পড়িয়া শাহজাদার পরিবর্তে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অন্য সুবাদার নিযুক্ত করিলেন এবং মীরজাফরকে আদেশ দিলেন যেন অবিলম্বে শাহজাদাকে আক্রমণ ও বন্দী করেন। শাহজাদা পাটনা দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন (মার্চ, ১৭৫৯)। কিন্তু ক্লাইবের হস্তে তিনি পরাজিত হইলেন। তখন শাহজাদা ইংরেজের নিকট কিছু অর্থ সাহায্য চাহিলেন। ক্লাইব তাঁহাকে দশহাজার টাকা দিলে তিনি বিহার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। দিল্লীর উজীর শাহজাদার পরাজয়ে খুসী হইয়া বাংলায় মীরজাফরের কর্তৃত্ব অনুমোদন করিলেন এবং মীরজাফরের অনুরোধে ক্লাইবকে একটি সম্মানসূচক পদবী দিলেন। মীরজাফরও ক্লাইবকে এই পদের উপযুক্ত জায়গীর প্রদান করিলেন।

এই যুদ্ধে মীরজাফরের পুত্র মীরন নবাব-সেনার নায়ক ছিলেন। মীরন কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর প্রতি দুর্ব্যবহার করায় তাঁহারা মীরনের প্রস্থানের পরই কয়েকজন জমিদারের সঙ্গে একযোগে বিদ্রোহ করিয়া শাহজাদাকে আবার বিহার আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। এই আমন্ত্রণ পাইয়া ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষভাগে শাহজাদা আবার বিহার আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। শোন নদীর নিকট পেঁছিয়া তিনি সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার পিতা উজীর কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। অমনি তিনি দ্বিতীয় শাহ আলম নামে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌলাকে উজীর নিযুক্ত করিলেন। তিনি অভিষেকের আমোদ-উৎসবে

বহু সময় কাটাইলেন। এই অবসরে পাটনায় রামনারায়ণ দুর্গ রক্ষার বন্দোবস্ত শেষ করিলেন এবং ক্যাইলোডের অধীনে একদল ইংরেজ সৈন্য পাটনায় পেঁীছিল। ইংরেজ-সৈন্য পৌঁছিবার পূর্বেই রামনারায়ণ বাদশাহী ফৌজকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হইলেন (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৬০)। কিন্তু শাহ আলম পাটনার নিকট পৌঁছিলেও দুর্গ আক্রমণ করিতে ভরসা পাইলেন না এবং ২২শে ফেব্রুয়ারী ক্যাইলোডের হস্তে পরাস্ত হইয়া তিনি বিহার সহরে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর শাহ আলম মুর্শিদাবাদ আক্রমণের জন্য কামগার খানের অধীনস্থ একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বিষ্ণুপুর পৌঁছিলেন। এইখানে একদল মারাঠা সৈন্য তাঁহার সঙ্গে যোগ দিল। এই সময় মীরজাফরের নবাবীর শেষ অবস্থা এবং বাংলা দেশেরও চরম দুরবস্থা। সম্ভবত এই সকল সংবাদ শুনিয়াই শাহ আলম বাংলা দেশ আক্রমণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। তাঁহার কতক সৈন্য দামোদর নদ পার হওয়ার পরই ইংরেজ সৈন্যের সহিত তাহাদের একটি খণ্ডযুদ্ধ হইল (৭ই এপ্রিল, ১৭৬০)। শাহ আলম তখন তাড়াতাড়ি ফিরিয়া অরক্ষিত পাটনা দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈন্য পাটনায় পৌঁছিলে (২৮ এপ্রিল, ১৭৬০) বাদশাহ পাটনা ত্যাগ করিয়া রানীসরাই নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে ফরাসী অধ্যক্ষ জঁ্যা ল সাহেব তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। কিন্তু হাজীপুরে ইংরেজ সৈন্য খাদিম হোসেনকে পরাজিত করিলে (১৯ জুন) বাদশাহ ভগ্নমনোরথ হইয়া বিহার প্রদেশ হইতে প্রস্থান করিয়া যমুনা তীরে পৌঁছিলেন (অগস্ট, ১৭৬০)।

বাদশাহ শাহ আলমের আক্রমণের সুযোগ লইয়া মারাঠা সেনানায়ক শিবভট্ট বৃহৎ একদল সৈন্যসহ কটক আক্রমণ করিলেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে তিনি মেদিনীপুর অধিকার করিলেন। বীরভূমের জমিদারও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। মীরজাফর তখন ইংরেজ সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ সৈন্য অগ্রসর হইবা মাত্র শিবভট্ট বিনা যুদ্ধে বাংলা দেশ হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে পূর্ণিয়ার নায়েব নাজিম খাদিম হোসেন খানও বিদ্রোহী হইয়া শাহ আলমের সঙ্গে যোগ দিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। মীরন ও ক্যাইলোড দুই সেনাদল লইয়া তাঁহাকে বাধা দানের জন্য অগ্রসর হইলেন। ১৬ই জুন খাদিম হোসেন খান পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন এবং নবাবের সৈন্য তাঁহার

পশ্চাদ্ধাবন করিল। কিন্তু ৩রা জুলাই অকস্মাৎ শিবিরে বজ্রাঘাতে মীরনের মৃত্যু হওয়ায় নবাবসৈন্য ফিরিয়া আসিল।

এইরূপে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে শাহ আলম ও শিবভট্টের আক্রমণ এবং খাদিম হোসেনের বিদ্রোহ বাংলা দেশকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ সৈন্যের সহায়তায় মীরজাফর এই তিনটি বিপদ হইতেই উদ্ধার পাইলেন।

কিন্তু অচিরেই আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। ইংরেজ ও ফরাসীদের ন্যায় ওলন্দাজরাও বাংলায় বাণিজ্য করিত এবং হুগলীর নিকটবর্তী চুঁচুড়ায় তাহাদের বাণিজ্য-কুঠি ছিল। মীর জাফরকে নবাবী পদে প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরেজদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া যাওয়ায় ওলন্দাজেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল এবং মীরজাফরকে নবাবের উপযুক্ত মর্যাদা দেখাইল না। নবাব ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করিলেন। কিন্তু তাহারা ত্রুটি স্বীকার না করিয়া লম্বা এক দাবী-দাওয়ার ফর্দ পেশ করিল। ক্লাইবের পরামর্শমত নবাব ওলন্দাজদের বাণিজ্য বন্ধ করিবার পরওয়ানা বাহির করিবামাত্র ওলন্দাজরা মীরজাফরের প্রাপ্য সম্মান দিল।

কিন্তু ইংরেজদের সহিত ওলন্দাজদের গোলমাল মিটিল না। একে তো ইংরেজরা বিনা শুল্কে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা পাইত, তারপর মীরজাফরের নিকট হইতে তাহারা আরও কতকগুলি অধিকার লাভ করিয়াছিল। ইহার বলে ওলন্দাজদের যত জাহাজ গঙ্গা দিয়া যাইত, ইংরেজরা তাহা খানাতল্লাসী করিত এবং ইংরেজ ভিন্ন অন্য কোন জাতির লোককে জাহাজের চালক (pilot) নিযুক্ত করিতে দিত না। ইহার ফলে ওলন্দাজদের বাণিজ্য অনেক কমিয়া যাইতে লাগিল। উপায়ন্তর না দেখিয়া ওলন্দাজরা ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করা স্থির করিল এবং এই উদ্দেশ্যে তাহাদের শক্তির প্রধান কেন্দ্র হইতে বহু সৈন্য আনাইবার ব্যবস্থা করিল। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইউরোপীয় ও মলয় সৈন্য বোঝাই ছয় সাতখানি জাহাজ গঙ্গায় পৌঁছিল। মীরজাফর তখন কলিকাতায় ছিলেন। তিনি ওলন্দাজদিগকে বাংলা দেশ হইতে তাড়াইবার প্রস্তাব করিলেন। ইংরেজরা ইহাতে সম্মত হইল না, কারণ ইউরোপে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছিল। তাহারা নবাবকে অনুরোধ করিল যেন তিনি ওলন্দাজদিগকে ইংরেজদের বিরুদ্ধতা হইতে নিবৃত্ত করেন। তদনুসারে নবাব কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে যাইবার পথে হুগলী ও চুঁচুড়ায়

মাঝামাঝি এক জায়গায় দরবারের আয়োজন করিয়া ওলন্দাজদিগকে উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন। দরবারে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষেরা নবাবকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে ইংরেজরাই তাঁহার দুর্বলতা ও দেশের দুর্দশার কারণ এবং তাঁহার অনুগ্রহ পাইলে তাহাকে তাহারা এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে। নবাবকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহারা ভরসা পাইল এবং প্রার্থনা করিল যে নবাব তাহাদিগের সেনাদলকে আসিতে দিবেন এবং ইংরেজরা যাহাতে কোন বাধা না দেয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। নবাব ইহাতে আপত্তি করায় তাহারা বলিল যে সৈন্যবোঝাই জাহাজগুলি শীঘ্রই ফেরৎ পাঠানো হইবে। ইহাতে খুশী হইয়া নবাব তাহাদিগকে সংবর্ধনা করিলেন এবং তাহাদের বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

কিন্তু নবাব চলিয়া যাইবার পরই ওলন্দাজরা এমন ভাব দেখাইল যে নবাব তাহাদিগকে সৈন্যবোঝাই জাহাজ আনিতে অনুমতি দিয়াছেন। তাহারা জাহাজগুলি আনিবার ও নূতন সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

ইহাতে ইংরেজদের সন্দেহ হইল যে নবাব তলে তলে ওলন্দাজদের সহায়তা করিতেছিলেন। অনেক ইংরেজের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে নবাবই গোপনে ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া সৈন্য আনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ক্লাইবও নবাবকে এক কড়া চিঠি লিখিলেন যে ওলন্দাজদের সহিত মিত্রতা করিলে ভবিষ্যতে তিনি মীরজাফরের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না। নবাব প্রতিবাদ করিয়া জানাইলেন যে ইংরেজের সহিত বন্ধুত্বের প্রমাণ দিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত আছেন। ক্লাইব তাঁহাকে সসৈন্যে ইংরেজদিগের সঙ্গে মিলিত হইবার আমন্ত্রণ করিলেন। নবাব লিখিলেন যে কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে যাতায়াতের ফলে তিনি বড় ক্লান্ত, সুতরাং নিজে না যাইয়া পুত্রকে পাঠাইবেন।

ইতিমধ্যে ওলন্দাজেরা ইংরেজদের সাতখানি জাহাজ আটক করিল এবং ফলতায় নামিয়া ইংরেজের নিশান ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঘর বাড়ী জ্বালাইয়া দিল। ক্লাইব ভাবিলেন যে নবাবের সহায়তা না থাকিলে ওলন্দাজেরা এতদূর সাহস করিত না। সুতরাং তিনি নবাবকে লিখিলেন যে তাঁহার পুত্র বা সৈন্য পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি যদি সত্য সত্যই ইংরেজের বন্ধু হন তবে ওলন্দাজদিগের যে ভাবে যতদূর সম্ভব অনিষ্ট করিবেন। নবাব তৎক্ষণাৎ রামনারায়ণকে আদেশ দিলেন যেন ওলন্দাজদের পাটনার কুঠি অবরোধ করা হয় এবং তাহাদের নানা-

ভাবে উৎপীড়ন করা হয়। তাঁহার পরামর্শদাতাদের অনেকেই তাঁহাকে ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিল, কিন্তু মীরজাফর তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না এবং হুগলীতে ওলন্দাজদের বাণিজ্য বন্ধ করিবার জন্য ফৌজদারের নিকট পরওয়ানা পাঠাইলেন। ইংরেজরা ওলন্দাজেদের বরাহনগরের কুঠি দখল করিলেন। তাহারা নবাবের নিকট নালিশ করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না।

(২১শে নভেম্বর, ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) ওলন্দাজরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল এবং ৭০০ ইউরোপীয় এবং প্রায় ৮০০ মলয় সৈন্য জাহাজ হইতে নামাইল। ক্লাইভ এই সংবাদ পাইয়া ফোর্ডের অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। চন্দননগর ও চুঁচুড়ার মাঝামাঝি বেদারা নামক স্থানে দুই দলে যুদ্ধ হইল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ওলন্দাজেরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিল (২৫শে নভেম্বর)।

তৎকালীন ইংরেজদের মধ্যে প্রায় সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মীরজাফর ওলন্দাজদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। ইহার স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল দুইটি। প্রথমত, মীরজাফরের সহায়তার ভরসা না থাকিলে তাহারা কখনও ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিতে ভরসা পাইত না—এবং ওলন্দাজ কোম্পানী তাহাদের কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠিতে স্পষ্টই এইরূপ সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা জানাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, মীরজাফরের দরবারের একদল অমাত্য যে ওলন্দাজদের সাহায্যে বাংলার ইংরেজদিগের প্রভাব খর্ব করিয়া নবাবের স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিবার ব্যবস্থা করিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন এবং এই দলে যে মীরন, রামনারায়ণ প্রভৃতিও ছিলেন, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে।

মীরজাফরের স্বপক্ষেও দুইটি প্রবল যুক্তি আছে। প্রথমত, সন্দেহ থাকিলেও ইংরেজরা মীরজাফরের বিরুদ্ধে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পায় নাই। পাইলে মীরজাফরের প্রতি তাহাদের ব্যবহার অন্যরূপ হইত। দ্বিতীয়ত ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর—অর্থাৎ সৈন্যবোঝাই ওলন্দাজ জাহাজগুলি বাংলাদেশে পৌছিবার পর—কলিকাতার কাউনসিল বিলাতের কর্তৃপক্ষকে এই বিষয় চিঠিতে জানাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছেন যে নবাব এ বিষয়ে কিছু জানিতেন না এবং তিনি ইহাতে ওলন্দাজদের প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।

কোন কোন ইংরেজ লিখিয়াছেন যে মীরজাফর মহারাজা রাজবল্লভের সাহায্যে ওলন্দাজদিগের সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। অনেক ইংরেজের এরূপ ধারণাও ছিল যে মহারাজা নন্দকুমারের চক্রান্তেই বর্ধমান, বীরভূম ও

অন্যান্য স্থানের জমিদারগণ ও খাদিম হোসেন খান বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং শাহজাদা ও মারাঠা শিবভট্ট বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। বর্তমানকালে অনেকের বিশ্বাস, এই সকলের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের অধীনতা পাশ হইতে বাংলাদেশ মুক্ত করা এবং এইজন্য নন্দকুমার স্বদেশভক্তরূপে সম্মানের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সুতরাং নন্দকুমারের সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য জানিতে পারা যায় তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

নন্দকুমার যে সিরাজউদ্দৌল্লার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরেজদিগকে চন্দননগর অধিকার করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং সিরাজউদ্দৌল্লার পতনের পর নন্দকুমার ইংরেজ ও মীরজাফর উভয়েরই প্রিয়পাত্র হইয়া নিজের উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইলেন। মীরজাফর যখন সিংহাসনচ্যুত হইলেন তখন নন্দকুমার তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ ও বিশ্বাসভাজন হইলেন। ইংরেজ লেখকগণের মতে অতঃপর নন্দকুমার নানা উপায়ে ইংরেজ কোম্পানীর অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গভর্ণর ভ্যান্‌সিটার্ট নন্দকুমারের বাড়ী হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি গোপনীয় পত্রের সাহায্যে শাহজাদা এবং পণ্ডিচেরীর ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহিত ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁহার চক্রান্তের বিষয় কাউনসিলের নিকট উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। কিন্তু যে কোন উপায়েই হউক, নন্দকুমার ৪০ দিন পরে মুক্ত হইলেন।

ইংরেজরা যখন মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মীরজাফরকে আবার নবাব করিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন মীরজাফর যে কয়েকটি শর্তে এই পদ গ্রহণে রাজী হইলেন তাহার একটি শর্ত এই যে নন্দকুমার তাঁহার দিওয়ান হইবেন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই সঙ্কটকালে ইংরেজেরা ইহাতে রাজী হইলেন।

ইংরেজ লেখকেরা বলেন যে দিওয়ান হইবার পরও নন্দকুমার ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। মীর কাশিমের সহিত তিনি এই বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে তিনি ইংরেজ সৈন্যের সমস্ত সংবাদ মীর কাশিমকে জানাইবেন— মীর কাশিম পুনরায় নবাব হইলে নন্দকুমারকে দিওয়ানের পদ দিবেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহকে ইংরেজের পক্ষ ত্যাগ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে সুজাউদ্দৌল্লার সঙ্গে যোগ দিবার জন্য প্ররোচিত করিয়াছিলেন। এই দুইটি অভিযোগ সম্বন্ধে গভর্ণর ভ্যান্‌সিটার্ট বহু অনুসন্ধানের ফলে যে সমুদয় প্রমাণ

সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহ থাকে না।

নন্দকুমারের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ এই যে তিনি শুজাউদ্দৌল্লাকে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি যদি ইংরেজদিগকে বাংলা দেশ হইতে তাড়াইতে পারেন, তবে তিনি তাঁহাকে এক কোটি টাকা এবং বিহার প্রদেশ দিবেন। শুজাউদ্দৌল্লা রাজী না হওয়ায় তিনি কয়েক লক্ষ টাকা সহ একজন উকীল পাঠাইয়াছিলেন এবং শুজাউদ্দৌল্লা রাজী হইয়াছিলেন। এই অভিযোগ সম্বন্ধে বিশ্বস্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে মীরজাফর যে শুজাউদ্দৌল্লাকে মীর কাশিমের পক্ষ ত্যাগ করাইয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দেওয়াইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কতকটা সফলও হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং নন্দকুমারের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ মীরজাফরের আচরণ দ্বারা সমর্থিত হয় না। আর মীরজাফরের অজ্ঞাতসারে এবং বিনা সমর্থনে যে নন্দকুমার এক কোটি টাকা ও বিহার প্রদেশ শুজাউদ্দৌল্লাকে দিবার প্রস্তাব করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। পূর্ব-অভিজ্ঞতার পরে মীরজাফরও যে ইংরেজদিগকে তাড়াইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিবেন, খুব বিশ্বস্ত প্রমাণ না থাকিলে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে।

কলিকাতার ইংরেজ কাউনসিল কিন্তু এই সমস্ত অভিযোগের বিষয় বিবেচনা করিয়া ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে নন্দকুমারকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। তাঁহাকে তাঁহার নিজের বাড়ীতেই নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল এবং শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার কোন হাত রহিল না। কিছুদিন পরে তিনি আবার ইংরেজদের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নন্দকুমার ইংরেজকে তাড়াইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন—এই অভিযোগের সত্যতার উপর নির্ভর করিয়া বর্তমান যুগে কেহ কেহ তাঁহাকে দেশপ্রেমিক বলিয়া অভিহিত করেন এবং দশ বৎসর পরে ইংরেজ আদালতে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে দেশের প্রথম শহীদ বলিয়া সম্মান দিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল জাল করিবার অভিযোগে—ইংরেজকে তাড়াইবার প্রসঙ্গমাত্রও সেই বিচারের সময় কেহ উচ্চারণ করে নাই। তাঁহার প্রাণদণ্ড ন্যায় হইয়াছিল কি অন্যায় হইয়াছিল এ সম্বন্ধে তাঁহার মৃত্যুর পর দেড়শত বৎসর পর্যন্ত বহু বিতর্ক হইয়াছে। এবং এখনও সন্দেহের যথেষ্ট অবসর আছে। কিন্তু এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে কেহ কল্পনাও করে নাই যে তিনি দেশের জন্য প্রাণ

দিয়াছিলেন। কারণ ইংরেজ তাড়াইবার অভিযোগ কতদূর সত্য তাহা বলা কঠিন এবং সত্য হইলেও তাঁহার উদ্দেশ্য কী ছিল আজ তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তিনি স্বীয় প্রভু সিরাজউদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তারপর মীরজাফরের স্বপক্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, এবং মীরজাফরের বিপক্ষে মীর কাশিমের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। অতএব স্বভাবতই তিনি যে স্বার্থ সাধনের জন্য চক্রান্ত করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। সুতরাং ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁহার চক্রান্ত নিছক স্বদেশপ্রেম অথবা নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায়মাত্র তাহা কেহই বলিতে পারে না এবং তিনি সত্যই ইংরেজকে তাড়াইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা, তাহাও নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

নবাব মীর জাফর, যে অযোগ্য ও অপদার্থ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার দেশদ্রোহিতার ফলেই যে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন হইল এই অভিযোগ পুরাপুরি সত্য নহে। রাজ্য লাভের জন্য প্রভুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র—ইহা তখন অনেকেই করিত। তাঁহার পূর্বে আলীবর্দী এবং তাঁহার পরে মীর কাশিম উভয়েই ইহা করিয়াছিলেন। মীরজাফর যখন ইংরেজের সাহায্য লাভের জন্য ষড়যন্ত্র করেন তখন তাঁহার পক্ষে ইহা কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল যে ইহার ফলে ইংরেজরা বাংলা দেশের সর্বময় কর্তা হইবে।

৮। মীর কাশিম

মীরজাফরের অযোগ্যতা ও অকর্মণ্যতায় ইংরেজ কোম্পানী তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার পুত্র মীরন ইংরেজদের প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং ইংরেজেরা ইহা জানিত। কিন্তু মীরন কার্যক্ষম এবং পিতার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। নবাবের উপর তাহার প্রভাবও খুব বেশী ছিল। অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে মীরনের মৃত্যু হইল (৩রা জুলাই, ১৭৬০) । ইংরেজরা এই ঘটনার সুযোগ লইয়া নবাবের উপর তাহাদের আধিপত্য আরও কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল।

যদিও মীরজাফর ইংরেজ কোম্পানী ও ইংরেজ কর্মচারীদিগকে বহু অর্থ দিয়াছিলেন—তথাপি তাহাদের দাবী মিটিল না। ওদিকে রাজকোষ শূন্য। সুতরাং

মীর জাফরের আর টাকা দিবার সাধ্য ছিল না। নূতন ইংরেজ গভর্ণর ভ্যান্‌সিটার্ট প্রস্তাব করিলেন যে চট্টগ্রাম জিলা কোম্পানীকে ইজারা দেওয়া হউক। কিন্তু মীর-জাফর ইহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। নবাবের জামাতা মীর কাশিমের হাতে অনেক টাকা ছিল, এবং যখন মীরজাফরের সৈন্যেরা বিদ্রোহ করে তখন তিনিই টাকা দিয়া তাহা মিটাইয়া দেন। মীরনের মৃত্যুর পর নবাবের উত্তরাধিকারী কে হইবে, এই প্রশ্ন উঠিলে দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইল। প্রথম মীরনের পুত্র। মীরনের দিওয়ান রাজবল্লভ খুব ধনী ছিলেন এবং পূর্ব হইতেই ইংরেজের বন্ধু ছিলেন। তিনি মীরনের পুত্রের পক্ষে থাকায় একদল ইংরেজ তাঁহাকে সমর্থন করিলেন। আর এক দল মীর কাশিমের দাবী সমর্থন করিলেন। রাজবল্লভ ও মীর কাশিম উভয়েই অর্থশালী ও ইংরেজের অনুগত; সুতরাং মীরজাফরের হাত হইতে প্রকৃত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া ইহাদের যে কোন একজনের হাতে দেওয়া ইংরেজের প্রধান চেষ্টার বিষয় হইল। মীরজাফর প্রথমে মীরনের পুত্র এবং মীর কাশিম উভয়ের স্বপক্ষেই মত দিলেন কিন্তু একজনকে মনোনীত করিতে ইতস্তত করিলেন—পরে যখন বুঝিলেন যে মীর কাশিম ও রাজবল্লভ দুইজনেই ইংরেজের অনুগৃহীত—তখন এই দুইজনকেই বাদ দিয়া মীর্জা দাউদ নামক এক তৃতীয় ব্যক্তির হাতেই আপাতত সমস্ত ক্ষমতা দিতে মনস্থ করিলেন।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ভ্যান্‌সিটার্ট ইংরেজ কোম্পানীর কলিকাতা প্রেসিডেন্সীর গভর্ণর হইয়া আসিলেন। তিনি মীর কাশিমের পক্ষ লইলেন এবং কলিকাতার কাউনসিল তাঁহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবার ভার গভর্ণরের উপর দিলেন। মীর কাশিম বলিলেন যে নবাবের বর্তমান পরামর্শদাতাদিগকে সরাইয়া যদি তাঁহার উপর শাসনের সকল দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দেওয়া হয় তাহা হইলে তিনি কোম্পানীকে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিতে পারেন, কিন্তু বলপ্রয়োগ ভিন্ন নবাব কিছুতেই এই বন্দোবস্তে রাজী হইবেন না। অতঃপর ভ্যান্‌সিটার্ট ও মীর কাশিমের মধ্যে অনেক গোপন পরামর্শ চলিল। ইহার ফলে মীর কাশিম ও ইংরেজদের মধ্যে এই শর্তে এক সন্ধি হইল যে, মীরজাফর নামে নবাব থাকিবেন—কিন্তু মীর কাশিম নায়েব সুবাদার হইবেন এবং শাসন সংক্রান্ত সকল বিষয়েই তাঁহার পুরাপুরি কর্তৃত্ব থাকিবে। ইংরেজরা প্রয়োজন হইলে মীর কাশিমকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবেন—এবং ইহার ব্যয় নির্বাহার্থে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিন জিলা

ইংরেজদিগকে 'ইজারা বন্দোবস্ত' করিয়া দিবেন। ইংরেজের প্রাপ্য টাকা কিস্তিবন্দী করিয়া শোধ দেওয়া হইবে।

কলিকাতার কাউনসিল মীরজাফরকে এই সন্ধির শর্ত স্বীকার করাইবার জন্য গভর্ণর ভ্যান্‌সিটার্ট ও সৈন্যাধ্যক্ষ ক্যাইলোডকে একদল সৈন্যসহ মুর্শিদাবাদে পাঠাইলেন। পাছে নবাব কিছু সন্দেহ করেন, এইজন্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হইল যে ঐ সৈন্যদল পাটনায় যাইতেছে, কারণ বাদশাহ শাহ আলম পুনরায় বিহার আক্রমণ করিবেন এইরূপ সম্ভাবনা আছে।

ইতিমধ্যে মীরজাফরের দুরবস্থা চরমে পৌঁছিয়াছিল (১৪ই জুলাই, ১৭৬০)। তাঁহার সৈন্যদল আবার বিদ্রোহী হয়, কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য কর্মচারীদিগকে পাল্কী হইতে জোর করিয়া নামাইয়া নানারূপ লাঞ্ছনা করে, নবাবের প্রাসাদ ঘেরাও করে, নবাবকে গালাগালি করে এবং তাহাদের প্রাপ্য টাকা না দিলে নবাবকে মারিয়া ফেলিবে এইরূপ ভয় দেখায়। এই সঙ্কটের সময়েই মীর কাশিম তিন লক্ষ টাকা নগদ দিয়া এবং বাকী টাকার জামীন হইয়া অনেক কষ্টে গোলমাল থামাইয়া দেন। পাটনাতেও সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া রাজবল্লভকে নানারূপ লাঞ্ছনা করে, তাঁহার বাড়ী ঘেরাও করে এবং তাঁহার জীবন বিপন্ন করিয়া তোলে। রাজকোষ শূন্য থাকায় বাংলার নবাব সৈন্যদলকে বেতন দিতে পারেন নাই, সুতরাং বাংলা রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য কোন সৈন্যই ছিল না এবং দুর্বল ও সহায়-হীন নবাব পুত্তলিকার মত সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না। এদিকে তাঁহারই প্রদত্ত অর্থে পরিপুষ্ট ইংরেজ কোম্পানীর নিয়মিত বেতনভুক সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০০০ ইউরোপীয় এবং ৫০০০ ভারতীয়। সুতরাং ইংরেজ কোম্পানীকে বাধা দিবার কোন সাধ্যই তাঁহার ছিল না।

তথাপি ১৪ই অক্টোবর যখন ভ্যান্‌সিটার্ট মুর্শিদাবাদে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মীর কাশিমের সহিত সন্ধি অনুযায়ী বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন, মীরজাফর কিছুতেই সম্মত হইলেন না। পাঁচদিন ধরিয়া কথাবার্তা চলিল— ইংরেজ গভর্ণর মীরজাফরকে রাজ্যের বর্তমান অবস্থার পরিণাম বর্ণনা করিয়া নানা-রূপ ভয় দেখাইলেন—কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে ২০শে অক্টোবর প্রাতঃ-কালে ক্যাইলোড ও মীর কাশিম একদল সৈন্য লইয়া মুর্শিদাবাদে নবাবের প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া গভর্ণরের পত্র নবাবের নিকট পাঠাইলেন। ইহার সার মর্ম এই : "আপনার বর্তমান পরামর্শদাতাদের হাতে ক্ষমতা থাকিলে অচিরেই আপনার

নিজের ও কোম্পানীর সর্বনাশ হইবে। দুই তিনটি লোকের জন্য আমাদের উভয়ের এইরূপ সর্বনাশ হইবে, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। সুতরাং আমি কর্নেল ক্যাইলোডকে পাঠাইতেছি—তিনি আপনার কুপরামর্শদাতাদিগকে তাড়াইয়া রাজ্য শাসনের সুবন্দোবস্ত করিবেন।"

নবাব এই চিঠি পাইয়া বিষম ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইলেন এবং ইংরেজকে বাধা দিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ঘণ্টা দুই পরেই নবাবের মাথা ঠাণ্ডা হইল এবং তিনি মীর কাশিমকে নবাবী পদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। তারপর তিনি ক্যাইলোডকে বলিলেন যে তাঁহার জীবন রক্ষার দায়িত্ব তাঁহার (ক্যাইলোডের) হাতেই রহিল। ভ্যান্‌সিটার্ট বলিলেন যে শুধু তাঁহার জীবন কেন তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার রাজ্যও নিরাপদে রাখিতে পারেন, কারণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার কোনরূপ অভিসন্ধি তাঁহাদের নাই। মীরজাফর বলিলেন "আমার রাজ্যের সখ মিটিয়াছে। আর এখানে থাকিলে মীর কাশিমের হাতে আমার জীবন বিপন্ন হইবে, সুতরাং কলিকাতায় বাসের ব্যবস্থা করিলে আমি সুখে শান্তিতে থাকিতে পারিব।" ২২শে অক্টোবর মীরজাফর একদল ইংরেজ সৈন্য পরিবৃত হইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। মীর কাশিম বাংলার নবাব হইলেন।

মীর কাশিম নবাব হইয়া দেখিলেন যে রাজকোষে মণি-মরকতাদি ও নগদ মাত্র ৪০ কি ৫০ হাজার টাকা আছে। তিনি সব মণিরত্ন বিক্রয় করিলেন। ইহা ছাড়া প্রায় তিন লাখ টাকার সোনা ও রূপার তৈজসপত্র ছিল, এগুলি গালাইয়া টাকা ও মোহর তৈরী হইল। কিন্তু ইংরেজকে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা দিবার শর্ত ছিল—সুতরাং তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত তহবিল হইতেও অনেক টাকা দিলেন। নবাবী পাইবার দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনি ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য নগদ দশ লক্ষ টাকা দিলেন এবং মাসিক এক লক্ষ টাকা কিস্তিতে আরও দশ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পাটনার সৈন্যের জন্য আরও পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে হইল। সন্ধির শর্তমত বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিন জিলার রাজস্ব কোম্পানীর হস্তগত হইল। ইহা ছাড়া কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীকে টাকা দিতে হইল। গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্ট পাইলেন পাঁচ লক্ষ, ক্যাইলোড দুই লক্ষ, এবং আরও পাঁচজন পদানুযায়ী মোটা টাকা পাইলেন। এই সাত জন কর্মচারী পাইলেন ১৭,৪৮,০০০ এবং সৈন্যদের জন্য নগদ ১৫ লক্ষ লইয়া মোট ৩২,৪৮,০০০ টাকা মীর কাশিমকে দিতে হইল।

মীর কাশিমের সৌভাগ্যক্রমে কলিকাতা কাউনসিলের 'বিশিষ্ট সমিতি'র সদস্যেরাই তখন কেবল তাঁহার সহিত গোপন বন্দোবস্তের কথা জানিতেন। সুতরাং কাউনসিলের অপরাপর সদস্যেরা টাকার ভাগ কিছুই পাইলেন না। অতএব তাঁহারা সাধারণ লোকের ন্যায় মীরজাফরকে অপসারণ করিয়া মীর কাশিমকে নবাব করা অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন।

মসনদে বসিবার জন্য মীর কাশিমকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। সুতরাং নানা উপায়ে তিনি অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। মীরজাফরের কয়েকজন অনুচর তাঁহার অনুগ্রহে নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য হইতে রাজস্বসংক্রান্ত উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। মীর কাশিম ইহাদিগকে এবং ইহাদের অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া তাহাদের যথাসর্বস্ব রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত করিলেন। তিনি প্রায় সকল কর্মচারীরই হিসাব-নিকাশ তলব করিলেন এবং ইহার ফলে বহু লোকের সর্বনাশ হইল। বহু অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক এমন কি আলীবর্দীর পরিবারবর্গও নানা কল্পিত মিথ্যা অপরাধের ফলে সর্বস্ব নবাবকে দিতে বাধ্য হইয়া পথের ফকীর হইলেন। এইরূপ নানাবিধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া মীর কাশিম রাজকোষ পরিপুষ্ট করিলেন এবং ইংরেজের ঋণ অনেকটা পরিশোধ করিলেন।

মীরজাফরের দুর্বল শাসন বাদশাহজাদার বিহার আক্রমণ ও নবাবী পরিবর্তনের সুযোগ লইয়া অনেক জমিদার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন—মীর কাশিম ইংরেজ সৈন্যের সাহায্যে মেদিনীপুরের বিদ্রোহীদলকে দমন করিয়া বীরভূমের দিকে অগ্রসর হইলেন। বীরভূমের জমিদার আসাদ্ জামান খাঁ প্রায় বিশ হাজার পদাতিক ও পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার লইয়া এক দুর্গম প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ আক্রমণে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। বর্ধমানও সহজেই মীর কাশিমের পদানত হইল। মুঙ্গেরের নিকটবর্তী করকপুরের রাজা বিদ্রোহী হইয়া মুঙ্গেরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু ইংরেজ ও নবাবের সৈন্যেরা তাঁহাকে পরাজিত করিল। বীরভূম ও বর্ধমানের এই যুদ্ধে মীর কাশিম স্বয়ং সেনানায়ক ছিলেন। সুতরাং নবাবী সৈন্য যে ইংরেজ সৈন্যের তুলনায় কত অপদার্থ ও অকর্মণ্য তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন। এই উপলব্ধির ফলে, এবং সম্ভবতঃ ইংরেজদের সহিত সংঘর্ষের অবশ্যম্ভাবিতা বুঝিতে পারিয়া তিনি অবিলম্বে তাঁহার সেনাদল ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এরূপ

আমূল পরিবর্তন খুবই কষ্টকর ও সময়সাধ্য—সুতরাং তাঁহার তিন বৎসর রাজ্য-কালের মধ্যে তিনি যে কতকটা কৃতকার্য হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয়। সম্ভবতঃ তাঁহার এই নূতন সামরিক নীতি যথাসম্ভব ইংরেজদিগের নিকট হইতে গোপন রাখার জন্য তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে ব্রতী হইলেন। মুঙ্গেরের পুরাতন দুর্গ সুসংস্কৃত হইল। ইউরোপীয় দক্ষ শিল্পিগণের উপদেশে ও নির্দেশে কর্মকুশল দেশীয় শিল্পকারগণ উৎকৃষ্ট কামান, বন্দুক, গুলি-গোলা, বারুদ প্রভৃতি সামরিক উপকরণ প্রস্তুত করিতে লাগিল। উপযুক্ত সৈনিক ও কর্মচারীর অধীনে নবাবের সৈন্যদল ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইল। কলিকাতার বিখ্যাত আর্মানী বণিক খোজা পিক্রর ভ্রাতা গ্রেগরী মীর কাশিমের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইল। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে গ্রেগরী বা 'গরগিন খাঁ' 'গুরগন খাঁ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 'গরগিন খাঁ' সেনাপতি হওয়ায় অনেক আর্মানী নবাবের সৈন্যদলে যোগদান করে এবং তিনি ভ্রাতা খোজা পিক্রর সাহায্যে গোপনে ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করেন।

নবাবের সৈন্যদল তিন ভাগে বিভক্ত হয়—অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ। প্রথম বিভাগের নায়ক ছিলেন মুঘল সেনানায়কগণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে আর্মানী, জার্মান, পর্তুগীজ ও ফরাসী নায়কদের অধীনে পরিচালিত হইত। ইহাদের মধ্যে আর্মানী মার্কার ও ফরাসী সমরু এই দুইজন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মার্কার ইউরোপে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা এবং হল্যাণ্ডে যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন। সমরুর প্রকৃত নাম ওয়ালটার রাইনহার্ড (Walter Reinhard)। ইনি ফরাসী জাহাজের নাবিক হইয়া ভারতে আসেন এবং সুম্‌নের (Sumner) অথবা সোমার্স (Somers) নামে ফরাসী সৈন্যদলে ভর্তি হন। ইহা হইতেই সমরু নামের উৎপত্তি। তিনি পূর্বে ইংরেজ, ফরাসী, অযোধ্যার সফদরজঙ্গ ও সিরাজ-উদ্দৌল্লার অধীনে সেনানায়ক ছিলেন। ইহারা এবং আরো কয়েকজন দক্ষ সেনানায়ক মীর কাশিমের অধীনে ছিলেন।

এই শিক্ষিত সেনাদলের সাহায্যে মীর কাশিম বেতিয়া রাজ্য জয় করিয়া নেপাল রাজ্য আক্রমণ করিলেন। সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও গুপ্ত আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া তিনি ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে শাহ আলমের দ্বিতীয় বার বিহার আক্রমণের

কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ঐ বৎসরই বর্ষাকাল শেষ হইলে শাহ্ আলম ফরাসী সৈন্য ও তাঁহাদের অধ্যক্ষ ল সাহেবকে সঙ্গে লইয়া তৃতীয় বার বিহার আক্রমণ করিলেন। ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ কারন্যাক তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া (১৫ই জানুয়ারী, ১৭৬১) ল ও ফরাসী সেনানায়কদের বন্দী করিলেন। শাহ্ আলম ইংরেজদের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলে কারন্যাক গয়ায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পাটনায় লইয়া আসেন। এই সময়ে বাংলার নূতন নবাব মীর কাশিম বর্ধমানে ও বীরভূমে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পাটনায় আসিয়া শাহ আলমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

ঐ যুদ্ধ উপলক্ষে মীর কাশিম ইংরেজ কোম্পানীকে যুদ্ধের খরচ বাবদ তিন লক্ষ টাকা দেন। কর্নেল কূট এই সময়ে ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া পাটনায় আসেন। তাঁহার পরামর্শে নবাব শাহ আলমকে বারো লক্ষ টাকা দেন। শাহ্ আলমের সহিত যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য সম্ভবত একটিও মরে নাই, নবাবের সৈন্যকেই ইহার বেগ সামলাইতে হইয়াছিল···এবং তাহার ফলে হতাহতের সংখ্যা হইয়াছিল প্রায় চারি শত। অথচ এই যুদ্ধের ফলে বাদশাহ শাহ আলম প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজদিগকেই বাংলা মুলুকের মালিক বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাহাদের সহিতই তাঁহার সন্ধির কথাবার্তা হয় এবং তিনি দিল্লীর সিংহাসন দখল করিবার জন্য ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরেজরা তাহাকে বাদশাহের ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান দিয়াছিল এবং সর্বপ্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিয়াছিল। তাঁহার ব্যয়ের জন্য মাসিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল। অবশ্য এ সকল টাকাই মীর কাশিমকে দিতে হইয়াছিল কিন্তু শাহ আলম মীর কাশিমের পরিবর্তে ইংরেজদিগকেই বাংলার সুবাদারী দিতে চাহিয়াছিলেন। কারণ তিনি ইংরেজদিগকেই তাঁহার সাহায্যের জন্য অধিকতর উপযুক্ত মনে করিতেন। ইংরেজরা এই সুবাদারী লইতে চাহিল না এবং তাহাদের প্রস্তাব মতই তিনি মীর কাশিমকে বাংলার সুবাদার বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইংরেজ সেনানায়ক বিহারের সীমা পর্যন্ত শাহ আলমের সঙ্গে গেলেন। বিদায়ের পূর্বে শাহ আলম বলিলেন যে ইংরেজরা প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাদিগকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দিওয়ানী এবং বাণিজ্যের সুবিধা দান কবিয়া ফরমান দিবেন। সুতরাং মোটের উপর বাংলাদেশে ইংরেজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেক বাড়িয়া গেল—এবং মীর কাশিমের ক্ষমতা ও মর্যাদা অনেক কমিয়া গেল। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও শীঘ্রই পাওয়া গেল।

মীর কাশিমের বহু অর্থব্যয় হইয়াছিল। সুতরাং তিনি পাটনা ত্যাগ করিবার পূর্বে বিহারের নায়েব-সুবাদার রামনারায়ণের নিকট প্রাপ্য টাকা দাবী করিলেন। মীরজাফরের আমলেও ইংরেজের আশ্রিত ও অনুগৃহীত রামনারায়ণ নবাবকে বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না এবং তিন বৎসর যাবৎ তিনি নবাব সরকারের প্রাপ্য দেন নাই। মীর কাশিম পুনঃ পুনঃ হিসাব-নিকাশের দাবী করিলেও তিনি নানা অজুহাতে তাহা স্থগিত রাখিলেন। পাটনার ইংরেজ কর্মচারীরাও নবাবকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতেন। নবাব রামনারায়ণ ও রাজবল্লভের অধীন ফৌজকে পাটনায় নবাবী ফৌজের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিলে মেজর কারন্যাক ইহার বিরুদ্ধে কলিকাতা কাউনসিলে অভিযোগ করিলেন। কলিকাতা কাউনসিল কারন্যাককে জানাইলেন যে তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া রামনারায়ণ ও রাজবল্লভকে ফৌজ নিয়া আসিবার আদেশ দেওয়া মীর কাশিমের পক্ষে অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে। তাঁহারা কারন্যাককে আদেশ দিলেন তিনি যেন নবাবের সর্ব-প্রকার উৎপীড়ন হইতে রামনারায়ণের ধন-মান-জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ কর্নেল কুট মীর কাশিমকে পদে পদে লাঞ্ছিত করিতেন। পাটনা শহরের দরজায় ইংরেজ সৈন্য পাহারা দিত এবং কাহাকেও ঢুকিতে বা বাহিরে যাইতে দিত না। নবাব কর্নেলকে এই সৈন্য সরাইতে বলিলে তিনি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আবার বাদশাহ শাহ আলমকে বাংলায় লইয়া আসিবেন।" বড় বড় পদে কাহাকে নিযুক্ত করিতে হইবে সে বিষয়েও কর্নেল মীর কাশিমকে আদেশ পাঠাইতেন। এই সমুদয় বর্ণনা করিয়া মীর কাশিম কলিকাতার গভর্ণর ভ্যান্‌সিটার্টকে (১৬ই জুন, ১৭৬১) পত্র লিখিয়া জানান যে কর্নেল পাটনায় পৌঁছিবার পর হইতেই নির্দেশ দিয়াছেন যে তিনি যাহা বলিবেন নবাবকে তাহাই করিতে হইবে। উপসংহারে মীর কাশিম লিখিলেন, "আমার ভয় যে সিপাহীরা আমার জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিবে এবং আমার মান সম্মান সমস্তই নষ্ট করিবে। গত আট মাস যাবৎ আমার আহার নিদ্রা নাই বলিলেই হয়।"

১৭ই জুন নবাব আর এক পত্রে লেখেন :

"কাল রাত দুপুরে মহারাজা রামনারায়ণ কর্নেলকে খবর পাঠান যে আমি দুর্গ আক্রমণের জন্য সৈন্যদের জড় করিয়াছি। এই মিথ্যা সংবাদে বিচলিত হইয়া কর্নেল সৈন্য সজ্জিত করেন। আজ সকালে মিঃ ওয়াট্‌স্‌, জেনানা মহলের

নিকটে আমার খাস কামরায় ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'নবাব কোথায় ?' কর্নেল কুট ক্রোধান্বিত হইয়া পিস্তল হাতে ঘোড়সওয়ার, পিওন, সিপাহী প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া আমার তাঁবুতে প্রবেশ করেন—তারপর ৬৫ জন ঘোর-সওয়ার এবং ২০০ সিপাহী লইয়া প্রতি তাঁবুতে ঢুকিয়া 'নবাব কোথায় ?' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। ইহাতে আমার কত দূর লাঞ্ছনা ও অপমান হইয়াছে এবং আমার শত্রু, মিত্র ও সৈন্যগণের চোখে আমি কত দূর হেয় হইয়াছি তাহা আপনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন।"

এই ত গেল নবাবের ব্যক্তিগত অপমান। কিন্তু ইংরেজ কর্মচারিগণের ব্যবহারে তাঁহার প্রজাগণেরও দুর্দশার সীমা ছিল না। কোম্পানীর মোহরাঙ্কিত "দস্তক" দেখাইয়া কোম্পানীর কর্মচারীরাও দেশের সর্বত্র জলপথে ও স্থলপথে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতেন। ইহাতে একদিকে রাজকোষের ক্ষতি হইত, অন্যদিকে দেশীয় বণিকগণকে শুল্ক দিতে হইত বলিয়া তাহারা ইংরেজ বণিকদের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইত। বিলাতের কর্তৃপক্ষ বারংবার এইরূপ বেআইনী কার্যের তীব্র নিন্দা করা সত্ত্বেও ইংরেজ কর্মচারীরা ইহা হইতে নিবৃত্ত হয় নাই। কারণ এখানকার উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরাও এই প্রকার বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। তা ছাড়া গভর্ণর ও কাউনসিলের সদস্যগণের প্রচুর উৎকোচ গ্রহণের ফলে অবৈধভাবে অর্থ সঞ্চয় করা কেহই দূষণীয় মনে করিত না।

শুল্কের ব্যাপার ছাড়াও কোম্পানীর কর্মচারীরা নবাবের প্রজার উপর নানা রকম উৎপীড়ন করিত। ঢাকার কর্মচারীরা ব্যক্তিগত আক্রোশ বশতঃ শ্রীহট্টে একদল সিপাহী পাঠাইয়া সেখানকার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বধ করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় জমিদারকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া বন্দী করিয়াছিলেন। এইরূপ অত্যাচারের ফলে প্রজাগণ অনেক সময় গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইত। ইংরেজের সঙ্গে কলহ বা যুদ্ধের আশঙ্কায় অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীকে নিজে দণ্ড না দিয়া প্রজাদের দুরবস্থা সম্বন্ধে মীর কাশিম গভর্ণরের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে মার্চ তারিখের চিঠির মর্ম এই: "কলিকাতা, কাশিমবাজার, পাটনা, ঢাকা প্রভৃতি সকল কুঠির ইংরেজ অধ্যক্ষ তাঁহাদের গোমস্তা ও অন্যান্য কর্মচারী সহ খাজানা আদায়কারী, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতির মতন ব্যবহার করেন—আমার কর্মচারীদের কোন আমলই

দেন না। প্রতি জিলা ও পরগণায়, প্রতি গঞ্জে, গ্রামে কোম্পানীর গোমস্তা ও অন্যান্য কর্মচারিগণ তেল, মাছ, খড়, বাঁশ, ধান, চাউল, সুপারি এবং অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসা করে, এবং তাহারা কোম্পানীর দস্তক দেখাইয়া কোম্পানীর মতই সকল সুযোগ-সুবিধা আদায় করে।" অন্যান্য পত্রে নবাব লেখেন যে "তাহারা বহু নূতন কুঠি নির্মাণ করিয়া ব্যবসা উপলক্ষে প্রজাদের উপর বহু অত্যাচার করে। তাহারা জোর করিয়া সিকি দামে দ্রব্য কেনে এবং আমার প্রজা ও ব্যবসায়ীদের উপর নানা অত্যাচার করে। কোম্পানীর দস্তক দেখাইয়া তাহারা শুল্ক দেয় না এবং ইহাতে আমার পঁচিশ লক্ষ টাকা লোকসান হয়। ইহার ফলে দেশের ব্যবসায়ীরা ও বহু প্রজা সর্বস্বান্ত হইয়া দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে।"

কয়েকজন ইংরেজও এইরূপ অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাখরগঞ্জ হইতে সার্জেন্ট ব্রেগো ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মে গভর্ণর ভ্যানসিটার্টকে যে পত্র লেখেন তাহার মর্ম এই: "এই স্থানটি বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে এ স্থানের ব্যবসা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একজন ইংরেজ বেচাকেনার জন্য একজন গোমস্তা পাঠাইলেন। সে অমনি প্রত্যেক লোককে তাহার দ্রব্য কিনিতে অথবা তাহার নিকট তাহাদের দ্রব্য বেচিতে বলে, যদি কেহ অস্বীকার করে বা অশক্ত হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বেত্রাঘাত অথবা কয়েদ করা হয়। যে সমস্ত দ্রব্যের ব্যবসায় তাহারা নিজেরা চালায় সেই সব দ্রব্য আর কেহ কেনাবেচা করিতে পারিবে না, করিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। ন্যায্য দামের চেয়ে জিনিষের দাম তাহারা অনেক কম করিয়া ধরে এবং অনেক সময় তাহাও দেয় না। যদি আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি, অমনি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। এইরূপে বাঙালী গোমস্তাদের অত্যাচারে প্রতিদিন বহু লোক শহর ছাড়িয়া পলাইতেছে। পূর্বে সরকারী কাছারীতে বিচার হইত কিন্তু এখন প্রতি গোমস্তাই বিচারক এবং তাহার বাড়ীই কাছারী। তাহারা জমিদারদেরও দণ্ডবিধান করে এবং মিথ্যা অভিযোগ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করে।"

১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে এপ্রিল ওয়ারেন হেষ্টিংস এইসব অত্যাচারের কাহিনী গভর্ণরকে জানান। তিনি বলেন যে "কেবল কোম্পানীর গোমস্তা ও সিপাহী নহে, অন্য লোকও সিপাহীর পোষাক পরিয়া বা গোমস্তা বলিয়া পরিচয় দিয়া সর্বত্র

লোকের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করে। আমাদের আগে একদল সিপাহী যাইতেছিল, তাহাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনেকে আমার নিকট অভিযোগ করিয়াছে। আমাদের আসার সংবাদে শহর ও সরাই হইতে লোকেরা পলাইয়াছে—দোকানীরা দোকান বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।"

২৬শে মের পত্রে হেষ্টিংস লেখেন: "সর্বত্র নবাবের কর্তৃত্ব প্রকাশ্যে অস্বীকৃত ও অপমানিত; নবাবের কর্মচারীরা কারারুদ্ধ; নবাবের দুর্গ আমাদের সিপাহী দ্বারা আক্রান্ত।"

গভর্ণর ভ্যান্‌সিটার্ট লিখিয়াছেন: "আমি গোপনে অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীদের সাবধান করিয়াছি; কিন্তু অত্যাচারের কোন উপশম না হওয়ায় বোর্ডের সভায় ইহা পেশ করিয়াছি। অথচ বোর্ডের সদস্যরা এ বিষয়ে কোন মনোযোগই দিলেন না। কারণ, তাঁহাদের বিশ্বাস নবাব আমাদের সঙ্গে কলহ করার জন্যই এই সব মিথ্যা সংবাদ রটাইতেছেন। নবাবের অভিযোগে বিশ্বাস করি বলিয়া তাঁহারা আমাকে গালি দেন ও শত্রু বলিয়া মনে করেন। যদিও প্রতিদিন অভিযোগের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিতেছে, তথাপি প্রতিকার তো দূরের কথা, ইহার একটির সম্বন্ধেও কোন তদন্ত হয় নাই।"

নবাবের প্রধান অভিযোগ ছিল ইংরেজদের বে-আইনী ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে। বাদশাহের ফরমান অনুসারে যে সকল দ্রব্য এদেশে জাহাজে আমদানী হয় অথবা এদেশ হইতে জাহাজে রপ্তানী হয়, কেবল সেই সকল দ্রব্যই কোম্পানী বেচাকেনা করিতে পারিবেন এবং কোম্পানীর মোহরাঙ্কিত 'দস্তক' দেখাইলে তাহার উপর কোন শুল্ক ধার্য হইবে না। কিন্তু কেবল কোম্পানী নয়, তাহাদের ইংরেজ কর্মচারীরাও অন্য সকল দ্রব্য—লবণ, সুপারি, তামাক প্রভৃতি—বাংলা দেশের মধ্যেই বেচাকেনা করিত এবং কোম্পানীর দস্তক দেখাইয়া কেহই শুল্ক দিত না। লবণের গোলা হইতে সর্বত্র দেশী ব্যাপারীদের সরাইয়া ইংরেজেরা প্রায় একচেটিয়া বাণিজ্য করিত এবং ইহাতে নবাবের প্রভূত লোকসান হইত। এতদ্ব্যতীত ইংরেজ বণিকের সহিত নবাবের কর্মচারীদের বিবাদ উপস্থিত হইলে ইংরেজরাই তাহার বিচার করিত। নবাব বা তাঁহার কর্মচারীদিগকে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে দিত না। সুতরাং যাহারা কোন অপরাধ করিত সেই অপরাধের বিচারের ভারও তাহাদের উপরেই ছিল।" গভর্ণর ভ্যান্‌সিটার্ট নবাবের অভিযোগগুলি ন্যায়সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন বলিয়াই হউক অথবা মীর কাশিমের

নিকট হইতে বহু অর্থ পাইয়াছিলেন বলিয়াই হউক নবাবের পক্ষ লইয়া কাউনসিলের ইংরেজ সদস্যদের সহিত অনেক লড়িয়াছিলেন এবং কিছু কিছু কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। রামনারায়ণকে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বরাবর নবাবের বিরুদ্ধে আশ্রয় দিয়াছিলেন কিন্তু নবাবের চিঠিতে উল্লিখিত ১৬ই জুনের ঘটনার দুইদিন পরে কলিকাতার কমিটি রামনারায়ণকে পদচ্যুত করে এবং কর্ণেল কুট ও মেজর কারন্যাককে পাটনা হইতে স্থানান্তরিত করে। আগস্ট মাসে পাটনায় নূতন নায়েব-সুবাদার নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে ভ্যান্‌সিটার্টের আদেশে রামনারায়ণকে নবাবের হস্তে অর্পণ করা হয়। নবাব তাঁহার নিকট হইতে যতদূর সম্ভব টাকা আদায় করিয়া অবশেষে তাহাকে হত্যা করেন। কেবল-মাত্র ইংরেজের অনুগ্রহের আশায় বা ভরসায় যাহারা স্বীয় প্রভুর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অদৃষ্টে যে কত নিগ্রহ ও দুঃখভোগ ছিল, মীর-জাফর, মীর কাশিম, রামনারায়ণ প্রভৃতি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীদের সম্বন্ধে নবাব যে অভিযোগ করিতেন, ভ্যান্‌সিটার্ট তাহারও প্রতিকার করিতে যত্নবান হইলেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি নবাবের নূতন রাজধানী মুঙ্গেরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এক নূতন সন্ধি করিলেন। স্থির হইল যে ভবিষ্যতে ইংরেজরা লবণের উপর শতকরা ৯ টাকা হারে শুল্ক দিবে। এ দেশীয় বণিকেরা শতকরা ৪০ টাকা শুল্ক দিত। সুতরাং নির্ধারিত শুল্ক দিয়াও ইংরেজদের অনেক লাভ থাকিত। কিন্তু এই সুবিধার পরিবর্তে সন্ধির আর একটি শর্তে স্থির হইল যে অতঃপর নবাবের কর্মচারীদের সহিত ইংরেজ বণিক বা তাহার গোমস্তার কোন বিবাদ বাধিলে নবাবের আদালতেই তাহার বিচার হইবে। ভ্যান্‌সিটার্টের স্পষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও কলিকাতা কাউনসিল এই মীমাংসা গ্রহণ করিবার পূর্বেই নবাব তাঁহার কর্মচারী-দিগকে এই বিষয় জানাইলেন এবং তদনুরূপ শুল্ক আদায় করিতে নির্দেশ দিলেন।

শুল্ক ব্যাপার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মীর কাশিম "গরগিন খাঁ"র অধীনে এক সৈন্যদল নেপাল জয় করিবার জন্য পাঠাইলেন। মকবনপুরের নিকটে এক যুদ্ধে নবাবসৈন্য গুর্খাদিগকে পরাজিত করিয়া রাত্রে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছিল। অকস্মাৎ গুর্খাদের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইল। নবাবের বহু সৈন্য নিহত হইল এবং বহু অস্ত্র-শস্ত্র কামান-বন্দুক গুর্খাদের হস্তগত হইল।

এদিকে ভ্যান্‌সিটার্ট নবাবের সহিত নূতন বন্দোবস্ত করায় ইংরেজ বণিকরা ক্রুদ্ধ হইয়া কলিকাতা বোর্ডের নিকট ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিল এবং বোর্ড এই নূতন বন্দোবস্ত নাকচ করিয়া দিল। ভ্যান্‌সিটার্ট বোর্ডের সদস্তদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে বাদশাহী ফরমানে এরূপ আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয় নাই, এবং কোম্পানীর ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষ একাধিকবার নির্দেশ দিয়াছেন যে লবণ, সুপারি প্রভৃতি যে সমুদয় দ্রব্যের বেচাকেনা বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাহার জন্য নির্ধারিত শুল্ক দিতে হইবে—কারণ তাহা না হইলে নবাবের রাজস্বের অনেক ক্ষতি হইবে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইংরেজরা বহুদিন যাবৎ যে সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহা ছাড়িয়া দিতে রাজী হইল না এবং ভ্যান্‌সিটার্টের নূতন বন্দোবস্ত কাউন্‌সিল নাকচ করিয়া দিলেন। অগত্যা ভ্যান্‌সিটার্ট নবাবকে লিখিলেন: "বাদশাহী ফরমান এবং বাংলার নবাবদের সহিত সন্ধি অনুসারে কোম্পানীর দস্তকের বলে বিনা শুল্কে আভ্যন্তরিক ও বিদেশীয় বাণিজ্য করিবার সম্পূর্ণ অধিকার ইংরেজ বণিকদের আছে। সুতরাং ইংরেজ বণিকেরা এই অধিকারের জোরে পূর্ব্বের ন্যায় বিনা শুল্কে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল দ্রব্যের ব্যবসায় করিতে পারে ও করিবে। তবে প্রাচীন প্রথা অনুসারে লবণের উপরে শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে শুল্ক দিবে। কেবল দুইটি কুঠিতে তামাকের উপর শুল্ক দিবে।"

কলিকাতা কাউন্‌সিলের এই নূতন সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইবার পূর্বেই পাটনায় নবাবের সহিত ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ এলিস সাহেবের এক সংঘর্ষ হইল। নবাবের সহিত ভ্যান্‌সিটার্টের যে নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল তদনুসারে নবাবের কর্মচারীরা ইংরেজ বণিকের নিকট শুল্ক দাবী করে। এলিস ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নবাবের কর্ম-চারীদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠান এবং তাহাদের অধ্যক্ষ আকবর আলী খানকে বন্দী করিয়া পাটনায় লইয়া আসেন। নিজের চোখের উপর এই রকম অত্যাচারে নবাব ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাঁহার কর্মচারীকে উদ্ধার করিবার জন্য ৫০০ ঘোড়সওয়ার পাঠাইলেন। ইহারা উক্ত কর্মচারীকে না পাইয়া এলিসের প্রহরীদের আক্রমণ করিল। চারিজন প্রহরী হত হইল এবং নবাবের সৈন্য এলিসের অবশিষ্ট প্রহরী ও গোমস্তাদের বন্দী করিয়া আনিল। নবাব তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। কলিকাতার কাউনসিল ভ্যান্‌সিটার্টের সহিত নবাবের নূতন বন্দোবস্ত নাকচ করিয়া দেওয়ায় ভবিষ্যতে এইরূপ গোলযোগ বন্ধ করিবার

অভিপ্রায়ে নবাব সমস্ত জিনিষের উপরই শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দিলেন (১৭ই মার্চ, ১৭৬৩)। গভর্ণরকে লিখিলেন, 'তাঁহার আর রাজত্ব করিবার সখ নাই; সুতরাং তাঁহাকে রেহাই দিয়া ইংরেজেরা যেন অন্য নবাব নিযুক্ত করে।'

সমস্ত শুল্ক তুলিয়া দেওয়ায় বাংলার রাজস্ব অর্ধেক কমিয়া গেল। অত্যাচার, অপমান ও অরাজকতা নিবারণের জন্য নবাব এ ক্ষতিও সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কলিকাতা কাউনসিলের অধিকাংশ সদস্য নবাবের প্রস্তাবে অমত করিলেন। তাঁহারা বলিলেন ইংরেজ বণিক ছাড়া আর সকলের নিকট হইতেই শুল্ক আদায় করিতে হইবে—কারণ তাহা না হইলে ইংরেজ বণিকদের অতিরিক্ত মুনাফা বন্ধ হয়।

ইংরেজ ঐতিহাসিক মিল লিখিয়াছেন, স্বার্থের প্ররোচনায় মানুষ যে কতদূর ন্যায়-অন্যায় বিচাররহিত ও লজ্জাহীন হইতে পারে, ইহা তাহার একটি চরম দৃষ্টান্ত।

এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া কলিকাতা কাউন্‌সিল মুঙ্গেরে নবাবের নিকট অ্যামিয়ট ও হে নামক দুই সাহেবকে পাঠাইয়া নিম্নলিখিত দাবীগুলি উপস্থাপিত করিলেন।

১। নবাব ও ভ্যান্‌সিটার্টের মধ্যে নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে নবাবের কর্মচারী-দিগকে যে সকল আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করা এবং ইহার জন্য ইংরেজদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূরণ করা।

২। শুল্ক রহিত করিবার আদেশ প্রত্যাহার করা।

৩। নবাবের কর্মচারীদের সহিত ইংরেজ বণিকদের বা তাহাদের গোমস্তার এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে কোম্পানীর কুঠির ইংরেজ অধ্যক্ষের হস্তেই তাহার বিচারের ভার দেওয়া।

৪। বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জিলা ইংরেজ কোম্পানীকে বর্তমান ইজারার পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্বত্ব বা জায়গীর দেওয়া।

৫। দেশীয় মহাজনেরা যাহাতে কোম্পানীর টাকা বিনা বাটায় গ্রহণ করে এবং কোম্পানী যাহাতে ঢাকা ও পাটনার টাকশালে তিন লক্ষ টাকা তৈরী করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা।

৬। নবাবের দরবারে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি (Resident) রাখা।

নবাব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, "ইংরেজেরা

বহু সন্ধি করিয়াছে এবং তাহা অবিলম্বে ভঙ্গ করিয়াছে—আমি কোন সন্ধি ভঙ্গ করি নাই। সুতরাং নূতন সন্ধির কোন অর্থ হয় না।" তারপর একখানি সাদা কাগজ তাহাদের হাতে দিয়া বলিলেন, "তোমাদের যাহা ইচ্ছা ইহাতে লিখিয়া দাও, আমি সই করিব—কিন্তু আমার কেবল একটি দাবী—তাহা এই যে দেশের যেখানে যত ইংরেজ সৈন্য আছে তাহাদিগকে সরাইয়া নিবে।"

নবাব বুঝিতে পারিলেন যে শীঘ্রই ইংরেজদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিবে। সুতরাং কলিকাতা হইতে যে কয়েকখানা ইংরেজের নৌকা অস্ত্র বোঝাই করিয়া পাটনায় পাঠান হইয়াছিল, তিনি সেগুলি আটক করিলেন এবং বলিলেন, পাটনা হইতে ইংরেজ সৈন্য না সরাইলে তিনি ঐ নৌকাগুলি ছাড়িবেন না। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে এলিস পাটনা দুর্গ আক্রমণের ব্যবস্থা করিতেছে তখন তিনি নৌকাগুলি ছাড়িয়া দিলেন এবং ঐ তারিখেই (২২ জুন) গভর্ণরকে এলিসের গোপন ব্যবস্থার খবর দিয়া লিখিলেন: "আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে অনুরোধ করিয়াছি, আবারও করিতেছি—আপনি আমাকে রেহাই দিয়া অন্য নবাব নিযুক্ত করুন।"

নবাব নূতন সন্ধির শর্ত না মানায় অ্যামিয়ট ও হে নবাবের রাজধানী মুঙ্গের ত্যাগ করিলেন। ২৪ শে জুন রাত্রে এলিস পাটনা আক্রমণ করিলেন। নবাবের সৈন্যেরা নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছিল—অতর্কিত আক্রমণে তাহারা বিপর্যস্ত হইল—এবং এলিস পাটনা দুর্গ জয় করিতে না পারিলেও পাটনা নগরী অধিকার করিলেন। বহু লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল। এবারে মীর কাশিমের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিল। তিনি পাটনা পুনরায় অধিকারের জন্য মার্কারের অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা পাটনা নগরী অধিকার করিয়া ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করিল। ইংরেজেরা আত্মসমর্পণ করিল এবং এলিস ও আরও অনেকে বন্দী হইল।

নবাব এলিসের আকস্মিক আক্রমণের কথা ভ্যান্‌সিটার্টকে জানাইলেন এবং ক্ষতি পূরণের দাবী করিলেন। অ্যামিয়ট সাহেব মীর কাশিমের নিকট দৌত্যকার্যে বিফল হইয়া আরও কয়েকজন ইংরেজ সহ মুঙ্গের হইতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। মীর কাশিম পাটনার সংবাদ পাইয়া মুর্শিদাবাদে আদেশ পাঠাইলেন যে অ্যামিয়টের নৌকা যেন আটক করা হয়। তাঁহাকে হত্যা করিবার কোন আদেশ ছিল না কিন্তু অ্যামিয়ট নবাবের আদেশ সত্ত্বেও নৌকা হইতে নামিতে অথবা আত্মসমর্পণ করিতে রাজী হইলেন না এবং নবাবের যে সমুদয় নৌকা তাঁহাকে ধরিতে আসিয়াছিল, ইংরেজ সৈন্যকে তাহাদের উপর গুলি বর্ষণ করিতে আদেশ

দিলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর নবাব সৈন্য অ্যামিয়টের নৌকাগুলি দখল করিল। ইংরেজ পক্ষের একজন হাবিলদার ও দুই এক জন সিপাহী পলাইল—বাকী সকলেই হত বা বন্দী হইল। অ্যামিয়টও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই ঘটনা পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড বলিয়াই সাধারণতঃ ইতিহাসে বর্ণিত হয়—কিন্তু অ্যামিয়টের আদেশে নবাবের নৌকাসমূহের বিরুদ্ধে গুলি ছোঁড়ার ফলেই যে এই দুর্ঘটনা হয়, কোন কোন ইংরেজ লেখকও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

পাটনায় এলিস্ ও অন্যান্য ইংরেজদিগকে বন্দী করায় কলিকাতার কাউনসিল মীর কাশিমের বিরুদ্ধে বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তারপর ৩রা জুলাই অ্যামিয়টের নিধন-সংবাদে তাঁহারা মীর কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং মীরজাফরকে পুনরায় বাংলার নবাবী-পদে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইংরেজেরা ঐ দুই ঘটনার অনেক পূর্বেই মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি কলিকাতার কাউনসিলে যুদ্ধ বাধিলে কোন্ সেনানায়ক কোন্ দিকে অগ্রসর হইবেন তাহা নির্ণীত হইয়াছিল এবং ১৮ই জুন যুদ্ধের ব্যবস্থা আরও অগ্রসর হইয়াছিল।

মীর কাশিম যে যুদ্ধের জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিলেন না, এমন কথা বলা যায় না। ইহার সম্ভাবনায়ই তিনি একদল সৈন্য ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্য সংখ্যা ৫০ হাজারের অধিক ছিল। ইংরেজ সেনাপতি মেজর অ্যাডাম্‌স্ চারি হাজার সিপাহী ও সহস্রাধিক ইউরোপীয় সৈন্য লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন (জুলাই, ১৭৬৩)।

মীর কাশিম মুর্শিদাবাদ রক্ষার জন্য বিশ্বাসী নায়কদের অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য সেখানে পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি অবরোধ করার আদেশ দিলেন। কাশিমবাজার সহজেই অধিকৃত হইল এবং বন্দী ইংরেজগণ মুঙ্গেরে প্রেরিত হইয়া তথা হইতে পাটনাতে নীত হইলেন।

নবাবী সৈন্যের সেনাপতি তকী খানের সহিত মুর্শিদাবাদের নায়েব নবাব সৈয়দ মুহম্মদ খানের সদ্ভাব ছিল না—সৈয়দ মুহম্মদ তকী খানকে প্রতিপদে বাধা দিতে লাগিলেন—এবং মুঙ্গের হইতে যে তিন দল সৈন্য তকী খানের সহিত যোগ দিতে আসিয়াছিল, তাহাদের নায়কগণকে কুপরামর্শ দিয়া তকী খানের শিবির হইতে দূরে রাখিলেন। অজয় নদের তীরে নবাবী সৈন্যের এই দলের সহিত একদল ইংরেজ সৈন্যের যুদ্ধ হইল। নবাব-সৈন্যের সহিত কামান ছিল না—ইংরেজ সৈন্যের

কামানের গোলায় তাহারা বিধ্বস্ত হইল। তথাপি নবাবসৈন্ত অতুল সাহসে চারি ঘণ্টাকাল যুদ্ধ করিল। কিন্তু অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল।

বিজয়ী ইংরেজ সৈন্ত কলিকাতা হইতে আগত মেজর অ্যাডাম্‌সের সৈন্তের সহিত যোগ দিল। ইহার দুই তিন দিন পরে ১৯শে জুলাই তকী খানের সহিত কাটোয়ার সন্নিকটে ইংরেজদের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে তকী খান অশেষ বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর তকী খান আহত হইলেন এবং তাঁহার অশ্ব নিহত হইল। তকী খান আর একটি অশ্বে চড়িয়া ভীমবেগে ইংরেজ সৈন্ত আক্রমণ করিলেন। এই সময় আর একটি গুলি তাঁহার স্কন্ধদেশ বিদীর্ণ করিল। ক্ষতস্থানের রক্ত কাপড়ে ঢাকিয়া অনুচরগণের নিষেধ না শুনিয়া তকী খান পলায়নপর ইংরেজদিগকে অনুসরণ করিয়া একটি নদীর খাতের কাছে পৌঁছিলেন। সেখানে ঝোপের আড়ালে কতকগুলি ইংরেজ সৈন্ত লুকাইয়া ছিল। তাঁহাদেরই একজন তকী খাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল—তকী খানের মৃত্যু হইল। অমনি তাঁহার সৈন্তদল ইতস্তত পলাইতে লাগিল। মুঙ্গের হইতে যে তিন দল সৈন্ত আসিয়াছিল তাহারা যুদ্ধে কোন অংশ গ্রহণ না করিয়া দূরে দাঁড়াইয়াছিল। তাহারাও এবারে পলায়ন করিল। ইংরেজেরা কাটোয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন।

এই যুদ্ধে নবাব-সৈন্তের পরাজয় হইলেও তকী খান যে সাহস, সমরকৌশল ও প্রভুভক্তি দেখাইয়াছেন তাহা ঐ যুগে সত্য সত্যই দুর্লভ ছিল। মুঙ্গের হইতে আগত সেনাদলের নায়কেরা যদি তাঁহার সহায়তা করিতেন তবে যুদ্ধের ফল অন্তরূপ হইত। তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলে তকী খানের বীরত্ব ও চরিত্র আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। দুঃখের বিষয় সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসে তকী খানের একটি অতি জঘন্ত চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ অলীক ও অনৈতিহাসিক। এই বীরের ললাটে যে কলঙ্ক কালিমা বঙ্কিমচন্দ্র লেপিয়া দিয়াছেন তাহা কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্যই তকী খানের কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত হইল।

কাটোয়ার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিজয়ী ইংরেজ সৈন্ত মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইল। মুর্শিদাবাদ রক্ষার জন্ত যথেষ্ট সৈন্ত ছিল; কিন্তু অযোগ্য ও অপদার্থ নায়েব-নবাব সৈয়দ মুহম্মদ মুঙ্গেরে পলায়ন করিলেন। এক রকম বিনা যুদ্ধেই মুর্শিদাবাদ ইংরেজের হস্তগত হইল। মুর্শিদাবাদের অধিবাসীরা—বিশেষত হিন্দুগণ মীর কাশিমের হস্তে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। জগৎশেঠ, মহারাজা রাজবল্লভ

প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণকে মীর কাশিম মুঙ্গেরে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে ইহারা ইংরেজের পক্ষভুক্ত। সুতরাং মুর্শিদাবাদে মীরজাফর ও ইংরেজ সৈন্য বিপুল সংবর্ধনা পাইলেন।

কাটোয়ার যুদ্ধে ইংরেজদের বহু লোকক্ষয় হইয়াছিল—সুতরাং তাঁহারা দুই পল্টন নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইলেন। গিরিয়ার প্রান্তরে দুই দলে যুদ্ধ হইল (২রা আগষ্ট)। আসাদুল্লা ও মীর বদরুদ্দীন প্রভৃতি মীর কাশিমের কয়েকজন সেনানায়ক অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিলেন। মীর বদরুদ্দীন ইংরেজ সৈন্যের বামপার্শ্ব ভেদ করিয়া অগ্রসর হইলেন; এবং তখন ইংরেজ সৈন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে লাগিল। এই সময়ে ইংরেজ সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিলেই জয় সুনিশ্চিত ছিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই বদরুদ্দীন আহত হওয়ায় তাঁহার সৈন্যদের অগ্রগতি থামিয়া গেল। এই অবসরে মেজর অ্যাডামস্ প্রবল-বেগে আক্রমণ করায় নবাবসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নবাবসৈন্যের দুই প্রধান নায়ক সমরু ও মার্কার এ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়াও যুদ্ধে বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। অনেকে মনে করেন তাঁহারা নবাবের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন কিন্তু এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন প্রমাণ নাই।

গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত নবাবসৈন্য কিছুদূর উত্তরে উধুয়ানালার দুর্গে আশ্রয় লইল। ইহার একধারে ভাগীরথী ও অপর পাশে উধুয়া নামক নালা এবং ইহারই মধ্য দিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে পাটনা যাইবার বাদশাহী রাজপথ। রাজপথের পার্শ্বদেশেই গভীর জলগড় এবং তাহার পাশেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতমালা ক্রমশ বিস্তারিত হইতে হইতে উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই দুর্ভেদ্য গিরিসঙ্কটে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। মীর কাশিম নূতন দুর্গ-প্রাচীর নির্মাণ করিয়া তদুপরি সারি সারি কামান সাজাইয়াছিলেন। এই প্রাচীর এত সুদৃঢ় ছিল যে দীর্ঘকাল গোলাবর্ষণেও তাহা ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বহু সংখ্যক নবাবী সৈন্য এই দুর্গরক্ষার জন্য পাঠান হইয়াছিল।

ইংরেজরা বহু গোলাবর্ষণ করিয়াও যখন দুর্গপ্রাচীর ভাঙ্গিতে পারিল না তখন নবাবসৈন্যের ধারণা হইল যে এই দুর্গ জয় করা ইংরেজের সাধ্য নহে। এইজন্য তাহারা আর পূর্বের ন্যায় সতর্কতার সহিত দুর্গ পাহারা দিত না এবং নৃত্যগীতে চিত্ত বিনোদন করিত। এই সময়ে এক বিশ্বাসঘাতক নবাবী সৈনিক দুর্গ হইতে

গোপনে রাত্রিতে পলায়ন করিয়া ইংরেজ শিবিরে উপস্থিত হইল। সে ইংরেজ সেনাপতিকে জানাইল যে জলগণ্ডের এমন একটি অগভীর স্থান আছে, যেখানে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। সেই রাত্রিতেই ইংরেজ সেনা অস্ত্রশস্ত্র মাথায় করিয়া নিঃশব্দে ঐ স্বল্প গভীর স্থানে জলগণ্ড পার হইয়া দুর্গমূলে সমবেত হইল। নিদ্রামগ্ন প্রহরীদিগকে হত্যা করিয়া কয়েকজন ইংরেজ সৈনিক প্রাচীর বাহিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল এবং দুর্গদ্বার খুলিয়া দিল। অমনি বহু ইংরেজ সৈন্য দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিল ; তখন নিদ্রিত নবাবী সৈন্য অতর্কিত আক্রমণে বিভ্রান্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। নবাবের সেনানায়কগণ পলায়নের পথরোধ করিয়া ঘোষণা করিলেন, যে পলায়ন করিবে তাহাকেই গুলি করা হইবে। নিজ পক্ষের গুলি বর্ষণে বহু নবাব সৈন্য নিহত হইল, তথাপি তাহারা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইল না। আরাটুন, মার্কাট ও গরগিন খাঁ বিনাযুদ্ধে দুর্গ সমর্পণ করিয়া পলায়ন করিলেন। এইরূপে ৪০,০০০ সৈন্য ও শতাধিক কামান দ্বারা রক্ষিত এই দুর্ভেদ্য দুর্গ এক হাজার ইউরোপীয় ও চারি হাজার সিপাহী জয় করিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে উল্লিখিত বিদেশী দুই সেনানায়কের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই উধুয়ানালায় মীর কাশিমের পরাজয় হইয়াছিল। "গরগিন খাঁ"র ভ্রাতা খোজা পিক্রু ইংরেজের বন্ধু ছিলেন—তিনি যে ইংরেজ সেনানায়ক অ্যাডাম্‌সের অনুরোধে উধুয়ানালায় মার্কাট ও আরাটুনের নিকট ইংরেজকে উপকার করিবার জন্য চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তীকালে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

এইরূপ পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে ও সেনানায়কদের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী শুনিয়া মীর কাশিম উন্মত্তবৎ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইলেন। তিনি ৯ই সেপ্টেম্বর ইংরেজ সেনাপতিকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে তাঁহার সৈন্যদের অত্যাচারে তিন মাস যাবৎ বাংলা দেশ বিধ্বস্ত হইতেছে—যদি তাহারা এখনও নিবৃত্ত না হয় তাহা হইলে তিনি এলিস ও ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করিবেন। তাঁহার সেনানায়কগণের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি সকলের উপরেই সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছিলেন। এবং মুঙ্গের দুর্গে বন্দী জগৎশেঠ, মহারাজা রাজবল্লভ, স্বরূপচাঁদ, রামনারায়ণ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এবং আরও বহু বন্দীকে গলায় বালি বা পাথর ভরা বস্তা বাঁধিয়া দুর্গপ্রাকার হইতে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিয়া নির্মমভাবে হত্যা করিলেন। কাহারও কাহারও মতে জগৎশেঠকে গুলি করিয়া মারা হয়।

তারপর আরাব আলি খাঁ নামক একজন সেনানায়কের হাতে মুঙ্গের দুর্গের ভার অর্পণ করিয়া পাটনায় গমন করিলেন। পথিমধ্যে দুইজন সৈন্য "গরগিন খাঁ"কে হত্যা করে। ইংরেজ সৈন্য ১লা অক্টোবর মুঙ্গের দুর্গ অবরোধ করিল এবং আরাব আলি খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় ঐ দুর্গ অধিকার করিল। কতক নবাবী সৈন্য ইংরেজের পক্ষে যোগ দিয়া নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। এই সংবাদ শুনিয়াই নবাব ইংরেজ বন্দীদিগকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। নৃশংস সমরু অতি নিষ্ঠুরভাবে এই আদেশ পালন করিল। একমাত্র ডাক্তার ফুলার্টন ব্যতীত ইংরেজ নরনারী, বালকবালিকা সকলেই নিহত হইল (৫ই অক্টোবর, ১৭৬৩)।

ইংরেজ সৈন্য ২৮শে অক্টোবর পাটনার নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইল। মীর কাশিম ইহার পুর্বেই তাঁহার সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। পাটনার দুর্গ রক্ষার যথেষ্ট বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও ৬ই নভেম্বর ইংরেজ সৈন্য এই দুর্গ অধিকার করিল। তখনও মীর কাশিমের শিবিরে তাঁহার ৩০,০০০ সুশিক্ষিত সেনা এবং সমরুর সেনাদল ও মুঘল অশ্বারোহিগণ ছিল। কিন্তু পুনঃ পুনঃ পরাজয়ের ফলে ভগ্নোদ্যম হইয়া তিনি বাংলা দেশ ত্যাগ করাই স্থির করিলেন এবং অযোধ্যার নবাব উজীর শুজাউদ্দৌল্লার আশ্রয় ও সাহায্য ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিলেন। কর্মনাশা নদীর তীরে পৌঁছিয়া তিনি শুজাউদ্দৌলার উত্তর পাইলেন। শুজাউদ্দৌল্লা স্বহস্তে একখানি কোরাণের আবরণ-পৃষ্ঠায় মীর কাশিমকে আশ্রয় দানের প্রতিশ্রুতি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন দেখিয়া মীর কাশিম আশ্বস্ত হইয়া বহু ধনরত্নসহ সপরিবারে এবং সুশিক্ষিত সেনাদল লইয়া এলাহাবাদে শিবির স্থাপন করিলেন। এই সময় সম্রাট শাহ আলমও শুজাউদ্দৌল্লার আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। এই তিন দল যাহাতে মিত্রতাবদ্ধ না হইতে পারে তাহার জন্য মীর জাফর, শাহ আলম ও শুজাউদ্দৌল্লা উভয়ের নিকটই গোপনে দূত পাঠাইলেন।

মীর কাশিম বহু অর্থদানে উভয়ের পাত্রমিত্রকে বশীভূত করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে বাংলা দেশ উদ্ধারের জন্য সাহায্য করিবেন, এই মর্মে এক সন্ধি হইল।

এদিকে ইংরেজ সেনাপতি অ্যাডামসের মৃত্যু হওয়ায় মেজর কারন্যাক ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি প্রথমে বক্সারে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু রসদের অভাবে পাটনায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। পাটনার পশ্চিমস্থ সমস্ত প্রদেশ বিনা যুদ্ধেই মীর কাশিমের হস্তগত হইল এবং তিনি ও অযোধ্যার নবাব মিলিত হইয়া পাটনায় ইংরেজ শিবির অবরোধ করিলেন। পরে বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে

বক্সারে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈন্য তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল না।

বক্সার শিবিরে অবস্থানের সময় সমরু ও অন্যান্য কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে শুজাউদ্দৌল্লা মীর কাশিমের প্রতি খুবই খারাপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। যথেষ্ট অর্থ না দিতে পারায়, মীর কাশিমকে ভর্ৎসনা করিলেন। অর্থাভাবে সৈন্যদের বেতন দিতে না পারায় সমরু তাঁহার সেনাদল ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শুজাউদ্দৌল্লার আশ্রয় গ্রহণ করিল। তারপর সমরু নূতন প্রভুর আদেশে পুরাতন প্রভুর শিবির লুণ্ঠন করিয়া মীর কাশিমকে বন্দী করিয়া শুজাউদ্দৌল্লার শিবিরে নিয়া গেল। শুজাউদ্দৌল্লা নিরুদ্বেগে বক্সারে নৃত্যগীত উপভোগ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে মেজর মনরো ক্যারন্যাকের পরিবর্তে সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া বক্সার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আরার নিকটে নবাব সৈন্য তাঁহাকে বাধা দিতে গিয়া পরাজিত হইল। ইংরেজ সেনা বক্সারের নিকট পৌঁছিলে শুজাউদ্দৌল্লা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর তারিখের প্রাতে মীর কাশিমকে মুক্তি দিয়া শুজাউদ্দৌল্লা ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে ইংরেজদের জয় হইল। শাহ আলম অমনি ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিলেন। শুজাউদ্দৌল্লা ও মীর কাশিম রোহিলখণ্ডে পলায়ন করিলেন। ইংরেজ সৈন্য অযোধ্যা বিধ্বস্ত করিল। মীর কাশিম কিছুদিন রোহিলখণ্ডে ছিলেন—তাহার পরে সম্ভবত ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে অতি দরিদ্র অবস্থায় দিল্লীর এক জীর্ণ কুটিরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইংরেজের সহিত মীর কাশিমের যুদ্ধের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। পলাশীতে ক্লাইব মীর জাফর ও রায়দুর্লভের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই জিতিয়াছিলেন—এবং সেখানে বিশেষ কোন যুদ্ধও হয় নাই। কিন্তু মীর কাশিমের সৈন্যদল ইংরেজ সৈন্যের তিন চার গুণ বেশী ছিল। তাহারা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের পুনঃ পুনঃ পরাজয় এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করে যে ইংরেজরা সামরিক শক্তি ও নৈপুণ্যে ভারতীয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল এবং বাহুবলেই বাংলা দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

মীর কাশিমের পতনের অনতিকাল পরে গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্ট তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই : "নবাব কোন দিন আমাদের ব্যবসায়ের কোন অনিষ্ট করেন নাই। কিন্তু আমরা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অতি সামান্য ও তুচ্ছ কারণে প্রতিদিন তাঁহার শাসনব্যবস্থায় পদাঘাত করিয়াছি এবং তাঁহার কর্মচারী-

দের যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছি। বহু দিন পর্যন্ত নবাব অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন, কারণ তাঁহার আশা ছিল যে আমি এই সমুদয় দূর করিতে পারিব। তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিশোধ লন নাই।

"এই যুদ্ধের জন্য যে আমরাই দায়ী—এলিসের পাটনা আক্রমণই যে এই যুদ্ধের কারণ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে নাই। যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি মীর কাশিমের দিক হইতে ঘটনাগুলি বিচার করিবেন, তিনিই বলিবেন যে এলিসের পাটনা আক্রমণ বিশ্বাসঘাতকতার একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এবং ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে আমরা যে সব সন্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছি তাহা স্তোকবাক্য মাত্র এবং মীর কাশিমকে প্রতারিত করিয়া তাহার সর্বনাশ সাধনের উপায় মাত্র।

"যখন আমাদের সহিত মীর কাশিমের যুদ্ধ বাধিল তখন তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কোন সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন নাই। কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল যে সাহস ও প্রভুভক্তি দেখাইয়াছেন হিন্দুস্থানে তাহার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। তাঁহার রাজ্যের দূরতম প্রদেশে তাঁহার কোন প্রজা পাটনার যুদ্ধে পরাজয় ও তাঁহার পলায়নের চেষ্টার পূর্বে বিদ্রোহ করে নাই বা আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় নাই। প্রজারা যে তাঁহাকে ভালবাসিত ইহা তাহারই পরিচয়।

"মুঙ্গেরের হত্যাকাণ্ডের পূর্বে মীর কাশিম কোন নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেন নাই। কিন্তু তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিনি যাহা সহ্য করিয়াছিলেন, তাহার কথা এবং তাঁহার গুরুতর ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করিলে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডজনিত অপরাধও তত গুরুতর মনে হইবে না। ধনসম্পদশালী দেশের আধিপত্য হইতে কপর্দকহীন ভিখারী অবস্থায় প্রাণের জন্য পলায়ন—এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মস্তিষ্ক বিকৃত হইবার ফলে ও সাময়িক উত্তেজনার ফলে তিন বৎসরের পুঞ্জীভূত অপমানের প্রতিহিংসা গ্রহণে প্রণোদিত হইয়াই তিনি এই দুষ্কার্য করিয়াছিলেন, এ কথা স্মরণ করিলে আমরা তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে পারিব।"

ভ্যান্‌সিটার্টের এই উক্তি মোটামুটিভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু মীর কাশিম যে নিষ্ঠুর-প্রকৃতি ছিলেন না ইহা পুরাপুরি স্বীকার করা যায় না। অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি বহু নিষ্ঠুর কার্য করিয়াছিলেন। রামনারায়ণ যতদিন ইংরেজের আশ্রিত ছিলেন মীর কাশিম তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। যে কোন কারণেই হউক, ইংরেজরা যখনই রামনারায়ণকে আশ্রয় হইতে বঞ্চিত

করিল তখনই মীর কাশিম তাঁহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। তারপর ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়া পলায়ন করিবার পূর্বে তিনি কেবল ইংরেজ বন্দীদিগকে নহে, রামনারায়ণ, জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতি রাজ্যের কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেনের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি মীর কাশিমের কয়েকজন বিশিষ্ট সভাসদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং নবাবের অপকীর্তি ও সৎকীর্তি উভয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:

"মীর কাশিম বঙ্গীয় সেনানায়ক ও সিপাহীদলের প্রভুভক্তিতে বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া, অনেক সময়ে সামান্য কারণে অনেকের প্রাণদণ্ড করিতেও ইতস্তত করেন নাই। কিন্তু দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকার্যে অথবা পণ্ডিত সমাজের মর্যাদা রক্ষা কার্যে তিনি যেরূপ ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে তৎসময়ের আদর্শ নরপতি বলিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না। তিনি সপ্তাহে দুই দিবস যথারীতি বিচারাসনে উপবেশন করিতেন। নিম্নপদস্থ বিচারকগণের বিচার কার্যের পর্যালোচনা করিতেন। স্বয়ং অর্থী, প্রত্যর্থী ও তাহাদের সাক্ষীগণের বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া বিচার কার্য্য সম্পাদনা করিতেন। তাঁহার আমলে কোন রাজকর্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করিয়া 'হাঁ'কে 'না' করিয়া দিতে পারিতেন না। জমিদারদিগের উৎপীড়ন হইতে দুর্বল প্রজাদিগকে রক্ষা করা তাঁহার বিশেষ প্রিয় কার্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। সিরাজউদ্দৌল্লা বহু ব্যয়ে যে ইমাম বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি তাহার গৃহসজ্জা বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন।"

মীর কাশিম ইংরেজদের হস্তে পদে পদে যে ভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন তাহাতে স্বতঃই তাঁহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি হয়। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইংরেজদের যে সকল কার্যের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ ও পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করিয়াছেন, বেআইনী হইলেও মীর জাফরের আমল হইতেই তাহা প্রচলিত ছিল। মীরজাফর নবাব হইয়া যে সমুদয় পরওয়ানা দিয়াছিলেন তাহাতে বাংলা দেশের অভ্যন্তরে বিনা শুল্কে কোম্পানীর বাণিজ্য করিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। আর কোম্পানীর কর্মচারীরা মীরজাফরের আমল হইতে

এরূপ অবৈধ বাণিজ্য করিয়াছে এবং নবাবের কর্মচারীরা বাধা দিলে নিজেরাই তাঁহাদের বিচার করিয়া শাস্তি দিয়াছে।

মীর কাশিম যখন ইংরেজ কর্মচারীদিগকে ঘুষ দিয়া তাহাদের অনুগ্রহে মীরজাফরকে সরাইয়া নিজে নবাব হইয়াছিলেন তখন তাঁহার বোঝা উচিত ছিল যে ন্যায় হউক অন্যায় হউক ইংরেজ যে সব সুযোগ সুবিধা পাইয়াছে তাহা কখনও ত্যাগ করিবে না। বরং নূতন নূতন সুবিধার দাবী করিবে। নবাবী লাভের মূল্যস্বরূপ তিনিও অনেক নূতন সুবিধা ও অধিকার ইংরেজকে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংরেজের বেআইনী ব্যবসায় বন্ধ করিতে হইলে তাহাদের সহিত যে সন্ধির ফলে তিনি নবাব হইয়াছিলেন, সেই সন্ধিতেই তাহার উল্লেখ করা উচিত ছিল। তিনি বেশ জানিতেন ইংরেজ কখনও তাহাতে রাজী হইবে না। সন্ধির সময়ে এ প্রসঙ্গ না তোলায় তিনি প্রকারান্তরে ইহা মানিয়াই লইয়াছিলেন। সুতরাং পরে এই বিষয় লইয়া আপত্তি করার স্বপক্ষে যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু ন্যায়ের বা আইনের দোহাই দিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও উৎপীড়িতের পর্যায়ে ফেলা যায় না।

নিজের প্রভু, রাজা ও শ্বশুরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তিনি যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন তাহা কোন রকমেই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। কেহ কেহ মনে করেন বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা দ্বারা তিনি তাঁহার অপরাধের ক্ষালন করিয়াছেন। অবশ্য সিরাজউদ্দৌল্লার পরবর্তী নবাবদের সহিত তুলনা করিলে এ বিষয়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। বঙ্কিমচন্দ্র মীর কাশিমকে 'বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব' আখ্যা দিয়া বাঙালীর হৃদয়ে তাঁহাকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন। কিন্তু পূর্বে মীর কাশিমের নবাবী সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা স্মরণ করিলে বলিতে হইবে যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রদত্ত উপাধি কেবল আংশিক-ভাবে সত্য। মীর কাশিমের চার বৎসর নবাবীর মধ্যে প্রায় তিন বৎসর স্বাধীনভাবে তিনি বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই। তিনি স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মীর কাশিমকে স্বাধীন নবাব বলিয়া মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

৯। মীর কাশিমের পর (১৭৬৪-৬৬)

মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেই কলিকাতা কাউনসিল তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে পুনরায় মসনদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকল্প করেন। তদনুসারে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই মীরজাফরের সহিত ইংরেজদের এক নূতন সন্ধি হয়। মীরজাফর ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় নির্বাহার্থ বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা ইংরেজদিগকে দিলেন। ইংরেজদিগকে বিনা শুল্কে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিতে (কেবল লবণের উপর আড়াই টাকা শুল্ক থাকিবে) অনুমতি দিলেন। ১২,০০০ অশ্বারোহী ও ১২,০০০ পদাতিকের বেশী সৈন্য না রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। ইংরেজের একজন প্রতিনিধিকে মুর্শিদাবাদে স্থায়ীরূপে বসবাস করিতে অনুমতি দিলেন ; এবং ইংরেজ কোম্পানীকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিতে রাজী হইলেন। এই সমুদয় শর্তের বিনিময়ে ইংরেজগণ মীর কাশিমকে পদচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে পুনরায় নবাব করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

সন্ধির শর্ত ব্যতীত মীরজাফরের অনুরোধে কোম্পানী আরও কয়েকটি প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল।

১। মীরজাফর খোজা পিক্রুকে সৈন্য বিভাগে এবং মহারাজা নন্দকুমারকে দিওয়ানী বিভাগে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

২। যদি নবাবের কোন প্রজা বা কর্মচারী কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে নবাব দাবী করিলে তাহাকে (নবাবের নিকট) ফেরৎ পাঠাইতে হইবে।

৩। নবাবের কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ইংরেজরা সরাসরি তাহার বিচার করিতে পারিবেন না।

৪। নবাব ইংরেজ গভর্ণরের নিকট সৈন্য-সাহায্য চাহিলে অবিলম্বে তাহা পাঠাইতে হইবে এবং ইহার ব্যয় বাবদ নবাবকে কিছুই দিতে হইবে না।

বলা বাহুল্য, এই দ্বিতীয় বার নবাবী লাভের জন্যও মীরজাফরকে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ত্রিশ লক্ষ ব্যতীত আরও অনেক টাকা দিতে হইল।

মীরজাফর মেজর অ্যাডম্‌সের সৈন্যদলের সঙ্গে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই মুর্শিদাবাদে পৌঁছিয়া প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। নগরে কিছু গোলযোগ, মারামারি ও লুঠপাঠ আরম্ভ হইল কিন্তু ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন এবং যথারীতি নূতন নবাবের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইলেন।

মীর জাফর ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে পাটনায় পৌছিলেন এবং সুবাদারীর সনদ পাইবার জন্য শুজাউদ্দৌল্লার সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা চালাইতে লাগিলেন। বাদশাহকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ এবং উজীরকে ২ লক্ষ টাকা দিবার শর্তে তিনি প্রার্থিত বাদশাহী সনদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ইংরেজ কাউনসিল ইহা অনুমোদন করিলেন না। শুজাউদ্দৌল্লা ও বাদশাহের সহিত এরূপ গোপন কথাবার্তায় সন্দিহান হইয়া ইংরেজরা মীরজাফরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে পাটনা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতে বাধ্য করিল। তারপর বক্সার যুদ্ধের পর শাহ আলম উজীরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বারাণসীতে অবস্থান করিতেছিলেন। মীরজাফর ইংরেজদের অনুমতি লইয়া তাহার নিকট সুবাদারীর আবেদন জানাইয়া লোক পাঠাইলেন। বাদশাহ এই আবেদন মঞ্জুর করিয়া সুবাদারীর সনদ ও খিলাৎ পাঠাইলেন (জানুয়ারী, ১৭৬৫)। অল্পদিনের মধ্যেই মীরজাফরের গুরুতর পীড়া হইল। মৃত্যু আসন্ন জানিয়া তিনি ইংরেজ কর্মচারী ও প্রধান প্রধান ব্যক্তির সম্মুখে নাবালক পুত্র নজমুদ্দৌল্লাকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিয়া তাহাকে মসনদে বসাইলেন এবং নন্দকুমারকে তাহার দিওয়ান মনোনীত করিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী মীরজাফরের মৃত্যু হইল। কথিত আছে যে মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে তিনি মহারাজা নন্দকুমারের অনুরোধে মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী কিরীটেশ্বরীর মন্দির হইতে দেবীর চরণামৃত আনাইয়া পান করিয়াছিলেন।

মীরজাফরের মৃত্যুর পর ইংরেজ কাউনসিল নজমুদ্দৌল্লাকে এই শর্তে নবাব করিলেন যে তিনি নামে নবাব থাকিবেন, কিন্তু সমস্ত শাসনক্ষমতা একজন নায়েব-সুবাদারের হস্তে থাকিবে। ইংরেজের অনুমোদন ব্যতীত তিনি কোন নায়েব সুবাদার নিযুক্ত বা বরখাস্ত করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে ইংরেজই বাংলার শাসনভার গ্রহণ করিল। এই শর্তে নবাবী করিবার জন্য নজমুদ্দৌল্লা ইংরেজ গভর্ণর ও অন্যান্য সদস্যগণকে প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিলেন।

অতঃপর গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্ট অনুগত বাদশাহ শাহ আলমকে অযোধ্যা প্রদেশ দান করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার স্থানে ক্লাইব পুনরায় গভর্ণর হইয়া কলিকাতায় আসিলেন (মে, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি এই ব্যবস্থা উল্টাইয়া শুজাউদ্দৌল্লার সঙ্গে সন্ধি করিলেন। তাঁহাকে তাহার রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া হইল, বিনিময়ে তিনি নগদ ৫০ লক্ষ টাকা এবং এলাহাবাদের

উপর অধিকার ছাড়িয়া দিলেন। তারপর ক্লাইব শাহ আলমের সহিত সন্ধি করিলেন। এলাহাবাদ ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ড শাহ আলমকে দেওয়া হইল। তৎপরিবর্তে বাদশাহ ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ান নিযুক্ত করিয়া এক ফরমান দিলেন। নবাবের সহিত সন্ধির ফলে বাংলার সৈন্যবল ও শাসনক্ষমতা পূর্বেই ইংরেজের হস্তগত হইয়াছিল।

দিওয়ানী পাইবার পর রাজস্ব আদায়ের ভারও ইংরেজরা পাইল। স্থির হইল যে প্রতি বৎসর আদায়ী রাজস্ব হইতে মুর্শিদাবাদের নাম-সর্বস্ব নবাব ৫৩ লক্ষ এবং দিল্লীর নাম-সর্বস্ব বাদশাহ ২৬ লক্ষ টাকা পাইবেন। বাকী টাকা ইংরেজরা ইচ্ছামত ব্যয় করিবে। নবাবের বার্ষিক বৃত্তি কমাইয়া ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪১ লক্ষ এবং ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩২ লক্ষ করা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বাংলার নবাবী আমল ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দেই শেষ হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

মুসলিম যুগের উত্তরার্ধের রাজ্যশাসনব্যবস্থা

ক। বারো ভুঞার যুগ

জাহাঙ্গীরের রাজত্বে এবং সুবাদার ইসলাম খাঁর কঠোর নীতিতে, বাংলায় মুঘল শাসনপ্রণালী দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আকবরের হস্তে দাউদ খান কররানীর পরাজয়ের পরে প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বাংলায় কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ শাসন প্রণালী ছিল না। বারো ভুঞা নামে পরিচিত বাংলার জমিদারগণ স্বেচ্ছামত নিজের নিজের রাজ্য শাসন করিতেন। সুতরাং ইহা বারো ভুঞার যুগ বলা যাইতে পারে। পরবর্তীকালে বাঙালীর কল্পনায় এই যুগ এক নূতন রূপে চিত্রিত হইয়াছে। মুঘলদের সঙ্গে বারো ভুঞার সংঘর্ষ বাঙালীর স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে এবং বাংলায় যে সকল জমিদার মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অপূর্ব বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেম রঙীন কল্পনায় রঞ্জিত হইয়া সাহিত্যে ও বাঙালীর মনে উজ্জ্বল রেখাপাত করিয়াছে।

বারো ভুঞাদের প্রায় সকলেই এই যুগসন্ধির অরাজকতার সুযোগ লইয়া বাংলার নানাস্থানে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহারা কোন প্রাচীন বংশের প্রতিনিধি নহেন এবং নিজের সম্পত্তি রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু বাঙালীর কল্পনায় যাঁহারা বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহার যোগ্য নহেন। প্রতাপাদিত্য অতুলনীয় বীর ও দেশপ্রেমিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন যুদ্ধেই বীরত্ব দেখাইতে পারেন নাই এবং বাঙালী জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘল সুবাদারকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। যাঁহারা বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন—ঈশা খাঁ, উসমান প্রভৃতি—তাঁহাদের অধিকাংশই মুসলমান। যে অর্থে মুঘলেরা বাংলায় বিদেশী, সে অর্থে এই সব পাঠানেরাও বিদেশী। পাঠানেরাও হিন্দুদের উপর অত্যাচার কম করেন নাই এবং স্বার্থের খাতিরে বাংলার হিন্দুদের সহিত একত্র হইয়া সাধারণ শত্রু মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং বারো ভুঞার যুগ হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত

বাঙালী জাতির বিদেশী মুঘল শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে সংগ্রামের যুগ—এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। মুঘলরা বাংলা দেশ অধিকার না করিলে হয় বারো ভুঞার অরাজকতার যুগই চলিত, নয় তো কোন মুসলমান জমিদার বাংলায় একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়া আবার পাঠান যুগের প্রবর্তন করিত। কারণ কোন হিন্দুকে যে মুসলমানেরা রাজা বলিয়া স্বীকার করিত না, হিন্দু রাজা গণেশ ও তাঁহার মুসলমান ধর্মাবলম্বী পুত্রের ইতিহাস স্মরণ করিলেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। মুর্শিদ কুলী খাঁর সময় হইতে বাংলার মুসলমান নবাবগণ বাংলা দেশেই স্থায়িভাবে বসবাস করিতেন। সিরাজউদ্দৌল্লা, মীর কাশিম প্রভৃতিকেও বাঙালীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে বাংলা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের নায়ক বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়া পাঠান জমিদারদের মুঘল শক্তির সহিত যুদ্ধের সঙ্গে ইহার কোন প্রভেদ নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে মুঘলরাজ বিদেশী শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইত—তাঁহারাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাঠান জমিদারদের ন্যায় বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বদেশ-প্রেমিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই দুইয়ের তুলনা করিলেই দেখা যাইবে যে জাতীয়তা এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের দিক দিয়া বারো ভুঞার যুগের সহিত নবাবী আমলের বাংলার যুগের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। সিরাজউদ্দৌলা ও মীর কাশিমের বিরুদ্ধে যাঁহারা ইংরেজের সহিত চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের কল্পনা মুঘল যুগের প্রারম্ভের ক্ষেত্রেও যেরূপ, ইংরেজ আমলের প্রথম ভাগের ক্ষেত্রেও সেরূপ অলীক ও সম্পূর্ণরূপে অনৈতিহাসিক।

খ। মুঘল শাসনপ্রণালী

মুঘল সাম্রাজ্য কয়েকটি সুবায় (প্রদেশে) বিভক্ত ছিল এবং প্রতি সুবার শাসন প্রণালী মোটামুটি এক রকমই ছিল। ব্রিটিশ যুগের বাংলা প্রদেশ অপেক্ষা সুবে বাংলা অধিকতর বিস্তৃত ছিল। পূর্ণিয়া ও ভাগলপুর জিলার কতক অংশ এবং শ্রীহট্ট জিলা বাংলা সুবার অন্তর্গত ছিল। চট্টগ্রাম জিলা প্রথমে আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সুবে বাংলার সহিত যুক্ত হয়।

প্রত্যেক প্রদেশেই একজন সুবাদার বা প্রধান শাসন কর্তা এবং আরও কয়েক-জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। সাধারণ রাজস্বের জন্য দিওয়ান, সামরিক ব্যয় নির্বাহের জন্য বখ্‌শী—এই দুই বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহারা অনেক পরিমাণে সুবাদারের যথেচ্ছ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করিতেন। বকাইনবিশ নামে একজন কর্মচারী প্রাদেশিক সমস্ত ঘটনার বিবরণ সোজাসুজি বাদশাহের নিকট পাঠাইতেন। সুবাদার সম্বন্ধে সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ এইভাবে বাদশাহের কাছে পৌঁছিত। এই কয়জন কর্মচারীই বাদশাহ কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং পরস্পরের কার্যে ক্ষমতার অপব্যবহার অনেকটা সংযত করিতে পারিতেন। নিম্নতর কর্মচারীদের মধ্যে কতক ছিলেন বাদশাহী মনসবদার—ইহারা সুবাদারের নিযুক্ত কর্মচারীদের অপেক্ষা অধিক সম্মানের দাবী করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে সুবাদারের বিরুদ্ধে বাদসাহের নিকট অভিযোগ করিতে পারিতেন। কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলে সুবাদারকে বাদশাহের উপদেশ, নির্দেশ ও মতামত লইতে হইত। কোন সুবাদার ইহা না করিয়া বেশী রকম স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে বাদশাহ তাঁহার বিরুদ্ধে কঠোর পরওয়ানা জারি করিতেন এবং কখনও কখনও সুবাদারের কার্য তদন্ত করিবার জন্য রাজধানী হইতে উচ্চপদস্থ কোন লোক পাঠাইতেন।

সুবাদারের অধীনস্থ কর্মচারীদের উন্নতি অবনতি বাদশাহের উপর নির্ভর করিত। অবশ্য সুবাদারের নিকট হইতে প্রত্যেকের কার্য সম্বন্ধে রিপোর্ট যাইত। সুবাদারদের উপর কড়া আদেশ ছিল যে রিপোর্টে যেন খাঁটি সত্য কথা বলা হয় এবং ইহা কোন রকম পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট না হয়। কিন্তু কর্মচারীরাও অনেক সময় অন্য লোক দিয়া বাদশাহের নিকট সুপারিস করাইতেন এবং বাদশাহের দরবারে উপহার বা পেশকাশ পাঠাইতেন। মির্জা নাথান নিজের পদোন্নতির জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরকে উপঢৌকন-স্বরূপ হস্তী ও অন্যান্য যে দ্রব্যাদি পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মূল্য ছিল ৪২, ০০০ টাকা।

ভূমির রাজস্বই ছিল সুবার প্রধান আয়। মোটামুটি তিন শ্রেণীর জমি ছিল। প্রথম, খালিসা শরিফা অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে সরকারের অধীন। দ্বিতীয়, কর্মচারীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য—জায়গীর। তৃতীয়, প্রাচীন জমিদার অথবা সামন্তরাজার জমি।

খালিসা জমির খাজনা কখনও কখনও সরকারী কর্মচারীরাই আদায় করিতেন কিন্তু বেশীর ভাগ ইজারাদারেরাই আদায় করিত। নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবার অঙ্গীকারে ইহারা এক একটা পরগনা ইজারা লইত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির কতকটা কর্মচারীর ব্যক্তিগত আর কতকটা চাকরাণ জমির মত কর্মচারীদিগকে বেতনের পরিবর্তে দেওয়া হইত।

বারো ভুঞা বা পাঠান যুগের অন্যান্য যে সকল স্বাধীন রাজা মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা অনেকেই তাঁহাদের পূর্বতন সম্পত্তি পুরাপুরি বা আংশিকভাবে ভোগ করিতেন এবং নির্দিষ্ট খাজানা দিতেন। আভ্যন্তরিক শাসন বিষয়ে তাঁহাদের যথেষ্ট ক্ষমতা ও অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল। অধীনস্থ জমিতে শান্তিরক্ষা, বিচার করা প্রভৃতি অনেক ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল।

গ। নবাবী আমলের শাসনপ্রণালী

মুর্শিদ কুলী খানের সময় হইতে এই ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়। তিনি দিওয়ান হইয়া যখন বাংলায় আসিলেন, তখন প্রায় সমস্ত খাস জমিই কর্মচারীদের জায়গীরে পরিণত হইয়াছে। জমিদারদের মধ্যেও অনেকেই অলস, অকর্মণ্য ও বিলাসী হওয়ায় নিয়মিত রাজস্ব দিত না। তিনি এই উভয় প্রকার জমির রাজস্ব আদায়ের জন্যই নূতন ইজারাদার নিযুক্ত করিলেন। জমিদার নামে মাত্র রহিলেন, কিন্তু ইজারাদারদের হাতেই তাঁহাদের রাজস্ব আদায়ের ভার পড়িল। ইজারাদারেরা যে রাজস্ব আদায় করিতেন, তাহার জন্য পূর্বেই তাঁহাদিগকে জামিন স্বরূপ মোটা-মুটি সেই টাকার পরিমাণ কড়ারী খত সই করিয়া দিতে হইত। সংগৃহীত রাজস্বের এক অংশ তাঁহারা পাইতেন। পূর্বেকার মুসলমান ইজারাদারেরা রাজস্ব আদায় করিয়াও ন্যায্য টাকা জমা দিতেন না—অধিকাংশই আত্মসাৎ করিতেন। এইজন্য মুর্শিদ কুলী খান বেশীর ভাগ হিন্দুদের মধ্য হইতেই নূতন ইজারাদার নিযুক্ত করিতেন। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে প্রাচীন জমিদারেরা প্রায় লুপ্ত হইল এবং নূতন ইজারাদারেরা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া দুই তিন পুরুষের মধ্যেই রাজা, মহারাজা প্রভৃতি উপাধি পাইলেন। এইরূপে বাংলা দেশে নূতন এক হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। ইংরেজ যুগে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর এই সব ইজারাদারের বংশধরেরাই উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইলেন। পরবর্তী কালের নাটোর, দীঘাপতিয়া, মুক্তাগাছা প্রভৃতি স্থানের প্রবল জমিদারগণের উৎপত্তি এই ভাবেই হইয়াছিল

অবশ্য বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, সুসঙ্গ, বীরভূম, বিষ্ণুপুর প্রভৃতির জমিদারগণ মুর্শিদ কুলী খানের সময়ের পূর্ব হইতেই ছিলেন। কুচবিহার, ত্রিপুরা ও জয়ন্তিয়া—এই তিনটি পুরাতন রাজ্য স্বাধীনতা হারাইয়া নবাবের বশ্যতা স্বীকার করিয়া করদ রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল।

সকল জমিদারই সম্পূর্ণরূপে মুঘল সুবাদারের আনুগত্য স্বীকার করিত। কেবলমাত্র সীতারাম রায় ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম এবং পুরাতন বারো ভুঞাদের মতনই স্বাধীনচেতা। তাঁহার পিতা ভূষণার মুসলমান ফৌজদারের অধীনে একজন সামান্য রাজস্ব-আদায়কারী ছিলেন। সীতারাম প্রথমে বাংলার সুবাদারের নিকট হইতে নলদি (বর্তমান নড়াইল) পরগনার রাজস্ব আদায়ের ভার পান (১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দ)। কথা ছিল যে তিনি নিয়মিতভাবে সুবাদারের প্রাপ্য রাজস্ব দিবেন এবং বিদ্রোহী আফগান ও দস্যুর দল হইতে ঐ অঞ্চল রক্ষা করিবেন। তাঁহার সততা ও দক্ষতার ফলে বাংলার সুবাদার আরও কতকগুলি পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভারও তাঁহার হাতে দেন। এইভাবে সীতারাম একদল সৈন্য সংগ্রহ করেন। তিনি সুবাদারকে নিয়মিত টাকা পাঠাইয়া সন্তুষ্ট রাখিতেন এবং প্রবাদ এই যে, তিনি দিল্লীর বাদশাহকে উপঢৌকন পাঠাইয়া রাজা উপাধি গ্রহণের ফরমান লাভ করেন। তাঁহার খ্যাতি ও প্রতাপে আকৃষ্ট হইয়া বহু বাঙ্গালী সৈন্য তাঁহার সহিত যোগ দেয় এবং তিনি ভূষণা হইতে দশ মাইল দূরে মধুমতী নদীর তীরে বাগজানী গ্রামে এক সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করিয়া সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। কথিত আছে যে, একজন মুসলমান ফকীরের অনুরোধে তিনি নূতন রাজধানীর নাম রাখেন মহম্মদপুর। এবং অনেক মন্দির, সুরম্য হর্ম্য, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণ এবং বৃহৎ বৃহৎ দীঘি কাটাইয়া ইহার গৌরব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। প্রথমে সুবাদার ইব্রাহিম খানের (১৬৮৯-১৬৯৭) দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা এবং পরে সুবাদার আজিমুস্সানের সহিত মুর্শিদ কুলী খানের কলহের সুযোগ লইয়া তিনি পার্শ্ববর্তী জমিদারদিগের ধনসম্পত্তি লুঠ করেন এবং সরকারী রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করেন। অবশেষে ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হুগলীর ফৌজদারকে হত্যা করেন। এইবার মুর্শিদ কুলী খান সীতারামের শক্তি ও ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্য ভূষণার ফৌজদারকে একদল সৈন্যসহ পাঠাইলেন। পার্শ্ববর্তী জমিদারদের সেনাদলও সুবাদারের ফৌজের সহিত যোগ দিল। এই মিলিত বাহিনীর সহিত যুদ্ধে সীতারাম পরাজিত ও সপরিবারে বন্দী হইলেন এবং তাঁহার

রাজধানী ধ্বংস করা হইল। এইরূপে বাংলার শেষ হিন্দু রাজ্যের পতন হইল। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে অমর করিয়া গিয়াছেন।

যে সকল জমিদার নিয়মমত রাজস্ব দিতেন মুর্শিদ কুলী খান তাঁহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন এবং কোন উপরি পাওনার দাবী করিতেন না। কিন্তু নির্ধারিত তারিখে রাজস্ব জমা দিতে না পারিলে তিনি রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারী ও জমিদারদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতেন। তাঁহাদিগকে কাছারীতে বন্ধ করিয়া রাখা হইত। খাদ্য বা পানীয় কিছুই দেওয়া হইত না। ঐ রুদ্ধ কক্ষেই মলমূত্র ত্যাগ করিতে হইত। অনেক সময় মাথা নীচু ও পা উপরের দিকে করিয়া তাঁহাদিগকে ঝুলাইয়া রাখিয়া বেত্রাঘাত করা হইত। বিষ্ঠাপূর্ণ গর্তে তাহাদিগকে ডুবাইয়া রাখা হইত, এই গর্তের নাম দেওয়া হইয়াছিল বৈকুণ্ঠ! অনেক সময় খাজনা দিতে না পারার অপরাধে হিন্দু আসিল, জমিদার প্রভৃতিকে স্ত্রীপুত্রসহ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা হইত। বলা বাহুল্য যে এই সব আসিল ও জমিদারগণও প্রজাদের উপর নানা রকম অত্যাচার করিয়া খাজনা আদায় করিতেন। বাদশাহের দরবারে এই সব অত্যাচারের কাহিনী পৌঁছিত, কিন্তু কোন প্রতিকার হইত না। শুজাউদ্দীন নবাব হইয়া বন্দী জমিদারদিগকে মুক্তি দিলেন এবং মুর্শিদ কুলীর যে দুইজন অনুচর পূর্বোক্তরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার করিত, তদন্ত করিয়া তাহাদের দোষ সাব্যস্ত হইলে পর তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

মুর্শিদ কুলী খান রাজস্বের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইহার ফলে প্রজাদের করভার অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইল। ইহাতে তাহাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। ওদিকে প্রতি বৎসর মুর্শিদ কুলীর কোষাগারে বহু অর্থ সঞ্চিত হইত। শুজাউদ্দীনের আমলেও মোট রাজস্বের পরিমাণ পূর্বের ন্যায় ১,৪২,৪৫,৫৬১ টাকা ছিল। কিন্তু তিনি অতিরিক্ত কর (আবওয়াব) বাবদ ১৯,১৪,০৯৫ টাকা আদায় করিতেন।

মুর্শিদ কুলী খানের প্রতিষ্ঠিত নবাবী আমলে বাংলায় হিন্দু জমিদারদের উৎপত্তি ছাড়াও আর একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বাদশাহী আমলে সুবাদার, উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ও মনসবদারগণ দিল্লী হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিত এবং নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হইলে বাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু নবাবী আমলে বংশানুক্রমিক 'আজীবন সুবাদারেরা বাংলা দেশেরই চিরস্থায়ী বাসিন্দা'

হইলেন। দিল্লীর দরবারের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার ফলে বাংলার অধিবাসীরাই সরকারী সকল পদে নিযুক্ত হইলেন। মুর্শিদ কুলী খান গুণের আদর করিতেন এবং তাঁহার আমলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দুগণ উত্তমরূপে ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া কর্মকুশলতার ফলে বহু উচ্চপদ অধিকার করিতে লাগিলেন। এইভাবে মুসলমান যুগে সর্বপ্রথম হিন্দুদের মধ্যে এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইল। ইহাদের কেহ কেহ নবাবের অনুগ্রহে জমিদারী লাভ করিয়া অথবা কার্যে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া বহু ধন অর্জন করিয়া রাজা, মহারাজা প্রভৃতি খেতাব পাইলেন। জগৎ শেঠের ন্যায় ধনী হিন্দুরাও ক্রমে নবাবের দরবারে খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। মুর্শিদ কুলী খানের পরবর্তী নবাবেরাও এই নীতি অনুসরণ করায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এক হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল।

মুর্শিদ কুলীর অধীনে ষোল জন খুব বড় জমিদার ছিলেন এবং ৬১৫টি পরগণার খাজনা তাঁহারাই আদায় করিতেন। ছোট ছোট জমিদার ও তালুকদারদের হস্তে আরও প্রায় ১৬০০ পরগণার খাজনা আদায়ের ভার ছিল। ছোট বড় জমিদারদের প্রায় তিন চতুর্থাংশ এবং তালুকদারদের অধিকাংশই হিন্দু ছিল। আজকাল হিন্দুদের মধ্যে দস্তিদার, সরকার, বক্সী, কানুনগো, চাকলাদার, তরফদার, লস্কর, হালদার প্রভৃতি উপাধিধারীদের পূর্বপুরুষগণ মুর্শিদ কুলীর আমলে বা তাঁহার পরবর্তী কালে ঐ সকল রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নবাব আলীবর্দীর আমলে হিন্দুদের প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া যায়। মুর্শিদ কুলী খানের বংশকে সরাইয়া তিনি নিজে নবাবী পদ লাভ করিয়াছিলেন, এই জন্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা তাঁহার প্রতি সদয় ছিল না। সুতরাং তিনি আত্মরক্ষার্থে হিন্দুদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতেন। ইহারাও তাঁহার খুব অনুগত ছিল এবং ইহাদের সাহায্য তাঁহার রাজ্যের স্থিতি ও শক্তিবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ইহাদের মধ্যে জানকীরাম, দুর্লভরাম, দর্পনারায়ণ, রামনারায়ণ, কিরীটচাঁদ, উমিদ রায়, বিরুদত্ত, রামরাম সিং ও গোকুলচাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেক হিন্দু উচ্চ সামরিক পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ সাতহাজারী মনসবদার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অনেক হিন্দু সেনানায়ক উড়িষ্যার যুদ্ধে এবং আফগান বিদ্রোহ দমন করিতে আলীবর্দীকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

কিন্তু তথাপি হিন্দু জমিদারেরা মুসলমান নবাবীর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল গ্রন্থের সূচনায় কৃষ্ণচন্দ্রের লাঞ্ছনাকারী আলীবর্দীর বিরুদ্ধে

অসন্তোষ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একখানি পত্রে কোম্পানীর একজন ইংরেজ কর্মচারী তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছেন যে 'হিন্দু রাজা এবং প্রজা সকল শ্রেণীর লোকই মুসলমান শাসনে অসন্তুষ্ট এবং মনে মনে তাহাদের দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা পোষণ করে এবং ইহার সুযোগ সন্ধান করে।'

বস্তুত এই যুগে কি হিন্দু কি মুসলমান কাহারও দেশের বা নবাবের প্রতি কোন ভক্তি বা ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায় না। সরফরাজ নবাবীর জন্য তাঁহার পিতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের শেঠেরা নবাব সরফরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া আলীবর্দীকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, আবার আলীবর্দীর দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া মীর জাফরকে সিংহাসনে বসাইলেন। মীর জাফরের প্রতি অনেক জমিদারই অসন্তুষ্ট ছিলেন। মীর কাশিম বহু হিন্দু জমিদারকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং অনেককে নির্মমরূপে হত্যা করেন। হিন্দু জমিদারেরাও তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিল। বহু হিন্দু জমিদার ও মুসলমান সেনানায়ক মীর কাশিমের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন। দেশের এই অবস্থার জন্য শাসনপ্রণালীই যে অনেক পরিমাণে দায়ী, তাহা অস্বীকার করা কঠিন। অতিরিক্ত করভারে প্রপীড়িত জমিদার ও প্রজাদের মনে সর্বদাই অসন্তোষের আগুন জ্বলিত—নবাবের ব্যবহার তাহাতে ইন্ধন যোগাইত। অস্থিরমতি স্বেচ্ছাচারী নবাব কখন কাহার কি সর্বনাশ করেন সেই ভয়েই সকলে অস্থির থাকিত। মুর্শিদ কুলী খান যে কোন কোন সময়ে ঘৃণিত উপায়ে জমিদারদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেন, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবাব আলীবর্দী উড়িষ্যায় যে অত্যাচার করিয়াছিলেন (বিশেষত ভুবনেশ্বরে), হিন্দুধর্মের উপর যে দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন, তাহা ভারতচন্দ্র কয়েকটি পংক্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন। "এই দুরাত্মা যবনের" দৌরাত্ম্য দেখিয়া নন্দী :

"মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল।
করিব যবন সব সমূল নির্মূল॥"

কিন্তু শিব বারণ করিলেন, বলিলেন মারাঠারাই এই অত্যাচারের শাস্তি দিবে। কবি লিখিয়াছেন বাংলায় মারাঠাদের অত্যাচার নবাবের দুষ্কৃতিরই ফল :

"লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী।
সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী।"

১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ আলীবর্দীর জীবিতকালেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি যে হিন্দুদিগের খুব প্রিয় ছিলেন না, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

মুঘল সাম্রাজ্য হইতে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা লাভ করিবার পর বাংলায় যে সব নবাব রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মুর্শিদ কুলী ও আলীবর্দীই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ তাঁহারাও প্রজাগণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের তুলনায় অন্য তিনজন নবাব শাসন ব্যাপারে নিতান্ত অযোগ্য এবং প্রত্যেকেই অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। সুতরাং স্বার্থান্বেষী অনুগৃহীত দলের হাতেই শাসনভার ন্যস্ত থাকিত। ইহার ফলে শাসন-ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হইল এবং রাজ্যে দুর্নীতির স্রোত বহিতে লাগিল।

দেশের সামরিক ব্যবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। নবাবেরা প্রকাণ্ড সৈন্যদল পুষিতেন কিন্তু তাহাদের বেতন নিয়মিত ভাবে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বেতন বাকী পড়ায় তাহারা সর্বদাই অসন্তুষ্ট থাকিত এবং কখনও কখনও বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। শিক্ষা ও কৌশলে ইউরোপীয় সৈন্যের তুলনায় তাহারা প্রায় নগণ্য ছিল। পুনঃ পুনঃ স্বল্পসংখ্যক ইংরেজ সৈন্যের হস্তে বিপুল নবাবী সৈন্যদলের পরাজয়ই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অবশ্য বিশ্বাস-ঘাতকতাও এই সমুদয় পরাজয়ের অন্যতম কারণ। মীর কাশিম ইউরোপীয় প্রথায় তাঁহার একদল সৈন্যকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনানায়কদের বিশ্বাসঘাতকতা ও কর্তব্যে অবহেলায় তাঁহার পুনঃ পুনঃ পরাজয় ঘটিয়াছে। সিরাজউদ্দৌলার যুদ্ধবিদ্যায় কিছুমাত্র জ্ঞান থাকিলে তিনি মোহনলালকে ফিরিতে আদেশ দিতেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একটির পর একটি যুদ্ধে মীর কাশিমের ভাগ্য নির্ণয় হইতেছিল—কিন্তু তিনি ইহার কোন যুদ্ধেই উপস্থিত ছিলেন না।

আলীবর্দীর মৃত্যুর পর দশ বৎসরের মধ্যে যে ইংরেজ শক্তি বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার প্রধান কারণ—সমরকৌশলের অভাব, নবাবদের চরিত্রহীনতা, প্রধান প্রধান বাঙালী নায়কদের মধ্যে প্রায় সকলেরই মনুষ্যত্বের অভাব, স্বার্থপরতার চরম বিকাশ ও সাধারণ লোকের রাজনীতি-বিষয়ে গভীর ঔদাসীন্য। অসত্য, বিশ্বাসঘাতকতা, ক্রূরতা, স্বার্থপরতা, বিলাস-ব্যসন ও

ইন্দ্রিয়পরায়ণতা—ইহাই ছিল তৎকালে বাঙ্গালীর স্বাভাবিক প্রকৃতি। হিন্দু মুসলমান উভয়েরই যে পুরুষত্বের ও সৎ চরিত্রের অভাব চরমে পৌঁছিয়াছিল, তাহাই বাংলার অধঃপতনের ও অবনতির প্রধান কারণ। পলাশীর যুদ্ধের ন্যায় কোন আকস্মিক কারণে ইহা ঘটে নাই, বহুদিন হইতেই ইহার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক অবস্থা

মুসলমান বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে পাল ও সেন রাজগণের আমলের রাজাদের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া যায় না। সে যুগে সম্ভবত প্রাচীন কালের মুদ্রারই প্রচলন ছিল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছোটখাট ব্যাপারে কড়িই মুদ্রার কাজ করিত।

মুসলমান যুগে প্রত্যেক স্বাধীন সুলতানই নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতেন। বস্তুত ইহাই তখন স্বাধীনতার প্রধান প্রতীক ছিল। বাংলার মুসলমান সুলতানেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াই নিজের নামে মুদ্রা বাহির করিতেন। এই সব মুদ্রায় তারিখ থাকিত। কয়েকজন সুলতানের অস্তিত্ব এবং অনেক স্থলে সুলতানদের সঠিক তারিখ কেবল মুদ্রা হইতেই জানা যায়। বাংলা দেশ দিল্লী সরকারের অন্তর্গত হইলে দিল্লীর সুলতানের মুদ্রাই চলিত। সপ্তদশ শতকের পর হইতে মুঘল সম্রাটগণের মুদ্রাই বাংলায় প্রচলিত ছিল। রূপার মুদ্রার নাম ছিল 'টঙ্ক'—ইহা হইতেই টাকা শব্দের উৎপত্তি। প্রতি টঙ্কতে (চীন দেশীয়) ২৯/৩২ আউন্স রূপা থাকিত।[১] সাধারণ কেনা বেচায় কড়ি ব্যবহৃত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চারি পাঁচ হাজার (কাহারও মতে আড়াই হাজার) কড়ি এক টাকার সমান ছিল।[২] হিন্দু যুগের শেষ পাঁচ শত বৎসরে অনেক পরাক্রান্ত রাজা ও সম্রাট বাংলা দেশে রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহারা কেন নিজ নামে মুদ্রা বাহির করেন নাই এবং মুসলমান সুলতানগণ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নিজ নামে কেন মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন, এ রহস্যের কোন মীমাংসা আজ পর্যন্তও হয় নাই।

স্বাধীন সুলতানী আমলে অর্থাৎ দ্বাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা দেশ ধন-সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। দেশের শস্য-সম্পদ, শিল্প ও বাণিজ্যই ইহার প্রধান কারণ। আর একটি রাজনীতিক কারণও ছিল।

---

(১) Visvabharati Annals. Vol. I. P. 99

(২) K. K. Datta, History of Bengal Subah, p. 464 ff.

সপ্তদশ শতকের আরম্ভেই মুঘল শাসন বাংলা দেশে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুবায় পরিণত হয়। ইহার পূর্বে চারি শতাব্দীতে বাংলা দেশ অধিকাংশ সময়ই স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। এই সময় বাংলার ধন-সম্পদ বাংলায়ই থাকিত, সুতরাং বাংলা দেশ খুবই সম্পদশালী ছিল।

অপর দিকে মুঘল যুগে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হইয়া শান্তি স্থাপন ও উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থার ফলে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি হইয়াছিল। ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতি—ইংরেজ, ফরাসী ওলন্দাজ প্রভৃতি বাংলা দেশে বাণিজ্য বিস্তার করায় বহু অর্থাগম হইত। ১৬৮০—১৬৮৪ এই চারি বৎসরে কেবলমাত্র ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ষোল লক্ষ টাকার জিনিষ কিনিয়াছিল। ওলন্দাজেরাও ইহার চেয়ে বেশী ছাড়া কম জিনিষ কিনিত না। সুতরাং এই দুই কোম্পানীর নিকট হইতে প্রতি বৎসর আট লক্ষ রূপার টাকা বাংলায় আসিত। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে দ্রব্যের যে মূল্য ছিল সেই অনুপাতে প্রতি বৎসর এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা এই দুইটি ইউরোপীয় কোম্পানী দিত। ইহা ছাড়া অন্য দেশের সহিত বাণিজ্য তো ছিলই।

কিন্তু সম্পদ যেমন বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তেমন কমিবারও ব্যবস্থা হইল। মুঘল শাসনের যুগে দুই কারণে বাংলার ধন শোষণ হইত। প্রথমত বাৎসরিক রাজস্ব হিসাব বহু টাকা দিল্লীতে যাইত। দ্বিতীয়ত সুবাদার হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় কর্মচারিগণ দিল্লী হইতে নিযুক্ত হইতেন এবং অধিকাংশই ছিলেন অবাঙালী! তাঁহারা অবসর গ্রহণ করিবার সময় সৎ ও অসৎ উপায়ে অর্জিত বহু অর্থ সঙ্গে লইয়া নিজের দেশে ফিরিয়া যাইতেন।

বাংলাদেশ হইতে মুর্শিদ কুলী খাঁর আমলে উদ্বৃত্ত রাজস্ব গড়ে এক কোটি টাকা প্রতি বৎসর বাদশাহের নিকট পাঠান হইত। শুজাউদ্দীন প্রতি বৎসর এক কোটি পচিশ লক্ষ টাকা পাঠাইতেন। তাঁহার ১২ বৎসর রাজত্বকালে মোট ১৪,৬২,৭৮,৫৩৮ টাকা দিল্লীতে প্রেরিত হয়। পূর্বেকার সুবাদারগণও এইরূপ রাজস্ব পাঠাইতেন এবং পদত্যাগ করিয়া যাইবার সময় সঞ্চিত বহু টাকা সঙ্গে লইয়া যাইতেন। শায়েস্তা খাঁ বাইশ বৎসরে আটত্রিশ কোটি এবং আজিমুদ্দীন (আজিমুসসান) নয় বৎসরে আট কোটি টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলন এবং এই টাকাও বাংলা দেশ হইতে দিল্লীতে গিয়াছিল। অন্যান্য সুবাদার ও কর্মচারীরা কত টাকা বাংলা দেশ হইতে লইয়া গিয়াছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় না। এই পরিমাণ

রূপার টাকা গাড়ী বোঝাই হইয়া দিল্লীতে চলিয়া যাইত। এইরূপ শোষণের ফলে রৌপ্যমুদ্রার চলন অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাসের ইহাই প্রধান কারণ। সাধারণ লোকে টাকা জমাইতে পারিত না; ফলে, তাহাদের মূলধনও ক্রমশ কমিতে লাগিল। সম্ভবত এই কারণেই বিনিময়ের জন্য কড়ির খুব প্রচলন ছিল। অবশ্য কড়ি ইহার পূর্ব হইতেই মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত।

বাংলাদেশে নানাবিধ উৎকৃষ্ট শিল্প প্রচলিত ছিল। বস্ত্র শিল্প খুবই উন্নত ছিল এবং ইহা দ্বারা বহু লোক জীবিকা অর্জন করিত। বাংলার মসলিন জগদ্বিখ্যাত ছিল। এই সূক্ষ্ম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকা। এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে মসলিন বিদেশে রপ্তানি হইত। ইরাক, আরব, ব্রহ্মদেশ, মলাক্কা ও সুমাত্রায় বাংলার কাপড় যাইত। ইউরোপে খুব সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রের বিস্তর চাহিদা ছিল। ইহা এমন সূক্ষ্ম হইত যে ২০ গজ মসলিন নস্যের ডিবায় ভরিয়া নেওয়া যাইত। ইহার বয়ন কৌশল ইউরোপে বিস্ময়ের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। মসলিন ছাড়া অন্যান্য উৎকৃষ্ট বস্ত্রও ঢাকায় তৈয়ারী হইত। ইংরেজ কোম্পানীর চিঠিতে ঢাকায় তৈয়ারী নিম্নলিখিত বস্ত্রসমূহের উল্লেখ আছে—সরবতী, মলমল, আলাবালি, তঞ্জীব, তেরিন্দাম, নয়নসুখ, শিরবান্ধানি (পাগড়ি), ডুরিয়া, জামদানী[১]। অতি সূক্ষ্ম মসলিন হইতে গরীবের জন্য মোটা কাপড় সবই ঢাকায় তৈরী হইত। বাংলার বহুস্থানে বস্ত্র বয়নের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল।

মির্জা নাথান মালদহে ৪,০০০ টাকা দিয়া একখণ্ড বস্ত্র ক্রয় করেন। সে আমলে বাংলার উৎকৃষ্ট বস্ত্রসমূহের মূল্য ইহা হইতে ধারণা করা যাইবে। বাংলাদেশে বহু পরিমাণ রেশম ও রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত হইত। নৌকা-নির্মাণ আর একটি বড় শিল্প ছিল। ট্যাভার্নিয়ারের বিবরণ হইতে জানা যায় যে ঢাকায় নদীতীরে দুই ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া কেবলমাত্র বড় বড় নৌকানির্মাণকারী সূত্রধরেরা বাস করিত। শঙ্খ ঢাকার একটি বিখ্যাত শিল্প ছিল। ইহা ছাড়া সোণারূপা ও দামী পাথরের অলঙ্কার নির্ম্মাণেও খুবই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশী লেখকদের বিবরণে লৌহ শিল্পের বহু উল্লেখ আছে। বীরভূমে লোহার খনি ছিল। রেনেল লিখিয়াছেন যে সিউড়ি হইতে ১৬ মাইল দূরে খনি হইতে লৌহপিণ্ড নিষ্কাশিত করিয়া দামরা ও মহ্মদারাতে কারখানায় লৌহ প্রস্তুত হইত। মুল্লারপুর পরগণায় এবং কৃষ্ণনগরে লোহার

১। K. K. Datta. op. cit., p. 419 ff

খনি ছিল এবং দেওচা ও মুহম্মদ বাজারে লৌহ তৈরীর কারখানা ছিল। কলিকাতা ও কাশিমবাজারে এ দেশী লোকেরা কামান তৈরী করিত। কামানের বারুদও এদেশেই তৈরী হইত।[১]

শীতকালে বাংলাদেশে কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈরী হইত। গরম জল সারা রাত্রি মাটির নীচে গর্ত করিয়া রাখিয়া বরফ প্রস্তুতের ব্যবস্থা ছিল।[২]

চীনা পর্যটকেরা লিখিয়াছেন যে বাংলায় গাছের বাকল হইতে উৎকৃষ্ট কাগজ তৈরী হইত। ইহার রং খুব সাদা এবং ইহা মৃগ-চর্মের মত মসৃণ। লাক্ষা এবং রেশম শিল্পেরও উল্লেখ আছে।

চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দে ইব্‌ন্ বতুতা লিখিয়াছেন যে বাংলা দেশে প্রচুর ধান ফলিত। সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন যে অনেকে বলেন পৃথিবীর মধ্যে মিশর দেশই সর্বাপেক্ষা শস্যশালিনী। কিন্তু এ খ্যাতি বাংলারই প্রাপ্য। এদেশে এত প্রচুর ধান হয় যে ইহা নিকটে ও দূরে বহু দেশে রপ্তানি হয়। সমুদ্রপথে ইহা মসলিপত্তন ও করমণ্ডল উপকূলের অন্যান্য বন্দরে, এমন কি লঙ্কা ও মালদ্বীপে চালান হয়। বাংলায় চিনি এত প্রস্তুত হয় যে দক্ষিণ ভারতে গোলকুণ্ডা ও কর্ণাটে, এবং আরব, পারস্য ও মেসোপটেমিয়ায় চালান হয়। যদিও এখানে গম খুব বেশী পরিমাণে হয় না; কিন্তু তাহা এ দেশের লোকের পক্ষে পর্যাপ্ত। উপরন্তু তাহা হইতে সমুদ্রগামী ইউরোপীয় নাবিকদের জন্য সুন্দর সস্তা বিস্কুট তৈরী হয়। এখানে সুতা ও রেশম এত পরিমাণে হয় যে কেবল ভারতবর্ষ ও নিকটবর্তী দেশ নহে সুদূর জাপান এবং ইউরোপেও এখানকার বস্ত্র চালান হয়। এই দেশ হইতে উৎকৃষ্ট লাক্ষা, আফিম, মোমবাতি, মৃগনাভি, লঙ্কা এবং ঘৃত সমুদ্রপথে বহু স্থানে চালান হয়।

মধ্যযুগে এমন কয়েকটি বিদেশী কৃষিজাত দ্রব্য বাংলায় প্রথম আমদানি হয় যাহার প্রচলন পরবর্তী কালে খুবই বেশি হইয়াছিল। ইহার মধ্যে তামাক ও আলু আমেরিকা হইতে ইউরোপীয় বণিকেরা সপ্তদশ শতকে এদেশে আনেন। বাংলার বর্তমান যুগের দুইটি বিশেষ সুপরিচিত রপ্তানী দ্রব্য পাট ও চা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমে বিদেশে পরিচিত হয়। যে নীলের চাষ ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহাও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আরম্ভ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই নীল ও পাটের রপ্তানী আরম্ভ হয়।

---

(১) K. K. Datta, op. cit, p. 481—3.

(২) ঐ p. 435

অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে গুড়, সুপারি, তামাক, তেল, আদা, পাট, মরিচ, ফল, তাড়ি ইত্যাদি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ও বাহিরে চালান যাইত। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে প্রতি বৎসর ৫০,০০০ মণ চিনি রপ্তানী হইত। মাখনও বাংলাদেশ হইতে রপ্তানি হইত। বাংলার ব্যবসায় বাণিজ্যও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ইউরোপীয় বণিকের প্রতিযোগিতা, শাসকদের উৎপীড়ন ও রৌপ্য মুদ্রার অভাব ইত্যাদি বহু গুরুতর বাধা সত্ত্বেও বাংলার অনেক দ্রব্য ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ও ভারতের বাহিরে রপ্তানি হইত। পূর্বোক্ত শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য ছাড়াও বাংলা হইতে লবণ, গালা, আফিম, নানা প্রকার মসলা, ঔষধ এবং খোজা ও ক্রীতদাস জল ও স্থল পথে ভারতের নানা স্থানে এবং সমুদ্রের পথে এশিয়ার নানা দেশে বিশেষতঃ লঙ্কা দ্বীপ ও ব্রহ্মদেশে রপ্তানি হইত। সূক্ষ্ম মসলিন বাঁশের চোঙ্গায় ভরিয়া অন্যান্য দ্রব্যসহ সদাগরেরা খোরাসান, পারস্য, তুরস্ক ও নিকটস্থ অন্যান্য দেশে রপ্তানি করিত। এতদ্ব্যতীত ম্যানিলা, চীন ও আফ্রিকার উপকূলের সহিতও বাঙালী বাণিজ্য করিত। বাঙালী সওদাগরদের সমুদ্র পথে দূর বিদেশে বাণিজ্য যাত্রার কথা বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা উল্লেখ করিয়াছেন এবং মধ্যযুগের বাংলা আখ্যানে ও সাহিত্যে তাহার বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়গুপ্ত ও বংশীদাসের মনসামঙ্গল এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বাঙালী সওদাগরেরা যে বহুসংখ্যক অতিবৃহৎ বাণিজ্য তরী লইয়া বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম কূল ধরিয়া সিংহলে এবং পরে উত্তর দিকে আরবসাগরের পূর্ব কূল বাহিয়া নানা বন্দরে সওদা করিতে করিতে পাটনে (গুজরাট) পৌছিতেন তাহার বিশদ বিবরণ

বাঙালী বণিকেরা বঙ্গোপসাগর পার হইয়া ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন ও ইন্দো-নেশিয়াতে যাইত। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইব্‌ন্ বতুতা সোণারগাঁও হইতে চল্লিশ দিনে সুমাত্রায় গিয়াছিলেন। সুদূর সমুদ্র যাত্রার বর্ণনায় পথিমধ্যে কয়েকটি বন্দরের নাম পাওয়া যায়—পুরী, কলিঙ্গপত্তন, চিক্কাচুলি (চিকাকোল), বাণপুর, সেতুবন্ধরামেশ্বর, লঙ্কাপুরী, বিজয়নগর। ইহা ছাড়া অনেক দ্বীপের নামও আছে।

অনেক মঙ্গলকাব্যেরই নায়ক একজন সওদাগর—যেমন, চাঁদ, ধনপতি ও তাহার পুত্র শ্রীমন্ত। ইহাদের বাণিজ্য যাত্রার বর্ণনা উপলক্ষে বাণিজ্য-তরীর বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগরের ছিল চৌদ্দ ডিঙ্গা আর ধনপতির ছিল সাত ডিঙ্গা। প্রত্যেক নৌকারই এক একটি নাম ছিল। এই দুই বহরেরই

প্রধান তরীর নাম ছিল মধুকর—সম্ভবতঃ সদাগর নিজে ইহাতে যাইতেন। নৌকাগুলি জলে ডোবান থাকিত, যাত্রার পূর্বে ডুবারুরা নৌকা উঠাইত।[1] কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ডিঙ্গা নির্মাণের বর্ণনায়[2] বলা হইয়াছে, কোন কোন ডিঙ্গা দৈর্ঘে শত গজ ও প্রস্থে বিশ গজ। এগুলির মধ্যে অত্যুক্তিও আছে, কারণ দ্বিজ বংশী দাসের মনসামঙ্গলে হাজার গজ দীর্ঘ নৌকারও উল্লেখ আছে। এই সব নৌকার সামনের দিকের গলুই নানারূপ জীব জন্তুর মুখের আকারে নির্মিত এবং বহু মূল্যবান প্রস্তর গজদন্ত ও স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা খচিত হইত। কাঁঠাল, পিয়াল, শাল, গাম্ভারী, তমাল প্রভৃতির কাঠে নৌকা তৈরী হইত। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে যে বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্য-তরী নির্মিত হইত, 'যুক্তি কল্পতরু' নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে এবং বৈদেশিক পর্যটকগণের বিবরণে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নিকলো কণ্টি লিখিয়াছেন যে ভারতে প্রস্তুত নৌকা ইউরোপের নৌকা অপেক্ষা বৃহত্তর এবং বেশী মজবুৎ। সপ্তদশ শতাব্দে ঢাকা নগরীর এক বিস্তৃত অংশে নৌবহর নির্মাণকারী সূত্রধরেরা বাস করিত।[3] সম্ভবতঃ বর্তমান ঢাকার সূত্রাপুর অঞ্চল তাহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্তও চট্টগ্রামে সমুদ্রগামী নৌবহর নির্মিত হইত। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে ডিঙ্গীর বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইলেও একেবারে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। নৌবহরের সঙ্গে যে সকল মাঝিমাল্লা প্রভৃতি যাইত মঙ্গলকাব্যে তাহাদের উল্লেখ আছে। প্রধান মাঝির নাম ছিল কাঁড়ারী—কাণ্ডারী শব্দের অপভ্রংশ। সাবরগণ সারিগান গাহিয়া দাঁড় টানিত। সূত্রধর, ডুবারী ও কর্মকারেরা সঙ্গে থাকিত এবং প্রয়োজনমত নৌকা মেরামত করিত। ইহা ছাড়া একদল পাইক থাকিত—সম্ভবতঃ জল দস্যুদিগের আক্রমণ নিবারণের জন্য এই ব্যবস্থা ছিল।

সে যুগে ভারতে চুম্বক দিগদর্শন যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। সুতরাং সূর্য ও তারার সাহায্যে দিঙ্ নির্ণয় করা হইত। বংশীদাসের মনসামঙ্গলে আছেঃ

অস্ত যায় যথা ভানু উদয় যথা হনে।
দুই তারা ডাইনে বামে রাখিল সন্ধানে॥
তাহার দক্ষিণ মুখে ধরিল কাঁড়ার।
সেই তারা লক্ষ্য করি বাহিল নাওয়ার॥

১। বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়—২১৯-২০ পৃঃ
২। কবিকঙ্কণ চণ্ডী—দ্বিতীয় ভাগ ৭৩৯ পৃঃ
৩। Tavernier's Travels in India, p.103

এই সমুদয় বর্ণনা সমুদ্রযাত্রার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে :

ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ডরে॥

হারমাদ পর্তুগীজ আরমাডা[১] শব্দের অপভ্রংশ। পর্তুগীজ বণিকেরা যে বাঙালীর তথা ভারতীয়ের ব্যবসায়বাণিজ্যে বহু অনিষ্ট করিত তাহার প্রমাণ আছে। বস্তুতঃ পর্তুগীজ বণিকেরা ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরে এদেশীয় বাণিজ্য জাহাজের উপর জলদস্যুর ন্যায় আচরণ করিত এবং তাহার ফলেই বাংলার জলপথের বাণিজ্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। আরাকান হইতে মগদের অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী বিস্তৃত অঞ্চল ধ্বংস হইয়াছিল। পর্তুগীজরাও তাহাদের অনুকরণে নদীপথে ঢুকিয়া দক্ষিণ বঙ্গে বহু অত্যাচার করিত।

ইউরোপীয় বণিক ও মগ জলদস্যুরা বন্দুক ব্যবহার করিত; কিন্তু বাঙালী বণিকেরা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানিত না বলিয়াই তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। বংশীদাস লিখিয়াছেন—

মগ ফিরিঙ্গি যত বন্দুক পলিতা হাত
একেবারে দশগুলি ছোটে॥

বাঙালী বণিকেরা কিরূপে দ্রব্য বিনিময়ে ব্যবসায় করিত; কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। ধনপতি সওদাগর সিংহলের রাজাকে ইহার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন :

বদলাশে নানা ধন আন্যাছি সিংহলে।
যে দিলে যে হয় তাহা শুন কুতূহলে॥
কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিরঙ্গ বদলে লবঙ্গ দিবে শুঁটের বদলে টঙ্ক (টঙ্ক ?)
পিড়ঙ্গ (প্রবঙ্গ ?) বদলে মাতঙ্গ পাব পায়রার বদলে শুয়া।
গাছফল বদলে জায়ফল দিবে বয়ড়ার বদলে গুয়া॥

১। Armada—রণতরী বহর

সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল দিবে গুঞ্জার বদলে পলা।
পাটশন বদলে ধবল চামর কাঁচের বদলে নীলা।॥
লবণ বদলে সৈন্ধব দিবে জোয়ানি বদলে জিরা।
আতঙ্গ (আকন্দ) বদলে মাতঙ্গ (মাকন্দ) দিবে হরিতাল বদলে হীরা॥
চঞ্চের বদলে চন্দন দিবে পাগের বদলে গড়া।
শুক্তার বদলে মুক্তা দিবে ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥

এই সুদীর্ঘ তালিকায় অনেক কাল্পনিক উক্তি আছে। কিন্তু এই সমুদয় বাণিজ্যের কাহিনী যে কবির কল্পনা মাত্র নহে, বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিবরণ তাহা সম্পূর্ণ সমর্থন করে। ষোড়শ শতকের প্রথমে (আনুমানিক ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দ) পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা বাংলা দেশের যে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহার সার মর্ম এই :—

"এদেশে সমুদ্রতীরে ও দেশের অভ্যন্তর ভাগে বহু নগরী আছে। ভিতরের নগরগুলিতে হিন্দুরা বাস করে। সমুদ্রতীরের বন্দরগুলিতে হিন্দু মুসলমান দুইই আছে—ইহারা জাহাজে করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য বহু দেশে পাঠায়। এই দেশের প্রধান বন্দরের নাম 'বেঙ্গল' (Bengal)। আরব, পারস্য, আবিসিনিয়া ও ভারতবাসী বহু বণিক এই নগরে বাস করে। এদেশের বড় বড় বণিকদের বড় বড় জাহাজ আছে এবং ইহা নানা দ্রব্যে বোঝাই করিয়া তাহারা করমণ্ডল উপকূল, মালাবার, ক্যাম্বে, পেগু, টেনাসেরিম, সুমাত্রা, লঙ্কা এবং মলাক্কায় যায়। এদেশে বহু পরিমাণ তুলা, ইক্ষু, উৎকৃষ্ট আদা ও মরিচ হয়। এখানে নানা রকমের সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরী হয় এবং আরবে ও পারস্যে ইহাদ্বারা এত অধিক পরিমাণে টুপি তৈরী করে যে প্রতি বৎসর অনেক জাহাজ বোঝাই করিয়া এই কাপড়ের চালান দেয়। ইহা ছাড়া আরও অনেক রকম কাপড় তৈরী হয়। মেয়েদের ওড়নার জন্য 'সরবতী' কাপড় খুব চড়া দামে বিক্রয় হয়। চরকায় সূতা কাটিয়া এই সকল কাপড় বোনা হয়। এই শহরে খুব উৎকৃষ্ট সাদা চিনি তৈরী হয় এবং অনেক জাহাজ বোঝাই করিয়া চালান হয়। মালাবার ও ক্যাম্বেতে চিনি ও মসলিন খুব চড়া দামে বিক্রয় হয়। এখানে আদা, কমলালেবু, বাতাবী লেবু এবং আরও অনেক ফল জন্মে। ঘোড়া, গরু, মেষ ও বড় বড় মুরগী প্রচুর আছে।"

বারবোসার সমসাময়িক ইতালীয় পর্যটক ভার্থেমাও (১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে) উক্ত

বন্দরের বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার বিস্তৃত বাণিজ্যসম্ভার বিশেষতঃ সূতা ও রেশমের কাপড়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

ভার্থেমা বলেন যে বাংলা দেশের মত ধনী বণিক আর কোন দেশে তিনি দেখেন নাই। আর একজন পর্তুগীজ, জাঁয়া দে' বারোস (১৪৯৬-১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে), লিখিয়াছেন যে, গৌড় নগরী বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। নয় মাইল দীর্ঘ এই শহরে প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক বাস করিত এবং বাণিজ্য দ্রব্য সম্ভারের জন্ত সর্বদাই রাস্তায় এত ভিড় থাকিত যে লোকের চলাচল খুবই কষ্টকর ছিল। সোনার গাঁও, হুগলী, চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামেও বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল।

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সিজার ফ্রেডারিক (১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) সাতগাঁওকে (সপ্তগ্রাম) খুব সমৃদ্ধশালী বন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি 'বেঙ্গল' বন্দরের নাম করেন নাই। বিশ বৎসর পরে রাল্‌ফ্‌ ফিচ সাতগাঁও ও চাটগাঁও এই দুই বন্দরের বর্ণনা দিয়াছেন এবং চাটগাঁও বা চট্টগ্রামকে প্রধান বন্দর (Porto Grande) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও 'বেঙ্গল' বন্দরের উল্লেখ করেন নাই। হ্যামিলটন (১৬৮৮-১৭২৩) হুগলীকে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু সাতগাঁও এর উল্লেখ করেন নাই। তিনি 'চিটাগাং' বন্দরেরও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন, কিন্তু 'বেঙ্গল' বন্দরের নাম করেন নাই। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দের অধিক একটি মানচিত্রে বেঙ্গল ও সাতগাঁ উভয় বন্দরেরই নাম আছে।

রাল্‌ফ্‌ ফিচ আগ্রা হইতে নৌকা করিয়া যমুনা ও গঙ্গা নদী বাহিয়া বাংলায় আসেন। তাঁহার সঙ্গে আরও ১৮০ খানি নৌকা ছিল। হিন্দু ও মুসলমান বণিকেরা এই সব নৌকায় লবণ, আফিং, নীল, সীসক, গালিচা ও অন্তান্ত দ্রব্য বোঝাই করিয়া বাংলা দেশে বিক্রয়ের জন্ত যাইতেছিল। বাংলা দেশে তিনি প্রথমে টাণ্ডায় পৌঁছেন। এখানে তুলা ও কাপড়ের খুব ভাল ব্যবসায় চলিত। এখান হইতে তিনি কুচবিহারে যান—সেখানে হিন্দু রাজা এবং অধিবাসীরাও হিন্দু অথবা বৌদ্ধ—মুসলমান নহে। ফিচ হুগলীরও উল্লেখ করিয়াছেন—এখানে পর্তুগীজেরা বাস করিত। ইহার অল্প একটু দূরে দক্ষিণে অঞ্জেলি (Angeli) নামে এক বন্দর ছিল। এখানে প্রতিবৎসর নেগাপটম, সুমাত্রা, মালাক্কা এবং আরও অনেক স্থান হইতে বহু বাণিজ্য-জাহাজ আসিত।

সমসাময়িক বৈদেশিক বিবরণ হইতে জানা যায় যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন

প্রদেশের বণিকেরা বাংলায় বাণিজ্য করিতে আসিত। ইহাদের মধ্যে কাশ্মীরী, মূলতানী, আফগান বা পাঠান, শেখ, পগেয়া, ভুটিয়া ও সন্ন্যাসীদের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। পগেয়া সম্ভবতঃ পাগড়ীওয়ালা হিন্দুস্থানীদের নাম এবং কলিকাতা বড়বাজারের পগেয়াপটি সম্ভবতঃ তাহাদের স্মৃতি বজায় রাখিয়াছে। সন্ন্যাসীরা সম্ভবতঃ হিমালয় অঞ্চল হইতে চন্দন কাঠ, ভূর্জপত্র, রুদ্রাক্ষ ও লতাগুল্ম প্রভৃতি ভেষজ দ্রব্য আনিত। বর্ধমান সম্বন্ধে হলওয়েল লিখিয়াছেন যে দিল্লী ও আগ্রার পগেয়া ব্যাপারীরা প্রতি বৎসর এখান হইতে সীসক, তামা, টিন, লঙ্কা ও বস্ত্র প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে কিনিত এবং তাহার পরিবর্তে নগদ টাকা অথবা আফিম, সোরা অথবা অশ্ব বিনিময় করিত। কাশ্মীরী বণিকেরা আগাম টাকা দিয়া সুন্দর বনে লবণ তৈরী করাইত। কাশ্মীরী এবং আর্মেনিয়ান বণিকেরা বাংলা হইতে নেপালে ও তিব্বতে, চর্ম, নীল, মণিমুক্তা, তামাক, চিনি, মালদহের সাটিন প্রভৃতি নানা রকমের বস্ত্র বিক্রয় করিত।

বাঙালী সদাগরেরাও ভারতের সর্বত্র বাণিজ্য করিত। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত জয়নারায়ণের হরিলীলা নামক বাংলা গ্রন্থে লিখিত আছে যে একজন বৈশ্য বণিক নিম্নলিখিত স্থানে বাণিজ্য করিতে যাইতেন: "হস্তিনাপুর, কর্ণাট, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গুর্জর, বারাণসী, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, পঞ্চাল, কাম্বোজ, ভোজ, মগধ, জয়ন্তী, দ্রাবিড় নেপাল, কাঞ্চী, অযোধ্যা, অবন্তী, মথুরা, কাম্পিল্য, মায়াপুরী, দ্বারাবতী, চীন, মহাচীন, কামরূপ।" চন্দ্রকান্ত নামে প্রায় সমসাময়িক আর একখানি বাংলা গ্রন্থে লিখিত আছে যে চন্দ্রকান্ত নামে মল্লভূম নিবাসী একজন গন্ধবণিক সাতখানি তরী বাণিজ্য দ্রব্যে বোঝাই করিয়া গুজরাটে গিয়াছিলেন।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের খুব প্রচলন থাকিলেও, বাংলায় কৃষিই ছিল জনসাধারণের উপজীব্য। প্রাচীন একখানি পুঁথিতে আছে যে আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন লোকের পক্ষে কৃষিই প্রশস্ত। কারণ বাণিজ্য করিতে মূলধনের প্রয়োজন এবং অনেক জাল-প্রতারণা করিতে হয়। চাকুরীতে আত্মসম্মান থাকে না এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে অর্থ লাভ হয় না। নানাবিধ শস্য, ফল, শাক-সব্‌জীর চাষ হইত—এবং এ বিষয়ে বাঙালীর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাও বহু পরিমাণে ছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ হইয়াও চাষ দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতেন। বাংলার অতুলনীয় কৃষিসম্পদের কথা সমসাময়িক সাহিত্যে ও বিদেশীয় পর্যটকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লিখিত হইয়াছে। একজন চীনা পর্যটক লিখিয়াছেন যে বাংলা দেশে বছরে তিনবার

ফসল হয়—লোকেরা খুব পরিশ্রমী ; বহু আয়াস সহকারে তাহারা জঙ্গল কাটিয়া জমি চাষের উপযোগী করিয়াছে। সরকারী রাজস্ব মাত্র উৎপন্ন শস্যের এক পঞ্চমাংশ।

মধ্যযুগে বাংলার ঐশ্বর্য ও সম্পদ প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যে ধনী নাগরিকদের বর্ণনায় বিস্তৃত প্রাসাদ, মণিমুক্তাখচিত বসনভূষণ, এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান রত্নের ছড়াছড়ি। বৈদেশিক বর্ণনায়ও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকে চীনা রাজদূতেরা বাংলায় আসিয়াছিলেন। তাহাদের বিবরণ হইতে এদেশের সম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়। ভোজনান্তে চীনা রাজদূতকে সোনার বাটি, পিকদানি, সুরাপাত্র ও কোমরবন্ধ এবং তাঁহার সহকারীদের ঐ সকল রৌপ্যের দ্রব্য, কর্মচারীদিগকে সোনার ঘণ্টা ও সৈন্যগণকে রূপার মুদ্রা উপহার দেওয়া হয়। এদেশে কৃষিজাত সম্পদের প্রাচুর্য ছিল এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে বহু ধনাগম হইত। পোষাকপরিচ্ছদ ও মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারেই এই ঐশ্বর্যের পরিচয় পাইয়া চীনাদূতেরা বিস্মিত হইয়াছিলেন।

'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'ও 'রিয়াজ-উস সলাতীনে' উক্ত হইয়াছে যে প্রাচীন যুগ হইতে গৌড় ও পূর্ববঙ্গে ধনী লোকেরা সোনার থালায় খাইত। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (ষোড়শ শতক) গৌড়ের লুণ্ঠনকারীদের বধ করিয়া ১৩০০ সোনার থালা ও বহু ধন রত্ন পাইয়াছিলেন। ফিরিশ্‌তা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে ঐ যুগে যাহার বাড়ীতে যত বেশী সোনার বাসনপত্র থাকিত সে তত বেশী মর্যাদার অধিকারী হইত এবং এখন পর্যন্তও বাংলা দেশে এইরূপ গর্বের প্রচলন আছে।

এই ঐশ্বর্যের প্রধান কারণ বঙ্গদেশের উর্বরাভূমির প্রাকৃতিক শস্যসম্পদ এবং বাঙালীর বাণিজ্য বৃত্তি। সপ্তগ্রামে বহু লক্ষপতি বণিকেরা বাস করিতেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে :

"হিরণ্য-গোবর্ধন নাম দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥"

যে যুগে টাকায় ৫।৬ মণ চাউল পাওয়া যাইত সে যুগে বার লক্ষ টাকার মূল্য কত সহজেই বুঝা যাইবে। কবিকঙ্কণের সমসাময়িক বিদেশী পর্যটক সিজার ফ্রেডারিক সপ্তগ্রামের বাণিজ্যও ঐশ্বর্যের বিবরণ দিয়াছেন। প্রতি বৎসর এখানে ৩০।৩৫ খানা বড় ও ছোট জাহাজ আসিত এবং মাল বোঝাই করিয়া ফিরিয়া যাইত।

মধ্যযুগে বাংলা দেশে খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র খুব সস্তা ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইব্‌ন্ বতুতা বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন দ্রব্যমূল্যের নিম্নলিখিত তালিকা দিয়াছেন।

দ্রব্য	পরিমাণ	মূল্য বর্তমানের (নয়া) পয়সা
চাউল	বর্তমানকালের একমণ	১২
ঘি	„	১৪৫
চিনি	„	১৪৫
তিল তৈল	„	৭৩
উত্তম কাপড়	১৫ গজ	২০০
দুগ্ধবতী গাভী	১টি	৩০০
হৃষ্টপুষ্ট মুরগী	১২টি	২০
ভেড়া	১টি	২৫

এক বৃদ্ধ বাঙালী মুসলমান ইব্‌ন্ বতুতাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি, তাঁহার স্ত্রী ও একটি ভৃত্য—এই তিন জনের খাদ্যের জন্য বৎসরে এক টাকা ব্যয় হইত। (স্বর্ণমানের হিসাবে সাত টাকা)।

ইব্‌ন্ বতুতা আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত টেঞ্জিয়ারের অধিবাসী। তিনি আফ্রিকার উত্তর উপকূল ও এশিয়ায় আরব দেশ হইতে ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়া হইয়া চীন দেশ পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে সারা পৃথিবীতে বাংলা দেশের মত কোথাও জিনিষপত্রের দাম এত সস্তা নহে।

সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন যে সাধারণ বাঙালীর খাদ্য—চাউল, ঘৃত ও তিনচারি প্রকার শাকসব্জী—নামমাত্র মূল্যে পাওয়া যাইত। এক টাকায় কুড়িটা বা তাহার বেশী ভাল মুরগী পাওয়া যাইত। হাঁসও এইরূপ সস্তা ছিল। ভেড়া এবং ছাগলও প্রচুর পাওয়া যাইত। শূকরের মাংস এত সস্তা ছিল যে এদেশবাসী পর্তুগীজরা কেবল তাহা খাইয়াই জীবন ধারণ করিত। নানারকম মাছও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত।

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে 'দুর্বলার বেসাতি' বর্ণনাও 'দ্রব্যের মূল্য এইরূপ সস্তা দেখা যায়। রাজধানী মুর্শিদাবাদে ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এইরূপ ছিল।[১]

১। K. K. Datta, op. cit. 463-64

প্রতি টাকায়	খুব ভাল চাউল (বাঁশফুল)	প্রথম শ্রেণী	১ মণ ১০ সের
ঐ	ঐ	দ্বিতীয় „	১ মণ ২৩ সের
ঐ	ঐ	তৃতীয় „	১ মণ ৩৫ সের
ঐ	মোটা (দেশনা ও পূরবী) চাউল		৪ মণ ২৫ সের
ঐ	মোটা (মুশসারা)		৫ মণ ২৫ সের
ঐ	মোটা (কুরাশালী)		৭ মণ ২০ সের
ঐ	উৎকৃষ্ট গম	প্রথম শ্রেণী	৩ মণ
ঐ		দ্বিতীয় শ্রেণী	৩ মণ ৩০ সের
ঐ	তেল	প্রথম শ্রেণী	২১ সের
ঐ	ঐ	দ্বিতীয় শ্রেণী	২৪ সের
ঐ	ঘৃত	প্রথম শ্রেণী	১০॥০ সের
ঐ		দ্বিতীয় শ্রেণী	১১½ সের

কাপাস (তুলা) প্রতি মণ ২ কি ২।০ টাকা।

মধ্য যুগের শেষভাগে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সরকারী কাগজপত্রে বাংলাদেশকে বলা হইত ভারতের স্বর্গ। ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি, প্রাকৃতিক শোভা, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার, জীবন যাত্রার স্বচ্ছলতা প্রভৃতির কথা মনে করিলে এই খ্যাতির সার্থকতা সহজেই বুঝা যায়।

দেশে ঐশ্বর্যশালী ধনীর পাশাপাশি দারিদ্র্যের চিত্রও সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কারণ দ্রব্যাদির মূল্য খুব সস্তা হইলেও সাধারণ কৃষক ও প্রজাগণের দুঃখ ও দুর্দশার অবধি ছিল না। ইহার অনেকগুলি কারণ ছিল। তাহাদের মধ্যে অন্যতম রাজকর্মচারীদের অযথা অত্যাচার ও উৎপীড়ন। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর গ্রন্থকার মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দামিন্যায় ছয় সাত পুরুষ যাবৎ বাস করিতে-ছিলেন—কৃষিদ্বারা জীবন যাপন করিতেন। ডিহিদার মামুদের অত্যাচারে যখন তিনি পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইলেন তখন তিন দিন ভিক্ষান্নে জীবন ধারণের পর এমন অবস্থা হইল যে—

"তৈল বিনা কৈল স্নান করিলুঁ উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে"

ক্ষেমানন্দ কেতকদাসেরও এইরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে সতীনের কোপে খুল্লনার কষ্ট ও ফুল্লরার বার মাসের দুঃখ বর্ণনায় এই দারিদ্র্য-

দুঃখ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্যেও খুল্লনার দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে।[১] শাসনকর্তার অত্যাচারে স্বচ্ছল গৃহস্থের কিরূপ দুরবস্থা হইত মাণিকচন্দ্র রাজার গানে তাহা বর্ণনা পাই।

"ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।
সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুলুকৎ কৈল্ল কড়ি॥
আছিল দেড় বুড়ি খাজনা, লইল পনর গণ্ডা।
লাঙ্গল বেচায় জোয়াল বেচায়, আরো বেচায় ফাল।
খাজনার তাপতে বেচায় দুধের ছাওয়াল॥
রাঢ়ী কাঙ্গাল দুঃখীর বড় দুঃখ হইল।
খানে খানে তালুক সব ছন হৈয়া গেল॥"

কিন্তু সুশাসনে প্রজারা চাষবাস করিয়াও, কিরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিত তাহারও উজ্জ্বল অতিরঞ্জিত বর্ণনা ময়নামতীর গানে আছে:—

"সেই যে রাজার রাইঅত প্রজা দুখখু নাহি পাএ।
কারও মারুলি (পথ) দিয়া কেহ নাহি যায়।
কারও পুষ্করিণীর জল কেহ নাহি খাএ।[২]
আথাইলের ধন কড়ি পাথাইলে শুকায়॥
সোনার ভেটা দিয়া রাইঅতের ছাওয়াল খেলায়।"

বিদেশী পর্যটক মানরিক লিখিয়াছেন যে খাজনার টাকা না দিতে পারিলে হিন্দুদের স্ত্রী ও সন্তানদের নিলামে বিক্রয় করা হইত। কর্মচারীরা কৃষকদের নারী ধর্ষণ করিত এবং পিয়াদারা নানা প্রকার উৎপীড়ন করিত। ইহার কোন প্রতিকার ছিল না। অথচ ইহারাই ছিল শতকরা নব্বই জন।

লোকেদের দুর্দশার আর একটি কারণ ছিল যুদ্ধের সময় সৈন্যদলের লুঠপাট। দুই পক্ষের সৈন্যেরাই লুঠপাট, নারীধর্ষণ প্রভৃতিতে এত অভ্যস্ত ছিল যে, সৈন্যের আগমনবার্তা শুনিলেই রাস্তার দুই পার্শ্বের গ্রাম ছাড়িয়া লোকে দূরে পলাইয়া যাইত। যুদ্ধের বিরতির পরেও বিজয়ী সৈন্যেরা লুঠপাট করিত।

১। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, প্রথম ভাগ ২৫৭ পৃঃ

২। ২-৩ পংক্তির অর্থ এই যে প্রত্যেকেরই নিজের নিজের পথ ঘাট পুকুর আছে—মূল্যবান দ্রব্য যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখে—চোরের ভয় নাই।
বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় পৃঃ ৩০৫

প্রতাপাদিত্যের আত্মসমর্পণের পর বিজয়ী মুঘল সেনানায়ক একদিন উদয়াদিত্যকে বলিলেন "মীর্জা মক্কী তোমাদের দেশ লুট করিতেছে আর তোমরা তাহাকে থলে ভর্ত্তি সোনা দিতেছ। আমি চুপ করিয়া আছি বলিয়া আমাকে একটা আম কাঁঠালও পাঠাও না। আচ্ছা, কাল ইহার শোধ নিব।" সেনানায়কের আজ্ঞায় রাত্রি দ্বিপ্রহরে জল ও স্থলের সৈন্ত ঘোড়ায় চড়িয়া রাজধানী যশোহর যাত্রা করিল এবং এমন ভাবে লুঠপাট করিল যে পূর্বের কোন অভিযানে আর সেরূপ হয় নাই। উক্ত সেনানায়ক নিজেই ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুর অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্র উপকূলের অধিবাসীরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। ইহারা নগর ও জনপদ লুঠপাট করিত ও আগুন লাগাইয়া ধ্বংস করিত, স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করিত এবং শিশু, যুবক, বৃদ্ধ বহু নর-নারীকে হরণ পূর্বক পশুর মত নৌকার খোলে বোঝাই করিয়া লইয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত। ১৬২১ হইতে ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পর্তুগীজেরা ৪২,০০০ দাস বাংলার নানা স্থান হইতে ধরিয়া চট্টগ্রামে আনিয়াছিল। অনেক দাস পর্তুগীজেরা গৃহকার্যে নিযুক্ত করিত।

স্থলপথে অভিযানের সময়ও সৈন্তেরা গ্রাম লুঠপাট করিয়া বহু নর-নারীকে বন্দী করিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত। শান্তির সময়েও সাধারণ লোককে কর্মচারী-দের হুকুমে বেগার (অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে) খাটিতে হইত। মোটের উপর মধ্যযুগে সাধারণ লোকের অবস্থা খুব ভাল ছিল এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। তবে ভাতকাপড়ের দুঃখ হয়ত বর্তমান যুগের অপেক্ষা কম ছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম ও সমাজ

১। হিন্দু ও মুসলমান

বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্ম এবং সমাজের মধ্যে একটি গুরুতর প্রভেদ আছে। প্রাচীন যুগে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় থাকিলেও মূলতঃ ইহারা একই ধর্ম হইতে উদ্ভূত এবং ইহাদের মধ্যে প্রভেদ ক্রমশঃ অনেকটা ঘুচিয়া আসিতেছিল। প্রাচীন যুগের শেষে বৌদ্ধধর্মের পৃথক সত্তা ছিল না বলিলেই হয়। জৈন ধর্মের প্রভাবও প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং মুসলমানেরা যখন এদেশে আসিয়া বসবাস করিল তখন 'হিন্দু' এই একটি সাধারণ নামেই এদেশে তাহারা তখনকার ধর্ম ও সমাজকে অভিহিত করিল। মুসলমানের ধর্ম ও সমাজ সমস্ত মৌলিক বিষয়েই ইহা হইতে এত স্বতন্ত্র ছিল যে তাহারা কোন দিনই হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে নাই। মুসলমানদের পূর্বে গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ, হূণ প্রভৃতি বহু বিদেশী জাতি ভারতের অল্প বা অনেক অংশ জয় করিয়া সেখানেই স্থায়িভাবে বসবাস করিয়াছে এবং ক্রমে বিরাট হিন্দু সমাজের মধ্যে এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে আজ তাহাদের পৃথক সত্তার চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই। কিন্তু মুসলমানেরা মধ্যযুগের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত স্থল বিশেষে ১৩০০ হইতে ৭০০ বৎসর হিন্দুর সঙ্গে পাশাপাশি বাস করিয়াও ঠিক পূর্বের মতই স্বতন্ত্র আছে। ইহার কারণ এই যে, এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও সমাজ-বিধান সম্পূর্ণ বিপরীত। মন্দিরে দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া নানা উপচারে তাহার পূজা করা হিন্দুদিগের ধর্মের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে দেবমূর্ত্তি পূজা যে কেবল অবৈধ তাহা নহে মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করা অত্যন্ত পুণ্যের কার্য বলিয়া গণ্য হয়। আবার হিন্দুশাস্ত্রমতে মুসলমানেরা ম্লেচ্ছ ও অপবিত্র, তাহাদের সহিত বিবাহ, একত্রে পানভোজন প্রভৃতি সামাজিক সম্বন্ধ তো দূরের কথা তাহাদের স্পর্শও দূষিত বলিয়া গণ্য করা হয়—তাহাদের স্পৃষ্ট অন্নজল গ্রহণ করিলে হিন্দু ধর্মে পতিত ও জাতিচ্যুত হয়। গোমাংস ভক্ষণ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি যে সমুদয় আচার ব্যবহার হিন্দুর দৃষ্টিতে অতিশয় গর্হিত,

মুসলমান সমাজে তাহা সর্বজন স্বীকৃত। এইরূপ অশন বসন ভোজন ও জীবনযাপন প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন। হিন্দুরা বাংলা সাহিত্যের প্রেরণা পায় সংস্কৃত হইতে, মুসলমানেরা পায় আরবী ফারসী হইতে। বিবাহাদির ও উত্তরাধিকারের আইন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই সমুদয় প্রভেদ লক্ষ্য করিয়াই মুসলমান পণ্ডিত আল্‌বিরূণী (১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ) বলিয়াছিলেন যে 'হিন্দুরা যাহা বিশ্বাস করে আমরা তাহা করি না—আমরা যাহা বিশ্বাস করি হিন্দুরা তাহা করে না।' নয় শত বৎসর পরে যে মুসলমানেরা পাকিস্থানের দাবী করিয়াছিল তাহারাও এই কথাই বলিয়াছিল। তাহারা পূর্বোক্ত ও অন্যান্য প্রভেদের বিষয় সবিস্তারে উল্লেখ করিয়া তাহাদের উক্তির সমর্থন করিত। অষ্টম শতাব্দের আরম্ভে মুসলমানেরা যখন সিন্ধুদেশ জয় করিয়া ভারতে প্রথম বসতি স্থাপন করে তখনও হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে মৌলিক প্রভেদগুলি ছিল সহস্র বৎসর পরেও এক ভাষার পার্থক্য ছাড়া আর সমস্তই ঠিক সেইরূপই ছিল। হিন্দুর সর্বপ্রকার রাজনীতিক অধিকার লোপ এবং এই ধর্ম ও সমাজগত প্রভেদ ও পার্থক্যই মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের সর্বপ্রধান দুইটি ঘটনা। রাজনৈতিক ইতিহাসে কেবল মুসলমান রাজাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে কারণ মুসলমানেরাই ছিল রাজপদের অধিকারী—হিন্দুরা ছিল তাহাদের দাস মাত্র। কোন হিন্দুর পক্ষে রাজপদ অধিকার করা যে কত অসম্ভব ছিল রাজা গণেশের কাহিনীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু গুরুতর প্রভেদ সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই বিধিবদ্ধ ধর্ম ও সমাজ ছিল—সুতরাং পৃথকভাবে এই দুইয়ের আলোচনা করিতে হইবে।

২। মুসলমান ধর্ম ও সমাজ

মুসলমানের ধর্ম ইসলাম নামে পরিচিত এবং ইহার মূলনীতিগুলি কোরাণ প্রভৃতি কয়েকখানি ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং পৃথিবীর সর্বত্রই মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে ও ধর্মাচরণে সাধারণভাবে একটি মূলগত ঐক্য দেখা যায়। বাংলা দেশেও এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় নাই।

যে সকল তুর্কী সৈন্য প্রথমে বাংলা দেশ জয় করিয়া এখানে বসবাস করিতে আরম্ভ করে তাহারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া খুব নিম্নস্তরেরই ছিল। অনেক

নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল। হিন্দু সমাজে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা নানা অসুবিধা ও অপমান সহ্য করিত। কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে যোগ্যতা অনুসারে রাজ্য ও সমাজে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার পক্ষেও তাহাদের কোন বাধা ছিল না। বখ্‌তিয়ার খিলজীর একজন মেচজাতীয় অনুচর গৌড়ের সম্রাট হইয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া যে দলে দলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত ইহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই। অপর পক্ষে হিন্দুর উপর নানাবিধ অত্যাচার হইত। তাহাদিগকে জিজিয়া কর দিতে হইত, উচ্চপদে নিয়োগের কোন আশা তাহাদের ছিল না এবং রাজনৈতিক সকল অধিকার হইতেই তাহারা বঞ্চিত ছিল। এই সব কারণে হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রলোভন খুবই বেশী ছিল। ষোড়শ শতাব্দের প্রারম্ভে পর্তুগীজ পর্যটক দুয়ার্তে বারবোসা বাংলা দেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে রাজ-অনুগ্রহ পাইবার জন্য প্রতিদিন হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আবার, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের স্পৃষ্ট পানীয় গ্রহণ ও দ্রব্য ভোজন এমন কি নিষিদ্ধ ভোজ্যের গন্ধ নাকে আসিলেও হিন্দুর জাতিচ্যুতি হইত। মুসলমান কোন হিন্দু নারীর অঙ্গ স্পর্শ করিলে সে স্বয়ং এবং কোন কোন স্থলে তাহার পরিবার ও আত্মীয়স্বজন জাতি ও ধর্মে পতিত বলিয়া গণ্য হইত। এই সমুদয় হিন্দুর ইসলামধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অনেক সময় জোর করিয়া হিন্দুকে মুসলমান করা হইত—আবার কোন কোন সময়ে কেহ কেহ স্বেচ্ছায় ফকীর ও দরবেশদের প্রভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত। এই সকল কারণে বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গেল। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই যে ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাংলা দেশে বৌদ্ধ পাল রাজত্বের সময় অনেক বৌদ্ধ ছিল। সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন; তাহার ফলে অনেক প্রাক্তন বৌদ্ধ সমাজের নিম্নস্তরে পতিত হয়। তাহারা মুসলমানদিগকে ত্রাণকর্তা বলিয়াই মনে করিত। তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল যে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্যই দেবতারা মুসলমানের মূর্তিতে ভূতলে আসিয়াছেন। এ সম্বন্ধে "ধর্মপূজা বিধান" নামক গ্রন্থখানি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ধর্মপূজা বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিয়াছে এবং তান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ্য মতের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া এখনও পশ্চিমবঙ্গে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত আছে। উল্লিখিত গ্রন্থে 'নিরঞ্জনের রূসনা'

নামে একটি কবিতা আছে। ব্রাহ্মণেরা ধর্মঠাকুরের ভক্তদের সহিত কিরূপ দুর্ব্যবহার করিত প্রথমে তাহার বর্ণনা আছে। দক্ষিণা না পাইলেই তাহারা শাপ দেয়—সদ্ধর্মীদের বিনাশ করে—ব্রাহ্মণদের ভয়ে সকলেই কম্পমান ইত্যাদি। ইহাতে বিচলিত হইয়া ভক্তেরা ধর্মঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিল :—

"মনেতে পাইয়া মর্ম সভে বলে রাখ ধর্ম
তোমা বিনে কে করে পরিত্রাণ।
এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহরণ
এ বড় হইল অবিচার॥"

ভক্তের প্রার্থনা শুনিয়া বৈকুণ্ঠে ধর্মঠাকুরের আসন টলিল :—

"বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে পাইয়া মর্ম
মায়ারূপে হইল খনকার।
ধর্ম হইলা যবনরূপী শিরে নিল কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
যতেক দেবতাগণ সবে হয়ে একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার।
বিষ্ণু হৈল পয়গম্বর ব্রহ্মা হৈল পাকাম্বর (হজরৎ মহম্মদ)
আদম্ভ হইলা শূলপাণি।

এইরূপে গণেশ হইলেন গাজী, কার্তিক কাজী, চণ্ডিকা দেবী হায়া বিবি, ও পদ্মাবতী বিবি নূর হইলেন। এইভাবে দেবগণ মুসলমানের রূপ ধারণ করিয়া জাজপুরে প্রবেশ করিল এবং মন্দিরাদি ভাঙ্গিয়া অনর্থ সৃষ্টি করিল।

এই কবিতাটি কোন্ সময়ের রচনা তাহা জানা নাই। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে সমাজের নিম্নশ্রেণীভুক্ত প্রাক্তন বৌদ্ধগণ মুসলমানদিগকেই হিন্দুর উপাস্য দেবতার স্থানে বসাইয়াছিল অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল উক্ত কবিতায় তাহাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

প্রথম যুগের তুর্কী সেনাগণ ও ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে লইয়াই বাংলার মুসলমান সমাজ সর্বাগ্রে গঠিত হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাহির হইতে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানও আসিয়া বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গলরাজ চেঙ্গিস খাঁ সমগ্র মধ্য এশিয়ায় তুর্কী মুসলমানদের রাজ্য এবং বোখারা, সমরখন্দ প্রভৃতি ইসলাম সংস্কৃতির প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি

ধ্বংস করেন। ইহার ফলে এই অঞ্চল হইতে গৃহহীন পলাতকেরা দলে দলে ভারতে তুর্কী মুসলমানদের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে তাহাদের অনেকে বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করিল এবং বাংলার মুসলমান সুলতানগণ জ্ঞানী-গুণী মুসলমানদিগকে অর্থ ও সম্মান দিয়া নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরবর্তী-কালে দিল্লীতে বিভিন্ন তুর্কী রাজবংশের উত্থান ও পতনের ফলে বিতাড়িত অনেক তুর্কী সম্রান্ত লোক বাংলায় আশ্রয় লইলেন। বাংলায় মুঘল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক সম্রান্ত মুসলমান রাজকর্মচারীরূপেও বাংলায় আসিতেন, ফলে বাংলার বাহিরের ইসলাম সভ্যতার সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল। এইরূপে কাল-ক্রমে বহু পণ্ডিত ও উচ্চশ্রেণীর মুসলমান বাংলায় আসিলেন এবং সংখ্যায় অল্প হইলেও ইঁহারা বাংলার মুসলমান সমাজে উচ্চতর শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবর্তন করিলেন। আরবী ও ফার্সী সাহিত্যের উন্নতি হইল এবং ইসলাম ধর্মেরও দ্রুত প্রসার হইতে লাগিল।

এই প্রসঙ্গে সুফী ও দরবেশ নামে পরিচিত একটি মুসলমান পীর বা ফকির সম্প্রদায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; কারণ প্রধানতঃ ইঁহাদের চেষ্টায়ই বাঙালী মুসলমানদের উন্নত ধর্মভাব ও সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছিল। সুফীগণ মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া হইতে উত্তর ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া বাংলায় আগমন করেন। খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলার সর্বত্র—শহরে ও গ্রামে—সুফীরা দর্গা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহারা ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায়ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সুফীরই বহু শিষ্য ছিল। ইঁহারা তাঁহাদিগকে ইসলামী শাস্ত্রে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে দীক্ষা দিতেন। এই শিষ্যেরাও আবার বড় হইয়া দর্গা প্রতিষ্ঠা করিয়া নূতন নূতন শিষ্যকে শিক্ষা-দীক্ষা দিতেন। রাজা প্রজা সকলেই সুফীদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। সুফীর দর্গা ও কবর পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত। এই সব দর্গায় শিক্ষা-দীক্ষা ব্যতীত দরিদ্রের অন্নদান ও চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল।

অ-মুসলমানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা মুসলমান শাস্ত্রমতে পুণ্য কার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। সুফীগণ এই বিষয়ে অতিশয় তৎপর ছিলেন। সুফীদের মধ্যে অনেকে পণ্ডিত ও সাধু ছিলেন এবং ধর্মনীতি অনুসরণ করিয়া জীবনযাপন করিতেন। তাঁহাদের উপদেশে ও দৃষ্টান্তে অনেক হিন্দু

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত। মুসলমান আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে বাংলায় তান্ত্রিক. ধর্মের খুব প্রভাব ছিল। সাধারণ লোকে বিশ্বাস করিত যে তান্ত্রিক সাধু বা গুরুর বহুবিধ অলৌকিক ক্ষমতা আছে। সুতরাং তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করিত এবং তাঁহাদের বাসস্থান তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইত। মুসলমানেরা বাংলা জয় করিবার পর অনেক সুফী দরবেশ ও পীর এই সব তান্ত্রিক সাধুকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহাদের বাসস্থানেই দর্গা প্রতিষ্ঠা করিতেন। ক্রমে পীরগণও অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। লোকে মনে করিত পীরেরা ইচ্ছা করিলেই লোকের দুঃখ দুর্দশা মোচন করিতে পারেন, মৃত লোককে বাঁচাইতে পারেন আবার জীবন্ত মানুষকেও জাদুবলে মারিতে পারেন। একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে থাকিতে পারেন এবং লোকের ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতে পারেন। ফলে তান্ত্রিক সাধুর শিষ্যেরাও অনেকে স্থান মাহাত্ম্যে এবং এই সব অলৌকিক ক্ষমতার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া পীরের দর্গায় আসিত ও ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিত।

আবার পীর ও দরবেশ সুফীরা অনেক সময় হিন্দুরাজ্য জয় করিবার জন্য যুদ্ধও করিতেন। মুসলমানদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে শাহ জালাল নামে এক সুফী দরবেশ তাঁহার পীর অর্থাৎ গুরুর আদেশে এবং উক্ত গুরুর ৭০০ শিষ্যসহ বহু যুদ্ধ করিয়া অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য জয় করেন এবং সেখানে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। পরিশেষে শ্রীহট্টের রাজাকে পরাজিত ও ঐ দেশ অধিকার করিয়া অনুচরগণসহ সেখানে বসবাস করেন। সম্ভবতঃ বাংলার সুলতানের সৈন্যদের সহায়তায়ই তিনি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। কোন কোন পীর সুলতান কর্তৃক শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং মুসলমান সেনাপতি হিন্দু রাজ্য জয় করিয়া পীর উপাধি এবং পীরের খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছেন এরূপ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তও আছে। সুতরাং পীরেরা শস্ত্র ও শাস্ত্র দুইটিতেই সমান দক্ষ ছিলেন। ধর্মপ্রচার ও শস্ত্রচালনা এই দুই উপায়েই বাংলায় মুসলমান রাজ্য ও ইসলাম ধর্মের বিস্তারে তাঁহারা সহায়তা করিতেন।

যে সকল নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা আরবী জানিত না এবং যদিও কেহ কেহ সামান্য ফার্সি জানিত, তথাপি মুসলমান ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ কোন জ্ঞানও ছিল না। যোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যে এই অবস্থা ছিল দুইজন মুসলমান লেখকের রচনা হইতে তাহা জানা যায়। একজন

লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালী মুসলমানেরা না বোঝে আরবি, না বোঝে নিজের ধর্ম—গল্প কাহিনী প্রভৃতি লইয়াই তাহারা মত্ত থাকে। আর একজন মহাভারতের বাংলা অনুবাদ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

হিন্দু মোছলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে।
খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে॥ [১]

তবে ইসলাম ধর্মের যে পাঁচটি মূল তথ্য বা তত্ত্ব, তাহার মধ্যে প্রথম চারিটি—ইমান (ঈশ্বরে ও পয়গম্বরে বিশ্বাস), নমাজ, রোজা ও হজ (মক্কা প্রভৃতি তীর্থ দর্শন) বাঙালী মুসলমানেরাও যথারীতি পালন করিত। পঞ্চম—জকাৎ অর্থাৎ নিজের আয়ের এক নির্দিষ্ট অংশ গরীব দুঃখীকে নিয়মিত দান—কতদূর প্রতিপালিত হইত তাহা বলা যায় না।

খাঁটি ইস্‌লামের অতিরিক্ত এবং অননুমোদিত কতকগুলি সংস্কার ও প্রথা বাংলায় মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল। কারণ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা বহু সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও তাহাদের কোন কোন বিশ্বাস ও সংস্কার ছাড়িতে পারে নাই। সুতরাং তাহা ধীরে ধীরে মুসলমান সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

হিন্দুদের গুরুবাদ অর্থাৎ গুরুর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি মুসলমান পীরের প্রতি ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ক্রমশঃ ইহা পঞ্চপীর—সত্যপীর, মাণিকপীর, ঘোড়াপীর, কুম্ভীরপীর, মদারী (মৎস্য ও কচ্ছপ) পীর—প্রভৃতির পূজায় পর্যবসিত হইল। বন্ধ্যার পুত্র লাভের জন্য নানা অনুষ্ঠান, কুম্ভীরের কৃপায় সন্তান লাভ হইলে প্রথম সন্তানটি কুম্ভীরকে দান, মদারীকে ভোজ্য দান, বৃক্ষে সূত্র বন্ধন ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের কুসংস্কার তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সমাজেও প্রবেশ করিল।

মোল্লা নামে আর একটি নূতন যাজকশ্রেণীর আবির্ভাবও উল্লেখযোগ্য। ইহারা হিন্দুদের পুরোহিতের মতন গ্রামবাসীর নিত্যনৈমিত্তিক ধর্মানুষ্ঠান এবং বিবাহাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত করিত। লোকের গলায় পুঁতি ঝুলাইয়া তাহাকে ভূতের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিত এবং সঙ্গে সঙ্গে কসাইয়ের ব্যবসা অর্থাৎ মুরগী, বকরী ইত্যাদি জবাই করিত। এই সমুদয় হইতে যে অর্থলাভ হইত তাহাই ছিল তাহাদের উপজীব্য।

১। স্মরণ করে।

ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে মোল্লার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে :

মোল্লা পড়ায়্যা নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলমা পড়িয়া।
করে ধরি খর ছুরি কুকুরা জবাই করি
দশ গণ্ডা দান পায় কড়ি॥

পীরের ন্যায় মোল্লাও ইসলামের অননুমোদিত ধর্মযাজক এবং হিন্দু সমাজের গুরু পুরোহিতের অনুকরণ।

প্রাচীন মুসলমান সাধুসন্তদের ও পীরদের সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁহাদের কৃপায় ব্যারাম-পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ হইতে পারে এইরূপ বিশ্বাসও প্রচলিত ছিল। এরূপ বিশ্বাস ইসলাম ধর্মের অননুমোদিত। অতএব ইহা সম্ভবতঃ হিন্দু সমাজের প্রভাব সূচিত করে। এইরূপ আরও অনেক কুসংস্কার মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল।

হিন্দু সমাজে জাতিভেদের কিছু প্রভাবও মুসলমান সমাজে দেখা যায়। কারণ বাংলার মুসলমান সমাজে কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সৈয়দ (অর্থাৎ যাঁহারা হজরৎ মুহম্মদের বংশধর বলিয়া দাবি করেন), আলিম (পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী), শেখ (পীর) ছিলেন উচ্চশ্রেণীভুক্ত এবং বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। কাজীও উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং মোল্লারাও জনসাধারণ অপেক্ষা কিছু উচ্চস্তরের ছিল। ইহা ছাড়া তুর্কী, পাঠান, মোগল প্রভৃতিও বিভিন্ন শ্রেণী বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু এই শ্রেণী-বিভাগ হিন্দুদের জাতিভেদের ন্যায় কঠোর ছিল না—ইহাদের মধ্যে পান ভোজনের বা স্পর্শদোষের বালাই ছিল না এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদিও একেবারে অপ্রচলিত ছিল না।

নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেও বংশানুক্রমিক বৃত্তি অনুসারে অনেক শ্রেণী বিভাগ ছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ইহাদের একটি সুদীর্ঘ তালিকা আছে। যথা গোলা, জোলা, মুকেরি[১], পিঠারি, কাবাড়ি[২], সানাকার, হাজাম, তীরকর, কাগজী[৩], দরজি, বেনটা[৪], রংরেজ[৫], হালান ও কসাই।

১। যাহারা বলদে করিয়া বিক্রেয় জিনিষ নেয়। ২। মৎস্য বিক্রেতা অথবা কসাই ৩। যে কাগজ তৈরী করে। ৪। যে বয়ন করে। ৫। যে রং লাগায়।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে নূতন নগরপত্তনের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে বড় বড় নগরে মুসলমানেরা একটি স্বতন্ত্র পাড়ায় বাস করিত। এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তিতে ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমান সমাজের একটি মনোরম চিত্র পাওয়া যায়:—

"ফজর[1] সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি[2] করয়ে নমাজ।
ছোলেমানী মালা করে জপে পীর পগম্বরে
পীরের মোকামে দেয় সাঁজ॥
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কেতাব কোরাণ।
কেহ বা বসিয়া হাটে পীরের শীরিণি বাঁটে
সাঁঝে বাজে দগড়[3], নিশান॥
বড়ই দানিসবন্দ[4] না জানে কপট ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
যার দেখে খালি মাথা তার সনে নাহি কথা
সারিয়া চেলার মারে বাড়ি॥
ধরয়ে কম্বোজ বেশ মাথাতে না রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।
না ছাড়ে আপন পথে দশ রেখা টুপি মাথে
ইজার পরয়ে দৃঢ় দড়ি (করি ?)॥
আপন টোপর নিয়া বসিলা গাঁয়ের মিয়া
ভুঞ্জিয়া[5] কাপড়ে মোছে হাত।"

ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে পর্তুগীজ বারবোসা বাংলা দেশের প্রধান একটি বন্দরের সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, মুসলমানেরা পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা সাদা জোব্বা পরে—ইহার তলে লুঙ্গির মত কোমরে জড়ান কাপড় এবং উপরে কোমরে রেশমের কোমরবন্ধ হইতে রৌপ্যখচিত তরবারি ঝুলান থাকে। হাতে মণিমাণিক্যখচিত অনেকগুলি আংটি এবং মাথায় সূক্ষ্ম তুলার কাপড়ের টুপি। তাহারা খুব বিলাসী—মেয়ে পুরুষ উভয়ই উৎকৃষ্ট খাদ্য ও মদ্যপানে

১। প্রাতঃকাল। ২। পাঁচবার। ৩। দামামা ৪। পণ্ডিত, ধার্মিক। ৫। আহার করিয়া।

অভ্যস্ত। প্রত্যেকের ৩।৪ বা ততোধিক স্ত্রী। তাহাদের পরণে মূল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কার কিন্তু তাহারা পর্দানসীন। নৃত্য গীত তাহাদের খুব প্রিয়। প্রত্যেকেরই অনেক ভৃত্য। সাধারণ লোকেরা খাটো কুর্তা ও মাথায় পাগড়ী পরে। সকলেই জুতা ব্যবহার করে। ধনীদের জুতায় রেশম ও সোনার সুতার কাজ।

মুসলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা সাধারণতঃ ফার্সী ভাষার সাহায্যেই হইত। অনেকে আরবী ভাষারও চর্চা করিতেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্য মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল। অনেক সুলতান এইরূপ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতেন। সুফীদের দর্গাতেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাভাষায় হইত। সাধারণতঃ বিদেশী ও স্বল্পসংখ্যক অভিজাত মুসলমান উর্দু ব্যবহার করিতেন তাছাড়া সকলেই বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলিত। মুসলমান সমাজে অবস্থাপন্ন লোকের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নেওয়া হইত। মসজিদেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সকলেই কোরাণ শরীফ পড়িত এবং অন্য এক বা একাধিক বিষয় শিখিত।

অনেক সময় অল্পবয়সেই ছেলেমেয়েদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইত কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে বিবাহ হইত না। বর ঘোড়ায় চড়িয়া শোভাযাত্রা করিয়া কনের বাড়ীতে যাইত—সেখানে কাজীর সামনে মোল্লা বিবাহ দিতেন। ধনীর বাড়ীতে ভোজ নৃত্যগীতাদি একাধিক দিন চলিত। বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুর অনেক লৌকিক আচার অনুষ্ঠান মুসলমান সমাজেও প্রচলিত ছিল।

ধনী পুরুষেরা বহু বিবাহ করিত এবং বিবাহবন্ধন ছেদও খুবই হইত। ধনীলোকের স্ত্রীদের সঙ্গে বহু দাসদাসী আসিত। পর্দার ব্যবস্থা খুব কড়া ছিল এবং বড়লোকের হারেমে খোজা প্রহরী নিযুক্ত হইত। নর্তকীর নৃত্য ও সঙ্গীত মুসলমান সমাজে খুবই আদৃত হইত।

৩। স্মৃতিশাস্ত্র অনুমোদিত আদর্শ রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম ও সমাজ

হিন্দু সংস্কৃতির দুইটি বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ ইহা ধর্মকেন্দ্রিক—অর্থাৎ ধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার সাহিত্য সমাজ শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন যুগের সহিত যোগসূত্র রক্ষা। অর্থাৎ অতীতে যাহা ছিল তাহা সহসা বা সরাসরি অস্বীকার না করিয়া যথাসম্ভব তাহার সহিত অন্ততঃ বাহ্যিক

একটি সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা। অল্পবিস্তর পরিবর্তন প্রতি সমাজেই যুগে যুগে ঘটে — উহা সমর্থনের জন্য শাস্ত্রবচন অগ্রাহ্য না করিয়া তাহার টীকা টিপ্পনী—অনেক সময় অসঙ্গত ব্যাখ্যাদ্বারা তাহার এরূপ অর্থ করা হইত যাহাতে পরিবর্তিত লোক-মতের বা লৌকিক আচরণের সহিত সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারে। এই জন্যই গুরুতর পরিবর্তন ঘটিলেও হিন্দুরা প্রাচীন স্মৃতির মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে—অথচ সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন টীকা রচনা করিয়া কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাসের অভাব ঘটিতে দেয় নাই। সুতরাং মধ্যযুগে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রামাণিক স্মৃতিগ্রন্থের নূতন নূতন টীকা হইয়াছে এবং স্মার্ত পণ্ডিতগণ নূতন নূতন নিবন্ধ লিখিয়া প্রতি অঞ্চলে যে সব নূতন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে তাহার সহিত শাস্ত্রের সঙ্গতি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে একই স্মৃতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা অথবা বিভিন্ন প্রদেশে বা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্মৃতির নিবন্ধ প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বাংলা দেশেও মধ্যযুগে, শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সুতরাং বাংলার ধর্ম ও সমাজ মধ্যযুগে কি আদর্শে পরিচালিত হইত এই সমুদয় সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের কয়েকজন বিখ্যাত নিবন্ধকারের জীবনকাল অদ্যাপি নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হয় নাই; তথাপি অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে ১২০০ খৃষ্টাব্দ এবং উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব বা পর হইতে যে সকল স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, ঐগুলি অবলম্বন করিয়া এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর সাহায্যে মধ্যযুগে বঙ্গদেশের আদর্শ রক্ষণশীল সমাজের চিত্র অঙ্কন করিতেছি। স্মৃতি ও নিবন্ধ ভিন্ন বঙ্গদেশে রচিত বলিয়া অনুমিত বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ[১], কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসার; প্রভৃতি গ্রন্থেও কিছু সামাজিক তথ্য আছে।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। স্মৃতি নিবন্ধাদিতে যে সকল বিধিনিষেধ আছে, উহাদের কতটুকু প্রাচীনতর শাস্ত্রের প্রতিধ্বনিমাত্র এবং কতটুকু তদানীন্তন সমাজের প্রতিচ্ছবি তাহা নির্ণয় করা দুরূহ এবং প্রায় অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সুতরাং সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে হিন্দুধর্ম ও সমাজের যে বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা পৃথকভাবে পরে আলোচিত হইবে।

১। বাংলা দেশের ইতিহাস—প্রথম ভাগ—৩য় সংস্করণ, ১৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

(ক) ধর্মচর্যা

স্মৃতিনিবন্ধগুলি হইতে মনে হয়, বাঙালীর জীবনে বার মাসেই পূজা পার্বণ লাগিয়া থাকিত। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাংলাদেশে মধ্যযুগে বৈদিক যাগযজ্ঞাদির বিশেষ প্রচলন দেখা যায় না। সমাজে ব্রতানুষ্ঠানের খুবই প্রচলন ছিল; এই ব্রত সংক্রান্ত আচার আচরণ বিশেষতঃ স্নানদানাদির মধ্যে পুরাণের যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধসমূহে, বিশেষতঃ শূলপাণি হইতে রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দের কাল পর্যন্ত রচিত গ্রন্থগুলিতে, তন্ত্রের প্রগাঢ় প্রভাব দেখা যায়। বাংলাদেশের পূজাপার্বণে তান্ত্রিক মন্ত্রের প্রয়োগ, তান্ত্রিক মণ্ডল, মুদ্রা, যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। জীবনে তান্ত্রিক দীক্ষার অপরিহার্যতাও এই দেশে স্বীকৃত হইয়াছিল।

সমাজে যে সকল সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল, তন্মধ্যে প্রধান শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব। এই তিনটি প্রধান সম্প্রদায় ছাড়াও বাংলা দেশে সৌর, গাণপত্য, পাশুপত, পাঞ্চরাত্র, কাপালিক, কৌলর্ক প্রভৃতি বহু সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। কোন কোন গ্রন্থে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মাবলম্বিগণেরও উল্লেখ আছে। চিরঞ্জীবের (১৭শ—১৮শ শতক) 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী' নামক চম্পূকাব্য হইতে মনে হয়, কোন স্থানে নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে সমবেত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম সংক্রান্ত তর্ক বিতর্ক হইত। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই বিশিষ্ট আচার আচরণ এবং স্বকীয় পূজাপার্বণ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। শাক্তগণের মধ্যে দেবী বা শক্তির পূজা প্রধান বলিয়া গণ্য হইত। 'দেবীপুরাণে' শক্তিপূজার বিধান বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। রঘুনন্দন এই পুরাণের প্রামাণিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'দেবীভাগবত', 'মহাভাগবত পুরাণ' প্রভৃতিতে শাক্তগণের ধর্মচর্যা সম্বন্ধে বহু তথ্য নিহিত আছে।

বাংলা দেশে প্রচলিত কালীপূজার প্রবর্তক ছিলেন 'তন্ত্রসার'-প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। এই দেশে প্রচলিত কালীমূর্ত্তির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন কৃষ্ণানন্দ। উক্ত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' কালীর স্তুতিচ্ছলে (৩।১৬।৩৭-৪৫) তাঁহাকে 'মঙ্গলচণ্ডিকা' আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। দেবীভাগবতে ও ৯।১।৮৩ প্রভৃতিও (৯।৪৭।১-৩৭) দেবীর এক রূপহিসাবে মঙ্গলচণ্ডীর প্রশস্তি ও পূজার উল্লেখ আছে। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলচণ্ডী অবলম্বনে বহু আখ্যান উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল এবং মঙ্গলচণ্ডীর পূজা অদ্যাবধি এই দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

সম্ভবতঃ এই দেশে রচিত 'পদ্মপুরাণ' এবং 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' বৈষ্ণবগণের ধর্মকর্ম সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট রাধাকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি। কিন্তু, ইহাদের প্রধান উপজীব্য 'ভাগবতপুরাণে' রাধার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' রাধাকে কৃষ্ণের বিলাসকলার কেন্দ্রগত রস-স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

পূজাপার্বণের মধ্যে বাংলাদেশে শারদীয়া পূজা বা দুর্গাপূজা সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই দুর্গাপূজার পদ্ধতি 'বৃহন্নন্দিকেশ্বর' ও 'নন্দিকেশ্বরপুরাণ' দ্বারা প্রভাবিত। স্ব-গৃহ, জীর্ণস্থান, ইষ্টকরচিত স্থান ও 'দীপস্থিতিবিবর্জিত' স্থান প্রভৃতিতে দুর্গাপূজা নিষিদ্ধ; 'স্বগৃহ' শব্দের অর্থ বোধ হয় নিজের বাসের ঘর। শূলপাণির মতে, ইষ্টকরচিত স্থানে মৃত্তিকাবেদির উপরে দুর্গাপূজা হইতে পারে।

দুর্গার মূর্তি হইবে দশভুজা এবং সিংহোপরি স্থাপিতা। মূর্তি সাধারণতঃ মৃন্ময়ী হইত। কিন্তু অন্য উপাদানের দ্বারাও উহা নির্মিত হইত বলিয়া মনে হয়; কারণ শূলপাণি বলিয়াছেন যে, মৃণ্ময়ী প্রতিমাপক্ষে দেবীর স্নান দর্পণে বিধেয় এবং মূর্তি স্নানযোগ্য হইলে স্নান প্রতিমাতেই করণীয়। সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী—এই ত্রিবিধ পূজাই বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণের অনুমোদিত বলিয়া মনে হয়। সাত্ত্বিকী পূজায় থাকিবে জপ, যজ্ঞ ও নিরামিষ পূজোপকরণ। রাজসী পূজাতে পশুবলি হইবে এবং পূজোপকরণ হইবে আমিষ। তামসী পূজার ব্যবস্থা কিরাতগণের জন্য; এইরূপ পূজায় জপ, যজ্ঞ বা মন্ত্র নাই এবং পূজোপকরণ মদ্য মাংস প্রভৃতি।

'কালিকাপুরাণের' প্রমাণবলে শূলপাণি একপ্রকার সংক্ষিপ্ত দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন; এই ব্যবস্থানুসারে মাত্র পঞ্চোপকরণের দ্বারা দেবীপূজা হইতে পারে, যথা—পুষ্প, চন্দন, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য। প্রতিকূল আর্থিক অবস্থাদি হেতু যে বহু দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে কেবল ফুল জল অথবা শুধু জলের দ্বারা পূজার বিধান আছে।

বাংলা দেশে প্রচলিত দুর্গাপূজা সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে শক্রবলি এবং শবরোৎসব কৌতূহলোদ্দীপক। 'দেবীপুরাণ', 'কালিকাপুরাণ' প্রভৃতিতে শক্রবলির উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ মানকচুর পাতায় ঢাকা একটি পুতুলকে বলি দেওয়া হয়। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, ইহা দ্বারা একবৎসর পর্যন্ত

শত্রুভয় হইতে মুক্ত থাকা যায়। 'দুর্গোৎসববিবেক', 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' প্রভৃতি নিবন্ধগুলিতে শত্রুবলির উল্লেখ নাই, কিন্তু পরবর্তী কালের বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য নামক জনৈক অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক রচিত 'দুর্গাপূজাপদ্ধতি'তে এই প্রথার উল্লেখ আছে। ইহা হইতে মনে হয়, এই প্রথা বাংলা দেশে কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ সম্ভবতঃ এই অনুষ্ঠানটিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই।

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধসমূহে বিবিধ দশমীকৃত্যের মধ্যে শবরোৎসবের ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থানুসারে পরস্পর অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করিবে। যে এইরূপ গালাগালি অপরকে করিবেনা এবং যাহাকে অপরে গালাগালি করিবেনা, তাহারা উভয়েই দেবীর বিরাগভাজন হইবে। 'শবরোৎসব' শব্দটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে, ইহাতে শবরের ন্যায় সমস্ত শরীর পত্রাদি দ্বারা আবৃত ও কর্দমলিপ্ত করিয়া গীত ও বাদ্য করিতে হয়।

বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের মতে, বিভিন্ন মাসে নিম্নলিখিত ধর্মানুষ্ঠান ও আচার প্রধান :

বৈশাখ—প্রাতঃস্নান, ব্রাহ্মণকে জলঘটদান, মসূরসহ নিম্বপত্র ভক্ষণ, বিষ্ণুকে শীতলজলে স্নান করান।

জ্যৈষ্ঠ—আরণ্যষষ্ঠী, সাবিত্রীব্রত ও দশহরা।

আষাঢ়—চাতুর্মাস্য ব্রত।

শ্রাবণ—মনসাপূজা।

ভাদ্র—জন্মাষ্টমীব্রত ও অনন্তব্রত।

আশ্বিন—দুর্গাপূজা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা।

কার্তিক—প্রাতঃস্নান, দীপান্বিতায় দিনে উপবাস ও পার্বণশ্রাদ্ধ, সন্ধ্যায় পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে উল্কাদান প্রভৃতি; দ্যূতপ্রতিপদ, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

অগ্রহায়ণ—নবান্নশ্রাদ্ধ।

পৌষ—এই মাসে উল্লেখযোগ্য কোন অনুষ্ঠানের বিধান নাই।

মাঘ—রটন্তীচতুর্দশী, শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপূজা, মাঘী সপ্তমীতে প্রাতঃস্নান ও সূর্যোপাসনা, বিধান সপ্তমীব্রত, আরোগ্যসপ্তমীব্রত, ভীষ্মাষ্টমীতে ।।

ফাল্গুন—শিবরাত্রিব্রত।

চৈত্র—শীতলাপূজা, বারুণীস্নান, অশোকাষ্টমী, রামনবমীব্রত, মদনত্রয়োদশী ও মদনচতুর্দ্দশী তিথিতে পুত্রপৌত্রাদির সৌভাগ্য কামনায় এবং সমস্ত বিপদ হইতে ত্রাণলাভের আকাঙ্ক্ষায় মদনদেবের পূজা কর্তব্য। রঘুনন্দনের মতে এই পূজায় মদনদেবের প্রীত্যর্থে অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ বিধেয়।

বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে কয়েকটি তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের কথা বলা আবশ্যক। 'তন্ত্রসারে' শত্রুর অনিষ্টকল্পে বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, অভিচার প্রভৃতি কতক অনুষ্ঠানপদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। বশীকরণ পদ্ধতিও এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। এই সকল অনুষ্ঠানে জনসাধারণের বিশ্বাস ও আচার-আচরণ প্রতিফলিত হইয়াছে।

শ্রাদ্ধ হিন্দুদের একটি বিশেষ ধর্মানুষ্ঠান। শ্রাদ্ধ বলিতে ঠিক কি বুঝায়, এই সম্বন্ধে বাঙালী স্মৃতিকারগণ প্রাচীন স্মৃতির বচনাদি আলোচনা করিয়া উহাদের মধ্যে ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া নিজস্ব সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। শূলপাণির মতে, সম্বোধন পদের দ্বারা আহূত উপস্থিত পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে হবিত্যাগের নাম শ্রাদ্ধ। রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, বৈদিক প্রয়োগাধীন আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্বক অন্নাদি দানের নাম শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধের উপযুক্ত স্থান ও সময়, শ্রাদ্ধকর্তার পক্ষে কোন্ কোন্ কর্ম বর্জনীয়, শ্রাদ্ধে কাহাকে এবং কত জনকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, এবং কোন্ খাদ্যদ্রব্য দেয় অথবা বর্জনীয়, শ্রাদ্ধের অধিকারী কে—ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মাবলী স্মৃতিশাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে।

(খ) নীতিবোধ

বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণ বিবিধ ব্যসনকে তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছেন। অবৈধ যৌনসম্বন্ধের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি সতর্ক। এইরূপ সম্বন্ধের মধ্যে গুর্বঙ্গনাগমন সর্বাপেক্ষা নিন্দিত। 'গুর্বঙ্গনা' শব্দের অর্থ, বাংলাদেশের স্মৃতিকারগণের মতে, মাতা। মাতার সপত্নী, ভগ্নী, আচার্যকন্যা, আচার্যানী এবং স্বীয় কন্যা প্রভৃতির সহিত যৌনসংসর্গও গুর্বঙ্গনাগমনের তুল্য। যে কোন লোকের পক্ষে নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তির স্ত্রী, নিম্নতরবর্ণের স্ত্রীলোক, রজকপত্নী, রজস্বলা নারী ও গর্ভবতী নারীর সহিত সহবাস এবং ব্রহ্মচারীর পক্ষে যে কোন নারীর সহিত

সহবাস প্রায়শ্চিত্তার্হ ; কিন্তু গুর্বঙ্গনাগমনজনিত পাপের তুলনায় ইহাদের সঙ্গে যৌনসম্পর্কের পাপ লঘুতর। গো প্রভৃতি ইতর প্রাণীর সহিত যোনি-সম্পর্কও পাপজনক বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যাহা নীতিবিগর্হিত এমন কতক ব্যাপার এই দেশের স্মৃতিকারগণের সমর্থন লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। দাসী ও অবিবাহিতা নারীর সহিত যৌনসংযোগ অন্ততঃ শূদ্রের পক্ষে অবৈধ বিবেচিত হইত না বলিয়া মনে হয়; কারণ, দায়ভাগে (৯।২৯) জীমূতবাহন শূদ্রের ঔরসে ও দাসীর অথবা অপর অবিবাহিতা নারীর গর্ভে জাত পুত্রের জন্য পিতার অনুমতিক্রমে পৈতৃক সম্পত্তির একটি ভাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায় এরূপ জারজ পুত্র সমাজে স্বীকৃত হইত।

প্রাচীন স্মৃতির অনুসরণে বঙ্গীয় স্মৃতিতেও বিবাহ-বন্ধন অত্যন্ত সুদৃঢ় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। একমাত্র স্ত্রীর অসতীত্ব ভিন্ন অপর কোন কারণে পতি তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। স্ত্রীর অপর কতক অপরাধে তিনি পতির সহাবস্থানে বঞ্চিত হইতেন বটে, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনে বঞ্চিত হইতেন না।

দুর্গাপূজা প্রসঙ্গে শবরোৎসবের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি এই উৎসবের অঙ্গ। মনে হয়, ইহা অনার্য প্রভাবের একটি নিদর্শন।

জ্যেষ্ঠভ্রাতার পূর্বে কনিষ্ঠভ্রাতার বিবাহ বাঙালী স্মৃতিকারগণ গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এইরূপ বিবাহ এত পাপজনক যে, ইহার সঙ্গে সংযুক্ত সকলেই, এমন কি পুরোহিত পর্যন্ত, পতিত হইবেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি পতিত বা বেশ্যাসক্ত, দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিযুক্ত এবং বোবা, অন্ধ, বধির প্রভৃতি না হন, তাহা হইলে তাঁহার অনুমতিক্রমে বিবাহ করিলেও কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপরাধী হইবেন। বিধবা-বিবাহ ত দূরের কথা। একজনের উদ্দেশ্যে বাগ্‌দত্তা কন্যাও অপরের বিবাহের অযোগ্যা।

(গ) পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত

পাপ দুই প্রকার—বিহিত কর্ম না করা এবং নিন্দিত কর্ম করা। পাপের ফলও দুই প্রকার—মৃত্যুর পর নরকে বাস অথবা জীবিত কালে পান, ভোজন

ও বিবাহাদি ব্যাপারে সমাজে অচল হইয়া থাকা। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত এই উভয়বিধ পাপের প্রায়শ্চিত্তের ফল সম্বন্ধে 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'র একটি বচন (৩।৫।২২৬) বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে। বচনটি এই :

প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
কামতো ব্যবহার্যস্তু বচনাদিহ জায়তে ॥

দ্বিতীয় পংক্তিতে 'ব্যবহার্য' পদের স্থলে 'অব্যবহার্য' পাঠ ধরিয়া শূলপাণি শ্লোকটির অর্থ করিয়াছেন যে, অজ্ঞানকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা দূরীভূত হয়; কিন্তু জ্ঞানাকৃত পাপ ইহা দ্বারা অপগত হইলেও পাপকর্মকারী সমাজে অব্যবহার্য থাকিবে।

প্রায়শ্চিত্ত শব্দটি শূলপাণির মতে, 'প্রায়' ও 'চিত্ত' এই দুইটি পদের দ্বারা গঠিত; 'প্রায়' অর্থাৎ তপ ও 'চিত্ত' বলিতে বুঝায় নিশ্চয়। অতএব প্রায়শ্চিত্ত শব্দে বুঝায় এমন তপশ্চর্যা যাহাদ্বারা পাপক্ষালন হইবে বলিয়া নিশ্চিতভাবে জানা যায়। প্রাচীন শাস্ত্রীয় প্রমাণমূলে রঘুনন্দন মনোজ্ঞ উপমার সাহায্যে প্রায়শ্চিত্তের ফল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

ক্ষার, উত্তাপ, প্রচণ্ড আঘাত ও প্রক্ষালনের ফলে যেমন মলিন বস্ত্র পরিষ্কৃত হয়, তেমন ভাবেই তপশ্চর্যা, দান ও যজ্ঞের দ্বারা পাপী পাপমুক্ত হয়।

পাপকারীর বয়স, বর্ণ, সে পুরুষ বা স্ত্রী—এই সকল বিবেচনায় প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য হয়।

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুর্বঙ্গনাগমন এবং এই চতুর্বিধ পাপাচরণকারীর সহিত সংসর্গ—এই পাঁচটি মহাপাতক বা গুরুতম পাপ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। দ্বিজবর্ণের কোন ব্যক্তি সজ্ঞানে সুরাপান করিলে মৃত্যুই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত; বিকল্প ব্যবস্থানুসারে চতুর্বিংশতিবার্ষিক ব্রত অনুষ্ঠেয়। ব্রাহ্মণ কর্তৃক অজ্ঞানে সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশবার্ষিক ব্রত; তাহা সম্ভবপর না হইলে ১৮০টি দুগ্ধবতী গাভী দান।

নরহত্যা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, শুধু হত্যাকারীই দোষী নহে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণও অপরাধী :—

(১) অনুমন্তা—(ক) যে হত্যাকারীকে এই বলিয়া আশ্বাস দেয় যে, অপর যে ব্যক্তি বাধা দিলে হত্যা সম্ভবপর হইবে না তাহাকে সে বাধা দিবে।
(খ) যে হত্যাকারীকে বিরত করিবার চেষ্টা করে না।

(২) অনুগ্রাহক—(ক) যে বধ্য ব্যক্তিকে অন্যমনস্ক করে।

(খ) বধ্যব্যক্তির সাহায্যার্থে আগমনকারী ব্যক্তিকে যে বাধা দেয়।

(৩) নিমিত্তী—(ক) যৎকর্তৃক ক্রোধোৎপাদন হেতু কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রাণনাশে কৃতসঙ্কল্প হয়।

(৪) প্রযোজক—(ক) যে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে হত্যায় প্রবৃত্ত করে।

(খ) হত্যায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে যে উৎসাহ দেয়।

কোন ব্যক্তি কর্তৃক সদুদ্দেশ্যে কৃতকর্মের ফলে কেহ নিহত হইলে ঐ ব্যক্তি নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হয় না; অর্থাৎ হত্যা মাত্রই গুরুতর অপরাধ নহে, যদি তাহাতে হত্যার অভিসন্ধি না থাকে।

প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গে বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্রে তন্ত্রতা ও প্রসঙ্গ নামক দুইটি নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। একই প্রকার পাপাচরণ পুনঃ পুনঃ করিয়া একবার মাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপমুক্ত হওয়া যায়—এই নীতির নাম তন্ত্রতা। এক ব্যক্তি গুরুতর ও লঘুতর পাপ করিয়া গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেই লঘুতর পাপ হইতেও মুক্ত হইবে—এই নীতির নাম প্রসঙ্গ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে মহাপাতকীর সংসর্গেও মহাপাতক জন্মায়। নিম্নলিখিত রূপ সংসর্গ পাপজনক :—

> এক শয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন, এক পংক্তিতে অবস্থান, ভাণ্ড বা পক্কান্নের মিশ্রণ, পাতকীর জন্য যজ্ঞসম্পাদন, অধ্যাপন, সহভোজন, বৈবাহিক বা যৌনসম্পর্ক, ভাষণ, স্পর্শন, সহযান ইত্যাদি।

পাতকীর জন্য যজ্ঞসম্পাদন, পাতকীর সহিত বৈবাহিক বা যৌন সংসর্গ, পাতকীর উপনয়ন ও পাতকীর সহভোজন—এইরূপ সংসর্গ সদ্য পাতিত্য-জনক। নিম্নলিখিতরূপ সংসর্গ একবৎসর কালের জন্য হইলে পাতিত্যজনক হয় :

> পাতকীর সহিত এক পংক্তিতে ভোজন, একাসনে উপবেশন, এক শয্যায় শয়ন ও সহযান।

প্রাচীন স্মৃতির প্রমাণানুসারে বঙ্গীয় স্মৃতিতে অতিকৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ, তপ্তকৃচ্ছ্র, পরাক, প্রাজাপত্য, সান্তপন প্রভৃতি বিবিধ প্রায়শ্চিত্তমূলক ব্রতের ব্যবস্থা আছে। নানা কারণে এইরূপ ব্রতানুষ্ঠান সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়া ধেনুসঙ্কলন

বা ব্রতের পরিবর্তে ব্রাহ্মণকে ধেনুদানের ব্যবস্থা আছে ; ব্রতভেদে দেয় ধেনুর সংখ্যা বিভিন্নরূপ।

(ঘ) বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা

হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই চারিবর্ণের জন্যই বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধসমূহে বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ আছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই ব্রাহ্মণবর্ণের প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াস স্মৃতিনিবন্ধগুলির পাতায় পাতায় রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ উচ্চতম বর্ণ। কিন্তু অপর দুইটি দ্বিজবর্ণের, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের, তুলনায়ও শূদ্রের স্থান সমাজে অতিশয় হেয়।

শূদ্রের বেদপাঠের অধিকার নাই এবং বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে এক বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন সংস্কারে শূদ্র অধিকারী নহে। অপর সকল বর্ণেরই স্বকীয় গোত্র আছে, কিন্তু শূদ্রের নিজস্ব কোন গোত্র নাই। উচ্চবর্ণের কোন ব্যক্তি কতক প্রকার হেয় কার্য করিলে শূদ্রবৎ পরিগণিত হইবেন। যেমন, ঋতুমতী কন্যাকে বিবাহ করিলে তাহার পতি শূদ্রতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন ; তাঁহার সহিত কথোপকথনও নিন্দনীয় হইবে। কয়েকটি মাত্র দ্রব্য ভিন্ন শূদ্র কর্তৃক প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। বিনা জলে শূদ্রপক্ব দ্রব্য এবং শূদ্র কর্তৃক প্রস্তুত ক্ষীর ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন। রঘুনন্দনের মতে, শূদ্র কর্তৃক প্রস্তুত দধি ও শক্তু ব্রাহ্মণের ভোজ্য।

আইন কানুনের ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণগণের স্ববর্ণ-পক্ষপাতিত্ব এবং শূদ্রের প্রতি অবজ্ঞা পরিস্ফুট। রাজা বিচার কার্য স্বয়ং পরিদর্শন করিতে অক্ষম হইলে তিনি প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার করিয়া রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, 'দুঃশীল' হইলেও দ্বিজ এইরূপ প্রতিনিধি হইতে পারেন, কিন্তু শূদ্র 'বিজিতেন্দ্রিয়' হইলেও এই কার্যের অযোগ্য।

বিচারে যখন দিব্য প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তখন সর্বাপেক্ষা কষ্টকর দিব্যের ব্যবস্থা শূদ্রের জন্য এবং দ্বিজগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য দিব্য প্রযোজ্য।

পুরাণ ও তন্ত্রের প্রভাবে বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণ ধর্মাচরণে স্ত্রীলোক এবং শূদ্রকে কিছু কিছু অধিকার দিয়াছেন। তান্ত্রিক দীক্ষালাভের অধিকার স্ত্রীলোক ও শূদ্র

উভয়েরই আছে। 'দেবীপুরাণে' চণ্ডাল, পুক্কস প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিকে দেবীপূজার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। 'দেবীপুরাণে'র মতে, দেবীপূজায় উচ্চতর নির্গুণ ব্যক্তি অপেক্ষা গুণবান্ শূদ্রও শ্রেয়। বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণ দুর্গাপূজায় শূদ্রের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, বর্ণাশ্রম বহির্ভূত ম্লেচ্ছগণ হিন্দুর অপর কোন পূজাপার্বণের অধিকারী না হইলেও দুর্গাপূজায় তাহাদিগকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

চারিটি প্রধান বর্ণ ছাড়াও বাংলাদেশে বহু সঙ্কর বর্ণের বাস ছিল। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে বা তাহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে বাংলা দেশে রচিত বলিয়া বিবেচিত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' (৩।১৩) ছত্রিশটি সঙ্কর বর্ণ বা মিশ্র জাতির উল্লেখ আছে।[১]

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—চতুরাশ্রম, এই ক্রমই বঙ্গীয় স্মৃতি-গ্রন্থসমূহে স্বীকৃত হইয়াছে। কোন একটি আশ্রমে মানুষকে থাকিতে হইবে, কারণ অনাশ্রমী ব্যক্তি অনেক ধর্মকার্যাদি করিবার অযোগ্য। এই প্রসঙ্গে রঘুনন্দনের একটি বিধান উল্লেখযোগ্য। গৃহিণীই গৃহ ; সুতরাং, বিবাহের দ্বারা গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ লাভ করা যায়। তাহা হইলে দেখা যায়, বিপত্নীক ব্যক্তি গার্হস্থ্যাশ্রমচ্যুত হয়। কিন্তু, পরিণত বয়সে কেহ বিপত্নীক হইলে তিনি বিবাহ করিতে পারিবেন না ; ফলে আমরণ তাঁহাকে অনাশ্রমী থাকিতে হইবে। এই সমস্যার সমাধানকল্পে রঘুনন্দন শাস্ত্রীয় প্রমাণবলে বিধান করিয়াছেন যে, আটচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পরে কেহ বিপত্নীক হইলে তাঁহাকে বলা হইবে 'রণ্ডাশ্রমী'। অতএব তিনি অনাশ্রমী বলিয়া পরিগণিত হইবেন না এবং গৃহস্থের কর্ত্তব্যে তিনি অধিকারী হইবেন। এই ব্যবস্থা হইতে মনে হয়, উক্ত বয়সের পরে বিপত্নীক ব্যক্তির বিবাহ তাঁহার অনুমোদিত ছিল না।

(৬) নারীর স্থান

বৈদিক যুগে শাস্ত্রাদির চর্চা এবং ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি কিছুতেই নারীর অধিকার পুরুষের তুলনায় কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। বেদে বহু ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রী-ঋষির নাম ও তাঁহাদের নামাঙ্কিত সূক্তাদি পাওয়া যায়। উপনিষদেও বিদুষী মহিলাগণ

১। বাংলা দেশের ইতিহাস ১ম খণ্ড (তৃতীয় সং) ১৭৬ পৃষ্ঠা।

পুরুষগণের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারাদিতে অংশ গ্রহণ করিতেছেন দেখা যায়। পরবর্তী কালে কিন্তু এই সকল ব্যাপারে স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'মনুসংহিতা'তেই বলা হইয়াছে যে, নারীর পৃথক্‌ভাবে করণীয় কোন যাগ যজ্ঞ ব্রত উপবাসাদি কিছুই নাই; একমাত্র পতিসেবাই তাহার পরম ধর্ম এবং পতি ভিন্ন তাহার যেন কোন সত্তাই নাই। পুরাণগুলিতে আবার অধিকাংশ ব্রতানুষ্ঠানে স্ত্রীলোকেরই অধিকার ঘোষণা করা হইয়াছে; ইহার যথেষ্ট ঐতিহাসিক কারণও বিদ্যমান।

অন্যান্য প্রদেশের স্মৃতিনিবন্ধগুলির ন্যায় বঙ্গীয় স্মৃতিগ্রন্থসমূহেও একদিকে যেমন আছে প্রাচীন স্মৃতির প্রভাব, অপরদিকে তেমনি রহিয়াছে পুরাণের প্রভাব। সুতরাং ব্রতাদি ব্যতীত অন্যপ্রকার ধর্মানুষ্ঠানে স্মৃতিনিবন্ধকার স্ত্রীলোককে অধিকার দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ব্রতাদিতে পতির অনুমতিক্রমে নারীর অধিকার বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে।

তান্ত্রিক দীক্ষায় কিন্তু বাঙালী শাস্ত্রকার স্ত্রীলোকের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। বাংলা দেশে কুমারীপূজার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। ইহা তান্ত্রিক প্রথা। 'তন্ত্রসারে' কৃষ্ণানন্দ প্রমাণবলে বলিয়াছেন যে, কুমারীপূজা ব্যতিরেকে হোমাদির সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। এক বৎসর হইতে ষোড়শবর্ষ পর্যন্ত বয়স্কা কুমারী পূজিতা হইতে পারে। মহাপর্বদিনে, বিশেষতঃ মহা নবমী তিথিতে, কুমারীপূজা অবশ্য কর্তব্য। 'দেবীপুরাণে'র মতে, কুমারী কন্যাস্বয়ং দেবীর মূর্ত প্রতীক; সুতরাং, দেবীপূজায় কুমারীপূজা অবশ্য করণীয়। এই পুরাণে নারী মাত্রেই সবিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।

নারীর প্রতি সমাজের যে চিরন্তন শ্রদ্ধা ও অনুকম্পা, বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্রে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। একই অপরাধের জন্য পুরুষ অপেক্ষা নারীর লঘুতর দণ্ডের বিধান দেখা যায়। পাপক্ষয়জনক প্রায়শ্চিত্তও স্ত্রীলোকের পক্ষে লঘুতর।

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধে রজোদর্শনের পূর্বেই কন্যার বিবাহ অবশ্যকরণীয় বলিয়া নির্দেশ আছে; রজোদর্শনের পরে কন্যার পিত্রালয়ে বাস অতিশয় পাপজনক বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু, ইহাও বলা হইয়াছে যে অপাত্রে বিবাহ অপেক্ষা কন্যার আমরণ পিত্রালয়ে বাসও শ্রেয়। সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠা কন্যার পূর্বে কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ তীব্রভাবে নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু রঘুনন্দন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কুরূপত্বাদির হেতু জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে বিলম্ব হইলে কনিষ্ঠার বিবাহে কোন দোষ নাই।

প্রাচীন স্মৃতির প্রমাণ অনুসরণে জীমূতবাহন 'আধিবেদনিক' নামক একপ্রকার স্ত্রীধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পতি অপর পত্নী গ্রহণ করিলে পূর্ব পত্নীকে যে অর্থাদি অবশ্য দান করিবেন উহার নাম 'আধিবেদনিক'। জীমূতবাহনের পরবর্তী কোন বাঙালী স্মৃতিনিবন্ধকার এই শ্রেণীর স্ত্রীধনের উল্লেখ করেন নাই। অধিকাংশ বাঙালী নিবন্ধকার বল্লালসেনের (খ্রীষ্টীয় ১২শ শতক) পরবর্তী। বল্লাল-প্রবর্তিত কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তনের ফলে সমাজে কুলীনগণ যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহার জন্য একজন কুলীননন্দন অপদার্থ হইলেও বহু স্ত্রী বিবাহ করিতেন। বহু বিবাহ এত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই বোধহয় 'আধিবেদনিক'-এর প্রচলন লুপ্ত হইয়াছিল এবং নিবন্ধকারগণও ইহার বিধান করেন নাই।

প্রাচীন স্মৃতির ন্যায় বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্রেও অনেক ক্ষেত্রেই পতি হইতে পত্নীর পৃথক সত্তা স্বীকৃত হয় নাই। পতির সহিত বিবাহ-জনিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকে স্থাবর সম্পত্তিতে স্ত্রীলোকের কোন অধিকার নাই। উত্তরাধিকারসূত্রে পতির সম্পত্তিতে স্ত্রীর যখন অধিকার জন্মে, তখনও তিনি মাত্র ভোগের অধিকারিণী; ঐ সম্পত্তিতে তাঁহার দান বিক্রয় করিবার অধিকার থাকে না। বিশিষ্ট কতক প্রকার স্ত্রীধনে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

কোন কন্যা যদি বিবাহের পূর্বেই পিতৃহীন হন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিবাহ দেওয়ার দায়িত্ব তাঁহার ভ্রাতার। এইরূপ ক্ষেত্রে, প্রাচীন স্মৃতি অনুসারে, ভ্রাতা বা ভ্রাতৃগণ 'তুরীয়ক অংশ' দান করিয়া বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিবেন। যাজ্ঞবল্ক্যের টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বরের মতে 'তুরীয়ক' শব্দের অর্থ কন্যা পুত্র হইলে পৈতৃক সম্পত্তির যে অংশ লাভ করিতেন তাহার চতুর্থাংশ। 'তুরীয়'-পদের আভিধানিক অর্থও এক চতুর্থাংশ। জীমূতবাহন ও রঘুনন্দন 'তুরীয়ক' পদের অর্থ করিয়াছেন বিবাহোচিত দ্রব্যাদি। ইহা হইতে মনে হয়, বাঙ্গালী স্মার্ত পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যার কোন প্রকার অংশের কল্পনা করিতেও কুণ্ঠিত।

স্বামীর নিকট হইতে পৃথক্ অবস্থান, ঘুরিয়া বেড়ান, অসময়ে নিদ্রা, অপরের গৃহে বাস প্রভৃতি স্ত্রীলোকের পক্ষে অতিশয় নিন্দনীয়। পতি বিদেশে থাকিলে নারী তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিবেন এবং অতিরিক্ত সাজসজ্জা বর্জন করিবেন; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অসজ্জিতা থাকিবেন না, কারণ ঐরূপ অবস্থায় থাকিলে তাঁহাকে বিধবার ন্যায় মনে হইবে।

স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য নাই—মনুর এই নির্দেশ অনুসারে স্মৃতিকারগণ যে শুধু

ইহলোকে নারীর পতি হইতে স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা নহে, পরলোকেও পতি-পত্নীর আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত। প্রমাণবলে বঙ্গীয় স্মার্তগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের মৃত্যুতিথি ভিন্ন অন্য সময়ে তদীয় আত্মার উদ্দেশ্যে পৃথক্ পিণ্ডদান বিধেয় নহে। মৃত্যুতিথি ভিন্ন অন্য সময়ে নিজ নিজ পতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পিণ্ড হইতেই তাঁহারা স্বীয় অংশ গ্রহণ করিবেন।

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধকারগণের মধ্যে রঘুনন্দনপূর্ব-যুগের শূলপাণি ও শ্রীনাথ 'ভ্রাতৃমতী' কন্যাকে বিবাহ করিতে বলিয়াছেন; ইহার তাৎপর্য এই যে, কন্যা ভ্রাতৃমতী হইলে তাহার পুত্রিকাপুত্র হইবার আশঙ্কা থাকে না। 'পুত্রিকাপুত্র' শব্দটির অর্থ দ্বিবিধ। একটি অর্থে, যে পুত্রিকা সেই পুত্র; অর্থাৎ পুত্রহীন ব্যক্তি কন্যাকেই স্বীয় পুত্ররূপে মনোনীত করিতে পারেন। অপর অর্থে, তিনি সঙ্কল্প করিতে পারেন যে, কন্যার গর্ভে যে পুত্রসন্তান জন্মিবে সে-ই তাঁহার পুত্রস্বরূপ হইবে। মনে হয়, শূলপাণি শ্রীনাথের যুগেও বাংলাদেশে পুত্রিকাপুত্রের প্রচলন ছিল। ইহাদের মতে, পুত্রিকাপুত্রত্বের আশঙ্কা না থাকিলে ভ্রাতৃহীনা কন্যা বিবাহযোগ্যা।

প্রাচীন স্মৃতির অনুসরণক্রমে বঙ্গীয় স্মার্তগণ পৌনর্ভবা কন্যাকে বিবাহে বর্জনীয়া বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত সাত প্রকার কন্যা পৌনর্ভবা বলিয়া অভিহিত—(১) বাগ্‌দত্তা, (২) মনোদত্তা, (৩) কৃতকৌতুকমঙ্গলা, (৪) উদকস্পর্শিতা, (৫) পাণিগৃহীতী, (৬) অগ্নিপরিগতা, (৭) পুনর্ভূপ্রভবা। এই বিধান হইতে দেখা যায়, বিধবা ত দূরের কথা, একজনের উদ্দেশ্যে বাগ্‌দত্তা কন্যাও অপরের পক্ষে বিবাহের অযোগ্যা।

বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণের মতে, স্ত্রীর কয়েকটি গুরুতর অপরাধ ছাড়া তাঁহার সঙ্গে স্বামীর সম্পূর্ণরূপে বিবাহবিচ্ছেদ হয় না। সগোত্রা কন্যার বিবাহ তীব্রভাবে নিন্দিত হইয়াছে। অজ্ঞতাবশতঃ সগোত্রা কন্যাকে বিবাহ করিলে তাহার উপর স্বামীর দাম্পত্যাধিকার থাকিবে না। সজ্ঞানে এইরূপ বিবাহের জন্য পত্নীর বর্জন ও চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রেই স্ত্রীর ভরণপোষণ স্বামীর অবশ্য কর্তব্য; সুতরাং বিবাহবন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয় না। নিম্নতর বর্ণের ব্যক্তির সহিত সহবাসের ফলে স্ত্রীর গর্ভোৎপত্তি, শিষ্য বা পুত্রের সহিত সহবাস হেতু স্ত্রীর গর্ভোৎপত্তি, স্ত্রীর অন্যবিধ হীন ব্যসনে আসক্তি বা তৎকর্তৃক ধননাশ

এই কয়েকটি ক্ষেত্রে বিবাহবন্ধনের সম্পূর্ণ ছেদন বঙ্গীয় স্মার্তগণের অনুমোদিত বলিয়া মনে হয়। প্রথমোক্ত অপরাধের জন্য স্ত্রী পরিত্যজ্যা এমন কি বধ্যাও। উক্তরূপ সহবাসাদির ফলে স্ত্রী যতক্ষণ গর্ভবতী না হইবেন, ততক্ষণ তিনি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দোষমুক্ত হইতে পারেন। ব্যাভিচারিণী পত্নীর ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। ইহা হইতে মনে হয় স্ত্রীর ব্যভিচারই একমাত্র অপরাধ যাহার ফলে সম্পূর্ণরূপে বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভবপর।

(চ) খাদ্য ও পানীয়

বঙ্গদেশের যে সকল স্মৃতিনিবন্ধ প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক, উহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। শাস্ত্রীয় প্রমাণবলে শূলপাণি নিষিদ্ধ খাদ্য দ্রব্যগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন :—

(১) জাতিদুষ্ট— স্বভাবতঃ অপকারী ; যথা—রসুন, পেঁয়াজ প্রভৃতি।

(২) ক্রিয়াদুষ্ট— পতিত ব্যক্তির স্পর্শ প্রভৃতি কোন কারণে দূষিত।

(৩) কালদূষিত—পর্যুষিত।

(৪) আশ্রয়দূষিত—ইহার অর্থ স্পষ্ট নহে। মনে হয় ইহা মন্দ আশ্রয় বা পাত্রে রক্ষণ হেতু দূষিত বস্তুকে বুঝায়।

(৫) সংসর্গদুষ্ট—সুরা, রশুন, প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যের সংসর্গে দূষিত।

(৬) শহৃল্লেখ—বিষ্ঠাতুল্য ; যে পদার্থের দর্শনে মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়।

'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' (৩।৫।৪৪-৪৬) অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দশী, অষ্টমী, দ্বাদশী তিথি, রবিবার এবং রবিসংক্রান্তি ভিন্ন অন্যান্য দিনে মৎস্যভক্ষণের বিধান আছে। এই পুরাণের মতে, রোহিত, শকুল, শফরাদি মৎস্য এবং শুক্লবর্ণ সশল্ক মৎস্য ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য।

সিদ্ধ চাউল, মুসুরির ডাল ও মৎস্য ভক্ষণ অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইলেও স্মার্ত রঘুনন্দন ইহা অনুমোদন করিয়াছেন। হিন্দু যুগে ভবদেব ভট্টও ব্রাহ্মণদের মাছ মাংস খাওয়া সমর্থন করিয়াছেন।[১] সুতরাং বাংলা দেশে আমিষ ভক্ষণ বরাবরই প্রচলিত ছিল।

বাংলা দেশের স্মৃতিশাস্ত্রে সুরাপান তীব্রভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা পঞ্চবিধ

১। বাংলা দেশের ইতিহাস প্রথম খণ্ড (তৃতীয় সং) ১১৪ পৃঃ।

মহাপাতকের অন্যতম। পৈষ্টী, গৌড়ী ও মাধ্বী—এই ত্রিবিধ মদ্য সুরা নামে অভিহিত। এই তিন প্রকার সুরা যথাক্রমে, অন্ন, গুড় এবং মধু হইতে জাত। সুরা শব্দের মুখ্যার্থ পৈষ্টী সুরা; ইহা পান করিলে দ্বিজগণের মহাপাতক হয়। অপর দ্বিবিধ সুরা শুধু ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ, অপর দুই দ্বিজবর্ণের পক্ষে নহে। সুরাপান সংক্রান্ত ব্যবস্থা হইতে মনে হয়, সমাজে ইহা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। 'পান' শব্দের অর্থ, শূলপাণির মতে, 'কণ্ঠদেশাদধোনয়ম্' অর্থাৎ গলাধঃকরণ; সুতরাং সুরার স্পর্শে, এমন কি মুখে লইয়া গিলিয়া না ফেলা পর্য্যন্ত, কোন পাতকের সম্ভাবনা ছিল বলিয়া মনে হয় না।

(ছ) বিবিধ আচার অনুষ্ঠান

প্রাচীন স্মৃতিতে বহুসংখ্যক সংস্কারের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে ঠিক কয়টি সংস্কার সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহা বলা কঠিন। হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' নামক গ্রন্থে একটি তালিকায় নিম্নলিখিত দশটি সংস্কারের উল্লেখ আছে:—

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। এই তালিকায় রঘুনন্দন যোগ করিয়াছেন সীমন্তোন্নয়নের পরে শোষ্যন্তীহোম এবং উপনয়নের পরে সমাবর্তন। হলায়ুধও এই দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু উক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। ইহা হইতে মনে হয়, এই দুইটি সংস্কারকে তেমন প্রাধান্য দেওয়া হইত না।

বিবাহ সম্বন্ধে কয়েকটি বিধিনিষেধ এইরূপ। সাধারণতঃ অশৌচ ধর্মানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক। কিন্তু, বিবাহ আরব্ধ হইবার পরে অশৌচ কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। মলমাসে ধর্মকার্য নিষিদ্ধ। কিন্তু, বিবাহারম্ভের পরে মলমাস বিবাহের অন্তরায় হইতে পারে না। রঘুনন্দন বলিয়াছেন, বিবাহারম্ভের পরে কন্যার রজোদর্শন হইলে বিবাহ পণ্ড হয় না। নান্দীমুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের দ্বারা বিবাহানুষ্ঠানের সূচনা হয়।

ক্ষুত বা হাঁচি সাধারণতঃ অশুভসূচক বলিয়া বিবেচিত হইলেও বিবাহে ইহা শুভসূচক। বিবাহে যন্ত্রসঙ্গীত ও স্ত্রীলোকের কণ্ঠসঙ্গীত এবং উলুধ্বনি শুভাবহ।

বিবাহস্থলে একটি গাভী বাঁধা থাকিবে। অর্হণান্তে বর পূর্বনিযুক্ত একজন নাপিতের অনুরোধে উহাকে মুক্ত করিবেন।

যদিও দানমাত্রেই দাতা বসিবেন পূর্বমুখ হইয়া এবং গ্রহীতা হইবেন উত্তরমুখ, তথাপি বিবাহে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। ব্যতিক্রম শব্দের অর্থ কেহ কেহ করিয়াছেন এই যে, দাতা হইবেন উত্তরমুখ এবং গ্রহীতা পূর্বমুখ। রঘুনন্দনের মতে, দাতা পশ্চিমমুখ হইবেন।

বিবাহানুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ রঘুনন্দন জম্বুলমালিকা বা মুখচন্দ্রিকার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে জম্বুলমালিকা শব্দে বুঝায় সেই প্রথা যাহাতে বর ও কন্যাকে পরস্পরের সম্মুখীন করিয়া তাহাদিগকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়। ইহা হইতে মনে হয়, জম্বুলমালিকা শব্দটি প্রথমে মালা বুঝাইলেও পরে যাহাতে ঐ মালা ব্যবহৃত হইত সেই অনুষ্ঠানকেই বুঝাইত।

বিবাহ সংক্রান্ত সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে দম্পতি ক্ষার ও লবণবর্জিত ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক তিন রাত্রি একত্র হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবেন।

বিবাহের পরে পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে পৌঁছিয়া কন্যা সেইদিন সেখানে অন্নগ্রহণ করিবে না। বিবাহিত কন্যার পুত্র না হওয়া পর্যন্ত কন্যার পিতা কন্যাগৃহে আহার করিবেন না।

বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্রে বহু ব্রতের বিধান আছে। ব্রতের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া শূলপাণি বলিয়াছেন যে, যাহার মূলে আছে সঙ্কল্প এবং যাহা 'দীর্ঘকালানু-পালনীয়' তাহা ব্রত। জ্ঞাতিগণের জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচ ধর্মকার্যের প্রতিবন্ধক হইলেও ব্রত আরব্ধ হইলে উহা কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না; সঙ্কল্পই ব্রতের আরম্ভ। উপবাস ব্রতের অপরিহার্য অঙ্গ হইলেও অশক্তপক্ষে নিম্নলিখিত দ্রব্যভক্ষণে কোন দোষ হয় না:

জল, ফল, মূল, ঘৃত, দুগ্ধ, আচার্যের অনুমতিক্রমে যে কোন খাদ্যদ্রব্য এবং ঔষধ।

উপবাসে অক্ষম ব্যক্তির রাত্রিতে ভোজনে কোন পাপ হয় না। ঋতুমতী, অন্তঃসত্ত্বা বা অন্যপ্রকারে অশুদ্ধা নারী স্বীয় ব্রতের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন এবং উপবাসাদি কায়িককৃত্য স্বয়ং সম্পাদন করিবেন। ব্রতদিনে নিম্নলিখিত কর্ম বর্জনীয়:

পতিত ও নাস্তিক ব্যক্তির সহিত আলাপ, অন্ত্যজ, পতিতা ও রজঃস্বলা

নারীর দর্শন, স্পর্শন ও উহাদের সহিত কথোপকথন, গাত্রাভ্যঙ্গ, তাম্বূলভক্ষণ, দন্তধাবন, দিবানিদ্রা, অক্ষক্রীড়া ও স্ত্রীসম্ভোগ।

যদিও মনুর মতে (৫।১৫৫) ব্রতে ও উপবাসে স্ত্রীলোকের অধিকার নাই, তথাপি বাংলা দেশের স্মৃতিকারগণ পতির অনুমতিক্রমে এই সকল কার্যে পত্নীর অধিকার স্বীকার করিয়াছেন।

প্রতি পক্ষের একাদশী তিথিতে গৃহস্থের ও বিধবার উপবাস করণীয়। পুত্রবান্ গৃহী কৃষ্ণপক্ষে এই উপবাস করিবেন না। যাঁহার পুত্র বৈষ্ণব তিনি কৃষ্ণপক্ষে একাদশীর উপবাস করিতে পারেন। অষ্টম বর্ষের ঊর্ধ্বে ও অশীতিতম বর্ষের নিম্নে যাহাদের বয়স, তাহাদের উপবাস অবশ্য করণীয়। একাদশীতে নিরম্বু উপবাসই বিধেয়। কিন্তু, অশক্তপক্ষে রাত্রিতে নিম্নলিখিত যে কোন দ্রব্য ভক্ষণ করা যায়:

হবিষ্যান্ন. ফল, তিল, দুগ্ধ, জল, ঘৃত, পঞ্চগব্য। এই তালিকায় পূর্ব পূর্ব দ্রব্য অপেক্ষা পর পর দ্রব্য প্রশস্ততর।

৪। বাস্তব জীবনে ধর্ম ও নীতি

মধ্য যুগে বাংলায় যে হিন্দু ধর্ম প্রচলিত ছিল তাহা প্রাচীন যুগের পৌরাণিক ধর্মেরই স্বাভাবিক বিবর্তন। সাধারণতঃ উপাস্য দেবতা অনুসারে হিন্দুদিগকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়—বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য। যদিও অনেকেই পৃথকভাবে বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য ও গণপতিকে ইষ্টদেব জ্ঞানে পূজা করিতেন তথাপি সাধারণতঃ ব্যবহারিক জীবনে প্রায় সকলেই স্মৃতিশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী একত্রে ঐ পঞ্চ দেবতারই পূজা করিতেন। সুতরাং বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত এই তিনটি প্রধান এবং সৌর ও গাণপত্য এই দুইটি অপ্রধান সম্প্রদায় থাকিলেও সাধারণতঃ হিন্দুদের মধ্যে বেশীর ভাগকেই স্মার্ত পঞ্চোপাসক বলাই যুক্তিসঙ্গত। নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্মকার্যে 'পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ' (পঞ্চদেবতাকে প্রণাম) মন্ত্র পাঠ করিয়া ফুল জল অর্ঘ, প্রভৃতি দ্বারা পঞ্চদেবতার পূজা করিতেন। সাধারণতঃ ইষ্টদেবতার মূর্তি বা প্রতীক কেন্দ্রস্থলে এবং অন্য চারি দেবতার মূর্তি ও প্রতীক চারি কোণে রাখিয়া পূজা করা হইত। এখনও যে

গৃহস্থের বাড়ীতে প্রত্যহ নারায়ণ-শিলা ও মৃৎ-শিবলিঙ্গের পূজা হয় ইহা পঞ্চোপাসনারই চিহ্ন।

এই ধর্মানুষ্ঠানের পদ্ধতি সাধারণভাবে সকল হিন্দুদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তবে মধ্যযুগে যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে রূপায়িত হইয়াছিল, অতঃপর তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে ষোড়শ শতকে বাংলায় এক অভিনব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়। গোপীগণের কিশোর কৃষ্ণের সহিত ও রাধার লাস্য ও মাধুর্যভাবপূর্ণ লীলাকে কেন্দ্র করিয়া ভগবদ্ভক্তি ও ঈশ্বর প্রেমের বিকাশ—ইহাই ছিল এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। চৈতন্যের পূর্বেও যে এই বৈষ্ণব ধর্ম বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" ও চণ্ডীদাসের 'পদাবলী' তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। চৈতন্যের জন্মের অল্প কিছুকাল পূর্বে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এই প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার উনিশ জন শিষ্যের মধ্যে ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, কেশবভারতী ও অদ্বৈত আচার্য প্রভৃতি কয়েকজনের সঙ্গে চৈতন্যের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণভক্তিমূলক বৈষ্ণবধর্ম চৈতন্যের পূর্বে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। 'চৈতন্য ভাগবতে'[১] এ সম্বন্ধে চৈতন্যের অব্যবহিত পূর্বেকার নবদ্বীপের অবস্থা এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে :—

"কৃষ্ণনাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥"[১]

ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র সকলে শাস্ত্র পড়ায় কিন্তু,

"না বাখানে যুগ-ধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন॥
... ...
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥

১। আদি, ২য় অধ্যায়।

... ...

গীতা ভাগবত যে যেজনে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥

... ...

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণ-পূজা বিষ্ণু-ভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্যমাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥"

তবে হরিভক্তিপরায়ণ কয়েকজন বৈষ্ণবও নবদ্বীপে ছিলেন—তাঁহাদের অগ্রণী অদ্বৈতাচার্য কৃষ্ণের ভক্তিবিহীন নগরবাসীদের দেখিয়া নিতান্ত দুঃখ পাইতেন। চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার দুঃখ দূর করিলেন। তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, ২২ বৎসর বয়সে ঈশ্বর পুরীর নিকট দশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন, এবং ইহার দুই বৎসর পরে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন (১৫১০ খ্রীঃ)। তাঁহার গার্হস্থ্য আশ্রমের নাম ছিল শ্রীবিশ্বম্ভর। দীক্ষাকালে নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে চৈতন্য। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি অধিকাংশ সময় পুরীতেই থাকিতেন; কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু তীর্থও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন তখন প্রায় জনশূন্য হইয়া কোনক্রমে টিঁকিয়াছিল—তিনি আবার ইহাকে বৈষ্ণব ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পরেই নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্ত ও পার্ষদগণ চৈতন্যকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। বৈষ্ণবগণের মতে ভগবানে ভক্তি ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ (প্রপত্তি) ইহাই মোক্ষলাভের একমাত্র পন্থা। কিন্তু এই নিষ্কাম ভক্তি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য এই পাঁচটি ভাবের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এই মাধুর্য ভাবের প্রতীক কৃষ্ণের প্রতি গোপীদের ও রাধার প্রেম। এই প্রেমের উন্মাদনাই চৈতন্যের জীবনে প্রতিভাত হইয়াছিল। এই প্রেমের উচ্ছ্বাসে তিনি সত্য সত্যই সময় সময় উন্মাদ ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেন এবং এই প্রেম-রস আস্বাদনের প্রকৃষ্ট উপায় স্বরূপ হরিকৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্তনের প্রচলন করিয়াছিলেন।) সপরিকর চৈতন্য বহু লোকজন সমভিব্যাহারে খোল করতালের বাদ্য সহযোগে গৃহে বা রাজপথে নামকীর্তন করিয়া বেড়াইতেন এবং অনেক সময় ভাবাবেগে মূর্ছিত হইয়া পড়িতেন। (কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার প্রেম

তিনি নিজের জীবনে আস্বাদন করিতেন। কিন্তু এ প্রেম দিব্য ও দেহাতীত। ইহাই সংক্ষেপে এই অভিনব বৈষ্ণব ধর্মের মূলকথা। শ্রীচৈতন্য নিজে কোন তত্ত্বমূলক গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার সমসাময়িক বৃন্দাবনবাসী ছয়জন গোস্বামী শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতকে একটি দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া ইহাকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছেন। এই ছয়জন গোস্বামীর নাম—রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্ট।

এই ছয় গোস্বামী ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণের রচিত অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে। এই সম্প্রদায়ের মূলকথা 'গৌরপারম্যবাদ' অর্থাৎ চৈতন্যই চরম সত্তা ও পরম উপেয়; চৈতন্য একাধারে কৃষ্ণ ও রাধা। এই দেশে 'গৌরনাগরভাব'ও প্রচলিত ছিল; ইহাতে রাগানুগা ভক্তির সাহায্যে ভক্তগণ চৈতন্যকে নাগর এবং নিজেকে নাগরীরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের মতে, গোপীগণ 'কৃষ্ণবধূ', কৃষ্ণের স্বকীয়া নারী; সুতরাং গোপীগণের সহিত পরকীয়াবাদ বিলাস নহে। গোপগণের সহিত গোপীগণের বিবাহ ও যৌনসম্বন্ধকালে গোপীগণ কৃষ্ণের মায়াশক্তিবলে প্রচ্ছন্ন ছিলেন এবং তাঁহাদের পরিবর্তে তদনুকারী কায়িকরূপ গোপগণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ভক্তিকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। ভক্তি হইতে পারে—শুদ্ধা, জ্ঞানমিশ্রা, যোগমিশ্রা ও কর্মমিশ্রা; শুদ্ধা ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ। অকৈতবা ভক্তির দুইটি অবস্থা—বৈধী ও রাগানুগা। শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা প্রবর্তিত হয় বলিয়া বৈধী ভক্তির ঈদৃশ নামকরণ হইয়াছে। রাগ বা সহজ চিত্তবৃত্তির অনুগমন করে বলিয়া দ্বিতীয় অবস্থার নাম রাগানুগা; ইহাতে শাস্ত্রীয় বিধির কোন প্রয়োজন নাই।

জীবকর্তৃক ভগবানের সাক্ষাৎকার বা ভগবৎ প্রাপ্তিই মুক্তি। একমাত্র প্রীতির দ্বারাই এই সাক্ষাৎকার সম্ভবপর; সুতরাং, ভগবৎপ্রীতিই চরম কাম্য। শান্ত, দাস্য, মৈত্র্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য—এই পাঁচটি ভগবৎপ্রীতির মূলীভূত ভাব; ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেয়।)

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বাংলা দেশের বৈষ্ণবগণের ধর্মমত সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। তাঁহাদের আচার, আচরণ ও ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে 'হরিভক্তিবিলাস' ও 'সংক্রিয়াসারদীপিকা' নামক দুইখানি গ্রন্থে।) এই দুই গ্রন্থে পুরাণ ও তন্ত্রের গভীর প্রভাব বিদ্যমান;) কিন্তু প্রচলিত

স্মৃতিশাস্ত্রের অনুসরণ ইহাদের মধ্যে নাই। 'হরিভক্তিবিলাসে' গুরু, শিষ্য, দীক্ষা, দৈনন্দিন ধর্মানুষ্ঠান, বিষ্ণুভক্তির স্বরূপ, ভক্তিতত্ত্ব, পুরশ্চরণ, মূর্তিনির্মাণ, মন্দির নির্মাণ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে; ইহাতে স্মৃতিশাস্ত্রের সংস্কারগুলির কোন উল্লেখ নাই। 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা'য় গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বিধান বৈষ্ণবগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। কিন্তু, এই গ্রন্থে প্রাচীনতর কতক স্মৃতিগ্রন্থের, বিশেষতঃ বাঙালী স্মৃতিকার ভবদেব ভট্ট ও অনিরুদ্ধ ভট্টের স্মৃতি-নিবন্ধের অনুসরণ লক্ষণীয়। ইহা হইতে মনে হয় যে, সামাজিক ব্যাপারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সনাতন স্মৃতিশাস্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেন নাই। উক্ত উভয় গ্রন্থে পূর্বপুরুষের আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধপ্রসঙ্গ বর্জিত হইয়াছে। 'হরিভক্তিবিলাসে' সংস্কারের উল্লেখ না থাকিলেও অপর গ্রন্থে সংস্কারসমূহের ব্যবস্থা আছে; তবে সংস্কারগুলির অনুষ্ঠানপদ্ধতি চিরাচরিত স্মার্ত মত অনুযায়ী নহে। 'সৎক্রিয়া-সারদীপিকা'য় ভগবদ্ধর্মের আচরণ অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা, পূর্বপুরুষের পূজা, এবং নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য অনুষ্ঠানাদি অপেক্ষা শ্রেয়। কৃষ্ণপূজা সকল পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিবাহপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, বর স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত পঞ্চোপাসনা অর্থাৎ গণেশ, শিব, দুর্গা, সূর্য ও বিষ্ণুর পূজা সযত্নে পরিহার করিবেন। নবগ্রহ, লোকপাল এবং ষোড়শমাতৃকার পূজাও তাহার পক্ষে বর্জনীয়। ইহাদের পরিবর্তে বিষ্বক্‌সেন, সনক প্রভৃতি পঞ্চ মহাভাগবত তাঁহার পূজ্য। এতদ্ব্যতীত কবি, হবি, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি যোগীন্দ্র, ব্রহ্মা, শুকদেব প্রভৃতি ভাগবত, পৌর্ণমাসী, লক্ষ্মী প্রভৃতি বৈষ্ণবীও তৎকর্তৃক পূজনীয়। তিনি যদি রাধা, কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর কোন অবতারের উপাসক হন তাহা হইলে আনুষঙ্গিক দেবতাগণের পূজাও তাঁহার পক্ষে বিধেয়।

কিন্তু (এই সমুদয় শাস্ত্র রচনার পূর্বেই চৈতন্যের সাত্ত্বিক ভাবযুক্ত দিব্য প্রেমোন্মাদনাপূর্ণ রাধাকৃষ্ণের আদর্শানুযায়ী ভগবদ্‌ভক্তির ও প্রেমের তরঙ্গ সারা দেশে এক অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করিল—রাধাকৃষ্ণের লীলা ও হরিনাম কীর্তনে বাংলাদেশ প্রেমের ও ভক্তির বন্যায় যেন ডুবিয়া গেল। ইহাতে আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের আচার বিচারের এবং জাতিভেদের বিশেষ কোন চিহ্ন ছিল না। স্ত্রীলোক, শূদ্র এবং আচণ্ডাল সকলকেই প্রেমের ধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের মনে ভগবৎপ্রেম ও সাত্ত্বিকভাব জাগাইয়া তোলাই ছিল চৈতন্যের আদর্শ ও লক্ষ্য।)

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মহান আদর্শ চৈতন্যের পূর্বেও এ দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাহা বহুল পরিমাণে সাত্ত্বিক ভাব শূন্য হইয়া নরনারীর দৈহিক সম্ভোগের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য সমগ্র ভারতে সমাদর লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সাধারণ নরনারীর দৈহিক সম্ভোগের যে বাস্তব চিত্র বর্তমান যুগে সাহিত্যে ও সমাজে হেয় ও অশ্লীল বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহার নগ্নরূপও জয়দেব অঙ্কিত করিয়াছেন। গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সর্গে রাধাকৃষ্ণের কামকেলির যে বর্ণনা আছে বর্তমান কালে কোন গ্রন্থে তাহা থাকিলে গ্রন্থকার দুর্নীতি প্রচারের অপরাধে আদালতে দণ্ডিত হইতেন। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে একজন বৈষ্ণবসাহিত্যের মহারথী লিখিয়াছেন যে "আদিরসের ছড়াছড়ি থাকায় কাব্যখানি প্রায় Pornography পর্যায়ে পড়িয়াছে।"[১] শুধু তাহাই নহে। এই কাব্যে বর্ণিত কৃষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—কবির কৃষ্ণ কামুক, কপট, মিথ্যাবাদী, অতিশয় দাম্ভিক এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ। ...রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনীর ইহা অত্যন্ত বিকৃত রূপ। এমন কি কৃষ্ণকীর্তনের নায়ক কৃষ্ণ বারংবার রাধাকে বলিয়াছেন যে তাহার দেহসম্ভোগের জন্যই তিনি (কৃষ্ণ) পৃথিবীতে অবতার হইয়া জন্মিয়াছেন (অবতার কৈল আহেন তোর রতি আসে)।[২] অনেক পণ্ডিতের মতে এই কৃষ্ণকীর্তন চৈতন্যের জন্মের অল্প পূর্বেই রচিত। সুতরাং জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া তিনশত বৎসর যাবৎ রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ছদ্ম আবরণে কামের নগ্নরূপ ও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য বৈষ্ণব ধর্মকে কলুষিত করিয়াছিল। অবশ্য চণ্ডীদাসের পদাবলীতে ও অন্যত্র বিশুদ্ধ উচ্চপ্রেমের আদর্শও চিত্রিত হইয়াছে। তবে উচ্চাঙ্গ ভক্তিরসেরও যে অভাব আছে এমন নয়। অর্থনীতির একটি মূলসূত্র এই যে যদি খাঁটি ও মেকী টাকা একত্র বাজারে চলে তবে ক্রমে ক্রমে খাঁটি টাকা লোপ পায়। চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন "রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তাহে।" কিন্তু সাধারণ মানুষ 'রজকিনী প্রেম' এই দুটি কথার উপর যতটা জোর দিয়াছে, 'কামগন্ধহীন প্রেমের' উপর ততটা নহে। চণ্ডীদাসের পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন একসঙ্গে প্রচারিত ও এক কবির লেখা হইলেও (এ বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ করেন) কৃষ্ণকীর্তনের রাধাকৃষ্ণই জনপ্রিয় হইবেন ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এই কলুষতার মূর্ত প্রতিবাদ ছিলেন শ্রীচৈতন্য। চৈতন্যের বলিষ্ঠ পৌরুষ

১। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, ২৮৪ পৃঃ

২। ঐ ২৮৪-৫ পৃঃ

বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব ও অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমমূলক বৈষ্ণব ধর্মকে এক অতি উচ্চ স্তরে তুলিল। পবিত্র ভক্তির প্রকাশ্য অনুভূতি, প্রাণোন্মাদকারী কীর্তন এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমের যে দিব্য আদর্শ তিনি নিজের জীবনে রূপায়িত করিয়াছিলেন, তাহার প্রবাহ সমস্ত কলুষতা ধুইয়া ফেলিল। বৈষ্ণবধর্মে তখন নূতন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। এই প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত একটি নিয়ম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁহার আজ্ঞায় বৈষ্ণব ভক্তগণের নারীর সহিত কথাবার্তা নিষিদ্ধ হইল। তাঁহার প্রিয় শিষ্য হরিদাস তাঁহারই ভোজনের জন্য একজন বর্ষীয়সী ভক্তিমতী মহিলার নিকট হইতে উৎকৃষ্ট চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন। এই নিয়মভঙ্গের অপরাধে তিনি হরিদাসকে ত্যাগ করিলেন।

"হরিদাস কৈল প্রকৃতি সম্ভাষণ।

* * *

হেরিতে না পারি মুই তাহার বদন॥"

অন্যান্য ভক্তগণের অনুরোধ উপরোধেও তিনি বিন্দুমাত্র টলিলেন না। বলিলেন, "মানুষের ইন্দ্রিয় দুর্বার, কাষ্ঠের নারীমূর্তি দেখিলেও মুনির মন চঞ্চল হয়। অসংযত-চিত্ত জীব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া স্ত্রী-সম্ভাষণের ফলে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া বেড়াইতেছে।" মনের দুঃখে হরিদাস প্রয়াগে ত্রিবেণীতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিল।

এই নৈতিক উন্নতির ফলে এবং চৈতন্যের আদর্শ ও দৃষ্টান্তে বাঙ্গালী হিন্দু যেন এক নবীন জীবন লাভ করিল। পবিত্র প্রেমের সাধক যে চৈতন্য কৃষ্ণ নাম করিয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিতেন তিনিই বাঙালীর সম্মুখে যে পৌরুষের আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন মধ্যযুগে তাহার তুলনা মিলে না। নবদ্বীপের মুসলমান কাজির হুকুমে যখন চৈতন্যের প্রবর্তিত কীর্তন গান নিষিদ্ধ হইল এবং কীর্তনীয়াদের উপর বিষম অত্যাচার আরম্ভ হইল, তখন অনেক বৈষ্ণব ভয় পাইয়া নবদ্বীপ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার প্রস্তাব করিলেন। অবৈষ্ণব নবদ্বীপবাসী কেহ কেহ খুসি হইয়া বলিলেন "এইবার নিমাই পণ্ডিতের দর্প চূর্ণ হইবে—বেদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে এইরূপই শাস্তি হয়।" কিন্তু চৈতন্য দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করিলেন, কাজীর আদেশ অমান্য করিয়া এই নবদ্বীপে থাকিয়াই কীর্তন করিব।

"ভাঙ্গিব কাজীর ঘর কাজীর দুয়ারে।
কীর্তন করিব দেখি কোন্ কর্ম করে॥
তিলার্ধেকো ভয় কেহ না করিও মনে।

তিন শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী ধর্মরক্ষার্থে মুসলমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই—মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের অসংখ্য লাঞ্ছনা ও অকথ্য অপমান নীরবে সহ্য করিয়াছে। চৈতন্যের নেতৃত্বে অসম্ভব সম্ভব হইল। চৈতন্য কীর্তনীয়ার দল লইয়া কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কাজী ক্রুদ্ধ হইয়া বাধা দিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু বিশাল জনসমুদ্র মার মার কাট কাট শব্দে তাহার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া কাজী পলাইল এবং সংকীর্তন নিষেধের আজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইল।

চৈতন্যের আদর্শে ভক্তগণ ব্যক্তিগতভাবেও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্ত বৈদ্য চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে যে দেবমূর্তি ছিল তাহা স্বর্ণ নির্মিত মনে করিয়া যবন সৈন্য তাহা কাড়িয়া নিতে আসিল।

"বক্ষে রাখিল ঠাকুর তবু না ছাড়িল।
চন্দ্রশেখরের মুণ্ড মোগলে কাটিল॥"

কিন্তু চৈতন্যের এই পৌরুষের আদর্শ বাঙালীর চিত্তে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় দাস্য ও মাধুর্য ভাবেই বিভোর ছিলেন—পৌরুষকে মর্যাদা দেন নাই। এই বৈষ্ণবদের হাতে চৈতন্যের আদর্শের কিরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছিল কাজীর সহিত বিরোধের বিবরণ হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। উপরে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা সমসাময়িক চৈতন্য-চরিতকার বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে উল্লিখিত আছে।[১] চৈতন্যের আদেশে তাঁহার অনুচরেরা যে কাজীর ঘর ও ফুলের বাগান ধ্বংস করিয়াছিল তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু বৈষ্ণবদের দাসবৃত্তিসুলভ মনোভাবের সহিত চৈতন্যের এই 'উদ্ধত' ও 'হিংসাত্মক' আচরণ সুসঙ্গত হয় না—সম্ভবত কতকটা এই কারণে এবং কতকটা মুসলমান রাজা ও রাজকর্মচারীর ভয়ে তাহারা চৈতন্যের জীবনের এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনাটিকে প্রাধান্য দেন নাই এবং বিকৃত করিয়াছেন। সমসাময়িক বৃন্দাবন দাস ছিলেন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী—কাহাকেও ভয় করিতেন না। সবিস্তারে তিনি সব লিখিয়াছেন। কিন্তু মুরারি গুপ্ত ছিলেন গৃহী। তিনি সুলতান হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের রাজত্বকালে চৈতন্যের জীবনী লেখেন। কাজীর ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল হোসেন শাহের রাজত্বকালে। সুতরাং যদিও বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন

১। চৈতন্য ভাগবত (মধ্য খণ্ড) ২৩ অধ্যায়

যে কাজীর ঘর ভাঙ্গার ব্যাপারে মুরারি গুপ্ত একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি মুরারি গুপ্ত এই ঘটনার বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তী চৈতন্য-চরিতকার কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেনও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। চৈতন্যের সমসাময়িক জয়ানন্দ মাত্র দুই ছত্রে কাজীর ঘর ভাঙ্গা ও পলায়নের উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনাটির প্রায় একশত বৎসর পরে বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে বসিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ বিরাট গ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করেন। তখন আকবরের রাজ্য কেবল শেষ হইয়াছে। সুতরাং স্থান ও কালের দিক দিয়া মুসলমান সরকারের ভীতি অনেকটা কম থাকিবার কথা। এই কারণে তিনি কাজীর ঘটনা, তাহার ঘর, বাগান ধ্বংসের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তখন বৈষ্ণবদের মধ্যে দীন দাস্য ভাবের মহিমা পৌরুষের স্থান অধিকার করিয়াছে। অতএব তিনি লিখিয়াছেন যে, এই হিংসাত্মক ব্যাপারে চৈতন্যের কোন হাত ছিল না, ইহা কয়েকটি উদ্ধত প্রকৃতি লোকের কাজ। চৈতন্য কাজীকে ডাকাইয়া আনিলেন।

বিনম্র বচনে "প্রভু কহে—এক দান মাগি হে তোমায়।
সংকীর্তন বাদ যৈছে না হয় নদীয়ায়॥"

কৃষ্ণদাস কবিরাজ কাজীর ঘটনা সংক্ষেপে বলিয়া তারপর লিখিয়াছেন :—

"বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্য মঙ্গলে।
বিস্তারি বলিয়াছেন প্রভু কৃপাবলে॥"[১]

অথচ তাঁহার মতে চৈতন্য কাজীর ঘর ও বাগান ধ্বংস করার আদেশ দেন নাই। কিন্তু চৈতন্য ভাগবতে স্পষ্ট আছে :—

"ক্রোধে বলে প্রভু 'আরে কাজি বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেলোঁ মাথা॥
প্রাণ লঞা কোথা কাজী গেল দিয়া দ্বার।
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ' প্রভু বলে বার বার॥"

এই কথা শুনিয়া "ভাঙ্গিলেক যত সব বাহিরের ঘর।
প্রভু বলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর॥
পুড়িয়া মরুক সব গণের সহিতে।
সর্ব বাড়ী বেড়ি অগ্নি দেহ চারি ভিতে॥"

১। চৈতন্য-চরিতামৃত, আদি, ১৭ অধ্যায়।

চৈতন্যের সহিত কাজীর সাক্ষাৎ বা তাহার কাছে কীর্তনের অনুমতি ভিক্ষা, স্বপ্ন-দর্শনে কাজীর ভয় ও তজ্জন্য কীর্তনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, কাজীর বৈষ্ণব ধর্মে ভক্তি প্রভৃতি কৃষ্ণদাসের অস্বাভাবিক ও অসঙ্গতিপূর্ণ কাহিনীর কিছুই চৈতন্য-ভাগবতে নাই। সমসাময়িক বৃন্দাবনদাসও প্রায় শতবর্ষ পরে বৃন্দাবনের গোঁসাই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যের জীবনীতে যে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণা কিরূপ পরিবর্তিত হইয়াছিল। প্রথমটিতে পাই চৈতন্য যাহা ছিলেন, দ্বিতীয়টিতে পাই চৈতন্য যাহা হইয়াছেন। গত তিন শতাধিক বৎসর বাংলার বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের কেবল একটি মূর্তিই ধ্যান ও ধারণা করিয়াছেন—কৃষ্ণ নাম জপিতে জপিতে ভাবাবেশে সংজ্ঞাহীন ভূলুণ্ঠিত ধূলিধূসরিত দেহ। কিন্তু তাঁহার যে দৃঢ় বলিষ্ঠ পূত চরিত্র ভক্তের সামান্য নীতিভ্রষ্টতাও ক্ষমা করে নাই এবং যিনি দুরাচারী যবনকে শাস্তি দিবার জন্য সদলবলে অগ্রসর হইয়া বলিয়াছিলেন "নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন"—বাঙালী তাহা মনে রাখে নাই। বাংলার পরাক্রান্ত সুলতান হোসেন শাহের রাজ্যে মুসলমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া তিনি যে সাহস ও ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন বাঙালী তাহা অচিরেই ভুলিয়া গিয়াছিল।

(বস্তুত চৈতন্যের আদর্শ ও প্রভাব কোন দিক দিয়াই বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন যে, স্ত্রী, শূদ্র, মূর্খ আদি আচণ্ডালে প্রেম ভক্তি দান করিয়া তাহাদের জীবন উন্নত করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অবধূত নিত্যানন্দকে পুরী হইতে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন। বলিলেন "তুমি যদি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন কর, তবে মূর্খ, নীচ, দরিদ্র, পতিতকে আর কে উদ্ধার করিবে।" ইহার ফলে জাতি-ভেদের কঠোর নিগড় ভাঙ্গিয়া গেল এবং হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের যে সমুদয় শ্রেণী এতদিন উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত জীবন যাপন করিতেছিল তাহাদের এক বড় অংশ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইল। পূর্বে বলা হইয়াছে যে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল। নিত্যানন্দ এবং তাঁহার সহচর ও অনুবর্তীদের প্রচারের ফলে তাহা সম্ভবত অন্তত আংশিক পরিমাণে রহিত হইয়াছিল।

চৈতন্য যে আনুষ্ঠানিক বিধি বিধান বাদ দিয়া স্ত্রী পুরুষ ও উচ্চ নীচ জাতি নির্বিশেষে সকলকে কেবল প্রেমভক্তিমূলক ধর্মে দীক্ষা দিবার প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন তাহাতে তৎকালীন হিন্দু সমাজে এক বিপ্লবের সূচনা দেখা দিল। বহু শূদ্র এবং খুব অল্প সংখ্যক হইলেও মুসলমানেরাও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিল।

জাতিভেদের ব্যবধান শিথিল হইল। হরিদাস ঠাকুরের যবন সংসর্গ থাকা সত্ত্বেও অদ্বৈত আচার্য তাঁহাকে শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির সঙ্গেও কীর্তনে 'যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম'। ব্রাহ্মণেতর জাতির সাধকেরা নিঃসঙ্কোচে ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দিতে আরম্ভ করিল। রঘুনাথ দাস কায়স্থ হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নিয়ামক ছয় গোস্বামীর মধ্যে স্থান পাইলেন। কালিদাস নামে রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি খুড়া শূদ্র ও অন্যান্য নীচ জাতীয় বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলেন। অসংখ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হইলেন। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের বংশে এই প্রথা এখনও প্রচলিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা তাহার বংশধরদের নিকট দীক্ষা লইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের অবস্থারও উন্নতি দেখা দিল। বলরাম দাসের পদে আছে, "সংকীর্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারি" অর্থাৎ কুলবধূরাও প্রকাশ্যে সংকীর্তনে যোগ দিতেন। শিবানন্দ সেনের স্ত্রী ও পরমেশ্বর মোদকের মাতার দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয় বহু নারী প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে পুরী যাইতেন। নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবী খেতুড়ি মহোৎসবের সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বহু শিষ্যকে মন্ত্রদানও করিয়াছিলেন। অদ্বৈত-পত্নী সীতা দেবী পুরুষের প্রকৃতি ও বেশ ধারণ করিয়া যে সাধনার রীতি প্রবর্তিত করেন তাহা তাঁহার শিষ্যা নন্দিনী ও জঙ্গলীর বিবরণ হইতে জানা যায়। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীও বহু শিষ্যকে মন্ত্র দিয়াছিলেন।[১])

কিন্তু এই সমুদয়ের মধ্য দিয়া যে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের একটি মহৎ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল এক শতাব্দীর বেশী তাহা স্থায়ী হয় নাই। বরং নূতন ভাবে নানাবিধ কলুষতার আবির্ভাব হইল।

বৌদ্ধ সহজিয়া ও তান্ত্রিকদল পূর্বেই এদেশে ছিল। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে এগুলির প্রভাব অনেকটা কমিয়াছিল কিন্তু শীঘ্রই বৈষ্ণব সহজিয়ারা তাহাদের সহিত যোগ দিয়া দল বৃদ্ধি করিল। ইহারা প্রচলিত ধর্মমত এবং সামাজিক রীতি-নীতি ও অনুষ্ঠানের ধার ধারিত না। বিভিন্ন পথে মুক্তিলাভের সন্ধান করিত। ইহাদের ধর্মাচরণের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল পরকীয়া প্রেম অর্থাৎ বর্তমান যুগের ভাষায় পরস্ত্রীর সহিত অবৈধ প্রণয় ও ব্যভিচার। বর্তমান কালের রুচির অমর্যাদা না করিয়া ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করা অসম্ভব। আশ্চর্যের বিষয় এই যে

১। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—পদাবলী সাহিত্য পৃঃ ৩১৫-৬

এই পরকীয়া প্রেম যে স্বকীয়া প্রেম অর্থাৎ পরিণীতা স্ত্রীর সহিত বৈধ প্রেম অপেক্ষা আধ্যাত্মিক হিসাবে অনেক শ্রেষ্ঠ—ইহা বাংলার বৈষ্ণব সমাজেও গৃহীত হইয়াছিল। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরের মহারাজা এই মত খণ্ডন করিবার জন্য কয়েকজন বৈষ্ণব পণ্ডিত পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা নানা দেশে স্বকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া অবশেষে বাংলা দেশে আসিলেন। ছয়মাস বিতর্কের পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া পরকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার ফলে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কর্তাভজা প্রভৃতি বহু সহজিয়া সম্প্রদায় এবং কিশোরী ভজন প্রভৃতি এমন নানাপ্রকার অনুষ্ঠান বাংলায় প্রচলিত ছিল, সুরুচি লঙ্ঘন না করিয়া তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব।

শ্রীচৈতন্যদেব যে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রেম ও ভক্তিবাদের উপর বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কালক্রমে তাহার এই পরিণতি হইয়াছিল। তবে ইহা কেবল সহজিয়া ও বৈষ্ণব ধর্মে সীমাবদ্ধ ছিল না। তান্ত্রিক ধর্মেও বীভৎসতা চরমে উঠিয়াছিল। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও ইহার প্রভাব দেখা যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে মানবদেহের অঙ্গসূচক অশ্লীল কথা দুর্গা পূজায় উচ্চারণ করিবে, কারণ দুর্গা ইহা উপভোগ করেন। কালবিবেকে নির্দেশ আছে যে কাম-মহোৎসবে অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিবে। দুর্গাপূজার বর্ণনা প্রসঙ্গে নরনারীর যে সব ক্রীড়া ও বাক্য কালবিবেকে লিখিত আছে তাহা বর্তমান যুগে ভদ্র সমাজে উচ্চারণ করা যায় না কিন্তু ইহা না করিলে বা না বলিলে নাকি ভগবতী ক্রুদ্ধা হইবেন। রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি গ্রন্থে যে নরনারীর দেহ সম্ভোগের নগ্নচিত্র প্রকটিত হইয়াছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পরবর্তী অনেক পদাবলীতেও ইহার অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সাহিত্যে ও সমাজে যে শ্রেণীর অশ্লীলতা আজকাল ভব্য সমাজে নিন্দনীয় এবং আইনে দণ্ডনীয়—মধ্যযুগে ধর্মের সূক্ষ্ম আবরণে তাহা ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে দোষাবহ বলিয়া মনে হইত না।

কিন্তু কেবল এই এক বিষয়েই চৈতন্যদেবের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। জাতিভেদের কঠোরতা দূর করিয়া নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নের যে চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন এক শতাব্দীর বেশী তাহা স্থায়ী হয় নাই। ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের মতে কেবল ব্রাহ্মণেরাই ব্রাহ্মণ জাতিকে দীক্ষা দিতে পারেন। নীচ জাতীয় লোক উচ্চ জাতিকে দীক্ষা দিতে পারেন না। মধ্যযুগে বাংলার বাহিরে রামানন্দ, কবীর,

নানক প্রভৃতি যে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িকভাবে কেবলমাত্র এক ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সার্বজনীন ধর্মের প্রচার করিতেছিলেন। বাংলাদেশে ইহাদের পূর্বেই চর্যাপদে তাহার সুষ্ঠু ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবও এই প্রকার সার্বজনীন ধর্মই প্রচার করিয়াছিলেন—তবে তিনি কবীর ও নানকের মত প্রাচীন ধর্ম ও আচারের সহিত যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন করেন নাই। কিন্তু চৈতন্যের পরবর্তী কালে এবং কতকটা পূর্বেও বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া এবং তান্ত্রিক মতের প্রভাবে এমন কতকগুলি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল বা প্রভাবশালী হইল যাহার উপাসকেরা শাস্ত্রোক্ত ধর্মমত ও আচার অনুষ্ঠান বর্জনপূর্বক কেবলমাত্র গুরুর নির্দেশে অথবা স্বীয় অন্তরের অনুভূতিজাত প্রেম, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা আধ্যাত্মিক প্রগতির পথ নির্ণয় করিত। গুরুর প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও ভক্তি এবং নির্বিচারে তাঁহার আদেশ পালন এই সকল সম্প্রদায়ের অনেকেরই বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল।

বর্তমান যুগের আদর্শ ও সংজ্ঞা অনুসারে এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অশ্লীলতা, দুর্নীতি ও ব্যভিচার ছিল এবং স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলনে তাহা অনেক সময় উৎকটরূপে দেখা দিত সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইহাদের মতামত ও সাধন প্রণালী অনেকটা গুহ্য রহস্যে আবৃত থাকিলেও ইহাদের বাহ্যিক ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে যেটুকু বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইতেই ইহা প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু তথাপি মধ্যযুগের বাংলার সংস্কৃতিতে ইহাদের যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে এবং অনেকগুলির একটা ভাল দিকও আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এজন্য ইহাদের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

তান্ত্রিক সাধন প্রণালী বহু প্রাচীন এবং একটি স্বতন্ত্র ধর্মসাধনার ধারা। পরবর্তী কালে বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহার প্রভাবযুক্ত এক বা একাধিক ছোটখাট দল গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সাধারণত তান্ত্রিক সম্প্রদায় শাক্ত বলিয়া গণ্য হইলেও তান্ত্রিক, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও আছে। তন্ত্রশাস্ত্রের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রে তান্ত্রিকদিগকে বেদাচারী, বৈষ্ণবাচারী, শৈবাচারী, দক্ষিণাচারী, বামাচারী, সিদ্ধান্তাচারী এবং কৌলাচারী প্রভৃতি ক্রমোচ্চ নানা পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে কৌলাচারীই সর্বশ্রেষ্ঠ। কেহ এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে

ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত একজনের নিকট দীক্ষা নিতে হয় এবং দিবাভাগে নানাবিধ অনুষ্ঠানের পর ঘোষণা করিতে হয় যে সে পূর্বেকার ধর্মসংস্কার সমস্ত পরিত্যাগ করিল এবং ইহার প্রমাণস্বরূপ তাহার বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাত্রিকালে গুরু ও শিষ্য আটজন বামাচারী তান্ত্রিক পুরুষ এবং আটটি স্ত্রীলোক (নর্তকী ও তাঁতির কন্যা, গণিকা, ধোপানী, নাপিতের স্ত্রী বা কন্যা, ব্রাহ্মণী, একজন ভূস্বামীর কন্যা ও গোয়ালিনী) সহ একটি অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করে এবং প্রতি পুরুষের পাশে একটি স্ত্রীলোক বসে। গুরু তখন শিষ্যকে নিম্নলিখিতরূপ উপদেশ দেন। 'আজি হইতে লজ্জা-ঘৃণা, শুচি-অশুচি জ্ঞান জাতিভেদ প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিবে। মদ্য, মাংস, স্ত্রীসম্ভোগ প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবে কিন্তু সর্বদা ইষ্ট-দেবতা শিবকে স্মরণ করিবে এবং মদ্য মাংস প্রভৃতি ব্রহ্মপদে লীন হইবার উপাদান স্বরূপ মনে করিবে। ইহার পর নানা প্রক্রিয়া ও মন্ত্র সহকারে সকলেই মদ্য পান ও মাংস ভক্ষণ করে—গোমাংসও বাদ যায় না। মদ্য পান করিতে করিতে চেলা সম্পূর্ণ বেহুঁস হইয়া পড়ে তখন সে অবধূত সংজ্ঞা পায় এবং তাহার নূতন নাম-করণ হয়। তারপর গুরু ও অন্যান্য সকলে চলিয়া যায় কেবলমাত্র চেলা ও একটি স্ত্রীলোক থাকে। তান্ত্রিকেরা অনেক বীভৎস আচরণ করে যেমন মানুষের মৃতদেহের উপর বসিয়া মড়ার মাথার খুলিতে উলঙ্গ স্ত্রী-পুরুষের একত্র সুরাপান ইত্যাদি।

তান্ত্রিকেরা তাহাদের এই সমুদয় আচারের সমর্থনকল্পে যে দার্শনিক তথ্যের অবতারণা করে তাহার মর্ম এই : কাম, ক্রোধ ইত্যাদি ব্যসন মানুষকে পাপের পথে চালিত করে। এই সমুদয় দূর না করিতে পারিলে মোক্ষ লাভ হয় না। শাস্ত্রকারেরা এই জন্য কঠোর তপস্যা ও ইন্দ্রিয় সংযমের বিধান দিয়াছেন। কিন্তু ইহা খুবই কষ্টকর—প্রায় অসাধ্য বলিলেই হয়। তান্ত্রিক বামাচারীরা এইজন্য প্রলোভন পরিহার ও ইন্দ্রিয় নিরোধের পরিবর্তে অপরিমিত ও যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় বৃত্তির চরিতার্থ দ্বারা মানুষের মনকে ইহা হইতে বিমুখ করেন। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে এই সমুদয়ের প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না এবং এই ভাবে ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিরোধ হয়। বামাচারীরা বলে যে সাধারণ সন্ন্যাসীরা কঠোরব্রতা অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ সংসার হইতে দূরে থাকিলেই নিরাপদ থাকেন। কিন্তু বামাচারীরা প্রলোভন সম্মুখে থাকিলেও ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধ করিতে সমর্থ হন।

বৈষ্ণব সহজিয়ারা এই তান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তিতেই পরকীয়া প্রেমের প্রতিষ্ঠা

করে। প্রেমের দ্বারা ভগবানকে লাভ করাই তাহাদের চরম লক্ষ্য। সুতরাং প্রথমে নর-নারীর প্রেমের মধ্য দিয়াই এই প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। নিজের স্ত্রী অপেক্ষা অন্য নারীর প্রতি আসক্তিই বেশী প্রবল হয় সুতরাং ইহাই এই প্রেমের প্রথম সোপান এবং প্রথমে স্থূল দেহজাত ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি হইলেও ক্রমে ইহা ভগবানের প্রতি প্রেমে পরিণত হয়। কেহ কেহ আবার ইহার সঙ্গে আর একটু যোগ করে। মানুষের মন কাম প্রবৃত্তিতে চঞ্চল হয়। তাহা চরিতার্থ হইলেই মন শান্তভাব অবলম্বন করে এবং তাহাকে ভগবানের ধ্যানে সমাহিত করা যায়। কেহ কেহ মানবদেহের শিরা উপশিরার উপর ইহার প্রভাব অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ প্রভৃতি নানা ব্যাখ্যা করেন।

সহজিয়ারা অনেক শাখায় বিভক্ত—যেমন আউল, বাউল, শাই, দরবেশ, নেড়া, সহজিয়া প্রভৃতি। ইহা ছাড়া কর্তাভজা, স্পষ্টদায়ক, সখীভাবক, কিশোরী ভজনী, রামবল্লভি, জগন্মোহিনী, গৌড়বাদী, সাহেবধানী, পাগলনাথি, গোবরাই প্রভৃতি সম্প্রদায়ও অনেকে সহজিয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন। এই সমুদয় বিভিন্ন শাখার সহজিয়াদের ধর্মমত, সামাজিক প্রথা ও সাধন প্রণালীর মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ থাকিলেও গুরুবাদ, স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলন ও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য সকলেই স্বীকার করে। ইহাদের উৎসবে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকায় বহু স্ত্রীলোক ইহাতে যোগ দেয়। ঘোষপাড়া, রামকেলি, নদীয়া, শান্তিপুর, খড়দহ, কেন্দুলি, এবং বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলায় সহজিয়াদের বহু কেন্দ্র আছে। সহজিয়াদের শাস্ত্র সবই প্রায় হাতে লেখা পুঁথিতে পাওয়া যায়—কিন্তু ইহার ভাষা সান্ধ্যভাষা—সাংকেতিক ও দুর্বোধ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সহজ বাংলা ভাষায় লিখিত কয়েকখানি পুঁথি আছে। এই সকল শাস্ত্রে পরকীয়া প্রেমের সমর্থনে কেবল তন্ত্রশাস্ত্র নহে, অথর্ব-সংহিতা, ছান্দোগ্যোপনিষৎ ও বৌদ্ধ কথাবত্থুর উল্লেখ করা হইয়াছে। অথর্বের উক্তি এস্থলে প্রযোজ্য নহে—কারণ ইহাতে স্ত্রীলোকের সহিত একাধিক ভূতপূর্ব স্বামীর মিলনের কথা আছে। ইহাতে স্ত্রীলোকের বহু বিবাহ প্রমাণিত হয় কিন্তু পরকীয়া প্রেম সমর্থিত হয় না। ছান্দোগ্যোপনিষদে দ্বিতীয় প্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের 'ন কাঞ্চন পরিহরেৎ' এই বচনে পরস্ত্রী সংগমের অনুমোদন আছে। শঙ্করাচার্যের ভাষ্যে ইহা বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তবে তিনি লিখিয়াছেন "পরস্ত্রীগমনের নিষেধ বিধায়িকা স্মৃতি এই বামদেব্য সামোপসনা ভিন্ন অন্য স্থানেই বুঝিতে হইবে।" কিন্তু ইহা খুব

প্রবল যুক্তি নহে—কারণ একখানি শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক উপনিষদ যদি কোন উপাসনায় পরস্ত্রীগমন অনুমোদন করে তবে তান্ত্রিক ও সহজিয়ারা সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা নিজেদের সমর্থন করিতে পারে।

বৌদ্ধগ্রন্থ কথাবত্থুতে 'একাধিপ্পয়ো' নামক একটি প্রথার উল্লেখ আছে। যে কোন স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলে তাহাদের দৈহিক মিলন হইতে পারে।

এই সকল দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে পরকীয়া-প্রেমের ভিত্তিতে ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনা হয়ত একটি প্রাচীন সাধনার ধারার অনুকরণ বা উদ্বর্তন মাত্র। অন্ততঃ বর্তমান যুগে আমরা ইহাকে যে চক্ষে দেখি মধ্য ও প্রাচীন যুগের দৃষ্টিভঙ্গি তাহা হইতে অন্যরূপ ছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে মধ্য-যুগের কয়েকজন প্রধান স্মার্ত পণ্ডিতও তন্ত্রোক্ত সাধনার ধারাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। প্রাচীন যুগের শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রকারেরা ইহাকে ধর্মানুষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

এই সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলি মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত সুপরিচিত ছিল। কয়েকটি এখনও আছে। দু একটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিতেছি। কর্তাভজা সম্প্রদায় আউলচাঁদ নামক এক সাধু অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নদীয়া জিলার নানা স্থানে ইহা প্রচার করেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে নৈহাটির নিকট ঘোষপাড়া নিবাসী সদ্‌গোপ জাতীয় রামশরণ পাল ইহার কর্তা হন। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না এবং হিন্দু মুসলমান উভয়ই তাঁহার শিষ্য ছিল। এই সম্প্রদায়ের লোক কর্তা বা গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান বা কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিত এবং তাহাকেই ইষ্টদেবতা জ্ঞানে পূজা করিত। ক্রমে এই সম্প্রদায়ের খুব সমৃদ্ধি হয় ও ভক্তের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি হয়। এই দলের মধ্যে নিম্নজাতীয়া স্ত্রীলোকের সংখ্যাই ছিল খুব বেশি এবং গোপীরা কৃষ্ণকে যেমন ভাবে কায়মনপ্রাণে ভজন করিত ইহারাও সেইরূপ করিত। ঘোষপাড়ার মেলায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইত, ইহার মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই ছিল অত্যন্ত অধিক। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও রামশরণ পালের পুত্র রামদুলাল পালের অধ্যক্ষতায় এই সম্প্রদায় খুব প্রভাবশালী ছিল কিন্তু ঐ যুগের নীতির আদর্শ অনুসারে ইহাদের নীতি ও আচরণ খুব নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহার ফলেই এই সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়।

"স্পষ্টদায়ক" সম্প্রদায় ছিল কর্তাভজার ঠিক বিপরীত। এই সম্প্রদায়ের

লোকেরা গুরুকে ভগবানের অবতার মনে করিত না এবং তাঁহার কর্তৃত্বও খুব সীমাবদ্ধ ছিল। মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত সৈদাবাদনিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর শিষ্য রূপরাম কবিরাজ ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। কর্তাভজা দলের ন্যায় ইহারও বহু সংখ্যক গৃহস্থ শিষ্য ছিল। কিন্তু কর্তৃত্ব ছিল একদল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর হাতে। ইহারা এক সঙ্গে এক মঠে ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় বাস করিত। ইহারা কৃষ্ণ ও চৈতন্যের স্তুতিমূলক গান গাহিয়া নৃত্য করিত। সন্ন্যাসিনীরা ভদ্রঘরের মেয়েদের আধ্যাত্মিক উপদেশ দিত। এই সকল মেয়েরাও মঠে আসিত। কলিকাতাই ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

সখীভাবক সম্প্রদায়ের পুরুষ ভক্তেরা স্ত্রীলোকের পোষাক পরিত, স্ত্রীলোকের নাম ধারণ করিত, এবং স্ত্রীলোকের ন্যায় কৃষ্ণ ও চৈতন্যের নামে নৃত্য গীত করিত। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ইহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত। মালদহ জিলার জঙ্গলিটোলা ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। জয়পুর ও কাশীতেও এই সম্প্রদায়ের কিছু প্রতিপত্তি ছিল।

বর্তমান যুগের দৃষ্টিতে এই সকল সম্প্রদায়ের অনেক প্রথা ও ব্যবস্থা আপত্তি-জনক ও অশ্লীল বলিয়া মনে হইলেও ইহাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষণীয়। মধ্যযুগে কবীর, নানক প্রভৃতি সাধুসন্তেরা যেমন প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের বিধি ও হিন্দুর প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠান ও সামাজিক বিধান সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া এক উদার বিশ্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ইহার মূল ভিত্তি ছিল কেবলমাত্র ভগবান ও ভক্তের মধ্যে ঐকান্তিক প্রেম ও ভক্তি বাংলার সহজিয়াদের মধ্যেও সেই ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার উৎস ছিল বাংলার বৌদ্ধ সহজিয়া মতের গ্রন্থ। এই সমুদয় গ্রন্থ মধ্যযুগে বা ইহার অনতিপূর্বে রচিত হইয়াছিল এবং এই প্রাচীন সহজিয়া সাধনার ধারাই যে বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং বাংলার এই সাধনা যে মধ্যযুগে ভারতের অন্যান্য স্থানের অনুরূপ সাধনার পূর্ববর্তী এবং কবীর, নানক প্রভৃতির দৃষ্টান্ত বা ইসলামীয় সুফী প্রভাবের ফল নহে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইহার প্রমাণস্বরূপ সরোরুহপাদের (অর্থাৎ সরহ-পাদের) 'দোহাকোষ' নামক গ্রন্থের সারমর্ম বর্ণনা করিতেছি।

"ধর্মের সূক্ষ্ম উপদেশ গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হইবে, শাস্ত্র পড়িয়া কিছু জ্ঞান লাভ হইবে না। গুরু যাহা বলিবেন, নির্বিচারে তাহা পালন করিবে।"

ষড়দর্শন খণ্ডন করিয়া সরোরুহ জাতিভেদের তীব্র ও বিস্তৃত প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল ; যখন হইয়াছিল, তখন হইয়াছিল, এখন ত অন্যেও যেরূপে হয় ব্রাহ্মণও সেরূপে হয়, তবে আর ব্রাহ্মণত্ব রহিল কি করিয়া? যদি বল, সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কার দেও, সে ব্রাহ্মণ হোক; যদি বল বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ুক"। "হোম করিলে মুক্তি যত হোক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয় এই মাত্র।"

বেদ সম্বন্ধে উক্তি :—

"বেদ ত আর পরমার্থ নয়, বেদ কেবল বাজে কথা বলে।"

বিভিন্ন ধর্মের সাধু সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে উক্তি :—

'ঈশ্বরপরায়ণেরা গায়ে ছাই মাখে; মাথায় জটা ধরে, প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঘরে ঈশান কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে, আসন করিয়া বসে, চক্ষু মিটমিট করে, কানে খুস্ খুস্ করে ও লোককে ধাঁধাঁ দেয়।'

'ক্ষপণকেরা (জৈন সাধু) আপনার শরীরকে কষ্ট দেয়, নগ্ন হইয়া থাকে এবং আপনার কেশোৎপাটন করে। যদি নগ্ন হইলে মুক্তি হয় তাহা হইলে শৃগাল-কুকুরের মুক্তি আগে হইবে, যদি লোমোৎপাটনে মুক্তি হয় তবে... ('তা জুবই নিত্যম্বহ' ইতি), ময়ূরপুচ্ছ গ্রহণ করিলে যদি মুক্তি হয় তবে ময়ূর ও মৃগের মুক্তি হওয়া উচিত, তৃণ আহার করিলে যদি মুক্তি হয় তাহা হইলে হাতী-ঘোড়ার আগে মুক্তি হওয়া উচিত।'

'যে বড় বড় শ্রমণ (বৌদ্ধ) স্থবির আছেন, কাহারও দশ শিষ্য, কাহারও কোটি শিষ্য সকলেই গেরুয়া কাপড় পরে, সন্ন্যাসী হয় ও লোক ঠকাইয়া খায়।'

'সহজ পন্থা ভিন্ন পন্থাই নাই। সহজ পন্থা গুরুর মুখে শুনিতে হয়। যে যে উপায়েই মুক্তির চেষ্টা করুক না কেন, শেষে সকলকে সহজ পথেই আসিতে হইবে।'

এই সমুদয় উক্তির ঐতিহাসিক মূল্য খুবই গুরুতর। প্রচলিত সংস্কার, আচার ও ধর্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুক্তিমূলক বিদ্রোহ আমাদিগকে বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণ বা রেনেসাঁসের (Renaissance) কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আর এই সাধনের ধারা যে মধ্যযুগে অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল বৈষ্ণব সহজিয়াদের অনুরূপ ধর্মমত তাহা প্রতিপন্ন করে। এই সহজিয়াদের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন—বাউল সম্প্রদায়। ইহা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই এবং ইহাদের অনেক গানের মধ্য দিয়া আমরা সহজিয়া মতের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই।

ধর্ম সম্প্রদায়ে সাধারণত যেরূপ প্রথাবদ্ধতা, গতানুগতিকতা, এবং রীতিপ্রবণতা দেখা যায়, বাউলেরা তাহা হইতে অনেকটা মুক্ত।

ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ ব্যক্তিগত অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত; দলবদ্ধ আচার অনুষ্ঠান পূজাপদ্ধতির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই—বরং এগুলি তাহাদের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে মাত্র এবং মানুষ যে অনুষ্ঠানের ও ধর্মমতের অপেক্ষা অনেক বড় এই গানগুলির মধ্য দিয়া তাহা অতি সুন্দর ও সহজভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞের মত সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি:[১]

"বাউলেরা জাতি, পঙ্‌ক্তি, তীর্থপ্রতিমা, শাস্ত্রবিধি, ভেখ-আচরণ মানেন না। মানবতত্ত্বই তাঁদের সার। মানবের মধ্যে সর্ববিশ্বচরাচর, সেখানেই সাধনা। তাঁদের সাধনার মূল তত্ত্ব হল প্রেম। কাজেই ভগবানের সঙ্গে সমান হতে হবে। ভগবানও ঐশ্বর্য্যময়, বিশ্বপতি হলে হবে কি, প্রেমে তিনি ধরা দিতেই ব্যাকুল। তাই বাউল বলেন—

'জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমেতে ভিখারী।'

এই বাউলেরা শাস্ত্রবিধি মানেন না।···আর পাগল তো কোন নিয়মের ধার ধারে না। তাই তাঁরা দেওয়ানা বা পাগল। বাউল বা বাতুল কথার অর্থও পাগল। বাউলেরা তাই গান করেন—

'তাই তো বাউল হৈনু ভাই।
এখন বেদের ভেদ বিভেদের
আর তো দাবি দাওয়া নাই।'

লোক চলাচলের পথ বন্ধ্যা। তাতে ঘাসটুকুও জন্মাতে পারে না।—

'গতাগতের বাংঝা পথে
আজায় না ঘাস কোনমতে।'

এই লোকাচারের বন্ধ্যা পথে বাউলেরা অগ্রসর হতে নারাজ। তাই তাঁরা লোক প্রচলিত বিধিও মানেন না, আবার প্রাণহীন অবাস্তব তত্ত্বও বোঝেন না। তাঁরা চান মানুষ, কিন্তু সে মানুষ আস্ত মানুষ, যে সমাজের ভগ্নাংশ নয়। সেই পরিপূর্ণ মানুষই ব্যক্তি, ইংরেজীতে যাকে বলে পার্সনালিটি। তার মধ্যেই যে সব—

'আদ্য অন্ত এই মানুষে, বাইরে কোথাও নাই'।[২]

১। ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার সাধনা ৭৩—৮৪ পৃঃ।

২। চণ্ডীদাসের উক্তি স্মরণীয়—"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

লোকমত এবং সম্প্রদায়গুলিই তো ভগবানের দিকে যাবার প্রেমপথের সব বাধা—

'তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে।
তোমার ডাক শুনি সাঁই, চলতে না পাই
রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মরশেদে॥'

এই জীবন্ত প্রেম কি মৃত শাস্ত্রের কাছে মেলে? তার খবর মেলে জীবন্ত মানুষের কাছে। তাঁরাই গুরু। শাস্ত্রভারগ্রস্ত গুরু হলে চলবে না, চাই প্রেমে-প্রাণে-রসে ভরপুর গুরু। তিনি যে বিশেষ একটি মানুষ তা নয়। নিখিল চরাচরের সব-কিছুই গুরু হয়ে আমার অন্তরে দিনের পর দিন অনন্তকাল ধরে সেই দীক্ষা দিচ্ছেন। তাই বাউলদের—

'অধিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন।
গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন?'

'আমাদের জীবন থেকে ভগবানকে নির্বাসিত করে রেখেছি। সেই জেলখানার নামই ঠাকুর ঘর। সেখানে দিনের মধ্যে এক আধটুকু সময় গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা বা মোলাকাত করে আসি। এইটুকু মোলাকাতেই মন তৃপ্ত হবে! যদি তিনি প্রেমময় প্রাণেশ্বর, তবে তাঁকে সর্বকাল ও জীবনের সর্বস্থান ছেড়ে দিতে হবে না?—

'ও তোর কিসের ঠাকুর ঘর?
(যারে) ফাটকে তুই রাখলি আটক
তারে আগে খালাস কর।'

সহজিয়া বৈষ্ণবদের সহিত বাউলদের কিছু প্রভেদ আছে। সহজিয়া বৈষ্ণবগণ রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের মধ্য দিয়া পরমাত্মার উপলব্ধি করেন। বাউলদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরেই পরমাত্মা আছেন তাঁহার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারিলেই পরমাত্মা বা ভগবানের উপলব্ধি হয়। এই 'মনের মানুষই' বাউলের ভগবান এবং তাহার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনই বাউলের চরম ও পরম লক্ষ্য এবং এই সম্বন্ধ প্রেমের মধ্য দিয়াই স্থাপিত হয়। অনেকে মনে করেন যে বাউলদের উপর স্থফী সম্প্রদায়ের প্রভাব আছে। কিন্তু স্থফীমতের উপর যে উপনিষদ ও সহজিয়ার যথেষ্ট প্রভাব আছে এবং স্থফীদের চিন্তা ও সাধনার ধারা যে ভারতবাসীদের নিকট কোন নূতন তথ্য উপস্থিত করে নাই, ইহাও অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের মধ্যযুগে যে বিশিষ্ট ধর্ম্ম সম্প্রদায় নিরপেক্ষ, যুক্তিমূলক, আচার-অনুষ্ঠানবর্জিত, জাতিভেদ ও সর্বপ্রকার শ্রেণীভেদরহিত, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও বিশুদ্ধ অন্তর্নিহিত প্রেম ও ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই উদার সার্বজনীন ধর্মমত ভগবানকে লাভ করিবার প্রকৃষ্ট পথ বলিয়া কবীর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি বহু সাধুসন্ত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা এই যুগের ধর্মের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করিয়াছে। অনেকেই মনে করেন যে ইসলামের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইহার উৎপত্তির অন্যতম কারণ। কিন্তু বাংলাদেশের বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়ারা যে মুসলমান সংস্পর্শে আসিবার বহু পূর্ব হইতেই এই সাধনার ধারার সহিত পরিচিত ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং ইহা বাংলার সংস্কৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। কবীর বা নানকের উপর ইসলাম কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু চৈতন্যের জীবনী ও ধর্মমত সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারা যায় তাহাতে ইসলামের কোন প্রভাব কল্পনা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। চৈতন্যের সহিত কবীর, নানক প্রভৃতির প্রভেদও বিশেষ লক্ষণীয়। চৈতন্য কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতেন। পুরীতে জগন্নাথ মূর্তি দেখিয়া তাঁহার ভাবাবেশ হইয়াছিল। তিনি বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থের মাহাত্ম্য স্বীকার করিতেন। জাতিভেদ না মানিলেও তিনি ইহা কিংবা প্রাচীন হিন্দুপ্রথা ও অনুষ্ঠান একেবারে বর্জন করেন নাই। কিছুকাল পরেই তাঁহার সম্প্রদায় জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। এই সমুদয়ই কবীর, নানক ও ইসলামীয় ধর্মমতের সম্পূর্ণ বিরোধী। চৈতন্যের ধর্মমতের সহিত ইহাদের যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়ার প্রভাবেরই ফল এই মত গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। অর্থাৎ চৈতন্য ও বৈষ্ণব সহজিয়াগণ সকলেই প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়ার সাধনা দ্বারাই অল্প বা বেশী পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। অন্য কোন বিদেশী প্রভাব স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই এবং ইহার সপক্ষে কোন যুক্তি বা প্রমাণও নাই। নাথ সম্প্রদায়ও অনেকটা সহজিয়াদের মতন—কেহ বৌদ্ধ ধর্ম হইতে কেহ বা হিন্দুধর্ম হইতে নাথ পন্থ গ্রহণ করেন।

এই নাথ বা যুগী সম্প্রদায়ও বাংলাদেশে খুব প্রভাবশালী হইয়াছিল এবং ক্রমে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কায়-সাধন, হঠযোগ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাহায্যে নানারূপ অলৌকিক শক্তি অর্জন এবং মৃত্যুর হাত হইতে

পরিত্রাণ লাভ করাই ছিল ইহাদের লক্ষ্য। এই সম্প্রদায়ের গুরু গোরক্ষনাথ এবং শিষ্যা রাণী ময়নামতী ও তাঁহার পুত্র গোপীচান্দের কাহিনী বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সম্প্রদায় এখন কানফাটা যোগী নামে পরিচিত এবং বাংলার বাহিরে বিহার, নেপাল, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে এখনও ইহারা বহুসংখ্যায় বিদ্যমান। সংস্কৃত, হিন্দী, পঞ্জাবী, মারাঠি ও ওড়িয়া ভাষায় রচিত ধর্মশাস্ত্র এককালে এই সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি ও প্রাধান্যের সাক্ষ্য দিতেছে।

ধর্মঠাকুরের পূজা এখনও পশ্চিমবঙ্গে কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। শূন্যপুরাণ ও ধর্মপূজা বিধান নামে এই সম্প্রদায়ের দুইখানি বাংলা ভাষায় রচিত ধর্মশাস্ত্রে এই লুপ্তপ্রায় সম্প্রদায়ের পরিচয় ও পূজার অনুষ্ঠান বিবৃত হইয়াছে। বর্তমানে হাড়ী, ডোম, বাগদী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই ইহা প্রচলিত। কিন্তু ধর্মমঙ্গল নামক এক শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে ইহার পূর্বপ্রভাব ও অনেক কাহিনী জানা যায়। এক অমিতবলশালী যোদ্ধা লাউসেনের যুদ্ধবিজয়কে কেন্দ্র করিয়াই এই সমুদয় কাহিনী রচিত হইয়াছে। ইহাদের মতে লাউসেন পালরাজগণের সমসাময়িক ছিলেন; কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং লাউসেন কাল্পনিক ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ ধর্মঠাকুরের পূজাকে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ নিদর্শন বলিয়া মনে করেন; কিন্তু বৌদ্ধধর্মের স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও ধর্মঠাকুরের পূজায় হিন্দুদের দেবী, তান্ত্রিক ধর্মমত এবং অনার্য আদিম জাতির ধর্মবিশ্বাসেরও যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই সম্প্রদায়ের আক্রোশ এবং বিজেতা মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।[১]

এইরূপ আরও অনেক ধর্মমত প্রচলিত ছিল যাহা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের অন্তর্বর্তী নহে এবং স্মৃতিশাস্ত্র অনুমোদিত আচার ব্যবহারেরও বিরোধী। দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই বাংলায় বেদের পঠন-পাঠন এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্মের প্রচলন অনেক কমিয়া গিয়াছিল এবং তান্ত্রিক মতের প্রভাব বাড়িয়াছিল। এমন কি, এই সকল মতের সমর্থনে পুরাণের অনুকরণে তার্ক্ষ্য, ব্রাহ্মণ, আগ্নেয়, বৈষ্ণব প্রভৃতি নামে কৃত্রিম পুরাণ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তারপর মুসলমান আক্রমণের ফলে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজে অনেক বিপর্যয় ঘটে। বিশেষত অনেক লৌকিক ধর্ম প্রভাবশালী হইয়া উঠে এবং অনেক অনাচার সমাজে প্রবেশ করে। সমাজের

১। ২৪২-২৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নায়ক স্মার্ত পণ্ডিতগণের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া দুই বিপরীত রকমের হয়। এক দল এই নূতন ভাবধারা ও আচার ব্যবহার কতক পরিমাণে স্বীকার করিয়া প্রাচীনের সহিত নূতনের সামঞ্জস্য সাধন করিতে চাহেন। অপর দল ইহাদিগকে "আধুনিক" এই আখ্যা দিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন। প্রথম শ্রেণীভুক্ত দুইজন প্রধান স্মার্ত ছিলেন শূলপাণি ও শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি। শূলপাণি তান্ত্রিক ধর্ম এবং ইহার শাস্ত্র অপ্রামাণিক বলিয়া একেবারে ত্যাগ করেন নাই বরং পুরাণ ও প্রাচীন স্মৃতির অনুমোদন না থাকিলেও দোল, রাসলীলা প্রভৃতি বিধিসঙ্গত হিন্দু আচরণ বলিয়া গ্রহণ করেন। শ্রীনাথ আচার্য আরও অনেক দূর অগ্রসর হইলেন। তিনি বলিলেন যে শাস্ত্র বহির্ভূত হইলেও দেশপ্রসিদ্ধ আচার ব্যবহারও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তিনি এই সূত্র অনুযায়ী মৎস্যভক্ষণ প্রভৃতি অনুমোদন করিলেন।

তান্ত্রিক ধর্ম ও আচার পুরাপুরি সমর্থন না করিলেও তিনি তান্ত্রিকগ্রন্থ—গারুড় তন্ত্র, রুদ্র-যামল, শৈবাগম প্রভৃতি হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। বল্লাল-সেন তাঁহার দানসাগরে তান্ত্রিক ও এই শ্রেণীর অর্বাচীন গ্রন্থগুলিকে ভণ্ড প্রতারকের লেখা বলিয়া একেবারে বর্জন করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যায় যে মধ্যযুগের প্রথম ভাগেই গোঁড়া হিন্দুদের ভিতরেও পরিবর্তনের সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই, কারণ প্রাচীনপন্থী স্মার্ত গোবিন্দানন্দ, অচ্যুত চক্রবর্তী, প্রভৃতি এই নূতন পন্থার তীব্র প্রতিবাদ করেন। এমন কি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য রঘুনন্দন ভট্টাচার্যও গুরুর অনেক মত খণ্ডন করিয়া প্রাচীন পদ্ধতি সমর্থন করিয়াছেন। রঘুনন্দন অগাধ পণ্ডিত ও সুনিপুণ নৈয়ায়িকের কৌশল-সহকারে যে সমুদয় মত প্রতিষ্ঠা করিলেন বাংলার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তাহাই গ্রহণ করিল। পরে আধুনিক স্মার্তদের প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে কমিয়া গেল। কিন্তু রঘুনন্দনও তন্ত্রশাস্ত্র সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন নাই এবং কোন কোন বিষয়ে তন্ত্রের সাহায্যে স্মৃতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাও বিশেষ দ্রষ্টব্য যে কলিযুগে যে সমস্ত আচার বর্জনীয়, রঘুনন্দনের তালিকায় তাহার মধ্যে সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ নাই।

কিন্তু সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাচীন আদর্শও অনেক পরিমাণে খর্ব হইল। বৃহদ্ধর্মপুরাণ সম্ভবত ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের বাংলাদেশের ধর্ম ও সামাজিক পরিবর্তনের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে ব্রাহ্মণেরা মদ্য, মাংস, মৎস্য সহকারে দেবপূজা করিতে পারে, শাস্ত্রানুসারে নরবলি

দিতে পারে, আপৎকালে শূদ্রদিগকে ধর্মোপদেশ ও মন্ত্র দান করিতে পারে এবং পুরাণ পাঠ করিয়া শুনাইতে পারে।

যবন অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ এবং ঘৃণাও এই গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়াছে। উক্ত হইয়াছে যে যবনের সংস্পর্শ ও তাহাদের ভাষা ব্যবহার সুরাপানের তুল্য দূষণীয়। তাহাদের অন্ন গ্রহণ আরও দূষণীয় এবং ম্লেচ্ছ যবনী সংসর্গ সর্বথা পরিত্যাজ্য।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে ধর্মজীবনের চিত্র দেখিতে পাই তাহাও স্মৃতি-শাস্ত্রের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। চৈতন্য ভাগবতকার দুঃখের সহিত বলিয়াছেন যে ভক্তিমূলক বৈষ্ণব ধর্ম লোপ পাইয়াছে। ধর্মের নামে যাহা প্রচলিত তাহা হয় তান্ত্রিক সাধনা অথবা লৌকিক দেবদেবীর পূজা। এক তান্ত্রিক সাধনার কথা তিনি লিখিয়াছেন :

> "রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
> নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে॥
> ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বসন।
> খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমন॥"

'মদ্য, মাংস দিয়া যক্ষ পূজার' কথাও লিখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নর-কপাল হস্তে যোগিনীর ভিক্ষা করার কথা আছে। পূর্বে সহজিয়া প্রসঙ্গে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। শক্তিতত্ত্বমূলক তান্ত্রিক সাধনা যে প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত এবং মধ্যযুগেই ইহা বঙ্গদেশীয় স্মার্তগণের স্বীকৃতি লাভ করে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তান্ত্রিক শাক্ত সাধনার প্রভাব বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব সকল ধর্মেই দেখা যায়। মূলতঃ বেদান্তের ব্রহ্ম ও মায়া, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি এবং তন্ত্রের শিব ও শক্তি একই তত্ত্বের বিভিন্ন দিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ক্রমে ক্রমে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, কৃষ্ণ ও রাধা এবং রাম ও সীতা—এই সকল যুগলও এই তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইঁহারা সকলেই অভিন্ন এবং আজ পর্যন্তও রাধা-শ্যাম, ভবানী-শঙ্কর, সীতা-রাম প্রভৃতি একই ভগবানের বিভিন্ন মূর্তিরূপে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। নানারূপে বিভিন্ন ধর্মমতের এই অপূর্ব সমন্বয় বা সামঞ্জস্য বাংলায় মধ্যযুগের হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য।

চৈতন্যভাগবতকার বর্ণিত মঙ্গলচণ্ডী, মনসা বা বাশুলী প্রভৃতি লৌকিক দেবী-গণের পূজা এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই সকল দেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণন ও

পূজা প্রচলনের জন্য এক শ্রেণীর কাব্যের উদ্ভব হয়। এইগুলি মঙ্গল-কাব্য নামে পরিচিত। সেকালে পাঁচালী গায়করা ইহা অবলম্বন করিয়া গান গাহিত।

মঙ্গলকাব্য বাংলার নিজস্ব সম্পদ, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে নাই। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমুদয় অখ্যাত বা অল্পখ্যাত দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, অথবা যে সব দেবদেবী প্রসিদ্ধ হইলেও সমাজের উচ্চকোটিতে স্বীকৃতি বা সম্মানের আসন পান নাই, প্রধানত তাঁহারাই মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য। ইহাদের মধ্যে মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, কালিকা, ষষ্ঠী, কমলা, বাশুলী, গঙ্গা, বরদা, গোসানী, ঘণ্টাকর্ণ প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এই সকল মঙ্গলকাব্য ও তাহাদের কাহিনী পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মনসা ও মঙ্গলচণ্ডিকাদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন। এগুলি পাচালীগানের বিষয়-বস্তু হওয়ায় এই দুই দেবী সমাজের সর্বশ্রেণীর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের মর্যাদা ও ভক্তের সংখ্যাও বাড়িয়াছে।

শুধু দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করাই প্রসিদ্ধ মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্দেশ্য নহে। যে আগ্যাশক্তি সৃষ্টির মূল কারণ, যিনি চণ্ডীরূপে মার্কণ্ডেয় পুরাণে পূজিতা এবং সাংখ্যে প্রকৃতি বলিয়া অভিহিতা, সেই মহাদেবী আর উল্লিখিত লৌকিক দেবীগণ যে অভিন্ন ইহা প্রতিপাদন করা তাহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। মনসা ও মঙ্গলচণ্ডী সম্পর্কীয় কাব্যে ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে। মনসা প্রাচীন পৌরাণিক যুগের দেবী নহেন। সর্প-দেবী নামে তিনি নানা স্থলে পূজিতা হইতেন এবং ক্রমে শিবের কন্যা বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। শিবভক্ত চাঁদ সদাগর যখন অবজ্ঞাভরে মনসাকে পূজা করিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না তখন দৈববাণী হইল যে মনসা ও ভগবতী একই দেবী। চাঁদ সদাগর ইহা মানিয়া লইয়া মনসাকে পূজা করিয়া স্তব করিলেন: "আদ্যাশক্তি সনাতনী, মুক্তিপদ-প্রদায়িনী, জগতে পূজিতা তুমি জয়া।"

মনসাও তখন তাঁহার স্বরূপ প্রকট করিলেন:

"আকাশ পাতাল ভূমি   সৃজন সকল আমি
শক্তিরূপা সবাকার মাতা।
মহেশের মহেশ্বরী   মনোরূপা সুকুমারী
লক্ষ্মীরূপা নারায়ণ যথা॥"

মঙ্গলচণ্ডী কাব্যের আরাধ্যা দেবী অস্পৃশ্য ব্যাধ সমাজের দেবী। তিনি বনে গোধিকারূপে ব্যাধ কালকেতুকে দেখা দেন এবং শূকর মাংস তাঁহার পূজায় ব্যবহৃত হয়। খুল্লনার আরাধ্যা দেবী এই দেবী হইতে ভিন্ন এবং সভ্য ভব্য সমাজে মেয়েদের ব্রতের দেবী। কিন্তু মঙ্গলচণ্ডী কাব্যের প্রসাদে এই দুই দেবী মিলিয়া গিয়াছেন এবং পুরাণোক্তা মহাদেবী দুর্গা ও চণ্ডীদেবীর সহিত অভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

এইরূপে ষষ্ঠী, শীতলা প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে শঙ্কর গৃহিণী শৈলসুতা রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ব্যাঘ্রভয় নিবারণী কমলা দেবীও 'সকলের শক্তি' ও 'জগতের মাতা', 'পরম ঈশ্বরী জগতের মা' এবং 'ব্রহ্মা বিষ্ণু হর' তাঁহাকে নিত্য পূজা করেন।

আজ পর্যন্ত এই সকল দেবদেবী প্রায় সর্বশ্রেণীরই পূজা পাইয়া আসিতেছেন। বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে ও পাঁচালীর গানে এই সকল দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারই ইহার পথ প্রশস্ত করিয়াছে। সম্ভবত আর একটি কারণও ছিল। যখন দলে দলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল তখন এই বিপর্যয়ের প্রতিকার স্বরূপ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা এই সকল দেবীকে সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়া নিম্নশ্রেণীদিগকে হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মনে হয় এই কারণেই স্মার্ত রঘুনন্দন কৃত্য-তত্ত্ব অধ্যায়ে এই সকল লৌকিক দেবীদের পূজার বিধি দিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু আখ্যানেও নিম্নশ্রেণীর আর্থিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কথাই ঘোষিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে যে শ্রেণীর অধিকার ছিল না, বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবে সেই শ্রেণীর দাবি ও সংস্কৃতি সমাজের সকল স্তরের কর্ণগোচরে আনার সুযোগ মিলিয়াছিল।

এই বাংলা সাহিত্যের কল্যাণেই আমরা স্মৃতি-বহির্ভূত ধর্মের আরও কিছু বিবরণ পাই। ব্যাঘ্র কুম্ভীরাদিকে দেবতা শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করা ও তৎসংশ্লিষ্ট বহু কুসংস্কারপূর্ণ অনুষ্ঠানের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই ইহা প্রচলিত ছিল।

জলদেবতা কুম্ভীরবাহন কালুরায় ও অরণ্যদেবতা শার্দুলবাহন দক্ষিণরায়— এই দুই দেবতার পূজা এখনও প্রচলিত আছে।

মধ্যযুগের শেষে যে হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ, গঙ্গায় সন্তানবিসর্জন, চড়কের আত্মঘাতী বীভৎস যন্ত্রণা প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাও এই সংস্কারেরই পরিণতি মাত্র।[1]

মধ্যযুগে প্রবর্তিত যে কয়েকটী নূতন ধর্মানুষ্ঠান এখনও বাংলাদেশে বিশেষ প্রভাবশালী, তাহাদের মধ্যে দুর্গাপূজা ও কালীপূজা এই দুইটিই প্রধান। ইহার মুখ্য কারণ তান্ত্রিক সাধনার সহিত এই দুই অনুষ্ঠানের নিগূঢ় সংযোগ।/

বর্তমানকালে যে পদ্ধতিতে দুর্গাপূজা হয় চতুর্দশ শতাব্দী বা তাহার কিছু পূর্বেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল; কিন্তু সম্ভবত ষোড়শ শতকের পূর্বে তাহা ঠিক বর্তমান আকার ধারণ করে নাই।

চৈতন্যভাগবতে[১] আছে:

"মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব ঘরে।
দুর্গোৎসব কালে বাদ্য বাজাবার তরে॥"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই দুর্গাপূজা খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রচলিত প্রবাদ এই যে মনুসংহিতার বিখ্যাত টীকাকার কুল্লুক ভট্টের পুত্র রাজা কংস নারায়ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া দুর্গাপূজা করেন এবং রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী যে দুর্গাপূজাপদ্ধতি রচনা করেন তাহাই এখন পর্যন্ত প্রচলিত। অবশ্য ইহার সপক্ষে কোনও প্রমাণ নাই এবং অন্যমতও আছে। তবে দুর্গাপূজা প্রথম হইতেই সাত্ত্বিক ভাবে সাধনার অপেক্ষা রাজসিক সমারোহ ও জাকজমক পূর্ণ উৎসব বলিয়াই পরিগণিত হইত।

মিথিলার কবি বিদ্যাপতি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনীতে কার্তিক, গণেশ, জয়া-বিজয়া (লক্ষ্মী-সরস্বতী) এবং দেবীর বাহন সিংহ সমেত প্রতিমায় শারদীয়া দুর্গাপূজার উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং মিথিলায়ও চতুর্দশ শতকে অনুরূপ দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল। ভারতের আর কোনও অঞ্চলে এই প্রকার দুর্গাপূজা প্রচলিত ছিল, এরূপ কোন প্রমাণ নাই।

মধ্যযুগের প্রথম ভাগে দুর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ ও ক্রিয়াদির সম্বন্ধে কালবিবেক ও বৃহদ্ধর্মের উক্তি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত যে এই সমুদয় অশ্লীলতা দুর্গাপূজার অঙ্গীভূত ছিল বিদেশীয় একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে তাহা জানা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লিখিত এই বিবরণের সার মর্ম দিতেছি।

"দিনের পূজা শেষ হইলে ধনী লোকের বাড়ীতে দেবীর মূর্তির সম্মুখে একদল

(১) মধ্য ―২৩ অধ্যায়।

বেশ্যার নৃত্যগীত আরম্ভ হয়। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র এত সূক্ষ্ম যে তাহাকে দেহের আবরণ বলা যায় না। গানগুলি অতিশয় অশ্লীল এবং নৃত্যভঙ্গী অতিশয় কুৎসিত। ইহা কোন ভদ্র সমাজে উচ্চারণ বা বর্ণনার যোগ্য নহে। অথচ দর্শকেরা সকলেই ইহা উপভোগ করেন—কোন রকম লজ্জা বোধ করেন না।" লেখক ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় রাজা রাজকৃষ্ণের বাড়ীতে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

পূজায় পাঁঠা ও মহিষ বলি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "নদীয়ার বর্তমান মহারাজার পিতা পূজার প্রথম দিন একটি পাঁঠা বলি দেন। তারপর প্রতিদিন পূর্বদিনের দ্বিগুণ সংখ্যা এবং এইরূপে ১৬ দিনে ৩৩,১৬৮ পাঁঠা বলি দেন। একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু আমাকে বলিয়াছেন যে তিনি এক বাড়ীর পূজায় ১০৮ টি মহিষ বলি দেখিয়াছেন।

"বলি শেষ হইলে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ নিহত পশুর রক্তলিপ্ত কর্দম গায়ে মাখিয়া উন্মত্তের মত নাচিতে আরম্ভ করে এবং তারপর রাস্তায় বাহির হইয়া অশ্লীল গীত ও নৃত্য করিতে করিতে অন্যান্য পূজা-বাড়ীতে গমন করে।"

মোটের উপর একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে দুর্গাপূজায় রাজসিক ও তামসিক ভাবের যেরূপ প্রাধান্য ছিল তদনুপাতে সাত্ত্বিক ভাবের পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশে প্রচলিত কালীপূজার প্রবর্তক ছিলেন সম্ভবত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। তাঁহার তন্ত্রসার গ্রন্থে কালীপূজার বিধান সংগৃহীত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন কৃষ্ণানন্দ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। কিন্তু অনেকের মতে 'তন্ত্রসার' নামক তন্ত্রশাস্ত্রের সার-সঙ্কলন-গ্রন্থ পরবর্তী কালে রচিত।

দীপালি উৎসবের দিনে কালীপূজার বিধান ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কাশীনাথের 'কালীসপর্যাবিধি' গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহার খুব বেশী পূর্বে কালীপূজা সম্ভবত বাংলাদেশ সুপরিচিত ছিল না। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই কালীপূজার প্রবর্তন করেন এবং কঠোর দণ্ডের ভয় দেখাইয়া তাঁহার প্রজাদিগকে এই পূজা করিতে বাধ্য করেন।

তন্ত্রসারে কালী ব্যতীত তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণের সাধনবিধিও সংকলিত হইয়াছে। এই সমুদয় দেবীকে অবলম্বন করিয়া বাংলায় তন্ত্রসাধন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কৃষ্ণানন্দ,

ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ ও সর্বানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি বিখ্যাত শাক্ত সাধকগণ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে আর একজন বিখ্যাত কালীসাধক রামপ্রসাদ সেন তাঁহার গানের মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

দুর্গাপূজা কালীপূজা অপেক্ষা প্রাচীনতর। কিন্তু দুর্গাপূজা সাত্ত্বিক সাধনার বিকাশ হিসাবে কালীপূজা অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের। এইজন্য দুর্গাপূজার প্রচলন ও জাঁকজমক বেশী হইলেও বাংলাদেশে শক্তি সাধকের নিকট কালী-পূজাই অধিকতর উচ্চস্তরের বলিয়া গণ্য হয়।

৫। বাস্তব সমাজের চিত্র

(ক) নানা জাতি

স্মৃতিশাস্ত্রে হিন্দুর সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন এবং লৌকিক ধর্মসংস্কার ও ধর্মানুষ্ঠানের বিধান আছে। এই সমুদয় ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে যে আদর্শ হিন্দু সমাজের চিত্র পাওয়া যায়—বাস্তব জীবনে তাহা কতদূর অনুসৃত হইত তাহা বলা শক্ত। সমাজের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে। ষোড়শ শতাব্দীতে (আঃ ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) রচিত মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে কালকেতুর নূতন রাজধানী বর্ণনা উপলক্ষে এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে যে সামাজিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা বাংলাদেশের মধ্যযুগের বাস্তব চিত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থে বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সমাজ চিত্রও এ বিষয়ের মূল্যবান উপকরণ। এই সমুদয়ের সাহায্যে বাঙালী সমাজের যে চিত্র আমাদের মানসচক্ষুতে ফুটিয়া ওঠে তাহার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতেছি।

বাংলার হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য সাধারণত এই তিন জাতিরই প্রাধান্য ছিল। মুকুন্দরাম তাঁহার নিজের জন্মস্থান দামুন্যা গ্রামের বর্ণনা আরম্ভে লিখিয়াছেন :

কুলে শীলে নিরবদ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য
দামুন্যায় সজ্জন-প্রধান।

প্রায় একশত বৎসর পূর্বেও যে হিন্দু সমাজে এই তিন জাতিরই প্রাধান্য ছিল

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল হইতেও আমরা তাহা জানিতে পারি। ব্রাহ্মণেরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। বাংলা দেশের ইতিহাসের প্রথম ভাগে ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ, কৌলীন্যপ্রথা ও কুলীনদের বাসস্থানের নাম অনুসারে গাঁঞীর সৃষ্টি, এবং এ বিষয়ে কুলজীর উক্তি সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। মুকুন্দরাম প্রায় চল্লিশটি গাঁঞীর উল্লেখ করিয়াছেন—চাটুতি, মুখটী, বন্দ্য, কাঞ্জিলাল, গাঙ্গুলি, ঘোষাল, পুতিতুণ্ড, মতিলাল, বড়াল, পিপলাই, পালধি, মাসচটক প্রভৃতি। ইহার অনেকগুলি এখনও বাঙালী ব্রাহ্মণের উপাধিস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এই ইতিহাসের প্রথম ভাগে মধ্যযুগের কুলজী বর্ণিত ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে একদল ছিলেন খুব সাত্ত্বিক প্রকৃতির ও বিদ্বান। বেদ, আগম, পুরাণ, স্মৃতি, দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁহাদের পারদর্শিতা ছিল ও নানা স্থান হইতে বিদ্যার্থীগণ তাঁহাদের নিকট পড়িতে আসিত। কিন্তু মূর্খ বিপ্রেরও অভাব ছিল না, সম্ভবত ইহাদের সংখ্যাই বেশী ছিল; তাই মুকুন্দরাম ইহার সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন:—

"মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখিয়া পূজার অনুষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরে ঘরে
চাউলের কোচড়া বান্ধে টান॥
ময়রাঘরে পায় খণ্ড গোপঘরে দধিভাণ্ড
তেলি ঘরে তৈল কুপী ভরি।
কেহ দেয় চাল কড়ি কেহ দেয় ডাল বড়ি
গ্রাম যাজী আনন্দে সাঁতরি॥" (৩৪৯ পৃ:)

বিবাহাদি অনুষ্ঠান শেষ হওয়ামাত্র ব্রাহ্মণ এক কাহন দক্ষিণা আদায় করিত। ঘটক ব্রাহ্মণেরা উপযুক্ত পুরস্কার না পাইলে বিবাহ-সভা মধ্যে কুলের অখ্যাতি করিত।

গ্রহ-বিপ্র অর্থাৎ দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা শিশুর কোষ্ঠি তৈরী করিত এবং গ্রহদোষ কাটাইবার জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিত। মুকুন্দরাম মঠপতি বর্ণবিপ্রগণের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত যে সব বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা হিন্দু সমাজে পুরাপুরি গৃহীত হইত না এবং সাধারণ ব্রাহ্মণেরা তাহাদের পৌরোহিত্য

করিত না। এইজন্ত বৌদ্ধমঠের শ্রমণেরাই তাহাদের পৌরোহিত্য করিত এবং বর্ণ-বিপ্র নামে পরিচিত হইত।

অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরও উল্লেখ আছে। ইহারা শ্রাদ্ধ ও মৃত্যুকালীন দান গ্রহণ করিত, এই কারণে "পতিত" বলিয়া গণ্য হইত।

বৈদ্য জাতির মধ্যে বর্তমান কালের ন্যায় সেন, গুপ্ত, দাস, দত্ত, কর প্রভৃতি উপাধি ছিল।

"উঠিয়া প্রভাত কালে উর্দ্ধ ফোঁটা করি ভালে
বসন-মণ্ডিত করি শিরে।
পরিয়া লোহিত ধুতি কাঁধে করি খুঙ্গি পুঁথি
গুজরাটে বৈদ্যজন ফিরে॥" (৩৫২ পৃঃ)

বৈদ্যগণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

"বটিকায় কার যশ কেহ প্রয়োগের বশ
নানা তন্ত্র করয়ে বাখান।"

ইহার অর্থ সম্ভবত এই যে কোন কোন বৈদ্য ঔষধের অর্থাৎ বটিকা সেবনের ব্যবস্থা করিতেন, আবার কেহ কেহ ঝাড়ফুঁক তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে ব্যাধির উপশম করিতেন। রোগ কঠিন দেখিলে বৈদ্যেরা রোগীর বাড়ী হইতে নানা ছলে পলাইতেন। চিকিৎসা বৈদ্যদের প্রধান বৃত্তি হইলেও অন্যান্য শাস্ত্রেও তাঁহাদের পারদর্শিতা ছিল। বৈষ্ণবগ্রন্থে চৈতন্যের ভক্ত বৈদ্য চন্দ্রশেখরকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে এবং বৈদ্যজাতীয় পুরুষোত্তম "হরিভক্তি তত্ত্বসার সংগ্রহ" গ্রন্থের উপসংহারে নিজে শর্মা উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন।

কায়স্থগণের মধ্যে ঘোষ, বসু, মিত্র উপাধিধারীরা ছিল কুলের প্রধান। ইহা ছাড়া পাল, পালিত, নন্দী, সিংহ, সেন, দেব, দত্ত, দাস, কর, নাগ, সোম, চন্দ, ভঞ্জ, বিষ্ণু, রাহা, বিন্দ প্রভৃতি উপাধিধারীরাও ছিল। বর্তমান কালে রথযাত্রার জন্য প্রসিদ্ধ মাহেশ গ্রামের ঘোষেদের বিশেষ উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় ইহা কায়স্থদের একটি প্রধান সমাজ স্থান ছিল। ইহারা লেখাপড়া জানিত এবং কৃষিকার্য করিত।

বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এই তিন জাতির লোকই দেখিতে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি, ইতিহাস ও শ্রেণীভেদ, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শাখা ও তদন্তর্গত পরিবারের কুলের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার,

তদনুসারে তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ, ভোজ্যান্নতা প্রভৃতির বিস্তারিত আলোচনা এবং সামাজিক বহু খুঁটিনাটি বিবরণ লইয়া অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।[১] ইহাদের নাম কুলজী অথবা কুল-শাস্ত্র এবং গ্রন্থকর্তারা ঘটক নামে পরিচিত ছিলেন। এই ইতিহাসের প্রথম ভাগে[১] এই গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। বঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণাদি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহাদের বিবরণের যে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই তাহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে। কিন্তু যে শ্রেণীভেদের বর্ণনা আছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রভৃতি পরিচালনা করার জন্য যে সমুদয় রীতিনীতির উল্লেখ আছে তাহা মধ্যযুগের বাংলার-সম্বন্ধে মোটামুটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বহু সংখ্যক কুলজী গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকখানি সবিশেষ প্রসিদ্ধ :

১। হরিমিশ্রের কারিকা
২। এড়ুমিশ্রের কারিকা
৩। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী
৪। নুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা
৫। বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম
৬। বরেন্দ্র কুলপঞ্জিকা (এই নামে অভিহিত বহু ভিন্ন ভিন্ন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে)
৭। ধনঞ্জয়ের কুলপ্রদীপ
৮। রামানন্দ শর্মার কুলদীপিকা
৯। মহেশের নির্দোষ কুলপঞ্জিকা
১০। সর্বানন্দ মিশ্রের কুলতত্ত্বার্ণব

৩ নং পুঁথি ছাপা হইয়াছে এবং ইহা সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে রচিত। ৬, ৭ ও ৮ নং গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। অন্যগুলি ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। ১০ নং গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে কিন্তু ইহা যে পুঁথি অবলম্বন করিয়া রচিত তাহার কোন উল্লেখ নাই। ৺নগেন্দ্র নাথ বসুর মতে ১ ও ২ নং গ্রন্থ ত্রয়োদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত এবং ১ নং গ্রন্থ হরিমিশ্রের কারিকা সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ। তিনি এই দুই গ্রন্থ হইতে অনেক উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বাংলার জাতি সম্বন্ধে একটি মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু বহু অনুরোধ-উপরোধসত্ত্বেও ঐ দুইখানির পুঁথি

১। বিস্তৃত বিবরণ 'ভারতবর্ষ', ১৩৩৬ কার্তিক সংখ্যা-৬১৭ পৃষ্ঠা।

কাহাকেও দেখান নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে অন্যান্য কুলজীর সহিত এই পুঁথিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রয় করে। তখন দেখা গেল যে এই গ্রন্থও প্রাচীন নহে এবং বসু মহাশয়ের উদ্ধৃত অনেক উক্তিও এই পুঁথিতে নাই। সুতরাং এই দুই পুঁথির মূল্য খুব বেশী নহে।

কুলশাস্ত্রের সংখ্যা অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ, ঘটকগণের বংশধরগণ এইগুলি রক্ষা করিয়াছেন ও প্রয়োজনমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন। মধ্যযুগে বাংলায় সামাজিক মর্যাদালাভ যেরূপ আকাঙ্ক্ষণীয় ছিল, সামাজিক গ্লানি এবং অপবাদও সেইরূপ মর্মপীড়াদায়ক ছিল। বস্তুত মধ্যযুগে বাঙালী হিন্দুর সম্মুখে উচ্চতর কোন জাতীয় ভাব বা ধর্মের আদর্শ না থাকায় সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ও তৎসম্পর্কিত বিচার বিতর্কদ্বারা সামাজিক মর্যাদালাভ জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য এবং জাতীয় ধীশক্তির প্রধান প্রয়োগক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক যে ঘটকগণকে অর্থদ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে বশীভূত করিয়া ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষ নিজেদের আভিজাত্য-গৌরব বৃদ্ধি অথবা বিরুদ্ধ পক্ষের সামাজিক গ্লানি ঘটাইবার জন্য প্রাচীন কুলশাস্ত্রের মধ্যে অনেক পরিবর্তন করাইয়াছেন কিংবা নূতন কুলশাস্ত্র লিখাইয়া পুরাতন কোন ঘটকের নামে চালাইয়াছেন। বর্তমান যুগেও এইরূপ বহু কৃত্রিম কুলজী-পুঁথি রচিত হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই। কারণ, জাতির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ইহার উৎপত্তিসূচক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অনেক বচন এবং অনেক তথাকথিত প্রাচীন সংহিতা ও তন্ত্রগ্রন্থ যে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালে রচিত হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পূর্বোক্ত কুলশাস্ত্রগুলিতে প্রধানত ব্রাহ্মণদের কথাই আছে। বহু বৈদ্য কুলপঞ্জিকার মধ্যে দুইখানি প্রামাণিক গ্রন্থ রামকান্ত দাস প্রণীত কবিকণ্ঠহার ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং ভরত মল্লিক কৃত চন্দ্রপ্রভা ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। কায়স্থদের বহু কুল-পঞ্জিকা আছে; কিন্তু, কোন গ্রন্থই প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

কুলশাস্ত্র মতে হিন্দুযুগেই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে গুণানুসারে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন হয়। কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আবার 'মুখ্য' ও 'গৌণ' এই দুই শ্রেণীভেদ হইল। অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা শ্রোত্রিয়, কাপ (বংশজ), সপ্তশতী প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইলেন। কৌলীন্য প্রথা প্রথমে ব্যক্তিগত গুণের উৎকর্ষের

উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—কিন্তু ক্রমে ইহা বংশানুক্রমিক হয়। পরে নিয়ম হইল কুলীনকন্যা যে ঘরে প্রদত্ত হইবে আবার সেই ঘর হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে এবং এইরূপ আদানপ্রদানের বিচার করিয়া মাঝে মাঝে কুলীনগণের পদমর্যাদা স্থির করা হইবে। এইরূপ 'সমীকরণ' অনেকবার হইয়াছে। সর্বশেষে সম্ভবত পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে দেবীবর ঘটক কুলীনদের দোষ বিচার করিয়া কতককে কৌলীন্য-চ্যুত করিলেন এবং অল্পদোষাশ্রিত অন্য কুলীনগণকে ছত্রিশ ভাগ অথবা মেল-এ বিভক্ত করিলেন। প্রতি মেলের মধ্যেও বিবাহাদি ক্রিয়া সম্বন্ধে এরূপ কঠোর নিয়ম করা হইল যে কালক্রমে কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিবার ছাড়া অন্য কুলীন পরিবারের সহিতও কুলীনদের বিবাহ হইতে পারিত না। ইহারই ফলে কুলীন সমাজে পুরুষের বহু বিবাহ, কন্যার বেশী বয়স পর্যন্ত বা চিরকালের জন্য অনূঢ়তা ও অবশ্যম্ভাবী ব্যভিচারের উদ্ভব হইল। কোন কুলীন ৫০, ৬০ বা ততোধিক বিবাহ করিয়াছে, বা অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত পিসী, ভাইঝি সম্পর্কান্বিতা ১০ হইতে ৬০ বৎসর বয়স্কা ২০।২৫টি অনূঢ়ার একসঙ্গে বিবাহ হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিংশ শতাব্দীতেও দেখা গিয়াছে। বলা বাহুল্য অনেক বিবাহিতা কুলীন কন্যা বিবাহ রাত্রির পরে আর স্বামীর মুখ দর্শন করিবার সুযোগ পাইত না।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ব্যতীত অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অবলম্বনে প্রথম ভাগে যাহা বলা হইয়াছে তাহা মধ্যযুগ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এরূপ অনেক জাতি ও তাহাদের বৃত্তির উল্লেখ আছে।

১। বণিক গোপ—ইহাদের ক্ষেতের ফসলে বাড়ী ভরা থাকিত।

"মুগ, তিল গুড় মাসে গম সরিষা কাপাসে
সভার পূর্ণিত নিকেতন।" (৩৫৫ পৃঃ)

২। তেলি—ইহারা কেহ চাষ করিত, কেহ ঘানি হইতে তৈল করিত, কেহ কেহ তৈল কিনিয়া আনিয়া বিক্রয় করিত।

৩। কামার—কুড়ালি, কোদালি, ফাল, টাঙ্গী প্রভৃতি গড়িত।

৪। তাম্বুলী—পান, সুপারি এবং কর্পূর দিয়া বীড়া বান্ধিয়া বিক্রয় করিত।

৫। নাপিত—ক্ষুরকর্ম ছাড়াও ইহারা মাসোহারা পাইয়া পালোয়ানদের ডলাই মলাই করিত।

৬। মোদক—ইহারা চিনির কারখানা করিত এবং খণ্ড (পাটালি গুড়), লাড়ু, প্রভৃতি

"পসরা করিয়া শিরে নগরে নগরে ফিরে
শিশুগণে করয়ে যোগান।" (৩৫৭ পৃঃ)

৭। দুই শ্রেণীর দাস—"মৎস্য বেচে করে চাষ।
দুই জাতি বৈসে দাস"॥ (৩৫৯ পৃঃ)

৮। কিরাত ও কোল—হাটে ঢোল বাজাইত।

৯। সিউলীরা—খেজুরের রস কাটিয়া নানাবিধ গুড় প্রস্তুত করিত।

১০। ছুতার—চিড়া কুটিত, মুড়ি ভাজিত, ছবি আঁকিত।

১১। পাটনী—নৌকায় পারাপার করিত, ইহার জন্য রাজকর আদায় করিত।

১২। মারহাটারা—"শোলঙ্গে পিলুই কাটে;
ছানি কাঁড়ে চক্ষে দিয়া কাঁটা।" (৩৬১ পৃঃ)

প্রথম পংক্তির অর্থ দুর্বোধ্য—সম্ভবত প্লীহা কাটার কথা আছে।

জীবিকার্জনের এই সমুদয় বৃত্তির সহিত বেশ্যাবৃত্তিরও উল্লেখ আছে। কামিলা বা কেয়লা জাতিকে 'জায়াজীব' বলা হইয়াছে। সম্ভবত ইহারা স্ত্রীকে ভাড়া দিয়া জীবিকা অর্জন করিত (৩৬১ পৃঃ)।

ইহা ছাড়া ক্ষত্রি, রাজপুত প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইহারা মল্ল-বিদ্যা শিক্ষা করিত। বাগদিদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"নানাবিধ অস্ত্র ধরে দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে।" (৩৫৯ পৃঃ)

দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্যে (১৬শ শতাব্দী)[১] এইরূপ তালিকা আছে। ইহার মধ্যে শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ, অম্বষ্ঠ, সদ্গোপ উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ) ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে বর্ধমান নগরীতে বিভিন্ন জাতির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার সহিত দুই শত বৎসর পূর্বেকার উল্লিখিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীর বর্ণনার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সুতরাং এই দুইটি মিলাইয়া বাংলায় মধ্যযুগের বিভিন্ন জাতির বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করা যায়। এখানেও প্রথমে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য এই দুই

(১) বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, পৃঃ ৩১৫।

জাতির উল্লেখ। তাহার পরেই আছে[১]

"কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেণে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারি শাঁখারি॥
গোয়ালা তামূলী তিলী তাঁতী মালাকার।
নাপিত বারুই কুরী (চাষা) কামার কুমার॥
আগরি প্রভৃতি (ময়রা) আর নাগরী যতেক।
যুগি চাসাধোবা চাসাকৈবর্ত্ত অনেক॥
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে শুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী॥
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর॥
বাইতি পটুয়া কান কসবি যতেক।[২]
ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক॥"

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আচারিজ (আচার্য, দৈবজ্ঞ ?), সগুনী (ব্যাধ বা শাকুন শাস্ত্রবিৎ) ঝালিয়া (ঐন্দ্রজালিক ?), ও বাদিয়া (সাপুড়ে) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এগুলি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বৃত্তি অথবা বৃত্তিগত জাতি নির্দেশ করিতেছে কি না তাহা বুঝা যায় না।

মধ্যযুগে প্রাচীন যুগের ন্যায় ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী সমাজের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। ইস্‌লামের বিধি অনুসারে হিন্দু কোন মুসলমান দাস রাখিতে পারিত না, কিন্তু মুসলমান হিন্দু দাস রাখিতে পারিত। মুসলমানেরা হিন্দু রাজ্য জয় করিয়া বহু হিন্দু বন্দীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া ক্রীতদাসরূপে ব্যবহার করিত। ইহারা গৃহে ভৃত্যের কার্যে নিযুক্ত হইত কিন্তু যুবতী স্ত্রীলোক অনেক সময়ই উপপত্নী বা গণিকাতে পরিণত হইত। মুসলমান সুলতানেরা ভারতের বাহির হইতে বহু ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী আনয়ন করিতেন। আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয়া হইতে আনীত বহু দাস বাংলায় ছিল। ইহাদিগকে খোজা করিয়া রাজপ্রাসাদে দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত করা হইত। এই হাবসী খোজারা যে এককালে খুব শক্তিশালী ছিল এবং এমন কি বাংলার সুলতান পদে যে আসীন ছিল তাহা পূর্বেই

১। বন্ধনীর মধ্যে পাঠভেদ দেওয়া হইল। ২য় ভাগ—১৩ পৃঃ।

২। বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়—পৃঃ ৩১৫

বলা হইয়াছে। অন্যান্য অনেক মুসলমান ক্রীতদাসও মধ্যযুগে খুব উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিল। কেহ কেহ রাজসিংহাসনেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইব্‌ন্ বত্তুতার ভ্রমণ-বিবরণী (চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ) হইতে জানা যায় যে, সে সময় বাংলা দেশে খুব সুবিধাতে দাসদাসী কিনিতে পাওয়া যাইত। ইব্‌ন্ বত্তুতা একটি যুবতী ক্রীতদাসী ও তাঁহার এক বন্ধু একটি বালক ক্রীতদাস ক্রয় করিয়াছিলেন।

হিন্দুদের মধ্যেও দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। দাসদাসীরা গৃহকার্যে নিযুক্ত থাকিত। অনেক সময় কোন কোন যুবতী স্ত্রীলোককে উপপত্নীরূপেও জীবন-যাপন করিতে হইত। দাস-ব্যবসায় খুব প্রচলিত ছিল। বহু বালক-বালিকা এবং বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোক অপহৃত হইয়া দাসরূপে বিক্রীত হইত। এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় প্রকাশ্যভাবে হইত। অনেক সময় লোকে নিজেকেই বিক্রয় করিত। এইরূপ বিক্রয়ের দলিলও পাওয়া গিয়াছে। মগ ও পর্তুগীজেরা যে দলেদলে স্ত্রী-পুরুষকে ধরিয়া নিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

আমেরিকার দাসদের তুলনায় ভারতীয় দাস-দাসী অনেক সদয় ব্যবহার পাইত। তবে কোন কোন স্থলে দাসগণকে অত্যন্ত নির্যাতন আর লাঞ্ছনাও সহ্য করিতে হইত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দাসত্ব প্রথা খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষের সময় অথবা দারিদ্র্যবশতঃ লোকে নিজেকে অথবা পুত্রকন্যাকে দাসখত লিখিয়া বিক্রয় করিত। তখনকার দিনে কলিকাতায় ইউরোপীয় ও ইউরেশিয়ান সমাজে দাস রাখা একটি ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম জোনস্ জুরীদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন "এই জনবহুল শহরে এমন কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক নাই বলিলেই চলে যাহার অন্তত একটিও অল্পবয়স্ক দাস নাই। সম্ভবত আপনারা সকলেই দেখিয়াছেন কিরূপে দাস-শিশুরদল বোঝাই করিয়া বড় বড় নৌকা গঙ্গা নদী দিয়া কলিকাতায় ইহাদের বিক্রয় করিবার জন্য লইয়া আসে। আর ইহাও আপনারা জানেন যে এই সব শিশু হয় অপহৃত না হয় ত দুর্ভিক্ষের সময় সামান্য কিছু চাউলের বিনিময়ে ক্রীত।" আফ্রিকা, পারস্য উপ-সাগরের উপকূল, আর্মেনিয়া, মরিশাস্ প্রভৃতি স্থান হইতে কলিকাতায় দাস চালান হইত। বাংলাদেশ হইতেও বহু দাস-দাসী ইউরোপীয়ান বণিকেরা ভারতের বাহিরে চালান দিত। কলিকাতায় কয়েকটি ইংরেজ রীতিমত ক্রীতদাসের ব্যবসা করিত এবং এই উদ্দেশ্যে কেবল বাহির হইতে দাস-দাসীই আনিত না তাহাদের

সন্তান-সন্ততিও বিক্রয় করিত্। কলিকাতায় ইউরোপীয় ও ইউরেশিয়ান পরিবার দাস-দাসীদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করিত। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ভারত হইতে ক্রীতদাস বাহিরে পাঠানো বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে দাসত্ব-প্রথা ও দাস-ব্যবসায় রহিত হয়।

৷ সমসাময়িক সাহিত্য হইতে প্রমাণিত হয় যে মধ্যযুগে বাংলা দেশে তথা-কথিত অনেক নিম্নশ্রেণী নানা কারণে সমাজে মর্যাদা লাভ করিয়াছিল।

হাড়ী, ডোম প্রভৃতি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য সম্মান পাইত। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে আছে যে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের মাতা তাঁহাকে এক হাড়ি জাতীয় গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে বলিয়াছিলেন। শূন্যপুরাণ-রচয়িতা ডোম জাতীয় রামাই পণ্ডিত ধর্মের পূজার পুরোহিত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণোচিত মর্যাদা পাইতেন। সহজিয়া ধর্মে চণ্ডালীমার্গ এবং ডোম্বীমার্গ মুক্তির সাধনস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের সহিত রজকিনীর নাম পদাবলীতে যুক্ত আছে। স্মৃতি ও পুরাণের গণ্ডীর বাহিরে সহজিয়া, তান্ত্রিক, নাথ প্রভৃতি যে সকল নব্যপন্থী ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল তাহারাই বর্ণাশ্রম ধর্মের গণ্ডীর বাহিরে এই সকল নিম্ন জাতিকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত যোগীরাও সে যুগে বর্তমান কালের তুলনায় অনেক উচ্চ স্থান অধিকার করিত।

সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক প্রভৃতি জাতির লোক বাণিজ্য করিয়া লক্ষপতি হইত এবং সমাজে খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিত। মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই শ্রেণীর প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে। স্মার্ত রঘুনন্দন সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বণিকেরা যে এই নিষেধ না মানিয়া সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিত, মঙ্গলকাব্যে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এই ব্যাপারে বাস্তবের সহিত আদর্শের প্রভেদ অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হয়। অসম্ভব নহে যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণেরা যাহাতে অর্থলালসায় কুলোচিত ধর্ম বিসর্জন দিয়া বণিক্‌বৃত্তি অবলম্বন না করে সেইজন্যই রঘুনন্দন সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতির মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রচলন ছিল এবং ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মধুসূদন নাপিত নলদময়ন্তী কাহিনী বাংলা কবিতায় বর্ণনা করিয়াছেন (১৮০৯ খ্রীঃ)। তিনি লিখিয়াছেন যে তাঁহার পিতা এবং পিতামহও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাঝি কায়েৎ, রামনারায়ণ

গোপ, ভাগ্যমন্ত ধুপী প্রভৃতি পুঁথির লেখকরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন।[১] ইহা হইতে বুঝা যায় যে শিক্ষা ও জ্ঞান কেবল উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ব্যতীত অন্যান্য জাতির লোকও ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সদ্‌গোপ জাতীয় রামশরণ পাল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে যবনের স্পৃষ্ট ভোজ্য বা পানীয় গ্রহণ করিলে হিন্দুর জাতিপাত হইত। চৈতন্যচরিতামৃতে সুবুদ্ধি রায়ের কাহিনী ইহার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সুলতান হোসেন শাহ বাল্যকালে সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকরি করিতেন এবং কর্তব্য কাজে অবহেলার জন্য সুবুদ্ধি তাঁহাকে চাবুক মারিয়াছিলেন। সুলতান হইবার পর হোসেন শাহের পত্নী এই কথা শুনিয়া সুবুদ্ধির প্রাণ বধ করার প্রস্তাব করেন। সুলতান ইহাতে অসম্মত হইলে তাঁহার স্ত্রী কহিলেন, তবে তাহার জাতি নষ্ট কর। অতএব "করোয়ার পানি তার মুখে দেয়াইলা", অর্থাৎ মুসলমানের পাত্র হইতে জল খাওয়াইয়া সুবুদ্ধি রায়ের জাতিধর্ম নষ্ট করা হইল। সুবুদ্ধি কাশীতে গিয়া পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাহিলেন। একদল বলিলেন "তপ্ত ঘৃত খাইয়া প্রাণ ত্যাগ কর।" আর একদল বলিলেন, "অল্পদোষে এরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিধেয় নহে"। তখন চৈতন্যদেব কাশীতে আসেন এবং সুবুদ্ধি তাঁহার কাছে নিজের কাহিনী ব্যক্ত করেন। চৈতন্যদেব বলিলেন, তুমি বৃন্দাবনে গিয়া "নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন"। ইহাতে তোমার পাপ খণ্ডন হইবে এবং তুমি কৃষ্ণচরণ পাইবে।

অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে মনে হয় যে যবনস্পর্শে জাতি নষ্ট হওয়ায় হিন্দু সমাজে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল তাহা রোধ করার জন্য একদল উদারপন্থী ইহার প্রতিবাদ করিতেন।

"বল করি জাতি যদি লএত যবনে।
ছয় গ্রাস অন্ন যদি করায় ভক্ষণে॥
প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেই জনে।"

এইরূপে মুসলমান কর্তৃক কোন কুলস্ত্রী ধর্ষিত হইলেও সমাজে যাহাতে সেই পরিবার জাতিচ্যুত না হয় দেবীবরের মেলবন্ধনে সেজন্য কতকগুলি মেল 'যবন-দোষে' দুষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ দূষিত হইলেও তাহারা ব্রাহ্মণসমাজে স্থান পাইয়াছে। সম্ভবত একই রকমের দোষে এক বা একাধিক মেলের সৃষ্টি হইত—

১। K. K. Datta, History of Bengal Subah, p. 8

তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি ভোজ্যান্নতা বজায় থাকিত। তবে এই সমুদয় চেষ্টায় খুব বেশী কাজ হয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যবন স্পর্শে হিন্দু জাতিচ্যুত হইত এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত। আবার পিরালী, শেরখানী প্রভৃতি ব্রাহ্মণের মত কোন কোন পরিবার জাতিভ্রষ্ট হইয়াও হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে নাই। দেবীবর ঘটকও যবন-দোষে দুষ্ট ভৈরব ঘটকী, দেহটা, হরি মজুমদারী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সমাজের মেল উল্লেখ করিয়াছেন। তখন দক্ষিণ বাংলায় মগদের অত্যাচার ছিল—সেই জন্যই 'মঘ দোষে' দুষ্ট বাঙ্গাল মেলের উৎপত্তি হইয়াছিল। দেবীবর ঘটকের মেল বর্ণনা পড়িলে মনে হয় বাংলার ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশই কোন না কোন দোষে দূষিত ছিলেন এবং এইজন্যই অসংখ্য মেলের বন্ধন সৃষ্টি করিয়া সমাজে ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডীতে তাঁহাদের স্থান দেওয়া হইয়াছিল।

মুসলমান ও মগ ব্যতীত আর এক অস্পৃশ্য বিদেশী জাতি—পর্তুগীজ—এদেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের অত্যাচারের কথা অন্যত্র বলা হইয়াছে। পর্তুগীজেরা অনেকে বাংলায় স্থায়িভাবে বাস করিত। বরিশালের পূর্বে, নোয়াখালির দক্ষিণে ও চট্টগ্রামের পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের উত্তর প্রান্তে যে সমুদয় দ্বীপ ছিল সেখানেই তাহারা বেশীর ভাগ বাস করিত এবং জলপথে দস্যু-বৃত্তি করিত। সন্দীপ দ্বীপটি কয়েক বৎসর যাবৎ পর্তুগীজ কার্বালোর অধীনে ছিল। তারপর সিবাস্তিও গনৃস্থালভেস্ তিবৌ নামক একজন দুর্ধর্ষ জলদস্যু তিন বৎসর (১৬০৭-১৬১০ খ্রীঃ) সন্দীপে স্বাধীন নরপতির ন্যায় রাজত্ব করিয়াছিল। তাহার অধীনে এক হাজার পর্তুগীজ ও দুই হাজার অন্যান্য সৈন্য, দুইশত ঘোড়-সওয়ার এবং ৮০ খানি কামান দ্বারা রক্ষিত রণতরী ছিল। বাংলা দেশের কোন কোন জমিদার তাহার মিত্র ছিল। সৈনিক ও সেনানায়ক হিসাবে পর্তুগীজদের খুব খ্যাতি ছিল।

হুগলী হইতে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত ভূভাগ তাহাদের অধিকারে ছিল। অন্যান্য বহু স্থানে তাহাদের বসতি ছিল। বাংলার বহু জমিদার এবং সময় সময় সুলতানেরাও পর্তুগীজ সেনা ও সেনানায়কদিগকে আত্মরক্ষার্থে নিযুক্ত করিতেন। মুঘল যুগেও বাংলার নবাবেরা পর্তুগীজ সৈন্য পোষণ করিতেন।

পর্তুগীজেরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়াও বাংলা দেশের কিছু উন্নতি করিয়াছিল। তাহারা একটি অনাথ আশ্রম এবং কয়েকটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া এই শ্রেণীর লোকহিতকর কার্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহারা

মিশনারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং কখনও কখনও এ-দেশীয় ছাত্রদিগের গোয়াতে কলেজে পড়ার বন্দোবস্ত করিত। বাংলা গদ্য-সাহিত্য তাহাদের কাছে যে বিশেষরূপে ঋণী তাহা সাহিত্য-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। এককালে বাংলাদেশের উপকূল-ভাগে পর্তুগীজ ভাষা বিভিন্ন দেশীয় লোকের মধ্যে কথ্য ভাষারূপে ব্যবহৃত হইত।

মধ্যযুগে পর্তুগীজদের নিকট হইতে কয়েকটি নূতন জিনিস বাংলায় আমদানী হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য তামাক। বর্তমান কালে ইহার ব্যবহারে আমরা এত অভ্যস্ত যে, ইহা যে মাত্র তিন চারিশত বৎসর আগে আমেরিকা হইতে পর্তুগীজেরা আমাদের দেশে আমদানি করিয়াছিল তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। এইরূপে জামরুল, সফেদা, চীনাবাদাম, কমলালেবু, ম্যাঙ্গোষ্টীন, কেশুবাদাম, পেঁপে, আনারস, কামরাঙ্গা, পেয়ারা, আতা, নোনা প্রভৃতি ফল, লঙ্কা, মরিচ, নীল, রাঙ্গা আলু এবং কৃষ্ণকলি ফুলও পর্তুগীজদের আমদানি।[১] 'কেদারা'

১। J. J. A. Campos, *History of the Portuguese in Bengal*, 253.

সম্রাট আকবরের সভাসদ আসাদ বেগ বিজাপুর হইতে তামাক আনিয়া সম্রাটকে উপহার দেন। আসাদ বেগ লিখিয়াছেন যে ইহার পূর্বে তিনি কখনও তামাক দেখেন নাই এবং মোগল দরবারেও ইহা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। সুতরাং অনেকে অনুমান করেন যে ষোড়শ শতকের শেষে অথবা সপ্তদশ শতকের প্রথমে ইহা ভারতে আমদানি হয়। কিন্তু বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁহার 'মনসা-বিজয়' কাব্যে (৬৬-৬৭ পৃঃ) লিখিয়াছেন যে মুসলমানেরা তামাক খাইতে খুব অভ্যস্ত। তিনি এই কাব্যের একটি শ্লোকে ইহার রচনাকাল ১৪১৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আকবরের, এমন কি পর্তুগীজদের ভারতে আগমনের পূর্বেই বাংলা দেশে তামাক প্রচলিত ছিল এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নহে। আসাদ বেগ আকবরকে তামাক উপহার দিলে আকবর জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? তখন নবাব খান-ই-আজম বলিলেন যে ইহা তামাক এবং মক্কা ও মদিনায় ইহা সুপরিচিত। সুতরাং বাংলা দেশেও বিপ্রদাসের সময়ে মুসলমানদের তামাক খাওয়া অভ্যাস ছিল, ইহা একেবারে অসম্ভব নহে। অপর পক্ষে বিপ্রদাসের কাব্যে 'খড়দহ শ্রীপাট' ও 'কলিকাতা'র উল্লেখ থাকায় অনেকে মনে করেন যে হয় তাঁহার কাব্য রচনার তারিখযুক্ত শ্লোকটি না হয় শ্রীপাট ও কলিকাতার উল্লেখযুক্ত পংক্তিগুলি প্রক্ষিপ্ত। তামাকের উল্লেখও কাব্য রচনার তারিখ সম্বন্ধে সংশয়ের পোষকতা করে ও উল্লিখিতরূপে সংশয় অপনোদনের সমর্থন করে। (আসাদ বেগের বর্ণনা—J. N. Das Gupta, *Bengal in the Sixteenth Century*, pp. 105, 121-2 দ্রষ্টব্য। বিপ্রদাসের কাল নির্ণয়—শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' পৃঃ ১১৯-২৪, ২৮৩-৭, দ্রষ্টব্য)

ও 'মেজ' এই দুইটি প্রাচীন শব্দ আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে সম্ভবত চেয়ার ও টেবল প্রভৃতির ব্যবহার আমরা পর্তুগীজদের নিকট হইতেই শিখিয়াছি। এইরূপ আরও কয়েকটি শব্দ পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে উল্লিখিত হইয়াছে। মধ্যযুগের শেষে তামাক খাওয়ার অভ্যাস যে কিরূপ সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ১২০৮ বাংলা সনে লিখিত "তামাকু মাহাত্ম্য" নামক পুঁথি হইতে বোঝা যায়। ইহাতে আছে "দিবানিশি যেবা নরে, তামাকু ভক্ষণ করে, অন্তকালে চলে যায় কাশী"; আর "অপমৃত্যু নাহিক তাঁহার"; এবং ইহাতে বহু রোগ সারে।

(খ) জ্ঞান ও বিদ্যা

লেখাপড়া শেখায় বাঙালীর চিরদিনই আগ্রহ ছিল। সাহিত্য প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণদের নানাবিধ শাস্ত্রচর্চার উল্লেখ করা হইয়াছে। গঙ্গাতীরে নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। চৈতন্যের সমসাময়িক নবদ্বীপের বর্ণনা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

"নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ॥
সবে মহা-অধ্যাপক করি গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হৈতে লোকে নবদ্বীপ যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়"॥[১]

নব্যন্যায় ও স্মৃতি চর্চার জন্য নবদ্বীপ বিখ্যাত ছিল। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গল্প বাংলার পণ্ডিত-সমাজে প্রচলিত আছে। একটি এই যে, মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নকালে রঘুনাথ বিচারে পক্ষধরকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে অনেকে বিশ্বাস করেন না যে রঘুনাথ শিরোমণি পক্ষধর মিশ্রের

১। চৈতন্য-ভাগবত—আদি, ২য় অধ্যায়।

ছাত্র ছিলেন। তাঁহারা বলেন, রঘুনাথের গুরু ছিলেন বাসুদেব সার্বভৌম। বাসুদেব সম্বন্ধেও একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তৎকালে মিথিলাই নব্যন্যায়-চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং যাহাতে এই প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে এই জন্য উক্ত শাস্ত্রের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি বা তাহার প্রতিলিপি মিথিলার বাহিরে কেহ লইয়া যাইতে পারিত না। প্রবাদ এই যে পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র বাসুদেব সার্বভৌম চারি খণ্ড 'চিন্তামণি' ও 'কুসুমাঞ্জলি'র কারিকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে 'সর্বপ্রথম' ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। বহুলপ্রচলিত হইলেও এই কাহিনীর মূলে কোন সত্য আছে কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। নূতন যে সমুদয় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বাসুদেব পক্ষধরের ছাত্র ছিলেন না, এবং তাঁহার পূর্বেই বাংলায় নব্যন্যায়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল ; কারণ, মিথিলার নব্যন্যায়ের গ্রন্থে 'গৌড়মতের' উল্লেখ আছে।

রঘুনাথ শিরোমণি পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাসুদেব সার্বভৌমের শিষ্য ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে নবদ্বীপে যবনরাজ যে অত্যাচার করেন তাহার বিবরণ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হইতে পরে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া উপসংহারে জয়ানন্দ লিখিয়াছেন :—

"বিশারদসুত সার্বভৌম ভট্টাচার্য।
সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড় রাজ্য ॥
উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধনুর্ময় রাজা।
রত্ন-সিংহাসনে সার্বভৌমে কৈল পূজা ॥"

সার্বভৌম বহুদিন পুরীধামে অবস্থান এবং মহাবৈদান্তিক পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি ও বিপুল রাজসম্মান লাভ করেন। চৈতন্যদেব বহু তর্ক-বিতর্কের পর তাঁহাকে বৈদান্তিকের মায়াবাদ হইতে ভক্তিবাদে বিশ্বাস করান। প্রৌঢ় বাসুদেব তরুণ যুবক সন্ন্যাসীর ভক্তিবাদে দীক্ষিত হন। বাংলার এই দুই সুসন্তান সুদীর্ঘকাল উড়িষ্যায় বসবাস করিয়া যে রাজসম্মান ও লোকপ্রিয়তা অর্জন করেন তাহা একাধারে বাংলার পাণ্ডিত্য ও গৌরব সূচিত করে।

মধ্যযুগে বাংলায় সাত্ত্বিক প্রকৃতি ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য অনেক ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায়। আবার ঐশ্বর্যশালী ভোগবিলাসী ব্রাহ্মণেরও উল্লেখ আছে। চৈতন্য-

ভাগবতে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সভার যে বর্ণনা আছে তাহা প্রায় রাজসভার সদৃশ :

"দিব্য খট্টা হিঙ্গুল-পিত্তলে শোভা করে।
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে॥
তঁহি দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্মবাসে।
পট্ট-নেত বালিস শোভয়ে চারিপাশে॥

... ...

দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুই জনে।
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্বক্ষণে॥"[১]

... ...

পরম ভক্ত পুণ্ডরীক চৈতন্যের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন; কিন্তু তিনি বিষয়ীর মত থাকিতেন। সুতরাং এই চিত্র যে অন্তত বিষয়ী বিত্তশালী ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রযোজ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পণ্ডিতদের রাজসম্মানও অনেকটা রাজসিক ভাবেরই ছিল। রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র কেবল স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি রঘুবংশ, মেঘদূত, কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি কাব্যের এবং অমরকোষের টীকাও লিখিয়াছিলেন।[২] গৌড়েশ্বর জলালুদ্দীন এবং বারবক শাহ তাঁহাকে বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তিনি উজ্জ্বল মণিময় হার, দ্যুতিমান কুণ্ডলদ্বয়, দশ অঙ্গুলির জন্য রত্নখচিত ভাস্বর ঊর্মিকা (রতনচূড়) প্রভৃতি পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তারপর নৃপতি তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে বসাইয়া স্বর্ণ-কলসের জলে অভিষেকান্তে ছত্র, হস্তী ও অশ্ব এবং রায়মুকুট উপাধি দান করেন।[৩] বৃহস্পতির পুত্রেরা রাজমন্ত্রী-পদ লাভ করেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

১। চৈতন্য ভাগবত, মধ্য—৭ম অধ্যায়

২। *Indian Historical Quarterly*, XVII, 458 ff, XXIX, 183.

৩। রায়মুকুট সম্ভবত উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; সুতরাং এই সমুদয় সম্মান কেবল পাণ্ডিত্যের জন্য না হইতেও পারে। রায়মুকুট সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছে (*Ind. Hist. Quarterly* (XVII, 442 ; XVIII, 75 ; XXVIII, 215 ; XXIX, 183, XXX, 264 দ্রষ্টব্য।) রায়মুকুট ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পুত্রেরা, এবং সম্ভবত তিনিও সুলতান বারবক শাহের অনুগ্রহভাজন ছিলেন।

জমিদার ও ধনী লোকেরা বার্ষিক বৃত্তি অথবা ভূসম্পত্তি দান করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ভরণপোষণ করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাটোরের রানী ভবানী ও নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বহু সংখ্যক পণ্ডিত ও টোলের ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিয়া সংস্কৃত শিক্ষায় সাহায্য করিয়াছেন।

সে যুগে প্রাচীন কালের রাজাদের ন্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। বিদ্যাবত্তার জন্য প্রসিদ্ধ বহু স্থানে বিতর্ক সভায় অপর সকল পণ্ডিতকে পরাজয় করিতে পারিলে তাঁহার দিগ্বিজয়ী উপাধি হইত। চৈতন্যের সময়ে নবদ্বীপে এইরূপ এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। চৈতন্য-ভাগবতে ইহার যে বর্ণনা আছে তাহাতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত "পরম-সমৃদ্ধ অশ্বগজযুক্ত" হইয়া আসিয়াছিলেন। আরও অনেক আখ্যান হইতে জানা যায় যে বড় বড় পণ্ডিতগণ তখন হাতী বা ঘোড়ায় চড়িয়া বহু লোকলস্কর সঙ্গে লইয়া চলিতেন।

বাংলা দেশের পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রবাদ আছে যে মিথিলার নৈয়ায়িক পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্র এইরূপ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং হিন্দুস্থানের বহু পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করিয়া হাতী, উট ও বহু লোকলস্কর সহ নবদ্বীপে আসেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানকার বড় পণ্ডিত কে? সকলেই গঙ্গার ঘাটে স্নানরত রঘুনাথ শিরোমণিকে দেখাইয়া দিল। রঘুনাথ ছিলেন কানা—তাই তাঁহাকে দেখিয়া পক্ষধর মিশ্র ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বলিলেন: "অভাগ্যং গৌড়-দেশস্য যত্র কাণঃ শিরোমণিঃ।" (গৌড়দেশের দুর্ভাগ্য যে এক কানা পণ্ডিতের শিরোমণি)। কিন্তু প্রবাদ অনুসারে এই কানা পণ্ডিতের নিকটই তিনি তর্কে পরাস্ত হইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়া বা নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সংস্কৃত পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বহু পণ্ডিত তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সভাস্থ পণ্ডিতগণের সহিত ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনের আলোচনা করিতেন। তাঁহার সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র কবি হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

নদীয়া ব্যতীত আরও কয়েকটি সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। বাঁশবেড়িয়াতে অনেকগুলি চতুষ্পাঠী ছিল—এগুলিতে প্রধানত ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। ত্রিবেণী, কুমারহট্ট, ভট্টপল্লী, গোন্দলপাড়া, ভদ্রেশ্বর, জয়নগর, মজিলপুর, আন্দুল ও বালিতে বহুসংখ্যক চতুষ্পাঠী ছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষত স্মৃতি ও ন্যায়ের চর্চায়, যে ব্রাহ্মণেরাই অগ্রণী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে অন্যান্য জাতীয় লোকেরা, বিশেষত বৈদ্য জাতি, যে সংস্কৃত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিল তাহারও বহু প্রমাণ আছে। কয়েকজন মুসলমান পণ্ডিতও নানা সংস্কৃত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। পূর্বোক্ত আলাওল ইহার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ধর্মঠাকুরের পূজারী সাধারণত নীচ জাতীয় হইলেও সংস্কৃত চর্চা করিতেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন লিখিয়াছেন: "দক্ষিণ রাঢ়ে স্থানে স্থানে এখনও ডোম ও বাগ্‌দী পণ্ডিতের টোল আছে। সেখানে ব্যাকরণ, কাব্য ইত্যাদির পঠন-পাঠন হয় এবং বামুনের ছেলেরাও পড়ে"।[১] কয়েকজন স্ত্রীলোকও সংস্কৃত কাব্য ও বাংলা পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

বাংলাদেশের নানা স্থানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বহু চতুষ্পাঠী ও টোল ছিল। বর্ধমানের এক চতুষ্পাঠীতে দ্রাবিড়, উৎকল, কাশী, মিথিলা প্রভৃতি স্থানের ছাত্র ছিল।[২] রূপরাম চক্রবর্তীর আত্ম-কাহিনীতে আছে যে তিনি বাল্যকালে রঘুরাম ভট্টাচার্যের টোলে অমরকোষ, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র অথবা প্রাকৃতপৈঙ্গল এবং শিশুপালবধ, রঘুবংশ, নৈষধচরিত প্রভৃতি কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষা প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ পাঠ্য বিষয়ের তালিকা হইতে তৎকালে এই সম্বন্ধে একটি ধারণা করা যায়। প্রথমেই আছে :—

"রক্ষিত পঞ্জিকা টীকা ন্যায় কোষ নাটিকা
গণবৃত্তি আর ব্যাকরণ।"

তারপর পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র, দণ্ডী, ভারবি, মাঘ, জৈমিনি মহাভারত, নৈষধ, মেঘদূত, কুমারসম্ভব, সপ্তশতী, রাঘবপাণ্ডবীয়, জয়দেব, বাসবদত্তা, কামন্দকী-দীপিকা, ভাস্বতী, বামন, হিতোপদেশ, বৈদ্য ও জ্যোতিষ শাস্ত্র, স্মৃতি, আগম, পুরাণ প্রভৃতি।

প্রাথমিক শিক্ষা এবং বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষার কি ব্যবস্থা ছিল তাহা বলা কঠিন। মধ্যযুগের শেষে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করা যায়। গ্রামে খড়ের ঘরে, কোন বাড়ীর

১। সুকুমার সেন, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী, ৪৩ পৃঃ।

২। রামপ্রসাদের গ্রন্থাবলী পৃঃ ৫। এই গ্রন্থে পাঠ্য বিষয়েরও বর্ণনা আছে। (পৃঃ ৫০-১)

চণ্ডীমণ্ডপে বা খোলা জায়গায় পাঠশালা বসিত। গুরুমহাশয়েরা খুব সামান্যই বেতন পাইতেন; কিন্তু ছাত্ররা বিদ্যা সাঙ্গ করিয়া গুরুদক্ষিণা দিত। গুরুমহাশয়েরা বেতের ব্যবহারে কোন কার্পণ্য করিতেন না। হাত-পা বাঁধা, বুকের উপর চাপিয়া বসা প্রভৃতি শাস্তির ব্যবস্থাও ছিল। সাধারণত গুরুমহাশয়দিগের বিদ্যা-বুদ্ধি খুব সামান্যই থাকিত। ছাত্রেরা ছয়-সাত বৎসর পাঠশালায় থাকিয়া বাংলা পড়িতে ও লিখিতে পারিত এবং কিছু কিছু গণিত শিখিত। কড়ি ও পাথরের কুচি দিয়া সংখ্যা গণনা, যোগ বিয়োগ শিক্ষা দেওয়া হইত। হিসাব রাখা, চিঠি-পত্র, দলিল ও দরখাস্ত লেখা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাঠশালাতেই হইত। শিশুরা প্রথমে বালির উপর খড়ের কুটা দিয়া লিখিত। তারপর খড়ি দিয়া মাটির মেজেতে লিখিত। ক্রমে ক্রমে কলাপাতায়, তালপাতায়, খাগ বা বাঁশের কঞ্চি দিয়া লেখা অভ্যাস করিত। তুলা দিয়া কাগজ তৈরি হইত—যাহারা তৈরি করিত তাহাদিগকে কাগজী বলিত। এই তুলট কাগজ ছাড়া তালপাতা ও ভূর্জপত্রে পুঁথি লেখা হইত। হরিতকী ও বয়ড়ার রস প্রদীপের কাল ভূষায় মিশাইয়া কালী তৈরি হইত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে শতকরা আটজনের বেশী ছাত্র পাঠশালায় পড়িত না এবং ছয়জনের বেশী লেখাপড়া জানিত না। তবে এই সংখ্যা সমস্ত মধ্যযুগের পক্ষেই প্রযোজ্য কিনা বলা শক্ত।

টোল ও চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষায় উচ্চশিক্ষা হইত। সাধারণত গুরুর গৃহেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিত। ইহার ব্যয়ের জন্য রাজা ও ধনী লোকেরা বার্ষিক বৃত্তি দিতেন।

পাঠশালা ছাড়াও কীর্তন, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতি দ্বারা লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

(গ) স্ত্রীজাতির অবস্থা

সমসাময়িক সাহিত্যে মেয়েদের পাঠশালায় যাওয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষা লাভের কথা আছে। সুতরাং তাহারা মোটামুটি লিখিতে পড়িতে জানিত। 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'তে লহনা, খুল্লনা ও লীলাবতীর পত্র লেখা ও পত্র পাঠের উল্লেখ আছে। দয়ারামের 'সারদামঙ্গলে' রাজকুমার ও রাজকুমারীদের এবং রাস-সুন্দরীর আত্মচরিতে ছেলেমেয়েদের একত্রে পাঠশালায় যাওয়ার কথা আছে। দুই

এক স্থলে—যেমন রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে—নায়িকা বিদ্যার উচ্চশিক্ষার উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহা কতদূর বাস্তব সত্য তাহা বলা যায় না। রাণী ভবানীও সুশিক্ষিতা ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও বাংলায় কয়েকজন বিদুষী মহিলা ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ হটী বিদ্যালঙ্কার, হটু বিদ্যালঙ্কার, প্রিয়ম্বদা দেবী, বিক্রমপুরের আনন্দময়ী দেবী এবং কোটালিপাড়ার বৈজয়ন্তী দেবীর সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে হটী বিদ্যালঙ্কার সমধিক প্রসিদ্ধ। রাঢ় দেশের এই কুলীন বালবিধবা ব্রাহ্মণকন্যা সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও নব্যন্যায়ে পারদর্শী হইয়া কাশীতে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন ও বিদ্যালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত হন। ইনি সভায় ন্যায়শাস্ত্রের বিচার করিতেন ও পুরুষ ভট্টাচার্যের ন্যায় বিদায় লইতেন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বৃদ্ধ বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। রূপমঞ্জরী, ওরফে হটু বিদ্যালঙ্কার, রাঢ়দেশবাসী নারায়ণ দাসের কন্যা। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম না হইলেও নারায়ণ দাস কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন এবং তাঁহার মেধাশক্তি দেখিয়া ষোল সতর বৎসর বয়সের সময় এক ব্রাহ্মণ বৈয়াকরণিকের গৃহে রাখেন। রূপমঞ্জরী গুরুগৃহে টোলের ছাত্রদের সঙ্গে ব্যাকরণ পড়িতেন। তারপর সাহিত্য, আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অনেকে তাঁহার নিকট ব্যাকরণ, চরকসংহিতা ও নিদান প্রভৃতি বৈদ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। অনেক কবিরাজ চিকিৎসাসম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। তিনি চিরকুমারী ছিলেন, মাথা মুড়াইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মত শিখা রাখিতেন এবং পুরুষের মত উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন।[১] প্রায় একশত বৎসর বয়সে (বাংলা ১২৮২ সন) তাঁহার মৃত্যু হয়।

কিন্তু এইরূপ কয়েকটি মহিলার কথা জানা গেলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্ত্রীশিক্ষার খুব বেশী প্রচলন ছিল না। সম্ভ্রান্ত ঘরে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ ঘরে মেয়েদের লেখাপড়ার প্রথা এক রকম উঠিয়া গিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহার প্রধান কারণ দুইটি। প্রথমত, হিন্দুদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে লেখাপড়া শিখিলে মেয়ে বিধবা হইবে। দ্বিতীয়ত, বাল্যাবস্থা পার হইতে না হইতেই মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার রীতি। সপ্তম বৎসরে কন্যাদান খুব প্রশংসনীয় ছিল এবং দশ বৎসরের অধিক বয়স পর্যন্ত কন্যার বিবাহ না দিলে গৃহস্থ নিন্দনীয় হইতেন এবং ইহা অমঙ্গলের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত।

১। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুষ্পাঠী যুগে বিদুষী বঙ্গমহিলা (৭—১১ পৃঃ)।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ইহা পড়িলে মনে হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে অর্থাৎ অতি আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত—রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে এখনও যে সব অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে তাহাই মধ্যযুগেও ছিল। অধিবাস, বাসি বিবাহ, বাসর ঘরে পুরস্ত্রীদের নির্লজ্জ ও অশ্লীল আচরণ, কুখাদ্য দিয়া জামাইয়ের সঙ্গে কৌতুক প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ণনা মঙ্গলকাব্যগুলিতে আছে।

একটি বিষয়ে মধ্যযুগে বিবাহ-প্রথা বর্তমান যুগের প্রথা হইতে ভিন্ন ছিল। এখন কন্যার পিতা বর-পণ দেন—তখন বরের পিতা কন্যা-পণ দিতেন। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে ; কিন্তু ক্রমশ বর-পণের প্রথা প্রচলিত হয়।

অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ায় বালিকা বধূর শ্বশুরবাড়ী গমনের কালে বিয়োগ-বিধুরা কন্যা ও তাহার মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নীর ব্যথা সে যুগের ছড়ায় ধ্বনিত হইয়াছে।

"ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানি।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি আমি মায়ের (ভাইয়ের, বুনের) কান্দন শুনি ॥"

বাল্য বিবাহের ফলে বালবিধবার সংখ্যাও অনেক ছিল। বর্তমান কালের বিধবাদের ন্যায়ই তাহাদের অশন-বসন-ভূষণ নিয়ন্ত্রিত ছিল। তবু শোকার্ত পিতা-মাতা নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া বালবিধবা কন্যার শাঁখা সিন্দুরের অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে আছে :

"খনি বদলে দিব কাঁচা পাটের শাড়ী।
শঙ্খ (শাঁখা) বদলে দিব সুবর্ণের চুড়ী।
সিন্দুর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি ॥"

এ বিষয়ে স্মার্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থা ছিল অতি কঠোর। একাদশীতে বালিকা, বৃদ্ধা সকল বিধবাকেই একেবারে উপবাসী থাকিতে হইবে। বর্তমান যুগেও কোন কোন রক্ষণশীল পরিবারে এই নিষ্ঠুর বিধান নিতান্ত বালিকা বয়সের বিধবাকেও পালন করিতে দেখা গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজা রাজবল্লভ বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিকূলতায় কৃতকার্য হন নাই।

পুরুষের বহুবিবাহ তখন খুবই প্রচলিত ছিল। সতীনের দুঃখ এবং প্রতিকার-স্বরূপ নানা প্রকার ঔষধ খাওয়াইয়া ও অন্যান্য প্রক্রিয়া দ্বারা স্বামী বশ করার কথা অনেক মঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত হইয়াছে। পুরুষের বহুবিবাহের ফলে পারিবারিক

অশান্তির কথা সমসাময়িক সাহিত্যে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কুলীনকন্যার দুঃখের কাহিনী পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

বিবাহের সময় নববধূর সঙ্গে অসংখ্য যুবতী দাসী এমন কি বধূর ভগ্নীকেও যৌতুক স্বরূপ দেওয়া হইত। এই প্রথা নাকি আধুনিক যুগেও উড়িষ্যায় ও অন্যান্য স্থানে প্রচলিত ছিল।

সমাজে যে স্ত্রীলোকের সতীত্বের সম্বন্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রচলিত ছিল, কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। খুল্লনা বনে বনে ছাগল চরাইত, এইজন্য তাহার স্বামী ধনপতি সওদাগরের কুটুম্বগণ তাহার সতীত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিল এবং যতক্ষণ বিধিমতে তাহার সতীত্ব পরীক্ষা না হয় ততদিন তাহার গৃহে ভোজন করিতে অস্বীকার করিল। পণ্ডিতদের ব্যবস্থামত খুল্লনাকে ক্রমে ক্রমে জলেডোবা, সর্পদংশন, অগ্নিদহন, জতুগৃহদাহ, প্রভৃতি নানাবিধ "দিব্য পরীক্ষা" দিয়া নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে হইল। এই সমুদয় "দিব্য" পরীক্ষার কতটা প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী কবির কল্পনা আর কতটা বাস্তব সত্য তাহা বলা শক্ত।[১] কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে কুলবধূর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের ও অবিশ্বাসের ভাব বিদ্যমান তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার আর একটি প্রমাণও আছে। ধনপতি সওদাগর যখন দীর্ঘকালের জন্য দূরদেশে বাণিজ্যযাত্রা করেন তখন খুল্লনা ছয় মাস গর্ভবতী। পাছে খুল্লনার সন্তান হইলে কোন নিন্দা হয় এইজন্য ধনপতি এক "জয়পত্র" লিখিলেন :—

> "অশেষ মঙ্গল-ধাম খুল্লনা যুবতী ॥
> তোরে আশীর্বাদ প্রিয়া পরম পিরীতি।
> সন্দেহ ভঞ্জন পত্র করিল নির্মিতি ॥
> যখন তোমার গর্ভ হইল ছয় মাস।
> সেই কালে নৃপাদেশে যাই পরবাস ॥[২]"

মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা ছিল কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও অন্যান্য গোপীগণের স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের

১। দিব্য পরীক্ষা দ্বারা দোষ নির্ণয়ের কথা অন্যান্য কাব্যেও আছে। বর্তমান কালের জল পড়া, চাউল পড়া, নল চালা, বাটি চালা প্রভৃতি ইহার স্মৃতি বহন করিতেছে। ইউরোপের অনেক দেশে দিব্য পরীক্ষার প্রথা মধ্যযুগেও প্রচলিত ছিল।

২। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, দ্বিতীয় ভাগ—৬১৮ পৃঃ

বিবরণ হইতে মনে হয় অবরোধ প্রথা অথবা ঘোমটার প্রচলন তখনও হয় নাই। কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণে দেখিতে পাই যে সীতার চতুর্দোল কাপড় দিয়া ঘেরা হইয়াছিল।

সম্ভবতঃসর্বদেশে সর্বযুগেই যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সৈন্যদের হস্তে স্ত্রীজাতির লাঞ্ছনা ও অপমানের সীমা থাকে না। মধ্যযুগের বাংলা দেশেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে। বহারিস্তান-ই-ঘায়েবি নামক সমসাময়িক প্রামাণিক গ্রন্থে মুঘল সৈন্য কর্তৃক প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজেই এই অভিযানের সেনানায়ক ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে তাঁহার সৈন্যেরা চারি হাজার স্ত্রীলোক বন্দী করিয়া আনিয়া সকলকে বিবস্ত্রা করিয়া রাখিয়াছিল। সেনাপতি সংবাদ পাইয়া যখন তাহাদিগকে মুক্তি দিবার আদেশ দিলেন, তখনও কাহারও অঙ্গে কোন পরিধান ছিল না। পাজামা, বিছানার চাদর, আলোয়ান প্রভৃতি দ্বারা কোন মতে লজ্জা নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে গৃহে পাঠান হইল।

সতীদাহের ন্যায় বর্বরোচিত প্রথা তখনও প্রচলিত ছিল। কোন কোন স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় সতী হইতেন, কোন বাধা মানিতেন না এবং জলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়াও কোন কাতরতা প্রকাশ করিতেন না। আবার অনিচ্ছুক বিধবাকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বা অন্য উপায়ে একবার রাজি করাইয়া তারপর সে মরিতে না চাহিলেও তাহাকে জোর করিয়া পোড়াইয়া মারা হইত। প্রত্যক্ষদর্শীরা এই দুই রকমেরই বর্ণনা করিয়াছেন।[১]

(ঘ) আহার

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে বাঙালী হিন্দুর ভোজন-দ্রব্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভাঁড়ুদত্ত রাজাকে ভেট দিবার জন্য লইল কাঁচকলা, পুঁইশাক, কদলীর মোচা, বেগুন, কচু ও মূলা। সুতরাং এগুলি প্রিয় খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। চৈতন্যদেব শাক ভালবাসিতেন। তাঁহার মাতা 'বিংশতি প্রকার শাক' রাঁধিলেন। ভোজনে বসিয়া প্রভু শাক পাইয়া খুব খুসী হইলেন এবং অচ্যুতা, পটোল, হেলঞ্চা প্রভৃতি শাকের মহিমা কীর্তন করিলেন।[২]

১। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় সরকারের নিকট যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে এইরূপ জোর করিয়া পোড়াইয়া মারার বহু দৃষ্টান্ত আছে, এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

২। চৈতন্য-ভাগবত—অন্ত্যখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়

ভোজন বিলাসেরও অনেক বর্ণনা আছে :

"ওদন পায়স পিঠা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন মিঠা
অবশেষে ক্ষীর খণ্ড কলা ॥"

চৈতন্যচরিতামৃতে সার্বভৌমের গৃহে চৈতন্যদেবের যে ভোজনের বর্ণনা আছে তাহাতে নিরামিষ আহার্যের বিপুল বর্ণনা পাই :—

"পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারিদিগে পাতে[১] ঘৃত বাহিয়া চলিল ॥ ২০৬
কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারি সারি।
চারিদিগে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি ॥ ২০৭
দশ প্রকার শাক, নিম্ব সুকুতার ঝোল।
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া, বড়ী, ঘোল ॥ ২০৮
দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, বেসারি, লাফরা।
মোচা ঘণ্ট, মোচা ভাজা বিবিধ শাকরা ॥ ২০৯
বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডবড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার ॥ ২১০
নব-নিম্বপত্রসহ ভৃষ্ট বার্তাকী।
ফুল বড়ী পটোলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী ॥ ২১১
ভৃষ্ট-মাষ, মুদ্গসূপ অমৃতে নিন্দয়।
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয় ॥ ২১২
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেলপুলী আর যত পিষ্ট ॥ ২১৩
কাঞ্জিবড়া দুগ্ধচিড়া দুগ্ধলকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি ॥ ২১৪
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা ঘনদুগ্ধ আম্র তাহাঁ ধরি ॥ ২১৫
রসালা, মথিত দধি, সন্দেশ অপার।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥" ২১৬

(চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্যলীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ)

১। কলার পাতা

আর এক শ্রেণীর ভক্ষ্যদ্রব্যের কথা 'চৈতন্যচরিতামৃতে' পাওয়া যায়। রাঘব পণ্ডিত যখন অন্যান্য ভক্তগণ সহ প্রভুর দর্শনের জন্য প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইতেন তখন সংবৎসরের উপযোগী এই সমুদয় দ্রব্য ঝালিতে করিয়া লইয়া যাইতেন। ইহার মধ্যে থাকিত :

"আম্রকাসুন্দী আদাকাসুন্দী ঝালকাসুন্দী নাম।
নেম্বু আদা আম্র-কোলি [১] বিবিধ বিধান ॥ ১৪
আমসী আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমতা।
যত্ন করি গুণ্ডি করি পুরাণ সুকুতা [২] ॥ ১৫

* * *

ধনিয়া-মহুরী[৩]-তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া।
লাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া ॥ ২০
শুন্ঠিখণ্ড নাড়ু আর আমপিত্তহর।
পৃথক পৃথক বান্ধি বস্ত্রের কোথলী ভিতর ॥ ২১
কোলি শুণ্ঠী কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।
কত নাম লৈব, শত প্রকার আচার ॥ ২২
নারিকেলখণ্ডনাড়ু আর নাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল ॥ ২৩
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃত কর্পূর আদি অনেক প্রকার ॥ ২৪
শালিকাঁচুটি-ধান্যের আতব-চিড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় থলী সব ভরি ॥ ২৫
কথোক চিড়া হুড়ুম[৪] করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া ॥ ২৬
শালিতণ্ডুলভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনি পাক দিয়া ॥ ২৭
কর্পূর মরিচ এলাচি লবঙ্গ রসবাস। [৫]
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস ॥ ২৮

১। কুল। ২। পুরাতন পাটপাতা। ৩। মৌরী। ৪। মুড়ি। ৫। কাবাব চিনি

শালিধান্যের খৈ পুন ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে উখরা [১] কৈল কর্পূরাদি দিয়া ॥ ২৯
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনিপাকে কর্পূরাদি দিয়া নাড়ু কৈল ॥" ৩০
(চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা—দশম পরিচ্ছেদ)

ফল ও মিষ্টান্নের তালিকায় আছে

"ছেনা [২] পানা [৩] পৈড় [৪] আম্র নারিকেল কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলক আর বীজতাল [৫] ॥ ২৪
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর [৬]।
বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা পিণ্ড খর্জ্জুর [৭] ॥ ২৫
মনোহরা-লাড়ু আদি শতেক প্রকার।
অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার" ॥ ২৬
......ইত্যাদি। (মধ্যলীলা—১৪শ পরিচ্ছেদ।)

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আরও বহু রন্ধনের ও ভোজনদ্রব্যের বর্ণনা আছে [৮]। সপ্তদশ শতকের আরম্ভে ভারতে গোল আলুর প্রচলন হইয়াছিল। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

অন্যান্য তান্ত্রিক আচারের সঙ্গে বৈষ্ণবগণ মৎস্য ও মাংস আহার বর্জন করেন। সুতরাং বৈষ্ণব সাহিত্যে কেবল নিরামিষ ভোজ্যের তালিকা পাই। কিন্তু শাক্ত গ্রন্থে নিরামিষ আমিষ দুইরূপ ভোজ্য দ্রব্যেরই বর্ণনা আছে। নারায়ণ দেবের পদ্মা-পুরাণে বেহুলার বিবাহ উপলক্ষে রন্ধনের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। [৯] নিরামিষের মধ্যে আছে—

১। বেতআগ=বেতের কচি অগ্রভাগ, স্বাদে তিক্ত। সিদ্ধ করিয়া অথবা

১। মুড়কি। ২। ছানা। ৩। সরবৎ। ৪। পেঁড়া। ৫। তালশাঁস। ৬। পাঁচ জাতীয় লেবুর নাম। ৭। পর্তুগীজেরা যে অনেক নূতন ফল এদেশে আমদানি করিয়াছিল তাহা অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

৮। নারায়ণ দেবের পদ্মা-পুরাণ, ৫৬-৫৭ পৃঃ। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৭৯, ৫১৫-৮, ৬০৮। দ্বিজ হরিরামের ও মাধবাচার্যের চণ্ডীকাব্য ও দ্বিজ বংশীদাসের মনসামঙ্গল (দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, পৃঃ ৩৩৯, ২২১-৪, ৩৩৫)।

৯। তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত সম্পাদিত পদ্মা-পুরাণ ৫৬-৫৭ পৃঃ।

স্থক্ত ইত্যাদিতে খাওয়া হইত। (ব্যাতাগ?); ২। বাইঙ্গন (বেগুন?); ৩। পাটশাক ৪। ঘৃতে ভাজা হেলেঁচা (হ্যালাঞ্চ?); ৫। লাউয়ের আগ (লাউয়ের ডগা?); ৬। মুগ দাইল আর মুগের বড়ি; ৭। ঘৃতে ভাজা সিজারি; ৮। তিলুয়া, তিলের বড়া, তিল কুমড়া; ৯। মউয়া আলু; ১০। পাকা কলার অম্বল; ১১। পোর লতার শাক ও আদা দিয়া স্থখত (শুক্তা বা শুকতুনি)।

নিরামিষ রান্না সব ঘৃতে সম্ভার হইত।

মৎস্যের ব্যঞ্জন

১। (বেসন দিয়া) চিথলের কোল ভাজা; ২। মাগুর মৎস্য দিয়া মরিচের ঝোল; ৩। বড় বড় কৈ মৎস্যে কাটার দাগ দিয়া জিরা, লবঙ্গ মাখিয়া তৈলে ভাজা; ৪। মহাশৌলের অম্বল; ৫। ইচা (চিংড়ী) মাছের রসলাস; ৬। রোহিত মৎস্যের মুড়া দিয়া মাসদাইল; ৭। আম দিয়া কাতল মাছ; ৮। পাবদা মৎস্য ও আদা দিয়া স্থখত (শুকতুনি); ৯। আমচুর দিয়া শৌল মৎস্যের পোনা; ১০। বোয়াল মৎস্যের ঝাটী (তেঁতুল মরিচ সহ); ১১। ইলিস মাছ ভাজা; ১২। বাচা, ইচা, শৌল, শৌলপোনা, ভাঙ্গনা, রিঠা, পুঠা (পুঁটিমাছ) ও বড় বড় চিংড়ী মাছ ভাজা।

সমস্ত ভাজাই তৈল দিয়া হইত।

মাংসের ব্যঞ্জন

খাসী, হরিণ, মেষ, কবুতর, কাউঠা (কেঠো, কচ্ছপ) প্রভৃতির মাংস দিয়া নানাবিধ ব্যঞ্জন ও অম্বল।

পিঠা

খিরিসা (ক্ষীরের পিঠা), চন্দ্রপুলি, মন্োহরা, নালবড়া, চন্দ্রকাতি (চন্দ্রকান্তি?), পাতপিঠা।

প্রকাশ্যে মদ্যপান হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই নিন্দনীয় ছিল কিন্তু গোপনে মাদক দ্রব্যের খুবই প্রচলন ছিল।

মুসলমানেরা নানাবিধ পশুপক্ষীর মাংস, মিষ্টান্ন এবং তাজা শুকনা ও কাবুলী ফল, আচার প্রভৃতি খাইতে ভালবাসিত। রুটি খাওয়ারও প্রচলন ছিল কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানই ভাত খাইত। হিন্দু মুসলমান উভয়েই পান খাইত এবং পান সুপারি দিয়া অতিথিকে সমাদর করিত।

মানরিক গৌড়ে এক মুসলমান বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভোজ্য দ্রব্যের এত প্রাচুর্য ছিল যে আহার করিতে তিন ঘণ্টা লাগিয়াছিল।

দরিদ্রদের আহারের ব্যবস্থাও বাংলা সাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যাধ কালকেতুর পশু শিকার করিয়া স্বচ্ছল অবস্থা হইলে

"চারি হাড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ।
ছয় হাণ্ডি মুসুরী-সুপ মিশ্যা তথি লাউ॥
ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া।
কচুর সহিত খায় করঞ্জা আমড়া [১]।"

কোন কোন দিন হরিণী বেচিয়া দধিরও যোগাড় হইত। কিন্তু যখন শিকার জুটিত না এবং বাসি মাংস বিক্রয় হইত না, তখন ধার করিয়া ক্ষুদ ও লবণ আনিয়া 'বনাতি (নালিতা) শাক' সহ ক্ষুদের জাউ দিয়াই উদর পূর্তি করিতে হইত।[২] বাটির অভাবে মাটিতে গর্ত করিয়া তাহার মধ্যেই খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া খাইতে হইত।[৩]

মানরিক লিখিয়াছেন,"গরীব লোকেরা ভাত, লবণ ও শাক এবং সামান্য কিছু তরকারীর ঝোল খাইত"। কদাচিৎ দধি ও সস্তা মিঠাই জুটিত। মাছও খুব সুলভ ছিল না। পান্তাভাতের জল (আমানি) গরীবদের প্রধান খাদ্য ছিল।

প্রাচীন যুগেও বর্তমান যুগের ন্যায় আহারান্তে পান, সুপারি, হরিতকী প্রভৃতি খাওয়ার অভ্যাস ছিল। অভ্যাগতকে পান সুপারি দিয়া অভ্যর্থনা করা হইত।

(ঙ) পোশাক-পরিচ্ছদ

সেকালে বাঙালী পুরুষেরা ধুতি, চাদর ও স্ত্রীলোকেরা সাধারণত খালি গায়ে শাড়ী পরিত। পুরুষের 'চরণে পাদুকা' ও মস্তকে পাগড়ির কথাও কবিকঙ্কণে আছে। লম্বা কোঁচা দিয়া কাপড় পরা হইত। নাগর অর্থাৎ বিলাসীদের রূপা ও ভেলভেটের জুতা, কানে সোনার অলঙ্কার, দেহ চন্দনচর্চিত ও পরিধানে তসরের বস্ত্র থাকিত।

১। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৮৮। ২। ঐ, ২৩০ পৃঃ। ৩। ঐ দ্বিতীয় ভাগ ৪৬৪ পৃঃ।

ধনী পুরুষেরা বর্তমান কোটের ন্যায় 'অঙ্গরাখা' ও পাগড়ি পরিত। কোমরে পুরুষেরা পটুকা ও স্ত্রীলোকেরা নীবিবন্ধ পরিত। নীবিবন্ধের সঙ্গে কখনও কখনও ঘুঙ্গুর বাঁধা থাকিত। দরবারের পোষাক ছিল আলাদা—ইজার, কোমরবন্ধ, কাবাই প্রভৃতি। ধনী স্ত্রীলোকের নানা রংয়ের রেশমের শাড়ীর বিচিত্র বর্ণনা পাওয়া যায়। কোন কোন স্ত্রীলোক পৌরাণিক পালার ছবি আঁকা কাঁচুলি ও ওড়না পরিত। নটীরা ইজার পরিত। গরীব লোকেরা কোমরে নেংটী জড়াইয়াই বেশীর ভাগ সময় থাকিত। স্নানের সময় মেয়েরা হলুদ-কুঙ্কুম দিয়া গাত্র এবং আমলকী দিয়া কেশ ধৌত করিত। তারপর কেশ মার্জ্জনা করিয়া ধূপ দিয়া চুল শুকাইত এবং চন্দন দিয়া দেহ লেপন করিত। অভ্রের চিরুনী দিয়া চুল আঁচড়াইত। বাঙালী বেহার, নব বেহার, পচিমা বেহার, দেব মহল প্রভৃতি নামের নানা প্রকার খোঁপা প্রচলিত ছিল।[১] সধবা স্ত্রীলোকেরা শাঁখা, সিন্দুর ও কাজল ব্যবহার করিত। ধনী গৃহিণীরা 'কস্তুরীর পত্রাবলী' কপালে, গালে ও স্তনে অঙ্কিত করিত। সমসাময়িক সাহিত্যে বঙ্গনারীর বহুবিধ অলঙ্কারের উল্লেখ আছে; যথা সিঁথি, বেশর (নথ), কুণ্ডল (কানবালা), হার, চক্রাবলী, অনন্ত, কেয়ূর, বাজু, তাবিজ, কবচ, জসম, রতনচূড়, শাঁখা ও খাড়ু। আরও কয়েকটি নূতন অলঙ্কারের নাম পাওয়া যায়—(১) হীরামঙ্গল কড়ি অথবা মদন কড়ি, সম্ভবত কড়ির ন্যায় আকৃতির কর্ণভূষণ; (২) গ্রীবাপত্র—সম্ভবত চিক বা হাঁসুলির ন্যায় গলদেশে আঁটিয়া পরা হইত; (৩) হাতপদ্ম—হাতের পাতার উপরের দিকে পরিবার জন্য কঙ্কণের সহিত যুক্ত পদ্মাকৃতি অলঙ্কার; (৪) উঙ্খাটিকা বা উঙ্খট—সম্ভবত চুটকির ন্যায় পায়ের আঙ্গুলে পরা হইত।

সোনা, রূপা ও হাতীর দাঁতে গয়না তৈরী হইত এবং মণিমাণিক্যে খচিত হইত।

(চ) ক্রীড়া-কৌতুক

সে যুগে পাশাখেলা খুব প্রচলিত ছিল। ধনপতি সওদাগর গৌড়ের রাজার সহিত "রাত্রিদিন খেলে পাশা ভক্ষণ সময় বাসা"। মেয়ে পুরুষ পাশা খেলায় মত্ত হইয়া কর্তব্য কাজ অবহেলা করিতেন এরূপ বহু কাহিনী আছে। বিষ্ণুপুরে গোল

১। নারায়ণ দেবের পদ্মা-পুরাণ ৫০-৫১ পৃঃ।

তাস খেলার প্রচলন ছিল। সম্ভবত পর্তুগীজেরা এই তাসখেলা আমদানি করে। পায়রা উড়ান প্রতিযোগিতা একটি খুব জনপ্রিয় ক্রীড়া ছিল। আলাওলের পদ্মাবতীতে চৌগাঁ খেলার উল্লেখ আছে। ইহা বর্তমান পোলো (Polo) খেলার ন্যায়। গেণ্ডুয়া অর্থাৎ কাঠের বল লোফালুফির খেলাও প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে চাঁচরী খেলার কথা আছে কিন্তু ইহা ঠিক কি রকম খেলা ছিল বলা যায় না। মল্ল ক্রীড়াও জনপ্রিয় ছিল। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে [1] আছে:—

"দোসর যমের দূত বৈসে যত রাজপুত
মল্লবিদ্যা শেখে অবিরতি"।

তারপর আখড়া-ঘরে মল্লযুদ্ধ অর্থাৎ কুস্তির বৈঠক হইত। ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে [2] মল্লযুদ্ধ বা কুস্তির বিস্তৃত বিবরণ আছে। দৈহিক শক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ লোহার বাঁটুল চূর্ণ করা, বুকে বেলভাঙ্গা, মুঠা করিয়া সরিষা হইতে তৈল নিষ্কাশন, ঊর্ধ্বে তরবারি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় তাহা মুঠার মধ্যে ধরা প্রভৃতি মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে আছে।

নৃত্যগীতের খুবই প্রচলন ছিল। চৈতন্য-ভাগবতে রামায়ণের কাহিনী ও কৃষ্ণ-লীলা অবলম্বনে যাত্রা অভিনয়ের কথা আছে। সীতা হরণের কাহিনী শুনিয়া যবন দর্শকেরাও কাঁদিত এবং দশরথের ভূমিকা অভিনয় করিতে করিতে এক অভি-নেতার সত্যসত্যই প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যও কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিতেন। [3] অনেক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে—যথা শঙ্খ, ঘণ্টা, ডম্ফ, মৃদঙ্গ, জগঝম্প, ডম্বরু ও বিষাণ।

সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল পাঁচালী গান। প্রাচীন বাংলা কাব্যগুলি প্রায় সবই ছিল এই শ্রেণীর। প্রধান গায়ক (মূল গায়েন) এক হাতে চামর ও আর এক হাতে মন্দিরা এবং পায়ে নূপুর পরিয়া নাচের ভঙ্গীতে গাহিতেন, সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গবাদক তাল দিত। যাত্রাদলের ন্যায় দুইজন দোহারও ধুয়া ধরিত। ইহা ব্যতীত ছিল তরজা ও কবি গান (দুই পক্ষের মধ্যে গানে ও কবিতায় প্রশ্নোত্তরের ও উত্তর-প্রত্যুত্তরের প্রতিযোগিতা)। এই শ্রেণীর গানের মধ্যে মাঝে মাঝে অশ্লীলতার প্রাধান্য থাকিত—এগুলিকে খেউড় বলা হইত।

চীনদেশীয় পর্যটকেরা লিখিয়াছেন যে প্রতিদিন খুব ভোরে এক শ্রেণীর পেশাদার লোক ধনী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পাড়ায় দ্বারে দ্বারে গিয়া সানাই, ঢোল

১। প্রথম ভাগ, ৩৫১ পৃঃ। ২। ৭৯-৮২ পৃঃ। ৩। চৈতন্য-ভাগবত—৫৩, ২৩৭ পৃঃ।

প্রভৃতি শ্রেণীর বাদ্য বাজায়। তারপর প্রাতরাশের কালে প্রতি বাড়ীতে গিয়া মদ্য, ভোজ্যদ্রব্য, টাকা-পয়সা ও অন্যান্য দ্রব্য উপহার পায়।

চীনারা বাঘের সাথে খেলারও বর্ণনা দিয়াছেন। এক শ্রেণীর লোক বাজারে কিংবা বাড়ীতে লোহার শিকলে বাঁধা একটি বাঘ নিয়া যায়। শিকল খুলিয়া দিলে বাঘটি মাটিতে শুইয়া পড়ে। তারপর লোকটি বাঘকে মারিতে থাকে এবং বাঘ উত্তেজিত হইয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে। লোকটিও বাঘকে লইয়া মাটিতে পড়ে। কয়েকবার এইরূপ করিয়া লোকটি বাঘের গলায় ঘুসি মারে। তারপর বাঘটাকে আবার শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখে। খেলা শেষ হইলে দর্শকেরা লোকটিকে টাকা এবং বাঘের খাওয়ার জন্য মাংস দেয়। এটি অনেকটা বর্তমান যুগে সার্কাসের বাঘের খেলার মত।

(ছ) যুদ্ধ-প্রণালী

মধ্যযুগে বাঙ্গালীরা যে বেশে লড়াই করিত সমসাময়িক সাহিত্যে তাহার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের যুদ্ধকালীন পোষাকের বর্ণনা :—

> "পরিলা ইজার খাসা নাম মেঘমালা।
> কাবাই পরিলা দশদিগ করে আলা॥
> পামরি পটুকা দিয়া বান্ধে কোমর-বন্ধ।"

মোগল ও পাঠান সৈন্যের "কাল ধল রাঙ্গা টুপি সভাকার মাথে" এবং পায়ে মোজা। হাতী ও ঘোড়ার সওয়ার এবং পদাতিক—এই তিন শ্রেণীর সৈন্য ধনুক, খড়্গ, ঢাল, বর্শা ও কামান লইয়া কাড়া দামামা বাজাইয়া যুদ্ধযাত্রা করিত। ডোম, হাড়ি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর পাইকেরা বহু সংখ্যায় সৈন্যদলে যোগ দিত। অধীনস্থ রাজা ও জমিদারেরা হাজার হাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধে যোগ দিত। কেহ চারি হাজার 'চৌহান সিপাই', কেহ 'বিয়াল্লিশ কাহন' তীরন্দাজ, কেহ সাত হাজার ঘোড়া, কেহ দশ হাজার রাণা, কেহ আট বা আশী হাজার ঢালি নিয়া আসিত। বাগদি সেনাপতির 'হাতে বালা, কানে সোনা', এবং তাহার পাইকদের 'কোমরে ঘাঘর, গলায় গুড়ের মালা, হাতে ধনুক বাণ'। পঞ্চাশ হাজার ডোম সৈন্য চলিল :—

"কড়া বাজে ডিগ-ডিগ টিঙ্গ-টিঙ্গ পড়া।
হাড়ি পাইক সাজিল সর্দার লোহার-গড়া॥
পায় বাজে নূপুর ঘাঘর বাজে ঢালে।
ঘুরুল্যা বাতাস পারা ঘুর্যা ঘুর্যা বুলে॥"

কালু ডোম সেনাপতির পদে উন্নীত হইয়াছিল। তাহার স্ত্রীও যুদ্ধ করিত। সৈন্য-দলের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বাঙালী, রাজপুত, উড়িয়া, তেলেঙ্গীর উল্লেখ আছে। কোল সৈন্যেরাও জয়ঢাক বাজাইতে বাজাইতে আসিত। তাহাদের

"চিকুরে চিরনি আছে অঙ্গে রাঙামাটি।
জাত্যের স্বভাবে তীর ধরে দিবারাতি॥ [১]

রূপরামের বর্ণনা কাল্পনিক হইলেও ইহা হইতে সেকালের সামরিক শ্রেণী ও যুদ্ধ-যাত্রার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

কলিঙ্গরাজ ও কালকেতুর প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতেও[২] যুদ্ধের বর্ণনা আছে—

"কাট কাট বলি তাজে কলিঙ্গ নৃপতি সাজে
গজঘণ্টা বাজে উতরোল।
সাজ সাজ পড়ে ডাক বাজে দামা রণ-ঢাক
কলিঙ্গে উঠিল গণ্ডগোল॥
শত শত মত্ত হাতী লইলেন সেনাপতি
শুণ্ডে বান্ধে লোহার মুদ্গর।

* * *

আশী গণ্ডা বাজে ঢোল তের কাহন সাজে কোল
করে ধরে তিন তিরকাঠি।
পরিধান পীতধড়ি মাথাতে জালের দড়ি
অঙ্গে সবে মাখে রাঙা মাটি॥
বাজন-নূপুর পায় বিবিধ পাইক ধায়
রায়বাঁশ ধরে খরশান।
সোণার টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ পুরে
বাঁশে বান্ধে চামর নিশান॥"

১। সুকুমার সেন, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী, ৩৩-৭ পৃঃ।
২। প্রথম ভাগ, ৩৮০-৮১ পৃঃ।

এই বর্ণনায় চারি ঘোড়ায় টানা রথের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই যুগের যুদ্ধে রথ ব্যবহার হইত, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। সম্ভবত এই বর্ণনায় রামায়ণ-মহাভারতের কিছু প্রভাব আছে। ঢাক, ঢোল, ভেরী, জগঝম্প, দামামা, রণশিঙ্গা, কাংস্য-করতাল, কাঁসি, ঘণ্টা, কাড়া প্রভৃতি বাদ্যের শব্দে রণক্ষেত্র মুখরিত হইত।

সমসাময়িক সাহিত্যে নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু সবগুলিই ব্যবহৃত হইত কিনা বলা কঠিন। শূল জাতীয়—'নেঞ্জা' (বর্তমান ল্যাজা), বর্শা, শক্তি বা শেল ; কুঠার জাতীয়—পরশু, ডাবুশ, পরশ্বধ, পট্টিশ ; মুগুর জাতীয়—ভূষণ্ডী, তোমর, মুদ্গর ; পাশ ও চক্রেরও উল্লেখ আছে। বাঙ্গালীর প্রধান অস্ত্র ছিল রায়বাঁশ, ধনুকবাণ, অসি বা খড়্গ এবং ঢাল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'টাকার' নামে অস্ত্রের উল্লেখ আছে। ইহা ঠিক কোন্ জাতীয়, তাহা বলা যায় না।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ শেষ হইবার পূর্বেই বাংলা দেশে যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র—কামান, বন্দুক ব্যবহৃত হইত। তখনও উত্তর-ভারতের অন্য কোন অঞ্চলে ইহা প্রচলিত হয় নাই।

যুদ্ধপ্রসঙ্গে মাধবাচার্যের চণ্ডীকাব্যের[১] নিম্নলিখিত অংশটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য

"পলাইল যোগী পাইক মনে ভয় পায়্যা।
সমরে রহিল কাটামুণ্ড শিরে দিয়া॥
কর্মকার পাইক বলে করিয়া বিনয়।
বীর গুরু বধিতে তোমার ধর্ম নয়॥
নট পাইক বলে বাপু আমি পাইক নহি।
বেগার ধরি আনিছে পরের ভার বহি॥
পলায় বিশ্বাস পাইক ভয় ত্রাস পায়্যা।
আকুল হইয়া কান্দে মুখে হাত দিয়া॥
যতেক ব্রাহ্মণ পাইক পৈতা ধরি করে।
দন্তে তৃণ ধরি তারা সন্ধ্যা মন্ত্র পড়ে॥
যত যত যোগী পাইক দণ্ড ধরি করে।
রক্ষ রক্ষ বলি তারা বিনয় ত করে॥"

ইহা হইতে অনুমিত হয় যে ব্রাহ্মণাদি সমস্ত জাতির লোকই সৈনিকের কার্য করিত (অথবা করিতে বাধ্য হইত)। কিন্তু সে যুগে (এবং এ যুগেও) যে ডোম

১। ৮২ পৃঃ। বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় পৃঃ ৩২৭

বাগদিরা সমাজের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থিত এবং অবহেলিত, তাহারা যে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিত উচ্চশ্রেণীর বাঙালীরা তাহা পারে নাই। অন্নদামঙ্গলে বর্ধমানের গড়ের যে বর্ণনা আছে তাহাতে ইউরোপীয়, মোগল, পাঠান, ক্ষত্রিয়, রাজপুত, বুন্দেলা প্রভৃতি বিদেশী সৈন্যের কথা আছে কিন্তু বাঙালী হিন্দু সৈন্যের কোন উল্লেখ নাই। ইহাও প্রকারান্তরে উক্ত মতের সমর্থন করে। অবশ্য অন্য প্রমাণের সমর্থন ব্যতীত এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ মুসলমানদের ঐতিহাসিক গ্রন্থে বাঙালী পাইকের সাহস, বীরত্ব ও সমরকৌশলের ভূয়সী প্রশংসা আছে। আর বাঙালী পাইকের মধ্যে যে উচ্চশ্রেণীয় ছিল না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে রণতরীর খুব ব্যবহার ছিল এবং নৌযুদ্ধে বাঙালীদের সহিত দিল্লীর ফৌজ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

(জ) বিবিধ

মধ্যযুগে সাধারণ লোকের মধ্যে বহু কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। মন্ত্র বা ঔষধ দ্বারা উচাটন, বশীকরণ, বন্ধ্যার সন্তানলাভ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

জ্যোতিষ-গণনার প্রতি লোকের অগাধ বিশ্বাস ছিল। শিশুর জন্ম হইবার পরই গণক ডাকাইয়া কোষ্ঠী তৈরী করা হইত। যাত্রা, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে শুভদিন দেখিতে হইত। তবে কেহ কেহ ইহা মানিতেন না। ধনপতির বাণিজ্য যাত্রার সময় দৈবজ্ঞ রাশিচক্র গণনা করিয়া এবং পঞ্জিকা দেখিয়া বলিল :—

"এমন যাত্রীর সাধু শুন অভিসন্ধি।
এ যাত্রায় লোক গেলে তথা হয় বন্দী॥
এমন শুনিয়া সাধু মুখ কৈল বাঁকা।
নফরে হুকুম দিয়া মারে ঘাড়ধাক্কা॥" [১]

বলা বাহুল্য গণকের গণনা পুরাপুরিই ফলিয়াছিল এবং এই কাহিনী শুনিয়া জ্যোতিষ-গণনার প্রতি লোকের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছিল। ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র, তুক-তাকে লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। ওঝা মন্ত্র পড়িয়া ভূত ছাড়াইত, ব্যারাম-পীড়া সারাইত।

গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া জাতকের মৃত্যু পর্যন্ত যে সব লৌকিক আচার-

১। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, ২য় ভাগ, ৩১৯ পৃঃ।

অনুষ্ঠান এখনও রক্ষণশীল সমাজে প্রচলিত আছে, মধ্যযুগের সাহিত্যে তাহার প্রায় সবগুলিরই উল্লেখ আছে। ধনপতি ও খুল্লনার বিবাহ, অন্তঃসত্ত্বা কালে খুল্লনার অবস্থা ও আনুষঙ্গিক সাধভক্ষণাদির অনুষ্ঠান, তাহার পুত্রের জন্ম ও পরবর্তী অনুষ্ঠান, পুত্রের ষষ্ঠী, আটকলাই, নামকরণ, ঘুম-পাড়ানী গান, শ্রীমন্তের বাল্যক্রীড়া, কর্ণবেধ, বিদ্যারম্ভ, উচ্চ শিক্ষা, ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ণনা পড়িতে পড়িতে মনে হয় মধ্যযুগের বাঙালীর সংস্কার ও লৌকিক আচারের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই।

সেকালে লোকের পশুপক্ষী পালিবার খুব সখ ছিল। রাজা গোবিন্দচন্দ্র যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন তখন তাঁহার পোষা পাখী, গরু, হাতী ও কুকুর আর্তনাদ করিয়া উঠিল। "নও বুড়ি কুত্তা কান্দে চরণেত পড়িয়া"। অর্থাৎ তাঁহার ১৮০টি পোষা কুকুর ছিল। লোকে পোষা পাখীর পায়ে নূপুর লাগাইত ও অনেক খরচ করিয়া পাখীর খাঁচা নির্মাণ করিত।

ধনী বিলাসীদের গৃহে বহু আসবাবের বর্ণনা পাওয়া যায়। স্বর্ণরৌপ্যখচিত পালঙ্ক, মশারি, শীতলপাটি, কম্বল, গালিচা, আয়না, স্বর্ণখচিত দোলা, রথ বা শকট, শামিয়ানা, নানাপ্রকার চামর ও পাখা, গজদন্ত নির্মিত পাশা, সোনার পিঁড়ি, প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

বাংলা দেশে জিনিসপত্র খুব সস্তা হওয়ায় বহু বিদেশী এখানে বসবাস করিত। সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে বার্নিয়ার লিখিয়াছেন যে এই কারণে "ওলন্দাজ কর্তৃক বিতাড়িত বহু পর্তুগীজ ও ট্যাঁস ফিরিঙ্গী (halfcaste) এই দেশে আশ্রয় লয়। এ দেশে অনেক গীর্জা আছে এবং এক হুগলী (Hogouli) সহরেই প্রায় আট নয় হাজার খ্রীষ্টান বাস করে। ইহা ছাড়া আরও পঁচিশ হাজার খ্রীষ্টান এ দেশে বাস করে। এই দেশের ঐশ্বর্য, জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য ও এদেশের মেয়েদের মধুর স্বভাবের ফলে ইংরেজ, পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে একটি প্রবাদ-বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে যে "বাংলা দেশে শতশত প্রবেশের দ্বার আছে কিন্তু বাহিরে যাইবার একটিও পথ নাই।" এই সমুদয় বিদেশীদের প্রভাবে বাংলা দেশে যে সকল নূতন খাদ্য, পানীয়, কৃষিজাত দ্রব্য, আসবাবপত্র ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের প্রচলন হইয়াছে তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

রাল্‌ফ্‌ ফিচ কুচবিহারে ছাগল, মেষ, কুকুর, বিড়াল, পাখী ও অন্যান্য জীব-জন্তুর জন্য আরোগ্যশালা (হাসপাতাল) ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(ঝ) বাঙালীর নীতি ও চরিত্র

মধ্যযুগে বাঙালীর নীতি ও চরিত্র সম্বন্ধে বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা পরস্পর-বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। জোয়ানেস্ ডি লায়েট (Joannes De Laet) বলিয়াছেন (১৬৩০ খ্রীঃ) যে 'তাহারা খুব চতুর চালাক কিন্তু স্বভাব চরিত্র খুবই খারাপ; পুরুষেরা চুরি ডাকাতি করে, স্ত্রীলোক লজ্জাহীনা ও অসতী।' সপ্তদশ শতকে শুটেন (Gautier Schouten) বলেন যে লাম্পট্য ও দুর্নীতি ভারতের সর্বত্রই আছে তবে বাংলাদেশে অন্য প্রদেশ হইতে বেশী। মানরিক (Sebastiao Manrique) লিখিয়াছেন (১৬২৮ খ্রীঃ) যে—বাঙালীরা ভীরু ও উদ্যমহীন, পরের পা চাটিতে অভ্যস্ত। তাহাদের মধ্যে একটি ছড়া প্রচলিত আছে 'মারে ঠাকুর না মারে কুকুর'—অর্থাৎ যে প্রহার করিতে পারে তাহাকে ঠাকুরের মত মান্য করিব আর যে না মারে তাহাকে কুকুরের মত ঘৃণা করিব। এই ছড়াটির মধ্য দিয়াই তাহাদের স্বভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অপর দিকে চীনাদের বিবরণে (পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে) বাঙালীর সততার ও দয়া-দাক্ষিণ্যের উচ্চ প্রশংসা আছে। তাহারা কোন চুক্তি করিলে তাহা ভঙ্গ করে না এমন কি দশ হাজার মুদ্রার চুক্তি করিলেও তাহারা কাহাকেও ঠকায় না এবং নিজের গ্রামের দুঃস্থ লোকদিগকে নিজেরাই পোষণ করে, সাহায্যের জন্য অন্য গ্রামে যাইতে দেয় না।[১] তবে চীনাদের বাঙালী সমাজের সম্বন্ধে জ্ঞান খুব বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ তাহারা লিখিয়াছে যে এদেশে হিন্দুদের মধ্যে স্বামী মরিলে স্ত্রীলোক এবং স্ত্রী মরিলে স্বামী আর দ্বিতীয়-বার বিবাহ করে না। ইউরোপীয় বিদেশীদের কথা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। অসম্ভব নহে যে পঞ্চদশ শতকের তুলনায় সপ্তদশ শতকে বাঙালী চরিত্রের অবনতি হইয়াছিল। কিন্তু দুর্নীতি ও ধূর্ততা বিষয়ে ইউরোপীয় লেখকেরা যে খুব অতিরঞ্জিত করেন নাই, উনবিংশ শতকের বাঙালী চরিত্র তাহা অনেকটা সমর্থন করে। মুকুন্দরাম বর্ণিত ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র বাঙালী সমাজের একটি শ্রেণীর প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ধনী ও সম্ভ্রান্ত বাঙালীরা আহার, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে যে বিলাসিতার চূড়ান্ত করিতেন, নারীদেহ ভোগ, মদ্যপান ও অন্যান্য ব্যভিচারে খুবই আসক্ত ছিলেন, এবং ইহা যে অস্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইত না তাহার

১। *Visva-bharati Annals*, I. p, 112, 113, 116.

যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গণিকাগৃহে গমন ও স্বগৃহে বাইজীর নৃত্যগীত ও অবাধ মদ্যপান, ধনী লোকের একটি বৈশিষ্ট্য বলিয়াই গণ্য হইত।

অশ্লীলতা ও নর-নারীর দৈহিক সম্ভোগ সম্বন্ধে যে আদর্শ বর্তমানে প্রচলিত, মধ্যযুগের আদর্শ তাহা হইতে অন্যরূপ ছিল বলিয়াই মনে হয়। ধর্মানুষ্ঠানের সহিত যে সকল অশ্লীল আচার ও আচরণ জড়িত ছিল, তান্ত্রিক ও সহজিয়া সম্প্রদায় এবং দুর্গাপূজার শবরোৎসব উপলক্ষে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এগুলি সে যুগের স্মৃতিশাস্ত্রে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে, অর্থাৎ মধ্যযুগের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, শৃঙ্গার রসের যে উৎকট বর্ণনা আছে, বর্তমান কালের আদর্শ অনুসারে তাহা সুরুচি ও নীতির দিক দিয়া সমাজের খুব অধঃপতিত অবস্থাই সূচিত করে। সুতরাং মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও যে নীতির আদর্শ খুব উচ্চ ছিল তাহা বলা যায় না। অবশ্য বর্তমান যুগের আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করিয়াই এই ভাল মন্দ স্থির করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন্ যুগের আদর্শ ভাল, তাহার বিচার বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

ইউরোপীয় লেখকেরা যে বাঙালীর ভীরুতার উল্লেখ করিয়াছেন উনবিংশ শতকের পটভূমিতে দেখিলে তাহা অস্বীকার করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। মধ্যযুগের ইতিহাসে বাঙালী সৈন্য যুদ্ধ করিয়াছে এবং সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, ইহার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্য হইতে এ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হইবে না যে সাধারণত হাড়ী, ডোম, বাগদী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাই পাইকের দলে ভর্তি হইয়া যুদ্ধ করিত। উচ্চতর শ্রেণীর হিন্দুগণ যে কিরূপ সাহসী ও সমরকুশল ছিল মাধবাচার্যের চণ্ডীকাব্য হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে[১] তাহাতেই তাহার বর্ণনা পাওয়া যাইবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালীদের যে সাহস ও সামরিক শক্তির যথেষ্ট অভাব ছিল তাহা মধ্যযুগের—অন্তত ইহার শেষভাগের—অবস্থা সূচিত করে।

মানরিক বাঙালীর ভীরুতা ও উদ্যমহীনতার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ইহারা দাসত্ব ও বন্দিজীবনে অভ্যস্ত। মধ্যযুগের বাঙালী হিন্দুরা যে সুলতানী ও মুঘল আমলে স্বাধীনতা লাভের বিশেষ কোন চেষ্টা করে নাই ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই

১। ৩২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

দুই শাসনের মধ্যবর্তী অরাজক অবস্থার সময়ে বাঙালী হিন্দু জমিদারেরা স্বীয় প্রতি-পত্তির জন্য লড়াই করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। এ বিষয়ে পাঠান জাতীয় মুসলমানেরা অনেক বেশী উদ্যম ও সাহস দেখাইয়াছিল। হিন্দুর মধ্যে রাজা সীতারাম রায় একমাত্র ব্যতিক্রম। সুপ্রতিষ্ঠিত মুঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধে তিনি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন। সমসাময়িক সাহিত্য ইহাই প্রমাণিত করে যে বাঙালী আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিত না। দৈব অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেই অভ্যস্ত ছিল।

কাজী যখন কীর্তন বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন তখন সাধারণ বাঙালীর ভীরুতা ও দুর্বলতা যেরূপ প্রকট হইয়াছিল চৈতন্য-ভাগবতে তাহার বর্ণনা আছে। স্বয়ং চৈতন্যদেবের আদর্শ এবং প্রচেষ্টাও যে কোন স্থায়ী ফল প্রসব করে নাই তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।[১] ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর এই মনোবৃত্তি উনবিংশ শতকের বাঙালীরাও উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিল।

টমাস্ বাউরী (১৬৬৯-৭৯) বাঙালী ব্রাহ্মণের মানসিক উৎকর্ষের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। যাঁহারা নব্যন্যায়ের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এ প্রশংসা ন্যায্যত তাঁহাদের প্রাপ্য। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে অন্যান্য অনেক বিষয়ে হীন হইলেও বাঙালী চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল জ্ঞানার্জনের স্পৃহা, এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই বিদ্যাশিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু বাঙালীর জ্ঞানের আদর্শ ছিল অতিশয় সীমাবদ্ধ। বিদেশীর নিকট হইতে নূতন নূতন জ্ঞানলাভের স্পৃহা তাহাদের মোটেই ছিল না, এবং ভারতের বাহিরে যে বিশাল জগৎ আছে তাহার সম্বন্ধে তাহারা কিছুই জানিত না। পঞ্চদশ শতকে একাধিক রাজদূত বাংলা হইতে চীনে গিয়াছিল এবং চীন হইতে বাংলায় আসিয়াছিল। কিন্তু চীন দেশের তুলনায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সম্বন্ধে বাঙালীর জ্ঞান খুব অল্পই ছিল। চীনদেশের তিনটি আবিষ্কার—মুদ্রণযন্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র ও চুম্বক-দিগ্‌দর্শন যন্ত্র—সভ্য জগতে যথাক্রমে শিক্ষা ও চিন্তার রাজ্যে, যুদ্ধে ও সমুদ্রযাত্রায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল; কিন্তু বাঙালীরা ইহার কোন সংবাদ রাখিত না। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্য জগতে নূতন নূতন চিন্তাধারার বিকাশ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতিসাধন হইয়াছিল কিন্তু বাংলাদেশে তথা ভারতে ইহার কোন প্রচার হয় নাই। যে সময়ে ইউরোপে নিউটন, লাইব্‌নিজ, বেকন প্রভৃতি

১। ২৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মানুষের প্রজ্ঞাশক্তি ও জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিতেছিলেন সেই সময় বাঙালীর মনীষা নব্যন্যায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে, বাঙালীর প্রজ্ঞা কোন্ তিথিতে কোন্ দিকে যাত্রা শুভ বা অশুভ এবং কোন্ ভোজ্য দ্রব্য বিধেয় বা নিষিদ্ধ তাহার নির্ণয়ে, এবং বাঙালীর ধর্মচিন্তা ও হৃদয়বৃত্তি স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়া প্রেমের আপেক্ষিক উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য ছয়মাস ব্যাপী তর্কযুদ্ধে নিয়োজিত ছিল।

৬। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সম্বন্ধ

মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান যে রাজনীতি, ধর্ম, ও সমাজের গুরুতর বৈষম্যের জন্য দুইটি পৃথক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছিল তাহা এই অধ্যায়ের প্রথমেই বলা হইয়াছে। তথাপি ছয় শত বৎসর যাবৎ এই দুই সম্প্রদায় একত্র বা পাশাপাশি বাস করিয়াছে। সুতরাং এ দুইয়ের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা জানিবার জন্য স্বতই ঔৎসুক্য হয়। বিশেষত, যদিও এ বিষয়ে নিরপেক্ষ বিচারসহ তথ্য খুব কমই আমরা জানি, তথাপি কল্পনার দ্বারা এই অভাব পূরণ করিয়া অনেকেই ইহাদের মধ্যে একটি বিশেষ সৌহার্দ্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বভাবের চিত্র আঁকিয়াছেন। ইতিহাসে এই সকল অবাস্তব ভাব-প্রবণতার স্থান নাই। সুতরাং এই দুই সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি আচরণের যে কয়েকটি গুরুতর ও প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় তাহার উল্লেখ করিতেছি।

ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্রের নায়ক একই এবং উভয়ই শাস্ত্রের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই শাস্ত্রমতে মুসলমান রাজ্যে কাফের হিন্দুদের কোন স্থান নাই; ইহারা জিম্মি অর্থাৎ আশ্রিতের ন্যায় জীবনযাপন করিবে এবং নাগরিকের প্রধান প্রধান অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবে। কুড়ি পঁচিশ দফায় ইহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মাত্র তিনটির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

১। হিন্দুদিগকে নিজের জন্মভূমিতে বাস করিতে হইলে বিনীতভাবে মাথা পিছু একটি কর দিতে হইবে—ইহার নাম জিজিয়া।

২। হিন্দুরা দেবদেবীর মূর্তির জন্য কোন মন্দির নির্মাণ করিতে পারিবে না। কার্যত ইহার ব্যাপক অর্থ দাঁড়াইয়াছিল যে, যে সকল মন্দির আছে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলাও পুণ্যের কাজ।

৩। যদি কোন অমুসলমান ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয় তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারিবে না, কিন্তু যদি কেহ কোন মুসলমানকে অন্য ধর্মে দীক্ষিত করে তাহা হইলে যে কোন মুসলমান ঐ দুই জনকেই স্বহস্তে বধ করিতে পারিবে।

ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম—এইরূপ বিশ্বাস হইতেই এই সমুদয় বিধির প্রবর্তন হইয়াছে। মধ্যযুগ পৃথিবীতে ধর্মান্ধতার যুগ। হিন্দু সমাজের অনেক কদাচার, নিষ্ঠুরতা, অবিচার ও অত্যাচার এই ধর্মান্ধতারই ফল। সুতরাং আশ্চর্য বোধ করার কিছুই নাই।

উক্ত মৌলিক তিনটি নীতিই যে ভারতের অন্য স্থানের ন্যায় বাংলাদেশের মুসলমানেরা অনুসরণ করিত তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

বর্তমান যুগে এক সম্প্রদায়ের হিন্দু প্রচার করিয়াছেন যে ইংরেজ শাসনের পূর্বে ভারত কখনও পরাধীন হয় নাই, কারণ মুসলমানেরা এদেশেই বসবাস করিত। এ যুক্তির অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে অষ্ট্রেলিয়ার মাওরি জাতি এবং আমেরিকার 'রেড ইণ্ডিয়ান' অর্থাৎ আদিম অধিবাসীরা ধ্বংস হইয়াছে বটে কিন্তু কখনও পরাধীন হয় নাই, কারণ ইংরেজ শাসকেরা তাহাদের দেশেই বাস করিত। এ সম্বন্ধে ইহাও বলা আবশ্যক যে সুদীর্ঘ ছয় শত বৎসরের মধ্যে মাত্র একজন হিন্দু রাজা—গণেশ—গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু বাংলার মুসলমানেরা জৌনপুরের মুসলমান সুলতানকে এই কাফেরকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। তাহার ফলে গণেশ সিংহাসনচ্যুত হন এবং তাঁহার পুত্র ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করিয়া রাজসিংহাসন অধিকারে রাখিতে সমর্থ হন।

কিন্তু হিন্দু রাজা হওয়া তো দূরের কথা ইহার সম্ভাবনামাত্রও মুসলমান সুলতানকে বিচলিত করিত। গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে নবদ্বীপে এইরূপ একটি ভবিষ্যদ্বাণীর প্রচার হওয়ায় সুলতানের আজ্ঞায় নবদ্বীপে যে কি ভীষণ অত্যাচার হইয়াছিল তাহা প্রায়-সমসাময়িক গ্রন্থ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বর্ণিত আছে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুর প্রতি সদ্ব্যবহারের প্রমাণস্বরূপ হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগের কথা অনেকেই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম দুইশত বৎসর সুলতানী রাজত্বের ইতিহাসে এইরূপ নিয়োগের কোন উল্লেখ নাই। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, রাজদরবারে বিরোধী মুসলমানদিগকে দমাইয়া রাখিবার জন্য হিন্দু-দিগকে উচ্চপদে নিয়োগ করা হইত। যে কারণেই হউক গিয়াসুদ্দীন আজম

শাহই (১৩৯০-১৪১০) প্রথমে হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করেন। কিন্তু ইহাতে মুসলমান সমাজ বিচলিত হইল। সুফী দরবেশ হজরৎ মৌলানা মুজফ্ফর শাম্‌স্ বলখি সুলতানকে চিঠি লিখিলেন যে এইরূপ নিয়োগ ধর্মশাস্ত্রের বিধি-বিরুদ্ধ। কাফেরদিগকে ছোটখাট কাজ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে কাজে মুসলমানদের উপর কর্তৃত্বের অধিকার জন্মে তাহা কদাচ হিন্দুকে দেওয়া উচিত নহে; কারণ, ইহার বিরুদ্ধে কোরান, হদিস ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের স্পষ্ট নির্দেশ আছে। সুলতানদের উপর সুফীদের খুব প্রভাব ছিল। সুতরাং চিঠিতে ফল হইল। ইহার অব্যবহিত পরে যে চীনা রাজদূতেরা বাংলায় আসিল, তাহারা লিখিয়াছে যে "সুলতান ও ছোট বড় অমাত্যেরা সকলেই মুসলমান।"

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে যিনি রাজা গণেশের বিরুদ্ধে জৌনপুরের সুলতানকে বাংলায় অভিযান করার জন্য আমন্ত্রণ করেন তিনিও সুফী দরবেশদের নেতা ছিলেন। যাঁহারা সুফীদিগকে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রীতি-সম্বন্ধের সেতু নির্মাণকারী বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের এই দুইটি ঘটনা স্মরণ রাখা আবশ্যক। অষ্টাদশ শতকে কি কারণে মুর্শিদকুলি খান ও আলিবর্দী হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন অন্যত্র তাহা আলোচিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় ছয় শত বৎসরে কত জন হিন্দু উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং কয়জন সুলতান এরূপ উদারতা দেখাইয়াছিলেন তাহা হিসাব করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে তর্কের মীমাংসা হইবে।

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ, হিন্দু পণ্ডিত ও কবিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি কার্য সকল সময়েই হিন্দুর প্রতি প্রীতি বা সহৃদয়তার পরিচায়ক নহে। কারণ যে স্বল্পসংখ্যক মুসলমান সুলতান এই সমুদয় কার্যের জন্য প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন—জলালুদ্দীন, বারবক শাহ, হোসেন শাহ প্রভৃতি—তাঁহারাও মন্দির ধ্বংস ও অন্যান্য প্রকারে হিন্দুদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছেন। মুর্শিদকুলি খান এবং আলিবর্দীও ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

মধ্যযুগে হিন্দুদের ছিল ধর্মগত প্রাণ, এবং সমাজও ধর্মের অঙ্গরূপেই বিবেচিত হইত। সুতরাং এই দুইয়ের উপর অত্যাচারই হিন্দুদের মর্মান্তিক ক্লেশ ও বিদ্বেষের কারণ হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। হিন্দুদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল দেব-দেবীর মূর্তি গড়িয়া মন্দিরে পূজা করা। কিন্তু বাংলার সুলতানী আমলে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার উপকরণ দ্বারা মস্‌জিদ তৈরী করা অতি

স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। ত্রয়োদশ শতকে জাফর খাঁ গাজী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদ কুলী খাঁ হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ তৈরী করিয়াছিলেন।[১] এইরূপে বাংলার প্রাচীন মন্দির প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে এবং শত শত দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস হইয়াছে। বহু মসজিদের সংস্কারকালে এগুলির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার ফলে নূতন মন্দির নির্মাণও প্রায় বন্ধ হইয়াছিল। উদারমতি আকবর বাদশাহের বাংলা অধিকারের পূর্বে প্রায় চারিশত বৎসর ব্যাপী সুলতানী আমলে বাংলায় যে কয়টি হিন্দু মন্দির নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া নিশ্চিত জানা যায় তাহার সংখ্যা হাতের আঙ্গুলে গোণা যায়। আকবরের পরবর্তী যুগে আবার প্রাচীন ধ্বংসলীলা আরম্ভ হয় এবং ঔরংজেবের সময় ইহা চরমে ওঠে।

কিন্তু কেবল মন্দির ধ্বংস নহে, হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠানেও মুসলমানেরা বাধা দিত। নবদ্বীপে কাজীর আদেশে কীর্তন করা বন্ধ হইয়াছিল। পথে যাইতে যাইতে কাজী শুনিলেন যে গৃহমধ্যে বাদ্য-সহযোগে কীর্তন হইতেছে—ইহাতে কুপিত হইয়া

"যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে॥
কাজি বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিব ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া॥"[২]

চৈতন্যদেব কি করিয়া কাজীকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।[৩]

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে[৪] (পঞ্চদশ শতাব্দী) হিন্দুর প্রতি মুসলমান কর্মচারীর অকথ্য অত্যাচারের বর্ণনা আছে।

"যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ॥
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্র কিল।
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল॥

* * *

১। Dr. A. H. Dani, Muslim Architecture in Bengal pp. 39-44, 275. Pl. III.

২। চৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড, ২৩শ অধ্যায়।

৩। ২৭৪-৫ পৃষ্ঠা।

৪। ৫৪-৫৬ পৃষ্ঠা।

ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুতু দেয় মুখে।"

রাখাল বালকেরা ঘট পাতিয়া মনসা পূজা করিতেছিল, তাহাদের প্রতি অকথ্য নিষ্ঠুর অত্যাচার হইল। ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিল, যে কুম্ভকার ঘট গড়াইয়াছিল, তাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল। এই প্রসঙ্গে কাজীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য :—

"হারামজাত হিন্দুর এত বড় প্রাণ।
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান ॥
গোটে গোটে ধরিব গিয়া যতেক ছেমরা।
এড়া রুটি খাওয়াইয়া করিব জাতি মারা ॥"

এইভাবে "জাতি মারা"ই বাংলায় মুসলমান বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয়। ইহার মুখবন্ধে আছে, 'দুরাত্মা' নবাব আলিবর্দী খান উড়িষ্যায় হিন্দুধর্মের প্রতি 'দৌরাত্ম্য' করায় নন্দী ক্রুদ্ধ হইয়া

"মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল।
করিব যবন সব সমূল নির্ম্মূল ॥"

তখন শিব তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন—যে সাতারায় বর্গীর (মহারাষ্ট্র) রাজাই নবাবকে দমন করিবেন।[১] অন্যত্র কবি দেবী অন্নদার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, মুসলমানেরা

"যতেক বেদের মত, সকলি করিল হত, নাহি মানে আগম পুরাণ।
মিছা মালা ছিলি মিলি, মিছা জপে ইলি মিলি, মিছা পড়ে কলমা কোরাণ ॥
যত দেবতার মঠ, ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ, নানা মতে করে অনাচার।
বামণ পণ্ডিত পায় থুথু দেয় তার গায়, পৈতা ছেঁড়ে ফোঁটা মোছে আর ॥"[২]

এই কাব্যের মধ্যেই আছে যে সেনাপতি মানসিংহ যখন প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন তখন ভবানন্দ মজুমদার রসদ দিয়া মোগল সৈন্যের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং ইহার পুরস্কারস্বরূপ তিনি প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ভবানন্দকে দিবার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরকে অনুরোধ করেন। ইহাতে কুপিত হইয়া জাহাঙ্গীর হিন্দুধর্মের অশেষ নিন্দা করিলেন এবং বলিলেন :—

১। প্রথম ভাগ—১৩ পৃষ্ঠা।
২ দ্বিতীয় ভাগ—১৯৩ পৃষ্ঠা।

"দেহ জলি যায় মোর বামন দেখিয়া।
বামনেরে রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া॥"

মুসলমান ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তিনি সখেদে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন:

"হায় হায় আখেরে কি হইবে হিন্দুর"

এবং মনের গুপ্ত বাসনা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন:

"আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।
সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই॥"[১]

এই কথোপকথন যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মুসলমান রাজত্ব অবসানের পাঁচ বৎসর পূর্বেও হিন্দুর প্রতি মুসলমানের মনোভাব সম্বন্ধে বাঙালী হিন্দুর কি ধারণা ছিল অন্নদামঙ্গলের উক্তি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বখতিয়ার খিলজী হইতে আলিবর্দী খানের রাজত্ব পর্যন্ত যে হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ বা মনোবৃত্তির মৌলিক বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই, অন্নদামঙ্গল তাহার সাক্ষ্য দেয়।

ধর্মের দিক দিয়া যেমন মন্দিরে দেবদেবীর মূর্তিপূজা, সমাজের দিক দিয়া তেমনি স্ত্রীলোকের শুচিতা ও সতীত্ব রক্ষা হিন্দুরা জীবনযাত্রায় প্রধান স্থান দিত। এদিক দিয়াও মুসলমানেরা হিন্দুদের প্রাণে মর্মান্তিক আঘাত দিয়াছে। ৺দীনেশচন্দ্র সেন হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির সম্বন্ধ উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও লিখিয়াছেন, "মুসলমান রাজা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ 'সিন্ধুকী' (গুপ্তচর) লাগাইয়া ক্রমাগত সুন্দরী হিন্দু ললনাগণকে অপহরণ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ময়মনসিংহের জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানগণ এবং শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানেরা এইরূপ যে কত হিন্দু রমণীকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছেন তাহার অবধি নাই। পল্লীগীতিকাগুলিতে সেই সকল করুণ কাহিনী বিবৃত আছে।"[২] পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যেও এই প্রকার বলপূর্বক হিন্দু নারীর সতীত্ব নাশের উল্লেখ আছে।

৺সেন মহাশয়ের মতে এই প্রকার অপহরণের ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ হইয়া তাহাদের মধ্যে "যেরূপ মেশামেশি হইয়াছিল, বোধ হয় ভারতের আর কোনও দেশে তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই।" বিংশ শতাব্দীতে ৺সেন

১। দ্বিতীয় ভাগ—১৮৮ পৃষ্ঠা।

২। বৃহৎ বঙ্গ—৬৫৩ পৃষ্ঠা।

মহাশয় এই "মেশামিশি" যে চোখে দেখিয়াছেন মধ্যযুগের হিন্দুরা ঠিক সে ভাবে দেখে নাই। ইহা তাহাদের মর্মান্তিক দুঃখের কারণ হইয়াছিল এবং ৺সেন মহাশয় এই সমুদয় কাহিনীকে 'করুণ' আখ্যা দিয়া তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন।

মধ্যযুগে রাজনীতিক অধিকার, ধর্মানুষ্ঠান ও সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা বিষয়ে আঘাতের পর আঘাত পাইয়া হিন্দুর যে অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক তাহা মুসলমানদের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের অনুকূল নহে। এ বিষয়ে হিন্দু সাহিত্য হইতে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাও এই অনুমানের পোষকতা করে। সুলতান হোসেন শাহ হিন্দুদিগের প্রতি উদারতার জন্য বর্তমান কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কালেই নবদ্বীপে উল্লিখিত কাজীর অত্যাচার ঘটিয়াছিল এবং বিজয় গুপ্তও তাঁহার সমসাময়িক। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে তাঁহার বাল্যকালের প্রভু এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কার্যে অবহেলার জন্য বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন এইজন্য সুলতান হইয়া তিনি মুসলমান-স্পৃষ্ট জল খাওয়াইয়া তাঁহার জাতি নষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি চৈতন্যদেবের জনপ্রিয়তা দেখিয়া কর্মচারীদিগকে বলিয়াছিলেন যেন তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার না হয়। কিন্তু তাঁহার হিন্দু কর্মচারীরা তাঁহার হিন্দু-বিদ্বেষ সম্বন্ধে জানিতেন সুতরাং তাঁহার কথায় আশ্বাস না পাইয়া গোপনে চৈতন্যকে সংবাদ পাঠাইলেন যেন তিনি অবিলম্বে হোসেন শাহের রাজধানী হইতে দূরে প্রস্থান করেন।[১] হোসেন শাহের মন্ত্রী সনাতন উড়িষ্যার বিরুদ্ধে অভিযানের সময় প্রভুর আদেশ সত্ত্বেও তাঁহার সঙ্গে যান নাই, কারণ তিনি দেবমূর্তি ধ্বংস করিবেন। এই অপরাধে হোসেন শাহ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রীই তাঁহার ভ্রাতা রূপকে সঙ্গে লইয়া গোপনে চৈতন্যের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে রাজধানীর নিকট হইতে দূরে যাইতে বলিয়াছিলেন। এই সাক্ষাতের সময় দুই ভ্রাতা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে 'গো-ব্রাহ্মণদ্রোহী ম্লেচ্ছের অধীনে কার্য করিয়া' তাঁহারা নিজেদের "অধম পতিত পাপী" বলিয়া মনে করেন।[২] 'উদার-হৃদয়' হোসেন শাহের প্রতি সমসাময়িক হিন্দুর মনোভাব যে বিংশ শতাব্দীর হিন্দুদের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে এই সুলতানের বা তাঁহার অনুচরদের প্রসাদপুষ্ট কবিগণ তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। যশোরাজ খান নামক কবি তাঁহাকে 'জগত ভূষণ' এবং

১। চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।

২। চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহাকে 'কলিযুগের কৃষ্ণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হোসেন শাহের স্বরূপ বর্ণনা মনে না করিয়া মধ্যযুগের বাঙালী কবির দীর্ঘ-দাসত্ব-জনিত নৈতিক অধঃপতনের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করাই অধিকতর সঙ্গত। কারণ মধ্যযুগের শেষে যখন ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস বিলাতের পার্লামেন্টে ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচারের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তখন কাশী-বাসী বাঙালী পণ্ডিতেরা তাঁহাকে এক প্রশস্তিপত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে অর্থের প্রতি হেষ্টিংসের কোন লোভ ছিল না এবং তিনি কখনও কাহারও কোন অনিষ্ট করেন নাই। অথচ এই হেষ্টিংসই উক্ত পণ্ডিতদের জীবদ্দশায় অর্থের লোভে কাশীর রাজা চৈৎসিংহের ও অযোধ্যার বেগমদের সর্বনাশ করিয়াছিলেন এবং অনেকের মতে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির জন্য প্রধানত তিনিই দায়ী। সুতরাং মধ্যযুগে কবির মুখে রাজার স্তুতির প্রকৃত মূল্য কতটুকু তাহা সহজেই অনুমেয়।

মুসলমানদের ধর্মের গোঁড়ামি যেমন হিন্দুদিগকে তাহাদের প্রতি বিমুখ করিয়াছিল, হিন্দুদের সামাজিক গোঁড়ামিও মুসলমানগণকে তাহাদের প্রতি সেইরূপ বিমুখ করিয়াছিল। হিন্দুরা মুসলমানদিগকে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ যবন বলিয়া ঘৃণা করিত, তাহাদের সহিত কোন প্রকার সামাজিক বন্ধন রাখিত না। গৃহের অভ্যন্তরে তাহাদের প্রবেশ করিতে দিত না, তাহাদের স্পৃষ্ট কোন জিনিষ ব্যবহার করিত না। তৃষ্ণার্ত মুসলমান পথিক জল চাহিলে বাসন অপবিত্র হইবে বলিয়া তাহা দেয় নাই, ইব্‌ন্ বতুতা এরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সপক্ষে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া হিন্দুরা যেমন নিজেদের আচরণ সমর্থন করিত, মুসলমানরাও তেমনি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের সমর্থন করিত। বস্তুত উভয় পক্ষের আচরণের মূল কারণ একই—যুক্তি ও বিচার নিরপেক্ষ ধর্মান্ধতা। কিন্তু ন্যায্য হউক বা অন্যায্য হউক পরস্পরের প্রতি এরূপ আচরণ যে উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের দুস্তর বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেক দিন যাবৎ অভ্যস্ত হইলে অত্যাচারও গা-সহা হইয়া যায়, যেমন সতীদাহ বা অন্যান্য নিষ্ঠুর প্রথাও হিন্দুর মনে এক সময়ে কোন বিকার আনিতে পারিত না। হিন্দু-মুসলমানও তেমনি এই সব সত্ত্বেও পাশাপাশি বাস করিয়াছে কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব তো দূরের কথা স্থায়ী প্রীতির বন্ধনও প্রকৃতরূপে স্থাপিত হয় নাই।

অনেকে ছোটখাট বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই সত্যকে অস্বীকার করেন। পূর্বোল্লিখিত 'কাজী দলন' প্রসঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতে[১] আছে যে যখন চৈতন্যের বহুসংখ্যক অনুচর তাহার গৃহ ধ্বংস করিল তখন কাজী চৈতন্যের সঙ্গে আপোষ করিবার জন্য বলিলেন :—

"গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥"

ইহার উপর নির্ভর করিয়া অনেকে মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য উদার সামাজিক প্রীতির সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এই কাজীই যখন শুনিলেন যে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া চৈতন্য কীর্তন করিতে বাহির হইয়াছিলেন তখন 'ভাগিনেয়' সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—

(নিমাই পণ্ডিত) "মোরে লঙ্ঘি হিন্দুয়ানি করে।
তবে জাতি নিমু আজি সবার নগরে॥"[২]

ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে এই "কাজী মামা" চৈতন্যের বাড়ীতে আসিলে যে আসনে বসিতেন তাহা গঙ্গাজল দিয়া ধুইয়া শোধন করিতে হইত, জল চাহিলে যে পাত্রে জল দেওয়া হইত তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অথবা শোধন করিতে হইত। খাদ্যের কোন প্রশ্নই উঠিত না। নিমাই পণ্ডিত 'কাজী মামার' বাড়ী গিয়া কিছু পান বা আহার করিলে জাতিচ্যুত হইতেন। ইহাতে আর যাহাই হউক মামা-ভাগিনেয়ের মধুর প্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না।

ক্রমে ক্রমে মুসলমান সমাজেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। মুসলমানেরা হিন্দুর ভাত খাইত না। কেহ হিন্দুর আচার অনুকরণ করিলে তাহাকে কঠোর শাস্তি পাইতে হইত। যবন হরিদাস বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিলে 'মুলুকের পতি' তাঁহাকে বলিলেন :—

"কত ভাগ্যে দেখ তুমি হঞাছ যবন।
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন॥

১। আদিলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদ।

২। চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২৩শ অধ্যায়।

আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশ-জাত॥" [১]

হরিদাসের প্রতি অতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হইল। হুকুম হইল বাইশ বাজারে নিয়া গিয়া কঠোর বেত্রাঘাতে হরিদাসকে হত্যা করিতে হইবে। চৈতন্য-ভাগবতের এই কাহিনী কিছু অতিরঞ্জিত হইলেও সে যুগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কাল্পনিক মধুর প্রীতি-সম্বন্ধের সমর্থন করে না।

এ সম্বন্ধে সমসাময়িক সাহিত্যে যে দুই একটি সাধারণ ভাবের উক্তি আছে তাহাও এই মতের সমর্থন করে না। বিখ্যাত মুসলমান কবি আলাওল বাংলায় কবিতা লিখিয়াছেন বলিয়া অনেকে তাঁহার কাব্যের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সূত্র খুঁজিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি নিঃসঙ্কোচে ইহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে হিন্দুর দেবতা মূর্খের দেবতা এবং ইসলামই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়।[২] অপরদিকে বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রেমবিলাসে মুসলিম শাসনকে সকল দুঃখের হেতু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অদ্বৈতপ্রকাশে মুসলমানদের আচার-ব্যবহারের নিন্দা করা হইয়াছে। জয়ানন্দের মতে ব্রাহ্মণদের পক্ষে মুসলমানদের আদব-কায়দা গ্রহণ কলিযুগের কলুষতারই একটী নিদর্শন মাত্র, ইত্যাদি।

হিন্দুরা যাহাতে মুসলমান সমাজের দিকে বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি দেখাইতে না পারে তাহার জন্য হিন্দু সমাজের নেতাগণ কঠোর হইতে কঠোরতর বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অনিচ্ছাকৃত সামান্য অপরাধেও হিন্দুরা সমাজে পতিত হইত। ইহার ফলে যে হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে এবং মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে তাহা হিন্দু সমাজপতিরা যে বুঝিতেন না তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা হিন্দুত্ব রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। ফলে বাংলা দেশে মুসলমানেরা হিন্দু অপেক্ষা সংখ্যায় বেশী হইয়াছে; কিন্তু হিন্দুর ধর্ম, সমাজ, ও সংস্কৃতি অক্ষত ও অবিকৃত আকারে অব্যাহতভাবে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে অনেকে ইহা স্বীকার করেন না, সুতরাং এ বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন।

১। ঐ, আদিখণ্ড, ১৪শ অধ্যায়।

২। T. K. Ray Chaudhuri, Bengal under Akbar and Jahangir, pp,142-3.

৬। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে আমাদের দেশে একটি মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে উভয়েই স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে। এবং এমন একটি নূতন সংস্কৃতি গঠিত হইয়াছে যাহা হিন্দু সংস্কৃতিও নহে, ইসলামীয় সংস্কৃতিও নহে—ভারতীয় সংস্কৃতি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি এবং শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ নায়কগণ ইহার ঠিক বিপরীত মতই পোষণ করিতেন, এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য এই বিপরীত মতেরই সমর্থন করে। হিন্দু রাজনীতিকেরাই এই নূতন মতের প্রবর্তক ও পৃষ্ঠপোষক। মুসলমান নায়কেরা ভারতে ইসলামীয় সংস্কৃতির পৃথক অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তির উপরই পাকিস্তান একটি ইসলামীয় রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মুসলমান বিজেতারা ভারতে আসিয়া যে নূতন সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হন, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য তাহাকে হিন্দু সংস্কৃতি বলেন। ইহার পূর্বে ভারতবাসী এবং ভারতে প্রচলিত ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি হিন্দু সংজ্ঞায় চিহ্নিত হয় নাই। সুতরাং আলোচ্য বিষয় এই যে ১২০০-১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে যে সংস্কৃতি ছিল ১৮০০ সালে মুসলমানের সহিত মিশ্রণের ফলে তাহার এমন কোন পরিবর্তন হইয়াছে কিনা যাহা ইহাকে একটি ভিন্ন রূপ ও বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। এই আলোচনার পূর্বে দুইটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, সকল প্রাণবন্ত সমাজেই স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে পরিবর্তন ঘটে। বাংলা দেশের মধ্যযুগের হিন্দুসমাজেও ঘটিয়াছে। কিন্তু এই পরিবর্তন কতটুকু ইসলামীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে ঘটিয়াছে বর্তমান ক্ষেত্রে কেবল তাহাই আমাদের বিবেচ্য।

দ্বিতীয়তঃ, দুই সম্প্রদায় একসঙ্গে বসবাস করিলে ছোটখাট বিষয়ে একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সংস্কৃতি অন্তরের জিনিষ—ইহার পরিচয় প্রধানতঃ ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক নীতি, আইনকানুন, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প ইত্যাদির মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং সংস্কৃতির পরিবর্তন বুঝিতে হইলে এই সমুদয় বিষয়ে কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহাই বুঝিতে হইবে।

হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক নীতিতে ইসলামীয় ধর্মের ও মুসলমান সমাজের প্রভাবে বিশেষ কোনই পরিবর্তন হয় নাই। জাতিভেদে জর্জরিত হিন্দু সমাজ

মুসলমান সমাজের সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা করে নাই। বহু কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও হিন্দু মূর্তিপূজা ও বহু দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস অটুট রাখিয়াছে। হিন্দু আইনকানুনকে নূতন স্মৃতিকারেরা কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন; কিন্তু তাহা সামাজিক প্রয়োজনে, ইসলামীয় আইনের কোন প্রভাব তাহাতে নাই।

বাংলা সাহিত্যে কতকগুলি আরবী ও ফার্সী শব্দের ব্যবহার ছাড়া আর কোন দিক দিয়া ইসলামীয় প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। একদল মুসলমান লেখক ফার্সী সাহিত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাংলায় রোমান্টিক সাহিত্যের আমদানি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু সাহিত্যিকেরা তাহা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া সাহিত্যকে ধর্মের বাহনরূপেই ব্যবহার করিয়াছেন।[১] বাংলাদেশে নব্য-ন্যায় ও দর্শনের অন্য কোন শাখার যে সমুদয় আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে এবং আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে ইসলামের কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।

মধ্যযুগে হিন্দু শিল্পের উপর মুসলমানের প্রভাব বিশেষ কিছুই নাই। যে সকল দোচালা বা চৌচালা মন্দিরের বিষয় ১৫শ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার গঠনপ্রণালী হিন্দুর নিজস্ব নয়, মুসলমানের নিকট হইতে প্রাপ্ত, এ বিশ্বাসের যে কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই তাহা সেখানে দেখান হইয়াছে। মন্দিরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোন অঙ্গে, যেমন ঢেউ-খেলান খিলানে, সম্ভবত মুসলমানের প্রভাব আছে। কিন্তু ইহা সংস্কৃতির পরিবর্তন সূচনা করে না।

কেহ কেহ মনে করেন যে, সুফী দরবেশরা যে উদার ধর্মমত প্রচার করেন, তাহাতে হিন্দু ধর্মমতের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। হিন্দুদের সম্বন্ধে সুফী দরবেশদের যে বিদ্বেষের ভাব ছিল তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহারা যে ধর্মমত প্রচার করিত তাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দুধর্মের প্রভাব ছিল। সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, সুফীদের প্রভাব যদি কিছু থাকে তবে তাহা আউল বাউল প্রভৃতি কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল।[২] স্বয়ং চৈতন্যদেব নানক, কবীরের ন্যায় যে উদার ভক্তিবাদ ও সামাজিক সাম্যবাদের প্রচার করিয়াছিলেন তাহাও শতবর্ষের মধ্যেই নিষ্ফল হইয়াছিল। বিরাট হিন্দুসমাজ পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্ররূপ বৃহৎ বনস্পতির

১। এনামুল হক ও আবদুল কবির, 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য', ৩৯ পৃষ্ঠা।

২। ২৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আশ্রয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র লতাপাতা চারিদিকে গজাইলেও বেশীদিন বাঁচে নাই এবং বিরাট হিন্দুসমাজের গায়েও কোন দাগই রাখিয়া যাইতে পারে নাই। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ যাহা ছিল আর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ যাহা হইয়াছিল এ দুইয়ের তুলনা করিলেই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। হিন্দু সাধুসন্ত ও সুফী দরবেশ, ফকীর প্রভৃতির মধ্যে ধর্মমতের উদারতা ও অপর ধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল তাহার ফল স্থায়ী বা ব্যাপক হয় নাই।

আরও যে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করা হয় তাহা অকিঞ্চিৎকর। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই উভয় সম্প্রদায়ের সাধুসন্ত পীর-ফকিরকে শ্রদ্ধা করিত। ইহা হইতে অনেকে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মের সমন্বয়ের কল্পনা করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে এইরূপ বিশ্বাসের কারণ ইহাদের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস। বিপদে পড়িলে লোকে নানা কাজ করে, সুতরাং আধিব্যাধি ও সমূহ বিপদ হইতে ত্রাণ বা ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশায় সাধারণ লোক অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সাধু ও পীরদের সাহায্য প্রার্থনা করিত এবং তাহাদের দরগায় শিরনি মানিত। ইহা মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ইহাতে ধর্মসমন্বয়ের কোন প্রশ্নই উঠে না। হিন্দুরা মুসলমান পীরকে ভক্তি করিত, কিন্তু গৃহের মধ্যে ঢুকিতে দিত না এবং তাহাদের স্পৃষ্ট পানীয় বা খাদ্য গ্রহণ করিত না। নবাব মীরজাফরের মৃত্যুশয্যায় নাকি তাঁহাকে কিরীটেশ্বরী দেবীর চরণামৃত পান করান হইয়াছিল। এই ঘটনাটিও হিন্দু-মুসলমানের মিলনচিহ্নস্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাঁচিয়া উঠিলে হয়ত তিনি ঐ দেবীর মন্দিরটিই ধ্বংস করিতেন। তাঁহার অনতিকাল পূর্বে নবাব মুর্শিদকুলী খান উহার নিকটবর্তী অনেক মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ইহা মীরজাফরের জীবিতকালেই ঘটিয়াছিল। মুসলমানেরা হোলি খেলিত এবং হিন্দুরা মহরমের শোভাযাত্রায় যোগ দিত, ইহা স্বাভাবিক কৌতূহলের ও আমোদ-উৎসবের প্রবৃত্তির পরিচয় দেয়। ইহাতে ধর্মমত পরিবর্তনের কোন চিহ্ন খুঁজিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আর কোটি কোটি মুসলমানদের মধ্যে একজন কি দুইজন হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিলে তাহা ব্যক্তিগত উদারতার পরিচয় হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান ধর্মের সমন্বয় সূচিত করে না। পূর্বে উল্লিখিত মুসলমান কর্তৃক হিন্দুর মন্দির ধ্বংস ও ধর্মানুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার অসংখ্য কাহিনী ও সমসাময়িক বর্ণনা সত্ত্বেও যাঁহারা ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সমন্বয়ের বা সম্প্রীতির প্রমাণ খুঁজিয়া বেড়ান, এই শ্রেণীর কতকগুলি দৃষ্টান্ত ছাড়া

তাঁহাদের অন্য কোন সম্বল নাই। সত্যপীরের পূজা তাঁহাদের ব্রহ্মাস্ত্র। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন যে সত্যপীরের পূজা হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের একটি বিশেষ নিদর্শন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে সত্যপীরের কাহিনী অনেকটা এক হইলেও এখন পর্যন্তও হিন্দুরা তাহাদের অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠানের ন্যায় সত্যনারায়ণকে পূজা করে আর মুসলমানেরা অন্যান্য পীরের ন্যায় সত্যপীরকে শিরনি দেয়। এই সম্বন্ধে যে লৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে তাহাতে বিশ্বাস করিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই বিপদ হইতে মুক্তি ও ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পূজা দিবে ইহা অস্বাভাবিক নহে। ধর্মসমন্বয় অর্থাৎ দুই ধর্মের মিশ্রণের ফলে নূতন ধর্মমতের প্রবর্তনের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। আজিকার দিনেও এমন বহু গোঁড়া হিন্দু পুরোহিত ডাকিয়া নিয়মিত সত্যনারায়ণের পূজা করেন, যাঁহারা মুসলমানের সঙ্গে কোন ধর্ম বা সামাজিক সম্বন্ধের কথা শুনিলে শিহরিয়া উঠিবেন। মধ্যযুগে যে হিন্দুদের মানসিক বৃত্তি ইহা অপেক্ষা উদার ছিল, এরূপ মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নাই।

প্রাচীনকালে অর্থাৎ ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে হিন্দুধর্মের যাহা মূল নীতি ছিল, অর্থাৎ দেবদেবীর মূর্তি পূজা ও তদানুষঙ্গিক অনুষ্ঠান, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে অচল বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাহায্যে শাস্ত্রের বিধান মত পূজাপার্বণ, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ, এবং ভগবান, পরলোক, জন্মান্তর, কর্মফল, অদৃষ্ট, স্বর্গ, নরক ইত্যাদিতে বিশ্বাস, দেবদ্বিজে ভক্তি ইত্যাদি, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ঠিক তাহাই ছিল। যদি কিছু যোগ বা পরিবর্তন হইয়া থাকে যেমন নূতন বৈষ্ণব মত, সহজিয়া মত ও নূতন লৌকিক দেবতার পূজা, ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি—তাহাও কালের পরিবর্তনেই হইয়াছে, ইসলামের প্রভাবে নহে। হিন্দুসমাজ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। হিন্দু সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য—কঠোর জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা, স্ত্রীলোকের বাল্যবিবাহ, বিধবা-বিবাহ নিষেধ, বাল-বিধবার দুর্দশা ও কঠোর জীবনযাত্রা, কৌলীন্যপ্রথা, সতীদাহ, স্বামীর সম্পত্তিতে অনধিকার—সকলই পূর্ববৎ ছিল। এই সকল দোষত্রুটি মুসলমান সমাজে ছিল না এবং প্রতিবেশী মুসলমানদের দৃষ্টান্তে এইগুলির অনৌচিত্য ও অপকারিতা হিন্দুর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে, ইহাই স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু কার্যতঃ তাহা হয় নাই। অপরদিকে সর্ব ধর্মই যে সত্য এবং মুক্তির সোপান, হিন্দুর এই উদার ধর্মমত মুসলমান গ্রহণ করে নাই।

ভক্ষ্য, পানীয়, ভোজনপ্রণালী, বিবাহাদি লৌকিক সংস্কার ও অনুষ্ঠান বিষয়ে হিন্দুর উপর মুসলমানের বিশেষ কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। যাঁহারা দরবারে যাইতেন তাঁহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ কতকটা মুসলমানী ধরনের ছিল, কিন্তু বাংলাদেশের বিরাট হিন্দু সমাজে ইহার প্রভাব স্থান ও সংখ্যায় খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃত সংস্কৃতির সহিত ইহার সম্বন্ধ এতই ক্ষীণ যে ইংরেজেরা এদেশে আসিবার পর মুসলমানী পোষাকের বদলে বিলাতী পোষাকেরই চল হইল। আজ বাঙালী হিন্দুদের পোষাকের মধ্যে মুসলমানী প্রভাব বিশেষ কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। হিন্দুর উপর মুসলমানের অনেক ছোটখাট প্রভাব হিন্দুরা এই পোষাকের ন্যায়ই ত্যাগ করিয়াছে। আজ আর তাহার চিহ্ন নাই। কারণ সেগুলি সংস্কৃতি নহে, তাহার বহিরাবরণ মাত্র। কিন্তু যদিও হিন্দুরা মুসলমানদের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে, মুসলমানেরা যে হিন্দুর প্রভাব এড়াইতে পারে নাই তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ বাঙালী মুসলমানদের অনেকেই ধর্মান্তরিত হিন্দু বা তাহাদের বংশধর। সুতরাং হিন্দুর ধর্ম ও সামাজিক সংস্কার তাহারা একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই এবং তাহাদের সঙ্গে ইহার কতকগুলি মুসলমান-সমাজেও গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এই হিন্দু প্রভাবের ফলে যে ইসলাম-সংস্কৃতির মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে অনেকে মনে করেন মুসলমান সুলতান ও ওমরাহের উৎসাহেই বাংলা সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। দুইটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করিলেই এই ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন হইবে।

প্রথমতঃ, বাংলাদেশে প্রায় ছয় শত বৎসর ব্যাপী মুসলমান রাজত্বে মুসলমান সুলতান ও তাঁহাদের অনুচরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক যাঁহাদের নাম জানা গিয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা ছয় জনের বেশী নহে।

দ্বিতীয়তঃ, মধ্যযুগে কেবল বাংলায় নহে ভারতের সকল প্রদেশেই—এমন কি যেখানে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল না এবং মুসলমান সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, সেইসব দেশেও স্থানীয় কথ্যভাষা সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হইয়াছিল।

সুতরাং বাংলার মুসলমান সুলতানদের অনুগ্রহ না হইলে যে বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হইত না এরূপ মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

আর দেশের রাজা দেশের সাহিত্যিককে উৎসাহ দিবেন ইহাই স্বাভাবিক। ইহা না করিলে প্রত্যবায়, করিলে অত্যধিক প্রশংসার কোন কারণ নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ইংরেজীতে লিখিত বাংলার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগে (History of Bengal, Vol. II) স্থলতান হোসেন শাহের বংশ সম্বন্ধে অধ্যাপক হবীবুল্লাহ্ যে উক্তি করিয়াছেন, তাহার প্রথম অংশের সারমর্ম এই যে—উক্ত বংশের উদার শাসননীতির আশ্রয়েই বাঙালীর যে সাহিত্যিক প্রতিভা এতদিন রুদ্ধগতি হইয়াছিল তাহা অবরোধমুক্ত হইয়া বেগবতী নদীর মত প্রবাহিত হইয়াছিল এবং চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। *

হোসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার পূর্বেই চণ্ডীদাসের পদাবলী, কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বিপ্রদাস পিপিলাই হোসেন শাহের রাজত্ব লাভের দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার মনসামঙ্গল রচনা করেন। স্থতরাং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যে তিনটি প্রধান বিভাগ—অনুবাদ-সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলী—তাহার প্রতি বিভাগেই উৎকৃষ্ট কাব্য হোসেন শাহী আমলের পূর্বেই রচিত হইয়াছে। স্থতরাং বাঙালী কবির সৃজনীশক্তি যে হোসেন শাহের পূর্বে রুদ্ধ হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। পদাবলী-সাহিত্য ও অনুবাদ-সাহিত্য যে চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসের হাতে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে

* Thus was a new dynasty established under whose enlightened rule the creative genius of the Bengali people reached its zenith. It was a period in which the vernacular found its due recognition as the literary medium through which the repressed intellect of Bengal was to find its release.

* * * *

With this renaissance, the rulers of the house of Husain Shah are inseparably connected. It is almost impossible to conceive of the rise and progress of Vaishnavism or the development of Bengali literature at this period without recalling to mind the tolerant and enlightened rule of the Muslim Lord of Gaur (*The History of Bengal*, published by the University of Dacca, Vol. II, pp. 143-44)

যে দুইখানি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহার মধ্যে একখানি—মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য—হোসেন শাহী বংশের অবসানের ৬০।৭০ বৎসর পর, এবং আর একখানি—ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল—তাহারও দেড়শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং হোসেন শাহী শাসনের আশ্রয়েই যে বাংলা সাহিত্যের চরম উন্নতি হইয়াছিল এই উক্তির সপক্ষে কোন যুক্তিই নাই।

এই উক্তির পর চৈতন্য এবং বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাবলীর উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক হবীবুল্লাহ্ আরও বলিয়াছেন যে হোসেন শাহের রাজত্বের মত উদার ও পরধর্ম-সহিষ্ণু শাসন না থাকিলে বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয় ও প্রসার এবং এই যুগে বাংলার সাংস্কৃতিক নব-জাগরণ (Renaissance) সম্ভবপর হইত না। হোসেন শাহের রাজত্বে নবদ্বীপের কাজী বৈষ্ণব ভক্তগণের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন এবং চৈতন্যদেব যে কাজীর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াই বৈষ্ণবধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ হরিনাম সংকীর্তন প্রচলিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।[১] হোসেন শাহের মন্ত্রী ও পারিষদেরা যে তাঁহার ভয়ে চৈতন্যদেবকে রাজধানী গৌড়ের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে।[২] আর ইহাও বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে শ্রীচৈতন্যদেব দীক্ষার পরে চব্বিশ বৎসর (১৫১০-৩৩খ্রী:) জীবিত ছিলেন—ইহার মধ্যে সর্বসাকুল্যে পুরা একটি বছরও তিনি হোসেন শাহী রাজ্যে অর্থাৎ বাংলাদেশে কাটান নাই। তাঁহার পরম ভক্ত ও হোসেন শাহের পরম শত্রু উড়িষ্যার পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্রের আশ্রয়েই তিনি অবশিষ্ট জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটাইয়াছেন।

এই সমুদয় মনে রাখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে অধ্যাপক হবীবুল্লাহ্‌র উক্তি এত অসার ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে তাহা আলোচনার যোগ্য নহে। তথাপি একটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত এবং আচার্য যদুনাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত বাংলার ইতিহাসের কোন উক্তিই অগ্রাহ্য করা যায় না। কারণ সাধারণ লোকে যে বিনা বিচারে তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইবে ইহা অস্বাভাবিক বা আশ্চর্যের বিষয় নহে। এই জন্যই নিতান্ত অসার হইলেও অধ্যাপক হবীবুল্লাহ্‌র উক্তির বিস্তৃত সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

১। পৃঃ ২৭৪-৫ দ্রষ্টব্য।

২। পৃঃ ৩৪০ দ্রষ্টব্য।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সংস্কৃত সাহিত্য

মধ্যযুগে বাংলা দেশের সংস্কৃত সাহিত্য নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(ক) স্মৃতিশাস্ত্র, (খ) নব্যন্যায় ও দর্শনশাস্ত্রের অন্যান্য শাখা, (গ) তন্ত্র, (ঘ) কাব্য, (ঙ) নাট্যসাহিত্য, (চ) পুরাণ, (ছ) গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব, (জ) অলঙ্কার, (ঝ) ব্যাকরণ, (ঞ) অভিধান, (ট) বিবিধ।

১। স্মৃতিশাস্ত্র

বাংলার মধ্যযুগীয় সংস্কৃত সাহিত্যের কীর্তিস্তম্ভ তিনটি,—স্মৃতি, নব্যন্যায় এবং তন্ত্র। বাংলাদেশের স্মৃতিনিবন্ধকারগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রঘুনন্দন; তিনি স্মার্ত ভট্টাচার্য নামে সুধী সমাজে সুপরিচিত। তাঁহার পরেও এই দেশে বহু স্মৃতিকার জন্মিয়াছিলেন; তবে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলী তেমন প্রসিদ্ধ নহে এবং বিশেষ কোন মৌলিক চিন্তার সাক্ষ্য বহন করে না। বঙ্গীয় প্রসিদ্ধ স্মৃতিকার-গণের গ্রন্থে, বিশেষত রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে, স্বাধীন চিন্তা ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই দেশের স্মৃতিনিবন্ধগুলিতে অসংখ্য স্মৃতিকার ও স্মৃতিগ্রন্থের উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে অনেক স্মৃতিকার মৈথিল। বঙ্গীয় স্মৃতি-সম্প্রদায়ের ন্যায় মৈথিল স্মৃতিসম্প্রদায়ও সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং শেষোক্ত সম্প্রদায় পূর্বোক্ত সম্প্রদায়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। স্মৃতি-শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় প্রধানত তিনটি—আচার, প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবহার। এই সকল বিষয়েই বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ স্মৃতি-নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচীন-স্মৃতির উল্লেখযোগ্য টীকাও রচনা করিয়াছিলেন।

'সাহুড়িয়ান' শূলপাণি প্রাক-রঘুনন্দন যুগের অন্যতম খ্যাতনামা স্মৃতিনিবন্ধকার। তিনি সম্ভবত চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহের নাম 'বিবেক'—অন্ত। তাঁহার বিবিধ-বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক' ও

'শ্রাদ্ধবিবেক' সমধিক প্রসিদ্ধ। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির 'দীপকলিকা' নামক টীকা শূলপাণির নামাঙ্কিত।

রঘুনন্দন সশ্রদ্ধভাবে যাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন, 'রায়মুকুট' উপাধিকারী বৃহস্পতি তাঁহাদের অন্যতম। রাজা গণেশের পুত্র যদু বা জলালুদ্দীনের সমকালীন বৃহস্পতি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে তাঁহার 'স্মৃতিরত্নহার' ও 'রায়মুকুটপদ্ধতি' নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণি ছিলেন রঘুনন্দনের অধ্যাপক। শূলপাণির কতক গ্রন্থের, জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ'-এর এবং নারায়ণ-রচিত ছন্দোগ-'পরিশিষ্টপ্রকাশ'-এর টীকা ছাড়াও শ্রীনাথ বহু নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন; নিবন্ধগুলির নামের অন্ত্যভাগ হিসাবে এইগুলিকে 'অর্ণব'-বর্গ, 'দীপিকা'-বর্গ, 'চন্দ্রিকা'-বর্গ ও 'বিবেক'-বর্গে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। তাঁহার 'কৃত্যতত্ত্বার্ণব' ও 'দুর্গোৎসববিবেক' সমধিক প্রসিদ্ধ।

বঙ্গের স্মার্তকুলতিলক নবদ্বীপ-গৌরব রঘুনন্দন ১৫০০ হইতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের অন্তবর্তী লেখক। প্রসিদ্ধ অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব ছাড়াও তিনি 'দায়ভাগটীকা', 'তীর্থতত্ত্ব', 'যাত্রাতত্ত্ব', 'গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি', 'রাসযাত্রাপদ্ধতি', 'ত্রিপুষ্করশান্তিতত্ত্ব' ও 'গ্রহযাগতত্ত্ব' নামক গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য বিষয়সমূহের ব্যাপকতা এবং ন্যায় ও মীমাংসাশাস্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে এই 'স্মার্ত ভট্টাচার্য' ছিলেন অদ্বিতীয়।

বাগ্‌ড়ি (=ব্যাঘ্রতটী) নিবাসী গোবিন্দানন্দ কবি কঙ্কণাচার্য ছিলেন সম্ভবত রঘুনন্দনের সমসাময়িক অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী। 'দানক্রিয়াকৌমুদী', 'শুদ্ধি-কৌমুদী', 'শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী', 'বর্ষক্রিয়াকৌমুদী' ও 'ক্রিয়াকৌমুদী' নামক নিবন্ধাবলী ছাড়াও গোবিন্দানন্দ শূলপাণির 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক'-এর 'তত্ত্বার্থকৌমুদী' এবং শ্রীনিবাসের 'শুদ্ধিদীপিকা'র অর্থকৌমুদী নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেকে'র একখানি টীকাও সম্ভবত গোবিন্দানন্দ রচনা করিয়াছিলেন।

রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দের পরে এই দেশে স্মৃতিশাস্ত্রের অবনতির সূত্রপাত হয়। বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত পুঁথিসমূহ হইতে মনে হয়, সত্তর জনেরও অধিক সংখ্যক লেখক এই যুগে নিবন্ধ বা টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থে বিশেষ কোন মৌলিকতার পরিচয় নাই; ইহাদের মধ্যে কতক পূর্ববর্তী নিবন্ধসমূহের,

বিশেষত রঘুনন্দনের প্রখ্যাত নিবন্ধাবলীর সারসংকলন অথবা টীকা-টিপ্পনী। কোন কোন গ্রন্থে আছে অশৌচাদির ব্যবস্থা বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পদ্ধতি। এই যুগের নিবন্ধকারগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোপাল ন্যায়পঞ্চানন। ইঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের সংখ্যা অষ্টাদশ এবং নাম 'নির্ণয়া'ন্ত ; যথা—'অশৌচনির্ণয়','সম্বন্ধনির্ণয়' ইত্যাদি। টীকাকারগণের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন কাশীরাম বাচস্পতি এবং শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ; কাশীরাম রঘুনন্দনের অনেক 'তত্ত্বে'র টীকা করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ জীমূতবাহনের 'দায়ভাগে'র এবং শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেক'-এর টীকা রচনা করিয়াছেন।

দত্তক পুত্র-সংক্রান্ত ব্যাপারে বাংলাদেশে 'দত্তকচন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থখানি সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হয়। ইহা কুবেরের নামাঙ্কিত ; এই কুবের সম্ভবত রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী। কেহ কেহ মনে করেন যে, গ্রন্থখানি অর্বাচীন এবং নদীয়ার রাজগুরু রঘুমণি বিদ্যাভূষণ কর্তৃক রচিত ; এই গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির আদ্য ও অন্ত্য বর্ণগুলি একত্র করিলে 'রঘুমণি' নামটি পাওয়া যায়।

(খ) নব্যন্যায় ও দর্শনশাস্ত্রের অন্যান্য শাখা

বাঙালীর বহুমুখী মনীষা দর্শন-শাস্ত্রের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া উহার গভীরে প্রবেশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল ; এই কথা অবশ্য নব্যন্যায়ের ক্ষেত্রেই সর্বাধিক প্রযোজ্য, দর্শনের অন্যান্য শাখায় বাঙালীর কীর্তি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে।

প্রাচীন ন্যায় ও নব্যন্যায়ের প্রভেদ এক কথায় বলিতে গেলে এই যে, প্রথমটি পদার্থশাস্ত্র এবং দ্বিতীয়টি প্রমাণশাস্ত্র। নব্যন্যায়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সংজ্ঞা বা লক্ষণ অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব প্রভৃতি দোষমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে লেখকগণ ছিলেন সতর্ক ; প্রমাণসমূহের স্বরূপ বিশ্লেষণে তাঁহারা সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

বাংলার নব্যন্যায়ে নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া এই শাস্ত্রকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায় : প্রাক-শিরোমণি যুগ, শিরোমণি-যুগ ও শিরোমণি-উত্তর যুগ। এই দেশে নব্যন্যায়ের চর্চা কত প্রাচীন তাহা ঠিক বলা যায় না। প্রাক্-শিরোমণি যুগে যাঁহার

নাম আমরা সর্বপ্রথম জানিতে পারি তিনি বিখ্যাত বাসুদেব সার্বভৌম। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় দশকে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি উৎকল-রাজ পুরুষোত্তমদেব ও প্রতাপরুদ্রদেবের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। পুরীতে চৈতন্যের সঙ্গে সার্বভৌমের বেদান্ত সংক্রান্ত বিচারের উল্লেখ আছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে' (মধ্যলীলা—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। বাসুদেবের 'অনুমানমণি পরীক্ষা' মৈথিল গঙ্গেশের 'তত্ত্বচিন্তামণি'র অনুমানখণ্ডের টীকা।

বাসুদেব সার্বভৌমের পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য সম্ভবত খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'শব্দালোকোদ্দ্যোত' পক্ষধর মিশ্রের 'শব্দালোকে'র টীকা।

জলেশ্বর-পুত্র স্বপ্নেশ্বরও বোধহয় নব্যন্যায়ের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগের লেখক কাশীনাথ বিদ্যানিবাস 'তত্ত্বমণিবিবেচন' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; ইহা উল্লিখিত 'তত্ত্বচিন্তামণি'র টীকার প্রত্যক্ষখণ্ডের অংশমাত্র।

এই যুগের শ্রীনাথ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি, পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর, পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য, কবিমণি ভট্টাচার্য, ঈশান ন্যায়াচার্য, কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিরিঞ্চি এবং শূলপাণি মহামহোপাধ্যায় (বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধকার ?) প্রভৃতিও নব্যন্যায়ের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থান্তরে সন্ধান পাওয়া যায়; কিন্তু ইহাদের কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে (?) আবির্ভূত রঘুনাথ ছিলেন যুগন্ধর পুরুষ। 'তত্ত্বচিন্তামণি'র প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দখণ্ডের উপর, রঘুনাথ-রচিত টীকার নাম যথাক্রমে 'প্রত্যক্ষমণিদীধিতি', 'অনুমানদীধিতি' এবং 'শব্দমণিদীধিতি'। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের নাম 'আখ্যাতবাদ', 'নঞবাদ', 'পদার্থখণ্ডন', 'দ্রব্যকিরণাবলী-প্রকাশদীধিতি', 'গুণকিরণাবলীদীধিতি', 'আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতি', 'ন্যায়লীলাবতী-প্রকাশদীধিতি', 'কৃতিসাধ্যতানুমান', 'বাজপেয়বাদ' ও 'নিষোজ্যান্বয়বাদ'।

শিরোমণি-যুগের অপর একজন উল্লেখযোগ্য নৈয়ায়িক জানকীনাথ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী' ও 'আন্বীক্ষিকীতত্ত্ব-বিবরণ' জানকীনাথ-রচিত। প্রথমোক্ত গ্রন্থে তিনি স্বরচিত 'মণিমরীচি' ও 'তাৎপর্যদীপিকা'র উল্লেখ করিয়াছেন।

জানকীনাথের শিষ্য কণাদ তর্কবাগীশের গ্রন্থ 'ভাষারত্ন' এবং 'তত্ত্বচিন্তামণি'র

অনুমানখণ্ডের টীকা; প্রথমোক্ত গ্রন্থে তিনি স্বরচিত 'তর্কবাদার্থমঞ্জরী'র উল্লেখ করিয়াছেন।

শিরোমণি-উত্তর যুগে বঙ্গীয় নৈয়ায়িকগণের প্রতিভার তেমন সমুজ্জল স্ফুরণ দেখা যায় না। এই যুগকে টীকা-যুগ ও পত্রিকা-যুগে বিভক্ত করা যায়। এই যুগে মৌলিক গ্রন্থ যে রচিত হয় নাই, তাহা নহে; তবে শিরোমণি-যুগের গ্রন্থাবলীর ন্যায় ইহারা উচ্চকোটির নহে। টীকা-যুগের লেখকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরিদাস ন্যায়লঙ্কার ভট্টাচার্য, কৃষ্ণদাস সার্বভৌম, রামভদ্র সার্বভৌম, শ্রীরাম তর্কালঙ্কার, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার এবং গদাধর ভট্টাচার্য চক্রবর্তী। ইঁহাদের মধ্যে শেষোক্ত লেখকত্রয় বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত কালকে পত্রিকা-যুগ বলা যায়। এই যুগের নৈয়ায়িকগণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মথুরানাথ, জগদীশ ও গদাধরের সর্বাধিক প্রচলিত গ্রন্থসমূহে অনুপপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান। তাঁহাদের এইরূপ রচনাগুলি 'পত্রিকা' নামে পরিচিত। পত্রিকাগুলি প্রধানতঃ শিরোমণির 'দীধিতি' গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইলেও অনুমানখণ্ডের চর্চাই এগুলিতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই যুগেও কিছু কিছু টীকা-টিপ্পনী রচিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকেই কাশীধামে নব্যন্যায়চর্চার সূত্রপাত করেন বাঙালী নৈয়ায়িক। তদবধি বহু বাঙালী নৈয়ায়িক যুগে যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির এই কেন্দ্রে জীবনযাপন করেন ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। ইঁহাদিগকে প্রধানত তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যায়; যথা—প্রগলভ-সম্প্রদায়, শিরোমণি-সম্প্রদায় এবং চূড়ামণি-সম্প্রদায়।

'প্রশস্তপাদভাষ্যে'র উপর প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ-রচিত টীকার নাম 'দ্রব্যসূক্তি'। 'গুণসূক্তি' নামক টীকাও জগদীশ-রচিত বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন, 'তর্কামৃত' নামক বৈশেষিক প্রকরণ গ্রন্থখানি জগদীশের রচনা। ময়মনসিংহ জিলার চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (১৮৩৬—১৯০৯ খ্রীঃ) বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে 'তত্ত্বাবলি' নামক পদ্যগ্রন্থ ছাড়াও কণাদের বৈশেষিক দর্শনের এবং উদয়নের 'কুসুমাঞ্জলি'র টীকা রচনা করিয়াছিলেন। গঙ্গাধর কবিরাজ (১৭৯৮—১৮৮৫ খ্রীঃ) করিয়াছিলেন বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্য রচনা।

মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের মীমাংসা গ্রন্থের নাম 'অধিকরণকৌমুদী'। ইনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের পূর্ববর্তী লেখক নহেন। খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতকের আদিভাগের চন্দ্রশেখর বাচস্পতির 'ধর্মদীপিকা' ও 'তত্ত্বসংবোধিনী' নামক দুইখানি মীমাংসাগ্রন্থ আছে। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের কাশীবাসী নৈয়ায়িক রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার 'মীমাংসারত্ন' নামক গ্রন্থে প্রমাণ ও প্রমেয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

কিম্বদন্তী এই যে, সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক কপিল ছিলেন বাংলাদেশের গঙ্গা-সাগরসঙ্গমবাসী। নৈয়ায়িক জলেশ্বর বাহিনীপতি-পুত্র স্বপ্নেশ্বরের সাংখ্যগ্রন্থের নাম 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীপ্রভা'। 'সাংখ্যকারিকার' উপর 'সাংখ্যবৃত্তিপ্রকাশ' (বা 'সাংখ্য-তত্ত্ববিলাস') এবং 'সাংখ্যকৌমুদী' যথাক্রমে তর্কবাগীশ ও রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-রচিত। শ্রীনাথ ভট্টাচার্যের নামাঙ্কিত গ্রন্থ 'সাংখ্যপ্রয়োগ'। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-পণ্ডিত রামানন্দ রচনা করেন 'সাংখ্যপদার্থমঞ্জরী', ভট্টপল্লীর পঞ্চানন তর্করত্ন 'সাংখ্যকারিকা'র 'পূর্ণিমা' নামক ব্যাখ্যার রচয়িতা। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বিজ্ঞানভিক্ষুর নামাঙ্কিত গ্রন্থ 'সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য', ও 'সাংখ্যসার'। সাংখ্য-সূত্রের টীকাকার অনিরুদ্ধ কাহারও কাহারও মতে বল্লালসেনের গুরু, কেহ বা তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের লেখক বলিয়া মনে করেন। গঙ্গাধর কবিরাজ সাংখ্যসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন।

যোগদর্শনে উক্ত বিজ্ঞানভিক্ষুর 'যোগবার্ত্তিক' এবং গঙ্গাধর কবিরাজের 'পাত-ঞ্জলসূত্রভাষ্য' উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানভিক্ষু-রচিত 'বিজ্ঞানামৃতভাষ্য' ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে ফরিদপুরের কোটালিপাড়ার অন্তর্গত ঊনশিয়া গ্রামে আবির্ভূত মধুসূদন সরস্বতী আকবরের সভায় সম্মানিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মধুসূদন-রচিত দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ ও টীকাসমূহের সংখ্যা দ্বাদশ; ইহাদের মধ্যে 'অদ্বৈতসিদ্ধি' বেদান্তদর্শনে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'প্রস্থানভেদ' নামক গ্রন্থে মধুসূদন সমস্ত বিদ্যার সারোল্লেখপূর্বক বেদান্তের প্রাধান্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। নবদ্বীপের মহানৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম লক্ষ্মীধরকৃত 'অদ্বৈত-মকরন্দ' নামক গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের স্বল্পজ্ঞাত বেদান্ত-বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গৌড়পূর্ণানন্দ কবিচক্রবর্তীর 'তত্ত্বমুক্তাবলী-মায়াবাদ শতদূষণী', গদাধরের (নৈয়ায়িক ?) 'ব্রহ্মনির্ণয়', সম্ভবত মধুসূদনের

সমসাময়িক গৌড়ব্রহ্মানন্দের 'অদ্বৈতসিদ্ধান্তবিদ্যোতন', রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতির 'বেদান্তরহস্য', পদ্মনাভ মিশ্রের (আঃ খ্রীঃ ১৬শতক), 'খণ্ডনপরাক্রম', নন্দরামতর্কবাগীশের (খ্রীঃ ১৭শ শতক) 'আত্মপ্রকাশক'। কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত রামানন্দ বাচস্পতি বা রামানন্দ তীর্থ বেদান্তবিষয়ে 'অদ্বৈতপ্রকাশ' ও 'অধ্যাত্মবিন্দু' প্রভৃতি সাত আটখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'অধ্যাত্মবিন্দু'তে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখপূর্বক ইনি বেদান্তমতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামক গ্রন্থে রামানন্দ বেদান্ত ও সাংখ্য মতের সাহায্যে বিভিন্ন দেবদেবীর অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই স্বল্পজ্ঞাত লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ শারীরকসূত্র ও গীতা প্রভৃতির টীকাও রচনা করিয়াছিলেন।

(গ) তন্ত্র

কোন কোন পণ্ডিতের মতে বাংলা দেশেই সর্বপ্রথম তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। ইহা বিতর্কের বিষয় হইলেও এই দেশের ধর্মজীবনে যে তন্ত্রের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত সেই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। বাংলা দেশের পূজাপার্বণে এবং স্মৃতিনিবন্ধগুলিতে তান্ত্রিক প্রভাব সুস্পষ্ট। এই দেশে রামকৃষ্ণ পরমহংস, গোঁসাই ভট্টাচার্য, বামাক্ষ্যাপা ও অর্ধকালী প্রভৃতি বহু তান্ত্রিক সাধক ও সাধিকার আবির্ভাব হইয়াছিল। তাছাড়া, অনেক তন্ত্রগ্রন্থও বাঙালী পণ্ডিতগণ রচনা করিয়াছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্র প্রধানত হিন্দু ও বৌদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ। হিন্দুতন্ত্র প্রধানত শৈব, শাক্ত অথবা বৈষ্ণব ; প্রথম দুই শ্রেণীর গ্রন্থের সংখ্যাই অধিকতর।

আনুমানিক ১৪শ শতকের মহামহোপাধ্যায় পরিব্রাজকাচার্য 'কাম্যযন্ত্রোদ্ধার' নামক নিবন্ধে তান্ত্রিক যন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন। চৈতন্যের সমকালীন বা কিঞ্চিৎ পরবর্তী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এই শাস্ত্রে যুগন্ধর পুরুষ। তৎপ্রণীত 'তন্ত্রসার'-এ হিন্দুতন্ত্রের সকল সম্প্রদায়েরই সার লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান বিষয়গুলির আলোচনা ছাড়াও বিভিন্ন দেবদেবীর স্তবস্তোত্র লিপিবদ্ধ আছে। বাংলাদেশে প্রচলিত কালীমূর্তির কল্পনা ও পূজার প্রবর্তন নাকি কৃষ্ণানন্দেরই কীর্তি। অমৃতানন্দ ভৈরব ও রামানন্দ তীর্থ 'তন্ত্রসারের' পৃথক্ পৃথক্ রূপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি' কৃষ্ণানন্দের নামাঙ্কিত অপর একখানি তন্ত্রগ্রন্থ।

'সর্বোল্লাস' নামক গ্রন্থ ত্রিপুরা জিলার মেহার গ্রামনিবাসী 'সর্ববিদ্যা' উপাধিধারী খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের সর্বানন্দের নামাঙ্কিত। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম বা মধ্যভাগে ব্রহ্মানন্দ গিরি 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী' ও 'তারারহস্য' নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। ইঁহার শিষ্য ময়মনসিংহ জিলার কাটিহালী গ্রামনিবাসী পূর্ণানন্দ পরমহংস পরিব্রাজক নিম্নলিখিত তন্ত্রগ্রন্থসমূহের রচয়িতা :—'শ্যামারহস্য', 'শাক্তক্রম', 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি', 'তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী', 'ষট্‌কর্মোল্লাস' ও 'কালীসহস্রনামস্তুতিরত্নটীকা'। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের গৌড়ীয় শঙ্করের নামাঙ্কিত গ্রন্থ 'তারারহস্যবৃত্তি', 'শিবার্চনমহারত্ন', 'শৈবরত্ন', 'কুলমূলাবতার' ও 'ক্রমস্তব'। অজ্ঞাতনামা লেখকের 'রাধাতন্ত্র' সম্ভবত বাংলাদেশে রচিত। শক্তির উপাসক কৃষ্ণের রাধার সহিত মিলনেই সিদ্ধিলাভ—ইহাই এই তন্ত্রের প্রতিপাদ্য।

উক্ত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত পঞ্চাশটিরও অধিকসংখ্যক তন্ত্রগ্রন্থ বাঙালী রচয়িতৃগণের নামাঙ্কিত; এই রচয়িতৃগণের নাম অনেকের নিকট অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। এই গ্রন্থগুলি প্রায়ই মৌলিকতাবিহীন; ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থের অথবা তান্ত্রিক স্তবস্তুতির টীকাটিপ্পনী। এই শ্রেণীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে রামতোষণ বিদ্যালঙ্কারের 'প্রাণতোষিণী' উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার ছিলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বৃদ্ধপ্রপৌত্র। ২৪ পরগণা জিলার খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের আনুকূল্যে এই গ্রন্থ রচিত হয়।

(ঘ) কাব্য

বঙ্গে তুর্কী আক্রমণের পর প্রায় দুইশত বৎসর পর্যন্ত এই দেশে রচিত কোন কাব্যগ্রন্থের সন্ধান মিলে না। চৈতন্যপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে কাব্যশ্রীর আসন এই দেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাংলা দেশে রচিত কাব্যগুলি আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যময়। বাঙালী পণ্ডিতগণ যেমন একদিকে কাব্য রচনা করিয়াছেন, তেমনই অপরদিকে মহাকাব্যাদির অভিনব টীকাটিপ্পনীও প্রণয়ন করিয়াছেন। মধ্যযুগে এই দেশে রচিত কাব্যগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীভুক্ত করা যায় :—

(১) বৈষ্ণবকাব্য, (২) ঐতিহাসিক কাব্য, (৩) স্তবস্তোত্র, (৪) কবিতাসংগ্রহ, (৫) দূতকাব্য, (৬) গদ্যকাব্য ও চম্পূ।

১। বৈষ্ণব কাব্য

আলোচ্য যুগে রাধাকৃষ্ণের লীলা, কৃষ্ণবিষয়ক আখ্যান-উপাখ্যান বা চৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে বহু কাব্য রচিত হইয়াছিল। এই কাব্যগুলির মধ্যে নানা শ্রেণীর রচনা বিদ্যমান ; যথা—মহাকাব্য, গীতিকাব্য, দূতকাব্য, চম্পূ ইত্যাদি।

মধ্যযুগের আরম্ভে বা তাহার কিছু পূর্বে রচিত লক্ষ্মীধরের 'চক্রপাণিবিজয়' নামক মহাকাব্যের বিষয়বস্তু বাণাসুরের কন্যা উষার সহিত কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ, বাণকর্তৃক অনিরুদ্ধের নিগ্রহের সংকল্প, বাণের সহিত কৃষ্ণের তুমুল সংগ্রাম, শঙ্কর এবং কার্তিকেয় সহায় থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণের হস্তে বাণের পরাজয় এবং পৌত্র এবং পৌত্রবধূ সহ কৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন। কৃষ্ণের জন্ম হইতে কংসবধ পর্যন্ত লীলা চতুর্ভুজের (খ্রীঃ ১৫শ শতক) 'হরিচরিত'-এর বিষয়বস্তু। রূপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামী (১৬শ-১৭শ শতক) 'সংকল্পকল্পদ্রুমে' কৃষ্ণের প্রকট ও অপ্রকট নিত্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। জীবের 'মাধবমহোৎসব' কাব্যখানির বর্ণনীয় বিষয় কৃষ্ণকর্তৃক রাধার বৃন্দাবনেশ্বরীরূপে অভিষেক ও তদুপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের নিত্যলীলা অবলম্বনে চৈতন্যশিষ্য কবিকর্ণপূর বা পরমানন্দ সেনের 'কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী' কাব্য রচিত। 'হরিবংশ', 'বিষ্ণুপুরাণ' ও 'ভাগবতো'ক্ত পারিজাতহরণের আখ্যান কবিকর্ণপূরের 'পারিজাতহরণ' নামক কাব্যের উপজীব্য। রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা অবলম্বনে চৈতন্যশিষ্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচনা করিয়াছিলেন 'সঙ্গীতমাধব' ; ইহা 'গীতগোবিন্দে'র আদর্শে রচিত। চৈতন্যের সমসাময়িক ও বৃন্দাবনের ষট্গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথদাস 'দানকেলিচিন্তামণি' নামক কাব্য সম্ভবত রূপগোস্বামীর 'দানকেলিকৌমুদী' অবলম্বনে রচনা করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের (খ্রীঃ ১৬শ-১৭শ শতক) 'গোবিন্দলীলামৃত' বঙ্গীয় বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে বৃহত্তম। কৃষ্ণের অষ্টকালিক নিত্যলীলা অবলম্বনে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (খ্রীঃ ১৭শ শতক) 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত' রচনা করিয়াছিলেন।

চৈতন্যের সমকালীন মুরারিগুপ্ত 'কড়চা' বলিয়া পরিচিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' বা 'চৈতন্যচরিতামৃত' নামক কাব্যে চৈতন্যের জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন। কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচরিতামৃত' নামক কাব্যে চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতাররূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাকে নায়ক করা হইয়াছে।

বৈষ্ণবদূতকাব্যগুলির মধ্যে কতক কাব্যে দূতপ্রেরক কৃষ্ণ এবং উদ্দেশ্য গোপীগণ ; কোন কোন কাব্যে ইহার বিপরীত ব্যাপারও লক্ষিত হয়। আবার কোন

কোন কাব্যে ভক্ত প্রেরক ও কৃষ্ণ উদ্দেশ্য। এই কাব্যগুলির আখ্যানাংশে বৈষ্ণব পুরাণাদির, বিশেষত 'ভাগবতে'র প্রভাব সুস্পষ্ট। সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর বিষ্ণুদাস 'মনোদূত'-এর রচয়িতা; ইহাতে আছে ভক্তকর্তৃক কৃষ্ণসমীপে স্বীয় মনকে দূতরূপে প্রেরণ। বিষ্ণুদাসের বংশধর রামরাম শর্মার 'মনোদূতে' প্রেরক ও দূতের উক্তি-প্রত্যুক্তি রহিয়াছে। রূপগোস্বামী রচিত দূতকাব্য 'হংসদূত' ও 'উদ্ধবসন্দেশ'। প্রথমটির বিষয়বস্তু ললিতা কর্তৃক মথুরায় কৃষ্ণের নিকট রাধার বিরহজ্বালা প্রশমিত করিবার অনুরোধ সহ হংসকে দূতরূপে প্রেরণ। মথুরা হইতে বৃন্দাবনে কৃষ্ণকর্তৃক প্রধানা গোপীগণের, বিশেষত রাধার, উদ্দেশ্যে উদ্ধবের মাধ্যমে সন্দেশ প্রেরণ—'ভাগবতো'ক্ত এই ব্যাপার দ্বিতীয়টির উপজীব্য। শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌমের (১৭শ-১৮শ শতক) 'পদাঙ্কদূত'-এর বিষয়বস্তু কৃষ্ণের বিরহবিধুর গোপীগণ কর্তৃক তৎপদাঙ্কসমূহকে মথুরায় দূতরূপে গমনের অনুরোধ। একই নামের অপর কাব্য অম্বিকাচরণ রচিত।

জনৈক জয়দেবের 'শৃঙ্গারমাধবীচম্পূ' নামক একখানি কাব্য আছে। জীব-গোস্বামীর 'গোপালচম্পূ'র পূর্বার্ধে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা এবং উত্তরার্ধে মথুরা ও দ্বারকালীলা বর্ণিত হইয়াছে। কবিকর্ণপূরের 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ' নামক বিশাল কাব্যের বিষয়বস্তু কৃষ্ণের বৃন্দাবনস্থ নিত্যলীলা। রঘুনাথদাসের 'মুক্তাচরিত্র' নামক চম্পূকাব্যের উপজীব্য কৃষ্ণের নৈমিত্তিক লীলার অন্তর্গত দানলীলা। চিরঞ্জীবের (১৭শ-১৮শ শতক) 'মাধবচম্পূ'তে বর্ণিত ঘটনাবলী এইরূপ—কৃষ্ণের মৃগয়াগমন, বনে কলাবতী নাম্নী নারীর দর্শন ও পরস্পরের প্রতি আসক্তি, স্বয়ংবরে কলাবতীকে কৃষ্ণের পত্নীরূপে লাভ, কলাবতীসহ প্রত্যাবর্তনকালে রাক্ষসগণের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ ও জয়লাভ, মধুপুরে কলাবতীসহ তাঁহার বাস, নারদের অনুরোধে কৃষ্ণের দ্বারকাগমন, বিরহক্লিষ্টা কলাবতীর শোচনীয় অবস্থা, কলাবতীকর্তৃক হংসকে দূতরূপে প্রেরণ এবং দ্বারকা হইতে কৃষ্ণের মধুপুরে প্রত্যাবর্তন। বাণেশ্বর বিদ্যা-লঙ্কারের (১৭শ-১৮শ শতক) 'চিত্রচম্পূ'তে বর্ধমানাধিপতি চিত্রসেনের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্ররাজ সাহুর বঙ্গদেশ আক্রমণ, রাজা কর্তৃক ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতি কতক ধর্ম-কার্যের অনুষ্ঠান, রাজার অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত, স্বপ্নে বৈষ্ণবমতে বেদান্ততত্ত্ব সম্বন্ধে রাজার জ্ঞানলাভ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। মনে হয়, চৈতন্যপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম অনুসারে জীবাত্মার মুক্তিলাভের উপায় বর্ণনা কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্ধমান জিলার রঘুনন্দন গোস্বামীর (১৮শ শতক) 'গৌরাঙ্গচম্পূ'তে 'আস্বাদ' নামক বত্রিশটি পরিচ্ছেদে চৈতন্যের জন্ম হইতে জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

২। ঐতিহাসিক কাব্য

১৬শ-১৭শ শতকের চন্দ্রশেখর 'শূর্জনচরিত' মহাকাব্যে স্বীয় পৃষ্ঠপোষক শূর্জনের জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই শূর্জন ছিলেন প্রসিদ্ধ চৌহান পৃথ্বীরাজের ভ্রাতা মাণিক্যরাজের বংশধর এবং সম্রাট্ আকবরের মিত্র। চন্দ্রশেখর নিজেকে গৌড়ীয় এবং অম্বষ্ঠকুলে জাত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে তিনি বাঙালী ও বৈদ্যজাতীয় ছিলেন। কিন্তু ইহা কতদূর সত্য বলা যায় না।

৩। স্তবস্তোত্র

বাংলা দেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ প্রধানত রাধাকৃষ্ণের ও চৈতন্যের লীলা অবলম্বনে স্তবস্তোত্র রচনা করিয়াছেন। মধুররসাশ্রিত আধ্যাত্মিকতা এই সকল স্তবস্তোত্রের জনপ্রিয়তার কারণ; কিন্তু, ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য খুব বেশী নহে। এই জাতীয় রচনাগুলিকে স্তোত্র, গীত ও বিরুদ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

সিংহল-প্রবাসী বাঙালী রামচন্দ্র কবিভারতী (খ্রীঃ ১৩শ শতক) 'ভক্তিশতক' নামক গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্ব অনুসারে বুদ্ধদেবের স্তুতিগান করিয়াছেন। চৈতন্যের সমকালীন নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম চৈতন্য সম্বন্ধে কতক স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। প্রায় একই সময়ে রচিত প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতে'র বিষয়বস্তুও অনুরূপ। এই কবির 'বৃন্দাবনমহিমামৃত' কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা অবলম্বনে রচিত বিশাল গ্রন্থ। চৈতন্যের সমসাময়িক রঘুনাথদাস-রচিত বহু স্তোত্রের মধ্যে কয়েকটির নাম এইরূপ—'চৈতন্যাষ্টক', 'গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ', 'ব্রজবিলাসস্তব'। দাস্যভাবে রাধার সেবা করিবার সঙ্কল্প 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'তে ব্যক্ত হইয়াছে। 'স্বসঙ্কল্পপ্রকাশ'-এ রাধা-উপাসনা ব্যতীত কৃষ্ণলাভ হয় না, কবির এই বিশ্বাস প্রমাণিত হইয়াছে। জীবগোস্বামীর 'গোপালবিরুদাবলী' কাব্যের বিষয়বস্তু কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা।

রূপগোস্বামী বহু স্তোত্র, বিরুদ ও গীত রচনা করিয়াছিলেন। স্তোত্রগুলির মধ্যে কতক চৈতন্যবিষয়ক, অপরগুলির উপজীব্য রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা। স্তোত্রগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 'কুঞ্জবিহার্যষ্টক', 'মুকুন্দমুক্তাবলী', 'উৎকলিকাবল্লরী' ও 'স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতলীলা'। 'গোবিন্দবিরুদাবলী' ও 'অষ্টাদশচ্ছন্দঃ' রূপরচিত দুইটি উল্লেখ-

যোগ্য বিরুদ। 'কৃষ্ণজন্ম', 'বসন্তপঞ্চমী' 'দোল' ও 'রাস' এই চারিটি প্রসঙ্গ রূপের 'গীতাবলী'র বিষয়বস্তু ; ইহাতে ৪১টি গীত 'গীতগোবিন্দে'র অনুকরণে রাগসম্বলিত হইয়াছে। দার্শনিক মধুসূদন সরস্বতীর (১৬শ শতক) 'আনন্দমন্দাকিনী'তে আছে শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে কৃষ্ণের স্তুতি। 'নিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলী' বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (১৭শ শতক) কর্তৃক রচিত। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের (১৭শ-১৮শ শতক) কতক স্তবস্তোত্রের গ্রন্থের নাম—হনূমৎস্তোত্র, শিবশতক, তারাস্তোত্র ও কালীশতক।

৪। কবিতা-সংগ্রহ

এই শ্রেণীর কাব্যরচনার ইতিহাসে বাংলাদেশের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মণসেনের সভাসদ শ্রীধরদাস রচিত 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র কথা প্রথমভাগে উল্লিখিত হইয়াছে। রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে আছে শুধু কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক শ্লোকসমষ্টি ; শ্লোকগুলির মধ্যে কতক রূপের স্বরচিত। 'সূক্তিমুক্তাবলী' বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন (১৫শ-১৬শ শতক) কর্তৃক সঙ্কলিত। গোবিন্দদাস মহামহোপাধ্যায়ের 'সৎকাব্যরত্নাকরে' ৩১৪৬টি শ্লোক আছে ; গ্রন্থকার ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী।

৫। দূতকাব্য

রুদ্র ন্যায়বাচস্পতির (১৫শ-১৬শ শতক) 'ভ্রমরদূতে'-র আখ্যানভাগ এই যে, রাবণহৃতা সীতাদেবীর নিকট হইতে অভিজ্ঞানমণিসহ আগত হনুমানের দর্শনে আকুল রামচন্দ্র পর্বতে ভ্রমণকালে একটি ভ্রমর দেখিতে পান এবং উহাকে সীতা-সমীপে গমনার্থে দূত নিযুক্ত করেন। 'দায়ভাগ'-এর টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের (১৮শ শতক) 'চন্দ্রদূত'-এর বিষয়বস্তু রামচন্দ্রকর্তৃক লঙ্কাস্থিতা সীতাদেবীর নিকট চন্দ্রকে দূতরূপে প্রেরণ।

এই শ্রেণীর অন্যান্য দূতকাব্য 'পদ্মদূত', 'বকদূত' 'বাতদূত' এবং 'মেঘদৌত্য'। কালীপ্রসাদ-রচিত 'ভক্তিদূত'-এর বিষয়বস্তু ভক্তকর্তৃক তৎপ্রিয়া মুক্তির সমীপে ভক্তিকে দূতরূপে প্রেরণ।

৬। গদ্যকাব্য ও চম্পূ

'হিতোপদেশ'-রচয়িতা নারায়ণকে (১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী) বাঙালী বলিয়া মনে করা হয়। ইহা 'পঞ্চতন্ত্রে'র একটি রূপ (version) ; মূলগ্রন্থের পাঁচটি

প্রসঙ্গের স্থলে ইহাতে চারিটি প্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পদ্মনাভ মিশ্রের (ষোড়শ শতক) 'বীরভদ্রদেবচম্পূ'তে তদীয় পৃষ্ঠপোষক বঘেলবংশীয় বীরভদ্রের (বা রুদ্রদেবের) কীর্তিকলাপ বর্ণিত আছে। কাল্পনিক প্রেমিক ও প্রেমিকার প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে কোটালীপাড়ার কৃষ্ণনাথের (সপ্তদশ শতক) 'আনন্দলতিকাচম্পূ' রচিত। চিরঞ্জীবের (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক) 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী' নামক চম্পূকাব্যে বিভিন্ন আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের মূল মতবাদ এবং বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধর্মের তত্ত্ব সংক্ষেপে অথচ সরল ও সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে।

৭। নাট্যসাহিত্য

কাব্যের তুলনায় বাংলাদেশে রচিত নাট্যগ্রন্থের সংখ্যা অল্প।

মদনের (১২শ-১৩শ শতক) 'পারিজাতমঞ্জরী' বা 'বিজয়শ্রী' গুজরাটরাজ জয়-সিংহের যুদ্ধে পরমাররাজ অর্জুনবর্মার জয়লাভের স্মারকগ্রন্থ স্বরূপে রচিত হইয়াছিল। মধুসূদন সরস্বতীর (ষোড়শ শতক) নাট্যগ্রন্থের নাম 'কুসুমাবচয়'। রূপগোস্বামীর নাট্যগ্রন্থ তিনটি—'দানকেলিকৌমুদী', 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব' সানুচর কৃষ্ণকর্তৃক রাধাসহ গোপীগণের নিকট শুল্ক দাবী করিয়া তাঁহাদের পথরোধ এবং অবশেষে পৌর্ণমাসী কর্তৃক রাধাকে শুল্করূপে দানের প্রস্তাব ভাণিকা শ্রেণীর 'দানকেলিকৌমুদী'র বিষয়বস্তু। পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সংক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাকে নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে সপ্তাঙ্ক 'বিদগ্ধমাধবে'। দশাঙ্ক 'ললিতমাধব'-এ কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা এবং মথুরা ও দ্বারকার জীবন বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবত কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র আদর্শে রচিত কবিকর্ণপূরের দশাঙ্ক নাটক 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে' চৈতন্যের জীবনের প্রধান ঘটনাবলীকে নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে। বারভূঞার অন্যতম নোয়াখালির ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্যের (ষোড়শ শতক) দুইখানি নাটক পাওয়া যায়—'বিখ্যাতবিজয়' ও 'কুবলয়াশ্বচরিত'। 'বিখ্যাতবিজয়' মহাভারতের কর্ণবধ অবলম্বনে রচিত। মহাভারতের মদালসা ও কুবলয়াশ্বের আখ্যান 'কুবলয়াশ্বে'র উপজীব্য। লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্র অমরমাণিক্য বাণাসুরকন্যা উষার কাহিনী অবলম্বনে 'বৈকুণ্ঠবিজয়' রচনা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ-মাণিক্যের সভাপণ্ডিত কবিতার্কিক 'কৌতুকরত্নাকর' নামক প্রহসনে পুণ্যবর্জিত নামক নগরের দুরিতার্ণব নামক রাজার নির্বুদ্ধিতার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। 'কৌতুকসর্বস্ব' নামক প্রহসনে গোপীনাথ চক্রবর্তী কলিবৎসল নামক রাজার

বিশৃঙ্খলাময় রাজ্যশাসন এবং ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যাচার বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভবত বঙ্গে তুর্কী আক্রমণের পরবর্তী শ্রীহর্ষ বিশ্বাসের পুত্র রামচন্দ্র যযাতির পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে 'ঐন্দবানন্দ' নাটক রচনা করেন। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের (১৭শ-১৮শ শতক) 'চন্দ্রাভিষেক' নামক নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়।

৮। পুরাণ

পুরাণ ও উপপুরাণশ্রেণীর কতক গ্রন্থ বাংলাদেশে রচিত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কতক যুক্তিপ্রমাণ হইতে এইগুলির উৎপত্তিস্থল বঙ্গদেশ বলিয়া মনে হয়। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে বা তৎপূর্ববর্তী কালে রচিত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে'র বিষয়বস্তু বিবিধ পৌরাণিক আখ্যান-উপাখ্যান, বর্ণাশ্রমধর্ম, স্ত্রীধর্ম, পূজাব্রত, জাতিনিরূপণ, সঙ্করজাতি, দানধর্ম, কৃষ্ণের জন্ম ও লীলা প্রভৃতি। ইহাতে ছত্রিশ সঙ্করজাতির উল্লেখ, 'রায়', 'দাস', 'দেবী', 'দাসী' প্রভৃতি পদবী, বাংলাদেশে প্রচলিত কালীমূর্তির বর্ণনা, বাংলাদেশের নদী পদ্মাবতী (=পদ্মা) ও ত্রিবেণীর (=মুক্তবেণী) উল্লেখ, 'গীতগোবিন্দে'র প্রভাব, বাঙালী কবির প্রিয় 'চৌত্রিশা' নামক রচনাপদ্ধতি প্রভৃতি হইতে ইহা বাংলাদেশে রচিত বলিয়া মনে হয়। এই পুরাণোক্ত শারদীয়া পূজা এবং রাসযাত্রা বাংলাদেশে অদ্যাবধি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ইহার অদ্যাবধিপ্রাপ্ত পুঁথিগুলির প্রায় সবই বঙ্গদেশে প্রাপ্ত ও বঙ্গাক্ষরে লিখিত। আনুমানিক চতুর্দশ শতকের বা তৎপরবর্তী কালের 'বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণের' অদ্যাবধি আবিষ্কৃত সকল পুঁথিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত এবং বঙ্গাক্ষরে লিখিত; 'নন্দিকেশ্বরপুরাণে'র ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। এই দুই পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা একমাত্র বাংলাদেশেই প্রচলিত। এই সকল কারণে এই দুই গ্রন্থ বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

আনুমানিক ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে রচিত 'মহাভাগবতপুরাণ'-এর আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য দেবী কর্তৃক দশমহাবিদ্যার রূপধারণ, দক্ষযজ্ঞনাশ, একান্নটী মহাপীঠের উৎপত্তি, পদ্মানদীর উৎপত্তি, শারদীয়া পূজায় দেবীর অকালবোধন, রামকর্তৃক তাড়কাবধ হইতে রামরাবণের যুদ্ধ পর্যন্ত রামায়ণ-বর্ণিত ঘটনাবলী ইত্যাদি। ইহাতে ভাগীরথী ও পদ্মা নদীর সহিত নিবিড় পরিচয়, এই পুরাণবর্ণিত শারদীয়া পূজার সহিত বর্তমান বাংলায় প্রচলিত দুর্গাপূজার সাদৃশ্য, ইহাতে প্রযুক্ত 'গর্বচূর্ণ', 'লোকলজ্জা' প্রভৃতি শব্দের বর্তমান বাংলা ভাষায়

প্রতিরূপ প্রভৃতি হইতে ইহা বাংলা দেশে রচিত বলিয়া মনে হয়। এই পুরাণের প্রায় সকল পুঁথিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত এবং বঙ্গাক্ষরে লিখিত।

বর্তমান 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ'-এর আদিম রূপের উদ্ভব হয় আনুমানিক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে ; দশম হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে, বোধ হয়, ইহার নবরূপায়ণ হইয়াছিল। এই পুরাণ চারিটি খণ্ডে বিভক্ত—ব্রহ্মখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণপতিখণ্ড ও কৃষ্ণজন্মখণ্ড। ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় কৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও লীলা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের উপরে এই পুরাণের প্রভাব গভীর। ইহাতে বাংলা দেশে বর্তমান সঙ্করবর্ণসমূহের বিবরণ, বৈদ্য উপবর্ণের উল্লেখ, কৈবর্তগণের উদ্ভবের সবিস্তার বর্ণনা প্রভৃতি হইতে ইহাকে বাংলাদেশের রচনা মনে করা হয়।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া 'কল্কিপুরাণ' (অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী) কোন কোন যুক্তিবলে বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

গৌড় দরবারের জনৈক কর্মচারী কুলধর, গোবর্ধন পাঠকের সাহায্যে, 'পুরাণ-সর্বস্ব' নামে পুরাণ ও স্মৃতিবিষয়ক সংগ্রহগ্রন্থ সংকলন করিয়াছিলেন ১৪৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সাক্ষ্য অনুসারে ইহাতে ইতিহাস, ভূগোল, রাজ্য-শাসনপদ্ধতি ও পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণ হইতে শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

নদীয়ারাজ রুদ্ররায় কর্তৃক সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে ১৪০০০-এরও অধিকসংখ্যক শ্লোকে 'পুরাণসার' রচিত হইয়াছিল। এই জাতীয় অপর একখানি গ্রন্থ রাধাকান্ত তর্কবাগীশরচিত 'পুরাণার্থপ্রকাশক' ; ইহাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পুরাতন রাজ-বংশের বর্ণনা আছে।

পুরাণ এবং পুরাণের সার সংকলন ছাড়াও কতক বাঙালী পণ্ডিত 'চণ্ডী' ও 'ভাগবত'-এর ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ পূজাপদ্ধতিও প্রণয়ন করিয়াছেন।

৯। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব

প্রাচীন হিন্দুদর্শনের সহিত তুলনায় বৈষ্ণবদর্শনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বহু। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ষড়্দর্শনের মধ্যে প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই চারিটি প্রমাণ সর্ববাদিসম্মত। বৈষ্ণব-দর্শনে একমাত্র শব্দপ্রমাণই স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন দর্শনে শব্দপ্রমাণে শ্রুতি

বা বেদ গৃহীত হইয়াছে; বৈষ্ণবগণের মতে, বৈষ্ণব পুরাণ, বিশেষত 'ভাগবত', শব্দ-পদবাচ্য। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একীভাব প্রাচীন দর্শনে চরম লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত। বৈষ্ণবদর্শনে কৃষ্ণই পরম দেবতা এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তি ভক্তের চরম লক্ষ্য। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের মতে, চৈতন্য একাধারে কৃষ্ণ ও রাধা এবং তিনিই চরম সত্তা ও পরম উপেয়—ইহাই গৌরপারম্যবাদ।

বাসুদেব সার্বভৌম 'তত্ত্বদীপিকা' গ্রন্থে বৈষ্ণবদর্শনের কিছু আলোচনা করিয়াছেন। 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' নামক গ্রন্থের সনাতন ভক্তিতত্ত্ব বিশ্লেষণ পূর্বক কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় আলোচনা করিয়াছেন। সনাতন 'ভাগবতে'র দশম স্কন্ধের 'বৈষ্ণবতোষণী' নামক ব্যাখ্যা রচনা করেন। 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে'র সংক্ষেপণ-স্বরূপ রূপগোস্বামী 'সংক্ষেপ- (বা, লঘু-) ভাগবতামৃত' রচনা করিয়াছেন; ইহাতে কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনার পরে ভক্তের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ আছে। রূপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামীর ছয়টী দর্শনগ্রন্থ ষট্সন্দর্ভ নামে পরিচিত; ইহাদের নাম 'তত্ত্বসন্দর্ভ', 'ভগবৎসন্দর্ভ', 'পরমাত্মসন্দর্ভ', 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ', 'ভক্তিসন্দর্ভ', ও 'প্রীতিসন্দর্ভ'। প্রথম তিনটি সন্দর্ভের পরিশিষ্টস্বরূপ জীব 'সর্বসংবাদিনী' নামক গ্রন্থখানিও রচনা করিয়াছিলেন। সন্দর্ভগুলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন পরিচ্ছন্নরূপে আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে গ্রন্থকারের মৌলিক চিন্তা ও রচনার পারিপাট্য উল্লেখযোগ্য। উক্ত 'বৈষ্ণবতোষণী'র 'লঘুতোষণী' নামক সংক্ষিপ্তসার জীব-প্রণীত। 'ভাগবতে'র 'ক্রমসন্দর্ভ' টীকা, অগ্নি ও পদ্মপুরাণের অংশবিশেষের টীকা, 'গোপালতাপনী' উপনিষদ ও 'ব্রহ্মসংহিতা'র টীকা এবং কৃষ্ণার্চনার পদ্ধতিস্বরূপ 'কৃষ্ণার্চাদীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থও জীব রচিত।

'ভাগবতের' ও 'ভগবদ্গীতার' টীকা ছাড়াও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা' ও 'মাধুর্যকাদম্বিনী' প্রভৃতি দশখানি গ্রন্থ বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন অবলম্বনে রচনা করিয়াছিলেন। ঈশ্বর ও সখা প্রভৃতি রূপে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সাধ্যসাধনকৌমুদী'র প্রতিপাদ্য বিষয়। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়' কবিকর্ণপূর বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণের জীবনী প্রসঙ্গে অনেক তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। সম্ভবত খ্রীঃ ১৭শ শতকের রূপ কবিরাজের 'সারসংগ্রহ' বৈষ্ণব দর্শনে একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আচার ও ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ 'হরিভক্তিবিলাস'। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা বা অন্তত ইহার কাঠামোটি, সনাতন রচিত। কাহারও কাহারও মতে, ইহা গোপাল ভট্ট

কর্তৃক রচিত বা পরিবর্ধিত; এই গোপালভট্ট বৃন্দাবনের ষট্ গোস্বামীর অন্যতম কিনা বলা যায় না। গোপালভট্টের নামাঙ্কিত 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা' উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টস্বরূপ; ইহাতে গৃহ্যানুষ্ঠানাদি আলোচিত হইয়াছে। গোপালদাসের (১৬শ শতক) 'ভক্তিরত্নাকর'-এ মুক্তিলাভের উপায় স্বরূপ কৃষ্ণভক্তির প্রাধান্য এবং 'ভাগবতের' প্রামাণিকতা প্রতিপাদনের প্রয়াস রহিয়াছে। বলদেব বিদ্যাভূষণের (১৮শ শতক) 'প্রমেয়রত্নাবলী' গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ। বেদান্তসূত্রের বলদেব রচিত ব্যাখ্যার নাম 'গোবিন্দভাষ্য'; ইহারই সংক্ষিপ্তসার তাঁহার রচিত 'সিদ্ধান্তরত্ন' বা 'ভাষ্যপীঠক'। 'ভগবদ্গীতা' এবং দশোপনিষদের টীকাও বলদেব রচিত। শান্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্যের 'ভাগবততত্ত্বসার' বৈষ্ণব শাস্ত্রে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'কৃষ্ণভক্তিসুধার্ণব', 'কৃষ্ণতত্ত্বার্ণব', 'ভক্তিরহস্য' প্রভৃতি নয়খানি নিবন্ধ ও টীকা রাধামোহন রচিত।

১০। অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যশাস্ত্র ও বৈষ্ণবরসশাস্ত্র

অলঙ্কার, ছন্দ ও নাট্যকলা বিষয়ে বাংলাদেশের দান সামান্য। এই সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে বাঙালী-রচিত যে কয়খানি গ্রন্থ আছে, উহাদের মধ্যে বিশেষ মৌলিকতা নাই। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে বাঙালীর কীর্তি গৌরবের বিষয়।

কবিকর্ণপূরের 'অলঙ্কারকৌস্তুভ' মম্মটের 'কাব্যপ্রকাশ' অনুসরণে রচিত। বিশেষত্ব এই যে, 'অলঙ্কারকৌস্তুভে'র অধিকাংশ উদাহরণশ্লোক কৃষ্ণস্তুতিবিষয়ক। ইহাতে ভক্তি, বাৎসল্য ও প্রেম রসরূপে পরিগণিত হইয়াছে। খ্রীঃ ১৭শ শতকের কবিচন্দ্র 'কাব্যচন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থে অলঙ্কার শাস্ত্রের মোটামুটি বিষয় এবং নাট্যশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন। একই শতকের রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি 'কাব্যরত্নাবলী' নামক অলঙ্কারগ্রন্থের রচয়িতা। বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন 'কাব্যকৌস্তুভ'। রামদেব (বা, বামদেব) চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের 'কাব্যবিলাস' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইনি চমৎকারিত্বকে কাব্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মায়ারস এবং বৈষ্ণবগণের বাৎসল্য, ভক্তি প্রভৃতি রস তদীয় গ্রন্থে স্বীকৃত হয় নাই। অলঙ্কারসমূহের উদাহরণশ্লোক চিরঞ্জীবের স্বরচিত।

উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও প্রাচীন অলঙ্কারগ্রন্থাদির, বিশেষতঃ 'কাব্যপ্রকাশ'

এবং 'সাহিত্যদর্পণে'র কয়েকখানি টীকা বাঙালীরচিত। তন্মধ্যে পরমানন্দ চক্রবর্তীর 'কাব্যপ্রকাশবিস্তারিকা', জয়রামের 'কাব্যপ্রকাশ-তিলক' এবং রামচরণ তর্কবাগীশের 'সাহিত্যদর্পণটীকা' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'ছন্দোমঞ্জরী'র রচয়িতা গঙ্গাদাস বৈদ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দেওয়ায় তিনি বাঙালী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার গ্রন্থের একটি অবহট্ট শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় তাঁহার জীবনকালের ঊর্ধ্বসীমারেখা খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে টানা যায়। ইহাতে সন্নিবিষ্ট উদাহরণশ্লোকগুলির অধিকাংশই গ্রন্থকারের রচনা এবং কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাবিষয়ক। 'বৃত্তমালা' নামক দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে একখানি কবিকর্ণপুরের নামাঙ্কিত এবং অপরটি রামচন্দ্র কবিভারতী প্রণীত। চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের 'বৃত্তরত্নাবলী' নামক গ্রন্থে উদাহরণস্বরূপ সুজাউদ্দৌলার সময়ে ঢাকার নায়েব দেওয়ান যশোবন্ত সিংহের প্রশস্তিসূচক শ্লোক আছে। চন্দ্রমোহন ঘোষের 'ছন্দঃসারসংগ্রহ' একখানি সঙ্কলনগ্রন্থ। কাশীনাথ চৌধুরী (অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক) 'পদ্যমুক্তাবলী' নামক ছন্দগ্রন্থের রচয়িতা।

রূপগোস্বামীর 'নাটকচন্দ্রিকা' ছাড়া বাংলাদেশে নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। দশটি রূপকের মধ্যে একমাত্র নাটক ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে অধিকাংশ উদাহরণ বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহ হইতে গৃহীত।

প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের সহিত তুলনায় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের সাহিত্যিক রসের পরিবর্তে বৈষ্ণবগণ ঐ শাস্ত্রের ভক্তিনামক ভাবকে রস বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন; এই রসের স্থায়িভাব কৃষ্ণরতি এবং ইহার আস্বাদ করিবেন অলঙ্কারশাস্ত্রের সহৃদয়ের পরিবর্তে ভক্ত। প্রাচীনতর শাস্ত্রের আটটি (শান্ত সহ নয়টি) রসের স্থলে বৈষ্ণবগণ পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরস স্বীকার করিলেন; যথা—শান্ত, প্রীত, প্রেয়, বাৎসল্য ও মধুর। শৃঙ্গার-রসের নাম ইঁহারা দিলেন মধুর, উজ্জ্বল বা শৃঙ্গার ভক্তিরস; এই রস ভক্তিরসরাজ এবং ইহার আলম্বন বিভাব স্বয়ং কৃষ্ণ। উক্ত মুখ্য ভক্তিরস ছাড়াও তাঁহারা সাতটি গৌণ ভক্তিরস স্বীকার করিয়াছেন; যথা—বীর, বীভৎস, রৌদ্র, হাস্য, ভয়ানক, করুণ ও অদ্ভুত।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে রূপগোস্বামীর অক্ষয় কীর্তি 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীল-মণি।' প্রথমোক্ত গ্রন্থে রূপ ভক্তিরসের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ভাব ও বিভাব

প্রভৃতির সংজ্ঞানির্দেশ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগ করিয়াছেন। রসশাস্ত্রে উজ্জ্বলরসের প্রাধান্যহেতুই, বোধ হয়, রূপগোস্বামী শুধু এই রসের বিশ্লেষণে 'উজ্জ্বলনীলমণি' রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে কৃষ্ণকে 'নায়কচূড়ামণি' এবং রাধাকে তাঁহার 'তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা' হ্লাদিনী শক্তিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, নায়িকার শ্রেণীভাগ ও সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের নানা অবস্থার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়াছেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যথাক্রমে 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুবিন্দু' এবং 'উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ' নামক গ্রন্থে। রূপের গ্রন্থদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন জীবগোস্বামী ; ব্যাখ্যাগ্রন্থ দুইখানির নাম যথাক্রমে—'দুর্গমসংগমনী' এবং 'লোচনরোচনী'। রূপের দুইটি গ্রন্থের পরিশিষ্টস্বরূপ 'রসামৃতশেষ' নামক গ্রন্থও সম্ভবত জীব রচিত।

১১। ব্যাকরণ

টীকাকার সৃষ্টিধরের সাক্ষ্য অনুসারে পুরুষোত্তমদেব লক্ষ্মণসেনের আদেশে 'অষ্টাধ্যায়ী'র 'ভাষাবৃত্তি' নামক বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, পুরুষোত্তমের গ্রন্থে বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব' এর কোন ভেদ দেখা যায় না। একটি সূত্রের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার পদ্মাবতী (=পদ্মা) নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল কারণে তাঁহাকে বাঙালী মনে করা হয়। বৌদ্ধ বলিয়াই সম্ভবত পুরুষোত্তম 'অষ্টাধ্যায়ী'র বৈদিক অংশ বর্জন করিয়াছেন। 'ভাষাবৃত্তি' সংক্ষিপ্ত অথচ সহজ-বোধ্য। 'দুর্ঘটবৃত্তি'-রচয়িতা শরণদেব ও লক্ষ্মণসেনের সভাকবি শরণ, কাহারও কাহারও মতে অভিন্ন। যে সকল প্রয়োগ আপাতদৃষ্টিতে অপাণিনীয় উহাদের শুদ্ধিবিচার এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। রূপগোস্বামীর (মতান্তরে সনাতনের বা জীবের) 'সংক্ষেপ—(বা, লঘু-) হরিনামামৃতব্যাকরণে'র বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে সংজ্ঞা ও উদাহরণগুলি রাধাকৃষ্ণের বা কৃষ্ণলীলার নামাঙ্কিত। ইহার অধিকাংশ সূত্রে বিষ্ণুর বা তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর নাম আছে। জীবগোস্বামীর 'হরিনামামৃত' ব্যাকরণ বৃহত্তর গ্রন্থ এবং একই উদ্দেশ্যে রচিত। স্বরচিত ব্যাকরণের পরিশিষ্ট স্বরূপ ইনি 'ধাতুসংগ্রহ' বা 'ধাতুসূত্রমালিকা' (?) নামক গ্রন্থও রচনা করিয়া-ছিলেন।

'অষ্টাধ্যায়ী'র সংক্ষিপ্তরূপ 'সংক্ষিপ্তসার' নামক ব্যাকরণের প্রণেতা ক্রমদীশ্বর

(পঞ্চদশ শতক ?) কাহারও কাহারও মতে ছিলেন বাঙালী। পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর (ষোড়শ শতকের পূর্ববর্তী ?) দুর্গসিংহের 'কাতন্ত্রবৃত্তিটীকা'র ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'কাতন্ত্রপ্রদীপ' গ্রন্থে। ইহা ছাড়া, 'ন্যাসটীকা', 'কারককৌমুদী' 'তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশ' ও 'কাতন্ত্রপরিশিষ্টটীকা' পুণ্ডরীকাক্ষ রচিত। বলরাম পঞ্চাননের 'প্রবোধপ্রকাশ' শৈব সম্প্রদায়ের ব্যাকরণ ; ইহাতে স্বরবর্ণের নাম 'শিব' ও ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ অভিহিত হইয়াছে 'শক্তি' নামে। 'ধাতুপ্রকাশ' নামক ধাতুপাঠ বলরামের নামের সহিত যুক্ত।

উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়া বাঙালী পণ্ডিতগণ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ ও টীকাটিপ্পনী রচনা করিয়াছিলেন। এই জাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভরত সেন বা ভরত মল্লিকের 'দ্রুতবোধব্যাকরণ', 'সুখলেখন' এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতির 'আশুবোধব্যাকরণ'। টীকাটিপ্পনীসমূহের মধ্যে ত্রিলোচন দাসের 'কাতন্ত্রবৃত্তি-পঞ্জিকা' উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে 'কাতন্ত্রব্যাকরণে'র সংক্ষিপ্তসার বা টীকার সংখ্যাই অধিকতর। অনেক বাঙালী নৈয়ায়িক ব্যাকরণের নানা বিষয় সম্বন্ধে বহু বাদগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

১২। অভিধান

বাঙালী পণ্ডিতগণ শুধু প্রসিদ্ধ অভিধানের টীকা রচনা করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অভিধানগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। এই অভিধানগুলির মধ্যে কতক অভিনব প্রণালীতে রচিত।

সম্ভবত বৈয়াকরণ পুরুষোত্তমদেবের সহিত অভিন্ন পুরুষোত্তমদেবের 'ত্রিকাণ্ড-শেষ' বিখ্যাত অভিধান। 'নামলিঙ্গানুশাসন' বা 'অমরকোষের' অপূর্ণ অংশ পূরণ করাই অভিধানকারের উদ্দেশ্য—ইহা তিনি এই গ্রন্থে (১।১।২) নিজেই বলিয়াছেন। পুরুষোত্তমের অপর অভিধানগুলির নাম 'হারাবলী', 'বর্ণদেশনা' ও 'দ্বিরূপকোষ'। প্রথম গ্রন্থটিতে সাধারণত অপ্রচলিত প্রতিশব্দ ও সমধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থক শব্দসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে আছে বিভিন্নরূপ বর্ণবিন্যাসবিশিষ্ট শব্দসমূহের সংগ্রহ। ইহাতে সংগৃহীত শব্দগুলির বর্ণবিন্যাসপদ্ধতি দ্বিবিধ। 'একাক্ষরকোষ' নামক অভিধানও ইহার নামাঙ্কিত। চাটুগ্রাম (= চট্টগ্রাম ?) নিবাসী জটাধর (পঞ্চদশ শতক ?) 'অভিধানতন্ত্র' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। পঞ্চদশ শতকের বৃহস্পতি রায়মুকুট রচনা করিয়াছিলেন 'অমরকোষে'র বিস্তৃত টীকা

'পদচন্দ্রিকা'। বর্তমান গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ভরতমল্লিকের (আঃ সপ্তদশ শতক) অভিধান দুইটি—'একবর্ণার্থসংগ্রহ' ও 'দ্বিরূপধ্বনিসংগ্রহ'। তাঁহার 'মুগ্ধবোধিনী' 'অমরকোষে'র টীকা। 'লিঙ্গাদিসংগ্রহ' নামক গ্রন্থে তিনি 'অমরকোষ'-ধৃত শব্দগুলির লিঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন।

সপ্তদশ শতকের মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার 'শব্দরত্নাবলী' নামক অভিধান রচনা করিয়াছিলেন; 'নানার্থশব্দ' ইহারই অংশ। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের আনুকূল্যে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু রামানন্দ ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র রঘুমণি বিদ্যাভূষণ 'প্রাণকৃষ্ণ-শব্দাব্ধি' প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রঘুমণির অপর অভিধানের নাম 'শব্দমুক্তা-মহার্ণব'।

১৩। বিবিধ

বাঙালী-রচিত এমন কতক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে যেগুলিকে পূর্বোক্ত কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এইরূপ বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য।

রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি বা সিদ্ধান্তবাচস্পতি (খ্রীঃ ১৭শ শতক) এবং রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কতক বৈদিক মন্ত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। চিরঞ্জীব (১৭শ-১৮শ শতক) 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিনী' নামক গ্রন্থে তদীয় পিতা রাঘবেন্দ্র শতাবধান-রচিত 'মন্ত্রার্থদীপ', (মন্ত্রদীপ ?) নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাতে আছে কতক বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত। কাত্যায়নের 'ছন্দোগপরিশিষ্টে'র 'ছন্দোগ-পরিশিষ্টপ্রকাশ' নামক টীকার রচয়িতা নারায়ণ স্বীয় পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বপুরুষ ছিলেন উত্তর রাঢ়ের অধিবাসী। 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত'-এ নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষগণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। অনঙ্গরঙ্গ নামক গ্রন্থ কল্যাণমল্লভূপতির নামের সহিত যুক্ত; এই কল্যাণমল্ল সম্ভবত ভরত-মল্লিকের (১৭শ শতক ?) পৃষ্ঠপোষক এবং বর্ধমানের অন্তর্গত ভূরশুট নিবাসী ছিলেন। গোবিন্দ রায় 'স্বাস্থ্যতত্ত্ব' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা।

'নাদদীপক' নামক গ্রন্থে জনৈক ভট্টাচার্য শব্দ, নাদ, ও স্বরাদির উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া রাগরাগিণী প্রভৃতি নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। রঘুনন্দন 'হরি-স্মৃতিসুধাঙ্কুর'-এ রাগরাগিণী নিরূপণপূর্বক হরিবিষয়ক সঙ্গীত নিরূপণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

চম্পাহট্টীয়কুলজাত ঈশানের পুত্র অর্জুন মিশ্র (পঞ্চদশ শতক) মহাভারতের 'মহাভারতার্থপ্রদীপিকা' বা 'ভারতসংগ্রহদীপিকা' নামক টীকার রচয়িতা।

বাংলাদেশে বহু কুলপঞ্জী সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল। সর্বক্ষেত্রে কুলপঞ্জীর বিবরণ হয়ত নির্ভরযোগ্য নহে; কিন্তু বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের পক্ষে এই সকল গ্রন্থের তথ্য একেবারে অগ্রাহ্য নহে। চন্দ্রকান্ত ঘটকের 'রাঢ়ীয়কুলকল্পদ্রুম', ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশাবলী', রামানন্দ শর্মার 'কুলদীপিকা', ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা', 'রত্নপ্রভা' ও 'বৈদ্যকুলতত্ত্ব' এবং রামকান্ত দাসের 'সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা' প্রভৃতি এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বাংলা সাহিত্য

চর্যাগীতির রচনা দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল। জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' বাংলায় রচিত না হইলেও বাংলা সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কান্বিত, তাহাও ১২০০ খ্রীঃর মত সময়ে প্রণীত হইয়াছিল। ইহার পর প্রায় আড়াই শত বৎসর বাঙালীর সাহিত্যসৃষ্টির বিশেষ কোন নিদর্শন পাই না। এই সময়টাতে বাঙালী সংস্কৃত ভাষাতেও উল্লেখযোগ্য কিছু রচনা করে নাই, বাংলা ভাষাতে তো করেই নাই। কেন করে নাই, তাহা বলা দুঃসাধ্য। অনেকে মুসলমান বিজয়কেই এ জন্য দায়ী করেন। তাঁহাদের মতে মুসলমান বিজেতাদের অত্যাচার ও তাহাদের হিন্দুদের গ্রন্থাদি নষ্ট করার প্রবণতার দরুণ এবং সারা দেশে অশান্তি ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করিতে থাকার দরুণই এদেশে এই সময়ে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু এই অভিমত স্বীকার করা যায় না। কারণ হিন্দুদের সাহিত্যের প্রতি মুসলমানদের আক্রোশের কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অশান্তির সময়েও যে সাহিত্যিকের লেখনী নিশ্চল হইয়া থাকে না, তাহার বহু প্রমাণ বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। সুতরাং আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশে সাহিত্যসৃষ্টির অনাবির্ভাবের কারণ এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়। সম্ভবত ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, এই সময়ের মধ্যে কোন প্রতিভাধর সাহিত্যিক আবির্ভূত হন নাই। কিছু নগণ্য লেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অকিঞ্চিৎকর রচনা স্বতই লুপ্ত ও বিস্মৃত হইয়াছে।

১। বিদ্যাপতি

পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙালী কবিদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস। অবশ্য আরও একজন কবির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইতে পারে—ইনি মৈথিল কবি বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি বাঙালী নহেন, এবং

বাংলা ভাষায় কিছু লেখেন নাই। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার নাম বাংলা সাহিত্যের সহিত অচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িত হইয়া গিয়াছে, কারণ বিদ্যাপতির জনপ্রিয়তা তাঁহার মাতৃভূমি মিথিলা অপেক্ষা বাংলাদেশেই অধিক হইয়াছিল; স্বয়ং চৈতন্যদেবের নিকট বিদ্যাপতির পদ অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বিদ্যাপতি যে বাঙালী নহেন, সে কথাই এক সময়ে বাংলাদেশের লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ পদগুলি বাংলাদেশেই সংরক্ষিত হইয়া কালের গ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। এইগুলি এখন যে ভাবে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বাঙালীর হাতের ছাপও অনেকখানি আছে। তাহা ভিন্ন বাংলায় প্রচলিত বিদ্যাপতি-নামাঙ্কিত পদগুলি যে সমস্তই মৈথিল বিদ্যাপতির রচনা, তাহাও নহে। ইহাদের মধ্যে পরবর্তী কালের এক বা একাধিক বাঙালী বিদ্যাপতির রচনা আছে; আছে সেই সমস্ত অজ্ঞাতনামা কবির রচনা, যাঁহারা নিজেদের পদকে অমরত্ব দান করিবার জন্য তাহাতে নিজের ভণিতা না দিয়া বিদ্যাপতির ভণিতা বসাইয়া দিয়াছিলেন; অধিকন্তু ইহাদের মধ্যে আছে অন্য অনেক কবির লেখা পদ, যেগুলির মধ্যে আদিতে মূল কবিরই ভণিতা ছিল, গায়নরা বা পুঁথি-লিপিকররা পদগুলির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহাদের ভণিতা বদলাইয়া মূল কবিদের নামের স্থলে বিদ্যাপতির নাম প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যাপতি-নামাঙ্কিত পদগুলির মধ্যে কেবল মৈথিল বিদ্যাপতিরই রচনা নাই, অনেক বাঙালী কবিরও রচনা আছে। অতএব যে কোন দিক হইতেই দেখা যাক্ না কেন, বিদ্যাপতিকে বা তাঁহার নামাঙ্কিত পদগুলিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে নির্বাসন দেওয়ার কোন উপায় নাই।

বিদ্যাপতি শুধু কবি ছিলেন না, নানা বিষয়ের নানা গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে কয়েকটি স্মৃতিগ্রন্থ,—দানবাক্যাবলী, বিভাগসার, বর্ষকৃত্য ও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, দুইটি গল্পের বই—ভূপরিক্রমা ও পুরুষ-পরীক্ষা, একটি পৌরাণিক নিবন্ধ—শৈবসর্বস্বসার, একটি পত্রলিখন বিষয়ক গ্রন্থ—লিখনাবলী, একটি নাটক—গোরক্ষবিজয়, দুইটি সমসাময়িক রাজার কীর্তিগাথা—কীর্তিলতা ও কীর্তিপতাকা। বিদ্যাপতির রচিত পদগুলি নানা ধরণের; লৌকিক প্রেমবিষয়ক পদ, রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ, হরগৌরী বিষয়ক পদ, গঙ্গা সম্বন্ধীয় পদ, অন্যান্য দেবদেবী বিষয়ক পদ, প্রহেলিকা পদ—প্রভৃতি অনেক ধরনের পদই তিনি রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে লৌকিক প্রেম বিষয়ক পদ ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলিই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। তবে মিথিলায় তাঁহার হরগৌরী বিষয়ক পদগুলি

সমধিক প্রসিদ্ধ। বিদ্যাপতির পদগুলি মৈথিলী ও ব্রজবুলি ভাষায়, 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা' অবহট্ট ভাষায় এবং অন্যান্য গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বিদ্যাপতির মত বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ও এতগুলি ভাষায় লেখনী ধারণে সক্ষম লেখক সেযুগে বোধহয় আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।

বিদ্যাপতির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে প্রায় কিছুই অবগত হওয়া যায় না। তিনি পণ্ডিত ছিলেন ও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন কথা প্রামাণিকভাবে জানা যায় না। তবে একটি বিষয় জানা যায়—তিনি মিথিলা বা ত্রিহুতের ওইনিবার বংশীয় ব্রাহ্মণ রাজাদের এবং রাজপরিবারভুক্ত বিভিন্ন লোকদের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত রাজারা স্বাধীন ছিলেন না। জৌনপুরের সুলতান এই সময় ত্রিহুতের সার্বভৌম অধিপতি ছিলেন; তাঁহার অধীনে এই সব রাজারা সামন্ত ছিলেন। বিদ্যাপতি ভোগীশ্বর, কীর্তিসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ, নরসিংহ, ধীরসিংহ, ভৈরব-সিংহ প্রভৃতি অনেক রাজা ও রাজপুত্রের নিকটে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন, তবে ইঁহাদের মধ্যে শিবসিংহের সহিতই তাঁহার সম্পর্ক ছিল সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের মত বিদ্যাপতি ও শিবসিংহের নামও এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া আছে। শিবসিংহের রানী লছিমার নামও বিদ্যাপতির অনেক পদে উল্লিখিত হইয়াছে। তবে বিদ্যাপতি ও লছিমার পরকীয়া প্রেম সম্বন্ধে বাংলা দেশে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা অমূলক।

বিদ্যাপতি একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। প্রেমের মধুর, সুকুমার রূপ তাঁহার পদাবলীতে অপরূপভাবে শিল্পকলামণ্ডিত হইয়া রূপায়িত হইয়াছে। রূপের বর্ণনাতে তাঁহার জুড়ি নাই; বিশেষভাবে বয়ঃসন্ধি পর্যায়ের নায়িকার তরুণ লাবণ্যের বর্ণনায় তিনি অদ্বিতীয়। বিদ্যাপতির পদের বাণীসৌন্দর্যও অনন্য-সাধারণ। তাঁহার ভাষা যেমন মার্জিত ও মধুর, ছন্দও তেমনি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, তাঁহার শব্দচয়নও ত্রুটিহীন। বিদ্যাপতির উপমা ও উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারগুলি অত্যন্ত মৌলিক ও হৃদয়গ্রাহী। অবশ্য বিদ্যাপতির অনেক পদে সৌন্দর্যের তুলনায় ভাবগভীরতার অভাব দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার লেখা বিরহ ও ভাবসম্মিলন বিষয়ক পদগুলিতে আবার ভাবের অতলস্পর্শী গভীরতার নিদর্শন মিলে, বিরহের অপরিসীম শূন্যতা ও বিরহিণীর হৃদয়ের অন্তহীন হাহাকার এই পদগুলির মধ্যে অপূর্বভাবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

বাংলাদেশের পদাবলী-সংকলনগ্রন্থগুলিতে বিদ্যাপতির পদগুলিকে অত্যন্ত বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশের বৈষ্ণব পদকর্তারা শুধু কবি ছিলেন না, সেই সঙ্গে ভক্তও ছিলেন। বিদ্যাপতিও তাহাই ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু বিদ্যাপতি কেবলমাত্র কবি ছিলেন, নিছক কাব্য-প্রেরণার তাগিদেই তিনি পদ লিখিয়াছিলেন ; তিনি যে ভক্ত ছিলেন অথবা বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাপতি নানা ধরনের পদ লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদও অন্যতম ; রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ রচনার দিকে তাঁহার যে বিশেষ ধরনের আসক্তি ছিল, তাহা নহে ; তাঁহার প্রেমবিষয়ক পদগুলির মধ্যে অধিকাংশই লৌকিক প্রেমের পদ, এগুলিতে রাধাকৃষ্ণের নাম নাই ; যেগুলিতে রাধাকৃষ্ণের নাম আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিতে ভক্তিভাবের কোন নিদর্শন মিলে না, সেগুলিও প্রেমবিষয়ক পদ।

বিদ্যাপতির পদগুলি অপূর্ব হইলেও তাহাদের একটা ত্রুটি এই যে, তাহাদের মধ্যে অনেক স্থানে অশ্লীল ও রুচিবিগর্হিত বর্ণনা পাওয়া যায় ; অসামাজিক ও অশোভন পরকীয়া প্রেমের নগ্ন বর্ণনাও তাঁহার অনেক পদে দেখা যায় ; তবে এগুলির জন্য বিদ্যাপতি ততটা দায়ী নহেন, যতটা দায়ী তাঁহার সমসাময়িক কালের রুচি ও প্রবৃত্তি।

বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ এমন অনেক পদ বর্তমানে প্রচলিত আছে, যেগুলি অন্য কবিদের রচনা, যথা—'ভরা বাদর মাহ ভাদর' ও 'কি পুছসি অনুভব মোয়' ; এই দুইটি পদ যথাক্রমে শেখর ও কবিবল্লভের রচনা।

বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল নির্ণয়ের প্রশ্ন কিছু জটিল। অনেক সমসাময়িক পুঁথিতে তাঁহার নাম পাওয়া যায় ; এই সব পুঁথির তারিখ 'লক্ষ্মণসেন-সংবতে' (সংক্ষেপে 'ল সং') দেওয়া আছে। ল সং-এর আদি বৎসর কোন্ খ্রীষ্টাব্দে পড়িয়াছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কীলহর্ন মনে করিয়াছিলেন, ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দই ল সং-এর আদি বৎসর, কিন্তু এই মত ভিত্তিহীন। এ পর্যন্ত যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে মিথিলায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ল সং প্রচলিত ছিল এবং খ্রীষ্টাব্দের সঙ্গে তাহাদের পার্থক্য ১০৭৯ বৎসর হইতে সুরু করিয়া ১১২৯ বৎসর পর্যন্ত হইত।

যাহা হউক, ল সং-এ তারিখ দেওয়া পুঁথিগুলি হইতে একটা বিষয় জানা যায় যে, বিদ্যাপতি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগে

বর্তমান ছিলেন। এই পুঁথিগুলির সাক্ষ্য বাদ দিলেও বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল নির্ণয় করা যায়। বিদ্যাপতির প্রথম দিককার একটি পদে রাজা ভোগীশ্বরের নাম পৃষ্ঠপোষক হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে ; ভোগীশ্বর ফিরোজ শাহ তোগলকের (রাজত্বকাল ১৩৫১-৮৮ খ্রীঃ) সমসাময়িক। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কী পঞ্চদশ শতকের প্রথম দশকে ত্রিহুতে আসিয়া রাজা কীর্তিসিংহকে তাঁহার পিতৃ-সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ; বিদ্যাপতি ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন, কারণ তিনি এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার 'কীর্তিলতা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাজা শিবসিংহ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে রাজত্ব করেন এবং ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম শর্কী ও বাংলার রাজা গণেশের সংঘর্ষে গণেশের পক্ষাবলম্বন করেন। সুতরাং বিদ্যাপতি নিশ্চয়ই ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন। বিদ্যাপতি রাজা নরসিংহেরও পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন, নরসিংহের একটি শিলালিপির তারিখ ১৩৭৫ শক বা ১৪৫৩ খ্রীঃ। মোটের উপর বিদ্যাপতি আনুমানিকভাবে ১৩৭০ খ্রীঃ হইতে ১৪৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই বিদ্যাপতির জীবৎকাল সম্বন্ধে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যের এবং তাঁহার ভোগীশ্বর হইতে নরসিংহ পর্যন্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করার সামঞ্জস্য করা যায়।

নরসিংহের এক পুত্র ধীরসিংহ পিতার জীবদ্দশাতেই রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু অপর পুত্র ভৈরবসিংহ পিতার পরে রাজা হন। বিদ্যাপতি তাঁহার কোন কোন পদ ও গ্রন্থে ভৈরবসিংহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সর্বত্র তাঁহাকে তিনি 'রাজপুত্র' বলিয়াছেন, কোথাও 'রাজা' বলেন নাই। ভৈরবসিংহ ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন বলিয়া প্রামাণিকভাবে জানা যায় ; সুতরাং বিদ্যাপতি যে ১৪৭৩ খ্রীঃর পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প।

২। চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাস একজন শ্রেষ্ঠ ও অবিস্মরণীয় কবি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে তাঁহাকে লইয়া এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। সংক্ষেপে আমরা এই সমস্যাটি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

চণ্ডীদাসের নামে অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ বাংলা রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ প্রচলিত

আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত সকলে এইগুলিকেই কবি চণ্ডীদাসের একমাত্র কৃতি বলিয়া জানিত। চণ্ডীদাস যে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি, তাহাতেও কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না, কারণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও অন্যান্য প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে লেখা আছে যে চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের লেখা গীত শুনিতেন।

কিন্তু ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে এক-খানি নবাবিষ্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার ফলে সমস্যার সৃষ্টি হইল। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' একখানি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক আখ্যানকাব্য ; জন্মখণ্ড, তাম্বূলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড —ইত্যাদি অনেকগুলি খণ্ডে কাব্যখানি বিভক্ত ; ভণিতায় এই কাব্যের রচয়িতার নাম পাওয়া যায় 'বড়ু চণ্ডীদাস'। কাব্যখানির ভাষা প্রাচীন ধরনের, রচনার মধ্যে লেখকের পাণ্ডিত্য ও অলঙ্কারপ্রীতির নিদর্শন আছে, উপরন্তু তাহার মধ্যে স্থূল আদিরস এবং অশ্লীল বর্ণনার নিদর্শন অনেক স্থানে মিলে ; কাব্যের মধ্যে কবিত্বের পরিচয় যথেষ্ট থাকিলেও কাব্যটিতে আধ্যাত্মিকতা বিশেষ নাই, উৎকট লালসার কথাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ পদগুলির ভাষা আধুনিক ভাষার কাছাকাছি, তাহাদের মধ্যে লেখকের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন বা কৃত্রিম অলঙ্কার সৃষ্টির কোন নিদর্শন নাই এবং তাহাদের ভাব অত্যন্ত পবিত্র ও অপার্থিব আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ। অবশ্য দুইটি বিষয়ে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র সঙ্গে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদাবলীর মিল দেখা গেল ; উভয় রচনাতেই কবি মাঝে মাঝে "বাসলী" (বা "বাশুলী") দেবীর বন্দনা করিয়াছেন আর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মত পদাবলীতেও অনেক স্থানে কবির ভণিতায় 'বড়ু চণ্ডীদাস' নাম পাওয়া যায়। ইহার পরে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র একটি পদ রূপান্তরিত আকারে প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে পাওয়া গেল। চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট পার্ষদ সনাতন গোস্বামী তাঁহার 'বৃহৎবৈষ্ণব-তোষণী' নামক ভাগবতের টীকার মধ্যে চণ্ডীদাস রচিত "দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড"র উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াও আবিষ্কৃত হইল।

যাহা হউক, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রকাশিত হইবার পর হইতেই এই গ্রন্থ ও চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত শ্রেষ্ঠ পদগুলি এক লোকের লেখা কিনা, সে সম্বন্ধে বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে একজন অর্বাচীন চণ্ডীদাসের লেখা একটি বৃহৎ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক আখ্যানকাব্য আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই বইটির মধ্যে কবি অনেকবার "দীন চণ্ডীদাস" নামে নিজেকে অভিহিত করিয়াছেন। এই

কাব্যটিতে চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালের ভাবধারার প্রভাব আছে এবং রূপ গোস্বামীর গ্রন্থের নাম আছে। পর্তুগীজ শব্দও আছে। বইটির মধ্যে কবিত্বশক্তি বিশেষ কিছুই নাই। এই বইখানি ছাড়াও চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত আরও বহু নিকৃষ্ট পদ পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের ভণিতায় বহু সহজিয়া পদও পাওয়া গিয়াছে।

পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলি মিলিয়া চণ্ডীদাস-সমস্যাকে এত ঘোরাল করিয়া তুলিয়াছে যে, এ সম্বন্ধে সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশা করা যাইতে পারে না। তবে, যে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ একমত, সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

(ক) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালের রচনা। কোন কোন পণ্ডিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে চৈতন্য-পরবর্তী রচনা বলিতে চাহেন, কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষার প্রাচীনতা, আদিরসের স্থূলতা, ইহার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও প্রাচীন ভাবধারার নিদর্শন মেলা এবং সনাতন গোস্বামী কর্তৃক চণ্ডীদাস রচিত "দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড"র উল্লেখ—এই সমস্ত কারণের জন্য ইহাকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী রচনা বলাই সঙ্গত।

(খ) চৈতন্যদেবের পূর্বে মাত্র একজন চণ্ডীদাসই ছিলেন, তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। অবশ্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' চৈতন্যদেব আস্বাদন করেন নাই, করিলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এমনভাবে বিস্মৃত ও লুপ্তপ্রায় হইত না। সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ছাড়া কতকগুলি পদও লিখিয়াছিলেন এবং চৈতন্যদেব তাহাই আস্বাদন করিয়াছিলেন—এইরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।

(গ) চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত শ্রেষ্ঠ পদগুলির মধ্যে কতকগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা; বাকীগুলির মধ্যে কয়েকটি অন্যান্য কবির রচনা, এখন চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট শ্রেষ্ঠ পদগুলি 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' নামক একজন চৈতন্য-পরবর্তী কবির রচনা।

(ঘ) চৈতন্য-পরবর্তী কালের কবি "দীন চণ্ডীদাস"—"বড়ু চণ্ডীদাস" ও "দ্বিজ চণ্ডীদাস" হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কোন কোন গবেষক মনে করেন, দীন চণ্ডীদাসই চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত শ্রেষ্ঠ পদগুলির রচয়িতা। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে; কারণ—প্রথমত, দীন চণ্ডীদাসের অসন্দিগ্ধ রচনাগুলি অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর; দ্বিতীয়ত, তাঁহার কৃষ্ণলীলা বিষয়ক আখ্যানকাব্যে বহু পদ থাকিলেও শ্রেষ্ঠ

পদগুলির একটিও তাহার মধ্যে মিলে নাই ; তৃতীয়ত, শ্রেষ্ঠ পদগুলির মধ্যে কোথাও "দীন চণ্ডীদাস" ভণিতা মিলে নাই।

(ঙ) চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত সহজিয়া পদগুলির মধ্যে অধিকাংশই চণ্ডীদাসের নাম দিয়া অন্য সহজিয়া কবিরা লিখিয়াছেন ; চণ্ডীদাসকে সহজিয়ারা নিজেদের গুরু মনে করিতেন, তাঁহাকে তাঁহারা "রসিক" আখ্যা দিয়াছেন এবং তাঁহারাই তাঁহার নামে সহজিয়া পদ লিখিয়া নিজেদের কৌলীন্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। অবশ্য সহজিয়াদের মধ্যে চণ্ডীদাস নামক পৃথক কবিও কেহ কেহ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তরুণীরমণ নামক একজন সহজিয়া কবির নামান্তর ছিল চণ্ডীদাস।

(চ) চণ্ডীদাস নামে আরও দুই একজন অর্বাচীন ও নগণ্য কবি ছিলেন।

'পদকল্পতরু'তে সঙ্কলিত দুইটি পদে বলা হইয়াছে যে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন, তাঁহারা পরস্পরকে গীত লিখিয়া প্রেরণ করিতেন এবং উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আরও দুইটি পদে বলা হইয়াছে যে, সাক্ষাতের পর উভয়ের মধ্যে সহজিয়া তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। কোন কোন গবেষকের মতে প্রথম দুইটি পদের উক্তি সত্য, অর্থাৎ বড়ু চণ্ডীদাস ও মৈথিল বিদ্যাপতির সমসাময়িকত্ব, পরস্পরের সহিত যোগাযোগস্থাপন ও মিলন ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু শেষ দুইটি পদের উক্তি, অর্থাৎ কবিদের সহজিয়া তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করার কথা সত্য নহে। আবার কোন কোন গবেষক মনে করেন, চারিটি পদের উক্তিই কবিকল্পনা মাত্র। তৃতীয় একদল গবেষকের মতে পদগুলির কথা সত্য, কিন্তু চৈতন্য-পূর্ববর্তী চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কথা তাহাদের মধ্যে বলা হয় নাই, চৈতন্য-পরবর্তী দ্বিতীয় চণ্ডীদাস ও দ্বিতীয় বিদ্যাপতির কথা ইহাদের মধ্যে বলা হইয়াছে এবং ইঁহাদের মধ্যেই মিলন ঘটিয়াছিল ; কিন্তু এই মত সত্য হইতে পারে না, কারণ পদগুলির মধ্যে "লছিমা"র উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে, ইহাদের মধ্যে 'বিদ্যাপতি' বলিতে চৈতন্য-পূর্ববর্তী বিদ্যাপতিকে বুঝানো হইয়াছে।

রামী নামে চণ্ডীদাসের একজন রজকজাতীয়া পরকীয়া প্রেমিকা ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই প্রবাদ অমূলক এবং সহজিয়াদের বানানো বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন সহজ-পন্থী সাধকেরা আধ্যাত্মিক শক্তির তারতম্য অনুসারে ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী—এই পাঁচটি কুলে বিভক্ত হইতেন। চণ্ডীদাস হয়ত "রজকী" কুলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এই ব্যাপারটিই পরে পল্লবিত হইয়া তাঁহার

রজকিনী-প্রেমের উপাখ্যানে পর্যবসিত হইয়াছে—এইরূপ হইতে পারে। চণ্ডীদাসের বাসভূমি হিসাবে কোন কোন কিংবদন্তীতে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা এবং কোন কোন কিংবদন্তীতে বীরভূম জেলার নান্নুরের নাম পাওয়া যায়। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক বিষয় হইতে মনে হয়, বড়ু চণ্ডীদাস বাঁকুড়া অঞ্চলের এবং দ্বিজ চণ্ডীদাস বীরভূম অঞ্চলের লোক। তবে এ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না।

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে অনেক অশ্লীল ও রুচিবিগর্হিত উপাদান থাকিলেও কাব্যটি শক্তিশালী কবির রচনা। কবি সংক্ষিপ্ত ও শাণিত উক্তিপরম্পরার মধ্য দিয়া এবং লৌকিক জীবনের উপমার মধ্য দিয়া যেরূপে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। এই কাব্যের 'বংশীখণ্ড' ও 'রাধাবিরহ' নামক খণ্ড দুইটি উচ্চস্তরের রচনা, ইহাদের মধ্যে স্থূলতা বা অশ্লীলতা বিশেষ নাই; এই দুইটি খণ্ডে গভীর প্রেমের হৃদয়গ্রাহী অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে তিনটি প্রধান চরিত্র—রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই (বৃদ্ধা দূতী); তিনটিই জীবন্ত, উজ্জ্বল ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাধার চরিত্র একটি সুন্দর ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কাব্যটি প্রায় আগাগোড়াই নাটকীয় রীতিতে, অর্থাৎ বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর উক্তিপ্রত্যুক্তির মধ্য দিয়া রচিত; তাহার ফলে ইহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে নাট্যরস সৃষ্টি হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' সে যুগের সমাজ সম্বন্ধে অজস্র তথ্য পাওয়া যায়; তখনকার লোকদের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, খাদ্য-পরিধেয়, এমন কি কুসংস্কার—সব কিছুর পরিচয় এই গ্রন্থ হইতে মিলে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে স্থূল লালসার বর্ণনা হইতে মনে হয়, সে যুগে বাঙালী বিশেষভাবে দেহসচেতন ও ভোগাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদগুলি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই পদগুলিতে ভাবের যে গভীরতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তুলনা বিরল। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রেমের বেদনাকে মর্মস্পর্শী-ভাবে রূপায়িত করা হইয়াছে। এই পদগুলিতে একটি অপার্থিব আধ্যাত্মিকতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পদে যে রাধার দেখা পাওয়া যায়, তিনি বাহ্যত প্রেমিকা হইলেও প্রকৃতপক্ষে সাধিকা, হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ তাঁহাকে জীবনের সমস্ত ভোগ ও সুখের মোহ ভুলাইয়া দিয়া তপস্বিনীতে পরিণত করিয়াছে। চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদগুলিতে গভীরতম ভাব অভিব্যক্ত হইলেও পদগুলির ভাষা অত্যন্ত সরল; ইহাদের

মধ্যে সর্বজনবোধ্য উপমার মধ্য দিয়া ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের একজন কবি চণ্ডীদাসের পদ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদগুণেতে ভরা"। এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সার্থক। চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদগুলির মধ্যে বিশেষভাবে পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ, রসোদ্গার, আত্মনিবেদন, বিরহ ও ভাবসম্মিলনের পদগুলি উৎকৃষ্ট।

৩। কৃত্তিবাস

কৃত্তিবাস সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। তাঁহার মত জনপ্রিয় কবি বাংলাদেশে বোধ হয় আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আবির্ভাব-কালের পরে কত শতাব্দী পার হইয়া গিয়াছে, অথচ তাঁহার জনপ্রিয়তা এখনও অম্লান।

কিন্তু এই জনপ্রিয়তা একদিক দিয়া ক্ষতির কারণ হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বিপুল প্রচার লাভ করিবার ফলে লোকমুখে এত পরিবর্তিত হইয়াছে এবং তাহাতে এত প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রবেশ করিয়াছে যে কৃত্তিবাস-রচিত মূল রামায়ণের বিশেষ কিছুই আজ বর্তমানপ্রচলিত "কৃত্তিবাসী রামায়ণ"-এর মধ্যে অবশিষ্ট নাই।

কৃত্তিবাসের রামায়ণকে বাঙালীর জাতীয় কাব্য বলা যাইতে পারে। কারণ—প্রথমত, সমগ্র জাতিই এই কাব্যকে সাদরে বরণ করিয়াছে, কোটিপতির প্রাসাদ হইতে দীনদরিদ্রের পর্ণ-কুটির পর্যন্ত, দেশের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্যন্ত এ-কাব্যের সমান জনপ্রিয়তা; দ্বিতীয়ত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ বর্তমানে যে রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা আর ব্যক্তিবিশেষের রচনা নাই, তাহার উপরে সমগ্র জাতির হাতের ছাপ আছে; তৃতীয়ত, কৃত্তিবাসের রামায়ণের চরিত্রগুলি ও তাহাদের জীবনযাত্রা অবিকল বাঙালীর চরিত্র ও জীবনযাত্রার ছাঁচে ঢালা; চতুর্থত, কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের স্বাক্ষর সংরক্ষিত হইয়াছে,—যে স্তরে বৈষ্ণবরা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, সেই স্তরের স্বাক্ষর রহিয়াছে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রাক্ষসদের রামভক্তি প্রদর্শন মূলক অংশ প্রক্ষেপ করার মধ্যে; আবার শাক্তেরা যে স্তরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহার স্বাক্ষর রহিয়াছে রামচন্দ্র কর্তৃক শক্তিপূজা করার অংশ প্রক্ষেপের মধ্যে।

কৃত্তিবাসের ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে ধ্রুবানন্দের ‘মহাবংশাবলী’ প্রভৃতি কুলজী-গ্রন্থ এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের কয়েকটি পুঁথি হইতে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক সংবাদ পাওয়া যায় “কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী” হইতে। এই আত্মকাহিনী বদনগঞ্জনিবাসী হারাধন দত্তের একটি পুঁথিতে সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৮৯৬ খ্রীঃ) সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। হারাধন দত্তের যে পুঁথিতে এই আত্মকাহিনী পাওয়া গিয়াছিল, সেটি সাধারণের দৃষ্টিগোচ না হওয়াতে কেহ কেহ এই আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী আর একটি পুঁথিতে এই আত্মকাহিনী পাইয়াছেন; আত্মকাহিনীর অনেকগুলি খণ্ডাংশ অন্যান্য কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে এবং আত্মকাহিনীতে প্রদত্ত প্রায় সমস্ত সংবাদের সমর্থন অন্য কোন না কোন সূত্রে মিলিয়াছে। সুতরাং আত্মকাহিনীটি যে কৃত্তিবাসের নিজেরই রচনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার প্রচার বেশী না হওয়ার দরুণ ইহার মূল রূপটি প্রায় অবিকৃতভাবেই রক্ষিত হইয়াছে, তবে ভাষা খানিকটা আধুনিক হইয়া গিয়াছে।

কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী হইতে জানা যায় যে, কৃত্তিবাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহ—“বেদানুজ মহারাজা’র পাত্র (পাঠান্তরে—‘পুত্র’)—নারসিংহ ওঝার আদি নিবাস পূর্ববঙ্গে; সেখানে কোন বিপদ উপস্থিত হওয়াতে তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন: নারসিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর, গর্ভেশ্বরের অন্যতম পুত্র মুরারি; মুরারির অন্যতম পুত্র বনমালী; বনমালীর ছয় পুত্র—তন্মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ কৃত্তিবাস। গর্ভেশ্বরের বংশে আরও অনেক বিশিষ্ট ও রাজানুগৃহীত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে রবিবারে (“আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস”) জন্মগ্রহণ করেন। বারো বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়া তিনি গুরুগৃহে পড়িতে যান এবং নানা দেশে নানা গুরুর কাছে অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে উত্তরবঙ্গের একজন গুরুর কাছে পাঠ সাঙ্গ করিয়া সর্বশাস্ত্র-বিশারদ হইয়া ঘরে ফেরেন। অতঃপর কৃত্তিবাস “গৌড়েশ্বর” অর্থাৎ বাংলার রাজার সহিত দেখা করিতে যান। সভাভঙ্গের অল্পক্ষণ পূর্বে রাজসভায় প্রবেশ করিয়া কবি দেখেন যে গৌড়েশ্বর সভায় বসিয়া আছেন, তাঁহার চতুর্দিকে জগদানন্দ, সুনন্দ, কেদার খাঁ; কেদার রায়, নারায়ণ, তরণী, গন্ধর্ব রায়,

সুন্দর, শ্রীবৎস্ত, মুকুন্দ পণ্ডিত প্রভৃতি সভাসদেরা বসিয়া আছেন ; ইহা ভিন্ন আরও বহু লোক বসিয়া ও দাঁড়াইয়া আছে। রাজার প্রাসাদ কোলাহল ও নৃত্যগীতে ভরপুর। কৃত্তিবাসকে রাজা সঙ্কেতে আহ্বান করিলে কৃত্তিবাস তাঁহার কাছে গিয়া সাতটি শ্লোক পড়িলেন। ইহাতে রাজা খুশী হইয়া কৃত্তিবাসকে ফুলের মালা ও পাটের পাছড়া দিলেন এবং রাজসভাসদ কেদার খাঁ কবির মাথায় চন্দনের ছড়া ঢালিয়া দিলেন ; রাজা কৃত্তিবাসের ইচ্ছামত যে কোন বস্তু দান করিতে চাহিলেন, কিন্তু কৃত্তিবাস তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন যে কাহারও নিকট হইতে তিনি অর্থ চাহেন না, গৌরব ভিন্ন তাঁহার আর কিছু কাম্য নাই। অতঃপর কৃত্তিবাস রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তখন প্রাসাদের বাহিরে সমবেত বিরাট জনতা কৃত্তিবাসকে বিপুল সংবর্ধনা জানাইল এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার উল্লেখ করিয়া তাহারা বাল্মীকির সহিত কৃত্তিবাসের তুলনা করিল।

কৃত্তিবাস কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্র হইতে কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী' প্রভৃতি কুলজী-গ্রন্থে কৃত্তিবাস ও তাঁহার পূর্বপুরুষদের এবং তাঁহার অনেক আত্মীয়ের নাম পাওয়া যায় ; কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ ও আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে কুলীন ব্রাহ্মণদের 'সমীকরণ', 'মেল-বন্ধন' প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সব সামাজিক অনুষ্ঠানের সময় সম্বন্ধে মোটামুটি যে আভাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র অনুমান করা যায় যে, কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন।

কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী হইতেও তাঁহার আবির্ভাবকাল নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। আত্মকাহিনীর প্রথম ছত্রে উল্লিখিত "বেদানুজ মহারাজা"কে কেহ ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজা দনুজমাধবের সহিত, আবার কেহ পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজা দনুজমর্দনের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছেন এবং তাহা হইতে কৃত্তিবাসের সময় নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ কৃত্তিবাসের জন্ম-তিথি "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস" (এবং তাহার ভ্রান্ত পাঠান্তর "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস" এর উপর নির্ভর করিয়াছেন এবং কতক কল্পনা, কতক জ্যোতিষ-গণনার আশ্রয় লইয়া কৃত্তিবাসের একটা "জন্মসাল" স্থির করিয়াছেন। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত কল্পনা-ভিত্তিক বলিয়া ইহাদের কোন মূল্য নাই।

কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম তিনি উল্লেখ করেন

নাই ; না করাই স্বাভাবিক, কারণ আমরা এখনও পর্যন্ত সমসাময়িক রাজাদের কথা বলিবার সময় তাঁহার রাজপদবীরই উল্লেখ করি, নামের উল্লেখ করি না। যাহা হউক, পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে কৃত্তিবাসের সংবর্ধনাকারীর পরিচয় আবিষ্কারের অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই গৌড়েশ্বর রাজা গণেশ ; ইঁহাদের যুক্তি এই যে, কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের যে সমস্ত সভাসদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই হিন্দু ; সুতরাং গৌড়েশ্বরও হিন্দু ; যেহেতু চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে রাজা গণেশ ভিন্ন অন্য কোন হিন্দু গৌড়েশ্বরকে পাওয়া যাইতেছে না, অতএব ইনি রাজা গণেশ। কিন্তু কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের মাত্র ৮।৯ জন সভাসদের নাম করিয়াছেন; গৌড়েশ্বরের সভায় অন্তত ৬০।৭০ জন সভাসদ উপস্থিত ছিলেন ; কৃত্তিবাস মাত্র কয়েকজন স্বধর্মী রাজসভাসদের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া গৌড়েশ্বরের সমস্ত সভাসদই যে হিন্দু ছিলেন, তাহা বলার কোন অর্থ হয় না ; সুতরাং ইহা হইতে গৌড়েশ্বরের হিন্দু হওয়াও প্রমাণিত হয় না। তাহার পর, কোন কোন পণ্ডিতের মতে কৃত্তিবাস-বর্ণিত গৌড়েশ্বর তাহিরপুরের ভূস্বামী রাজা কংসনারায়ণ ; তিনি প্রকৃত গৌড়েশ্বর না হইলেও কৃত্তিবাস তাঁহাকে স্তাবকতা করিয়া গৌড়েশ্বর বলিয়াছেন। ইঁহাদের যুক্তি এই—কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের যে সমস্ত সভাসদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মুকুন্দ, জগদানন্দ ও নারায়ণ—এই তিনটি নাম পাওয়া যায় ; এদিকে কুলজী-গ্রন্থে মুকুন্দ, জগদানন্দ ও নারায়ণ নামে কংসনারায়ণের তিনজন আত্মীয়ের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে ; সুতরাং কংসনারায়ণই কৃত্তিবাস-উল্লিখিত গৌড়েশ্বর। কিন্তু এই মত সমর্থন করা কঠিন ; কারণ, প্রথমত, আত্মকাহিনীর মধ্যে কৃত্তিবাসের যে নির্লোভ ও তেজস্বী মনের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তিনি একজন সাধারণ ভূস্বামীকে "গৌড়েশ্বর" বলিবেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না; দ্বিতীয়ত, কংসনারায়ণের সময় সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই ; তৃতীয়ত, কংসনারায়ণের আত্মীয় মুকুন্দ জগদানন্দের পিতামহ ছিলেন বলিয়া কুলজী-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত রাজসভাসদ মুকুন্দ জগদানন্দের পুত্র ("মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর। জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥")। সুতরাং আলোচ্য মতের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল।

কৃত্তিবাসের সংবর্ধনাকারী গৌড়েশ্বরকে হিন্দু বলিবার কোন কারণ নাই। তিনি যে মুসলমান নহেন, সে কথা জোর করিয়া বলিবারও কোন হেতু নাই। আসলে এই গৌড়েশ্বর যে রুকনুদ্দীন বারবক শাহ, সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে।

প্রথম প্রমাণ, কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে গৌড়েশ্বরের কেদার রায় ও নারায়ণ নামে দুইজন সভাসদের উল্লেখ পাওয়া যায়; রুকনুদ্দীন বারবক শাহের অধীনে এই দুই নামের দুইজন রাজপুরুষ ছিলেন; নারায়ণ ছিলেন বারবক শাহের চিকিৎসক; ইনি চৈতন্যদেবের পার্ষদ মুকুন্দের পিতা; ইঁহার নাম চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' ও ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা'তে পাওয়া যায়; কেদার রায় ছিলেন বারবক শাহের অত্যন্ত বিশ্বস্ত রাজপুরুষ, ইনি মিথিলা বা ত্রিহুতে বারবক শাহের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন; বর্ধমান উপাধ্যায়ের 'দণ্ডবিবেক' ও মুল্লা তকিয়ার 'বয়াজে' ইঁহার নাম পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রমাণ, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হইতে জানা যায় যে, হরিদাস ঠাকুর যখন ফুলিয়া হইতে নীলাচলে যান, তখন মুরারি, দুর্গাবর ও মনোহরের বংশে জাত কুলীননন্দন সুষেণ পণ্ডিত হরিদাসকে বিদায় দিয়াছিলেন; এই ঘটনা আনু-মাণিক ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের। এদিকে ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী'র মতে কৃত্তিবাসের সুষেণ নামে এক সম্পর্কিত পৌত্র (কৃত্তিবাসের পিতৃব্য অনিরুদ্ধের প্রপৌত্র) ছিলেন; এই সুষেণের বৃদ্ধপ্রপিতামহ, জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার নাম যথাক্রমে মুরারি, দুর্গাবর ও মনোহর; ইনিও ফুলিয়ানিবাসী কুলীন ব্রাহ্মণ। সুতরাং এই সুষেণ ও জয়ানন্দ-উল্লিখিত সুষেণ পণ্ডিত যে অভিন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুষেণ পণ্ডিত যখন ১৫১৬ খ্রীঃর মত সময়ে জীবিত ছিলেন, তখন তাঁহার পিতামহস্থানীয় কৃত্তিবাস গড়পড়তা হিসাবে তাহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৪৬৬ খ্রীঃর মত সময়ে জীবিত ছিলেন বলিয়া ধরা যায়; ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রুকনুদ্দীন বারবক শাহই গৌড়েশ্বর ছিলেন।

তৃতীয় প্রমাণ, রুকনুদ্দীন বারবক শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের একজন বিখ্যাত পৃষ্ঠপোষক। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-কার মালাধর বসু, অমরকোষটীকা 'পদচন্দ্রিকা'র রচয়িতা রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র, ফার্সী শব্দকোষ 'শরফ্‌নামা'র সঙ্কলয়িতা ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী প্রভৃতি তাঁহার নিকট পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং অন্য গৌড়েশ্বর অপেক্ষা তাঁহারই নিকটে কৃত্তিবাসের সংবর্ধনা লাভ করা বেশী স্বাভাবিক।

অতএব কৃত্তিবাস যে রুকনুদ্দীন বারবক শাহেরই সভায় গিয়াছিলেন ও তাঁহারই নিকট সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত খুবই যুক্তিসঙ্গত। এ সম্বন্ধে গৌণ প্রমাণও কতকগুলি আছে, বাহুল্যবোধে সেগুলি উল্লেখ করা হইলনা।

মহাকবি কৃত্তিবাসের নাম বাঙালীর অমূল্য সম্পত্তি। তাঁহার রচিত মূল রামায়ণ আজ অবিকৃতভাবে পাওয়া যাইতেছে না, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু আর এক দিক দিয়া ইহা কবির পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়, কারণ কৃত্তিবাসের কাব্যের জনপ্রিয়তা ও প্রচার যে কত অসাধারণ হইয়াছিল, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়; সাধারণ কবির বা জনপ্রিয়তাহীন কবির রচনা এইভাবে যুগে যুগে লোকহস্তে পরিবর্তন লাভ করে না। অসামান্য জনপ্রিয়তা ভিন্ন কৃত্তিবাসের পক্ষে আর একটি গর্বের বিষয় এই যে, তিনি শুধু বাংলা রামায়ণের প্রথম রচয়িতা নহেন, শ্রেষ্ঠ রচয়িতাও। সাধারণত সাহিত্যের কোন ধারার প্রবর্তক ঐ ধারার শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা হন না। কৃত্তিবাস ইহার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

কৃত্তিবাসের রচিত মূল রামায়ণ কীরকম ছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে এইটুকু স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে, তিনি বাল্মীকির রামায়ণকে অবিকলভাবে অনুসরণ করেন নাই। বাল্মীকি-রামায়ণ বহির্ভূত রামলীলা বিষয়ক অনেক কাহিনী বহু পূর্ব হইতে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, কৃত্তিবাস নিঃসন্দেহে তাহাদের অনেকগুলিকে তাঁহার রামায়ণের মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে যে বাঙালীসুলভ কোমলতা দেখিতে পাওয়া যায়, কৃত্তিবাসের মূল রচনার মধ্যেও চরিত্রগুলির এই বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণের তুলনায় কৃত্তিবাসের মূল রচনা যে কতকটা সংক্ষিপ্ত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ ইহার বিভিন্ন সময়ে লিপিকৃত পুঁথিগুলির তুলনা করিলে দেখা যায় প্রাচীনতর পুঁথিগুলির তুলনায় অর্বাচীন পুঁথিগুলি অপেক্ষাকৃত বিপুলকলেবর; যতই দিন গিয়াছে, ততই ইহার মধ্যে উত্তরোত্তর প্রক্ষিপ্ত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে এবং বর্ণনাগুলি পল্লবিত হইয়াছে।

৪। মালাধর বসু

মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামক কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন; কাব্যটির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যের অনেক স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতের অংশবিশেষের

অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, 'হরিবংশে'র প্রভাবও কোথাও কোথাও দেখা যায়। কিন্তু কাব্যটির মধ্যে কবির স্বাধীন রচনার নিদর্শনও যথেষ্ট পরিমাণে মিলে।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর প্রাচীন পুঁথিতে ইহার যে রচনাকালবাচক শ্লোক পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই কাব্যের রচনা ১৩৯৫ শকাব্দে (১৪৭৩-৭৪ খ্রীঃ) আরম্ভ হয় এবং ১৪০২ শকাব্দে (১৪৮০-৮১ খ্রীঃ) শেষ হয়। মালাধর বসু গৌড়েশ্বরের নিকট 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। স্বনাম অপেক্ষা এই উপাধি দ্বারাই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত মালাধর 'গুণরাজ খান' নামে ভণিতা দিয়াছেন। সুতরাং কাব্যের রচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে তিনি 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৩৯৫ শকাব্দে (১৪৭৩-৭৪ খ্রীঃ) গৌড়েশ্বর ছিলেন রুকনুদ্দীন বারবক শাহ। অতএব মালাধর বারবক শাহের কাছেই যে 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মালাধর বসুর নিবাস ছিল কাটোয়ার কুলীনগ্রামে। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম ইন্দুমতী। মালাধর বসুর সত্যরাজ খান ও রামানন্দ নামে দুই পুত্র ছিল। ইঁহারা পরে চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট পার্ষদ হইয়াছিলেন এবং প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময় নীলাচলে গিয়া ইঁহারা চৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়া আসিতেন।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' অত্যন্ত সরল ও সুখপাঠ্য রচনা। মালাধর শুধু কবি ছিলেন না, ভক্তও ছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর অনেক স্থানে তাঁহার ভক্ত হৃদয়ের ছাপ পড়িয়াছে। বাংলার চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগের বৈষ্ণব ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে খানিকটা আভাস 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' হইতে পাওয়া যায়। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর আর একটি প্রশংসনীয় বিষয় এই যে, ইহার মধ্যে অনেক স্থানে ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বের সার কথাগুলি অত্যন্ত সংক্ষেপে সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে কিছু কিছু অভিনব বিষয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। রাধার সখী ও কৃষ্ণের সখাদের যে সমস্ত নাম বাংলাদেশে প্রচলিত (যেমন বৃন্দা, ললিতা, অনুরাধা, বিশাখা, শ্রীদাম, সুদাম, সুবল প্রভৃতি), তাহাদের দুই একটি ভিন্ন অন্যগুলি বাংলার বাহিরে পরিচিত নহে ; প্রাচীন পুরাণে বা কাব্যেও সেগুলি মিলে না ; এই সমস্ত নামের অধিকাংশেরই উল্লেখ মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' সর্বপ্রথম পাওয়া যায়।

চৈতন্যদেব মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য আস্বাদন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নীলাচলে তিনি মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজ খান ও রামানন্দের কাছে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র একটি চরণ ("নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ") আবৃত্তি করিয়া বলেন যে এই বাক্যটি রচনার জন্য তিনি গুণরাজ খানের বংশের কাছে বিক্রীত হইয়া থাকিবেন ; তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, মালাধর বসুর গ্রামের কুকুরও তাঁহার নিকট অন্য লোকের অপেক্ষা প্রিয়। চৈতন্যদেবের এই প্রশংসার জন্যই মালাধর বাংলার বৈষ্ণবদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

৫। চৈতন্যদেব

চৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচী দেবী। চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষদের নিবাস ছিল শ্রীহট্টে। চৈতন্যদেবের পূর্ব-নাম বিশ্বম্ভর, ডাক-নাম নিমাই।

শৈশবে নিমাই অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। ছাত্র হিসাবে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। অল্প বয়সেই পণ্ডিত হইয়া তিনি নবদ্বীপে টোল খুলিয়া বসেন এবং সেখানে ব্যাকরণ পড়াইতে থাকেন। তিনি প্রথমে লক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরে লক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু হওয়াতে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

তেইশ বৎসর বয়সে গয়ায় পিতার পিণ্ড দিতে গিয়া নিমাই পণ্ডিত বিষ্ণুর পাদপদ্ম দর্শন করেন এবং তাহাতেই তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। এখন হইতে তিনি হরিভক্তিতে বিভোর হইয়া পড়েন। ইহার পর নবদ্বীপে ফিরিয়া তিনি এক বৎসর বন্ধু ও ভক্তদের লইয়া হরিনাম সঙ্কীর্তন করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার পার্ষদশ্রেণীভুক্ত হন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন শান্তিপুরনিবাসী প্রবীণ বৈষ্ণব আচার্য অদ্বৈত, বীরভূমের একচাকা গ্রামের হাড়াই ওঝার পুত্র অবধূত নিত্যানন্দ, বৈষ্ণবধর্মান্তরিত মুসলমান হরিদাস ঠাকুর, নিমাই পণ্ডিতের সহপাঠী ও চরিতকার মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি। এইসব ভক্তরা নিমাইকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করেন।

এক বৎসর সঙ্কীর্তন করার পর নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' (সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য বা চৈতন্যদেব) নাম গ্রহণ করিলেন। ইহার পর তিনি

নীলাচল বা পুরীতে চলিয়া গেলেন। পরবর্তী ছয় বৎসর তিনি তীর্থভ্রমণ করেন এবং তাহার পর একাদিক্রমে আঠারো বৎসর নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া অতিবাহিত করিবার পর সাতচল্লিশ বৎসর ছয় মাস বয়সে—১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার জীবৎকালে সহস্র সহস্র লোক তাঁহার ভক্তশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন ; প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময়ে ভক্তেরা নীলাচলে যাইতেন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য।

চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্মকে এক নূতন রূপ দেন ; এই নূতন বৈষ্ণব ধর্ম 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম' নামে পরিচিত। এই ধর্মের মূল কথা সংক্ষেপে এই। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর ও আরাধ্য ; কিন্তু তিনি প্রেমময় ; তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে তিনি যে ঈশ্বর, সে কথা ভুলিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে। এই ভালবাসার প্রাথমিক স্তর ভক্তি, তাহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট দাস্যপ্রেম, তাহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট সখ্যপ্রেম, তাহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বাৎসল্যপ্রেম এবং সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কান্তাপ্রেম। কান্তা প্রেমের মধ্যে আবার স্বকীয়া প্রেমের তুলনায় পরকীয়া প্রেম শ্রেষ্ঠ, কারণ পরকীয়া প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতা ও চিরনবীনতা রহিয়াছে, স্বকীয়া প্রেমে তাহা নাই। এই কারণে কৃষ্ণের সমস্ত ভক্তদের মধ্যে পরকীয়া প্রেমের নায়িকা গোপীদের স্থান সর্বোচ্চে. গোপীদের মধ্যে আবার রাধাই শ্রেষ্ঠা, কারণ কৃষ্ণ তাঁহার প্রতি বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট। তত্ত্বের দিক দিয়া—রাধা সর্বশক্তিমান কৃষ্ণের হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী শক্তি ; শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, সুতরাং রাধা ও কৃষ্ণও অভিন্ন, কিন্তু লীলারস আস্বাদনের জন্য দুই রূপ ধারণ করিয়াছেন। রাধা-কৃষ্ণের লীলা নিত্য, ভক্তেরা এই লীলা শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-বন্দন করিবে, ইহাই তাহাদের সাধনার মুখ্য অঙ্গ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্বের পরিকল্পনা চৈতন্যদেবের, অবশ্য উপরে বর্ণিত তত্ত্বগুলির সবটাই চৈতন্যদেবের দান বলিয়া মনে হয় না। 'চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন চৈতন্যচরিতগ্রন্থে রাধার কোন উল্লেখ নাই। যাহা হউক, এই ধর্মকে বিস্তৃত ভাষ্যের মধ্য দিয়া চূড়ান্ত রূপ দান করিয়াছেন বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ; ইহাদের মধ্যে রূপ-সনাতন ভ্রাতৃযুগল ও তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব প্রধান।

চৈতন্যদেব কর্তৃক প্রবর্তিত ও বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত বৈষ্ণবধর্ম অচিরেই বাংলাদেশে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করিল। ইহার ফলে বাংলা সাহিত্যও বিশেষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে

ভক্তের সাধনার মুখ্য অঙ্গ রাধা-কৃষ্ণ-লীলা শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-বন্দন, এই শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-বন্দন—গানের মধ্য দিয়া যতটা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব, অন্য কোন ভাবে ততখানি করা সম্ভব নহে; তাই বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে যাঁহারা কবি ছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে অসংখ্য গান বা পদ লিখিতে লাগিলেন; বহু পদই খুব উৎকৃষ্ট হইল; এইভাবে বাংলার বিশাল ও সমৃদ্ধ পদাবলী-সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। চৈতন্যদেবের জীবন-চরিত অবলম্বনেও অনেকগুলি বৃহৎ ও সুন্দর গ্রন্থ রচিত হইল; এইভাবে বাংলা সাহিত্যের এক নূতন শাখা—চরিত-সাহিত্য সৃষ্ট হইল। ইহা ভিন্ন কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে অনেক আখ্যানকাব্য রচিত হইল এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া, বৈষ্ণব ভক্তদের গুরু-শিষ্য-পরম্পরা বর্ণনা করিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রন্থ লিখিত হইল। চৈতন্যদেব আবির্ভূত না হইলে এইসব রচনাগুলির কোনটিই রচিত হইত না। অথচ এইসব রচনাগুলিই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং ইহাদের পরিমাণও সুবিশাল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্যদেব স্বয়ং বাংলা ভাষায় কিছু না লিখিলেও তিনি বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের সমৃদ্ধি বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখাকেও প্রভাবিত করিয়াছিল, তাই ঐ সমস্ত শাখাতেও চৈতন্য-পরবর্তী কালে উন্নততর সৃষ্টির অজস্র ফসল ফলিয়াছিল।

মোটের উপর, ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাংলা সাহিত্যে যে সৃষ্টির বান ডাকিয়াছিল, চৈতন্যদেবই তাহার প্রধান কারণ। এই কারণে সাহিত্যস্রষ্টা না হইয়াও চৈতন্যদেব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়া আছেন।

৬। পদাবলী-সাহিত্য

পদাবলী-সাহিত্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বৈষ্ণব পদগুলির মধ্যে প্রেমের যে অপূর্ব মধুর ভক্তিরসমণ্ডিত রূপায়ণ দেখা যায়, তাহার তুলনা বিরল। এ কথা সত্য যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও বাংলাদেশে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ রচিত হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবিরা পদ লিখিয়াছেন নিজেদের স্বাধীন কবি-প্রেরণার বশবর্তী হইয়া এবং তাঁহাদের রচিত পদের সংখ্যা খুব বেশী

নহে। কিন্তু চৈতন্য-পরবর্তী পদকর্তাদের অধিকাংশই বৈষ্ণব সাধক ছিলেন তাঁহাদের পদের উপরে তাঁহাদের সাধনার প্রভাব পড়াতে তাহা একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে এবং পদ-রচনাও তাঁহাদের সাধনার অঙ্গস্বরূপ বলিয়া তাঁহারা স্বতই অনেক বেশী পদ রচনা করিয়াছেন। এই জন্য বাংলার চৈতন্য-পরবর্তী যুগের পদাবলী-সাহিত্য অনন্যসাধারণ বিশালতা লাভ করিয়াছে।

বিষয়বস্তু ও রসের দিক দিয়া পদাবলী-সাহিত্যে বৈচিত্র্য অপরিসীম। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি বিভিন্ন রসের অসংখ্য পদাবলী বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে মধুর রসের ও রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদই সংখ্যায় সর্বাধিক। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদগুলির মধ্যে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ উভয় পর্যায়েরই রচনা পাওয়া যায়। সম্ভোগ পর্যায়ের পদগুলিতে অভিসার, মিলন, মান প্রভৃতি এবং বিপ্রলম্ভ পর্যায়ের পদগুলিতে পূর্বরাগ, বিরহ, মাথুর প্রভৃতি স্তর বর্ণিত হইয়াছে।

বাঙালী কবিদের লেখা বৈষ্ণব পদগুলির সমস্তই অবিমিশ্র বাংলা ভাষায় রচিত নহে। অনেক পদ "ব্রজবুলী" নামে পরিচিত এক কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষায় লেখা। বিদ্যাপতির পদের, বিশেষভাবে তাঁহার যে সব পদ বাংলাদেশে প্রচলিত, তাহাদের ভাষার সহিত এই ব্রজবুলী ভাষার মিল খুব বেশী। ব্রজবুলী ভাষার উদ্ভব কীভাবে হইয়াছিল, সে প্রশ্ন রহস্যাবৃত। অনেকের মতে বিদ্যাপতিই এই ব্রজবুলী ভাষার স্রষ্টিকর্তা। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নহে; কারণ, প্রথমত, পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও এরকম দৃষ্টান্ত দেখা যায় না যে একজন মাত্র লোক একা একটি ভাষা সৃষ্টি করিলেন এবং সেই ভাষায় শত শত লোক পরবর্তী কালে সাহিত্য সৃষ্টি করিল; দ্বিতীয়ত, বিদ্যাপতির পূর্বেও কোন কোন কবি ব্রজবুলী ভাষায় পদ লিখিয়াছিলেন মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। আবার কেহ কেহ মনে করেন বিদ্যাপতির খাঁটি মৈথিল ভাষায় লেখা পদগুলির ভাষা বিকৃত করিয়া মিথিলা হইতে প্রত্যাগত বাঙালী ছাত্রেরা বাংলাদেশে প্রচার করিয়াছিলেন এবং এই বিকৃত ভাষাই ব্রজবুলী; কিন্তু এই মতও গ্রহণ করা যায় না; কারণ—প্রথমত, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিরা একটি বিকৃত ভাষায় পদ লিখিবেন, ইহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে; দ্বিতীয়ত, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিক হইতে একই সঙ্গে বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা ও উড়িষ্যায় ব্রজবুলী ভাষায় পদ রচনার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। সব জায়গাতেই মিথিলা হইতে প্রত্যাগত ছাত্রেরা একই ভাবে বিদ্যাপতির পদের

ভাষাকে বিকৃত করিয়াছে বলিয়া কল্পনা করা যায় না। ব্রজবুলীর উদ্ভব সম্বন্ধে তৃতীয় মত এই যে, আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ উদ্ভূত হইবার পরেও কেবল সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যম হিসাবে যে "অর্বাচীন অপভ্রংশ" ভাষার প্রচলন ছিল, সেই ভাষাই ক্রমবিবর্তনের ফলে অবহট্ট ভাষায় এবং অবহট্ট ভাষা আবার ক্রমবিবর্তনের ফলে ব্রজবুলী ভাষায় পরিণত হইয়াছে। এই মত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

চৈতন্যপরবর্তী যুগের পদকর্তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে সময়ের দিক দিয়া দিয়া প্রথম হইতেছেন যশোরাজ খান, মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ ও কবিশেখর। যশোরাজ খান হোসেন শাহের অন্যতম কর্মচারী ছিলেন এবং ঐ সুলতানের নাম উল্লেখ করিয়া ব্রজবুলী ভাষায় একটি পদ লিখিয়াছিলেন; বাংলাদেশে প্রাপ্ত ব্রজবুলী ভাষায় লেখা প্রাচীনতম পদ এইটিই। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের সহপাঠী ছিলেন, পরে তাঁহার ভক্ত হন, তাঁহার লেখা কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ পাওয়া গিয়াছে। নরহরি সরকার চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট পার্ষদ ছিলেন, তিনি প্রথম জীবনে ব্রজলীলা অবলম্বনে পদ রচনা করিতেন, কিন্তু চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের পরে তিনি কেবল চৈতন্যদেব সম্বন্ধেই পদ রচনা করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। বাসুদেব ঘোষও চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ ছিলেন, তিনি চৈতন্যদেবের লীলা সম্বন্ধে বহুসংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন।

কবিশেখর সম্বন্ধে তাঁহার লেখা পদ ও গ্রন্থ হইতে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন সিংহ, তাঁহার পিতার নাম চতুর্ভুজ, মাতার নাম হীরাবতী; কবিশেখর, শেখর, রায়শেখর, কবিরঞ্জন, বিদ্যাপতি প্রভৃতি নানা ভণিতায় ইনি পদ রচনা করিতেন; পদ রচনায় ইহার উৎকর্ষের জন্য সকলে ইহাকে 'ছোট বিদ্যাপতি' বলিত। কবিশেখর প্রথম জীবনে হোসেন শাহ, নসরৎ শাহ, গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ প্রভৃতি সুলতানের কর্মচারী ছিলেন; ঐ সমস্ত সুলতানের নাম উল্লেখ করিয়া তিনি কয়েকটি পদ লিখিয়াছিলেন। পরে তিনি বৈষ্ণব হন এবং শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি 'গোপালের কীর্তন অমৃত' ও 'গোপীনাথবিজয় নাটক' নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এই দুইটি গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। ইহা ভিন্ন তিনি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটি বৃহৎ আখ্যানকাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম 'গোপালবিজয়'; শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীন

লীলা বর্ণনা করিয়া 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী' নামে একটি পদসমষ্টি-গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন; এই দুইটি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। কবিশেখর বাংলা ও ব্রজবুলী উভয় ভাষায় বহু সংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ব্রজবুলী ভাষায় রচিত পদগুলিই উৎকৃষ্ট। কতকগুলি পদে কবিশেখর বর্ষার রাত্রির এবং রাধার অভিসার ও বিরহের বর্ণনা দিয়াছেন। এই পদগুলি খুব উচ্চাঙ্গের রচনা। কবিশেখরের কোন কোন পদ (যেমন 'ভরা বাদর মাহ ভাদর') ভ্রমবশত মৈথিল বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে।

পদাবলী-সাহিত্যের আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি জ্ঞানদাস। ইনি ১৫২০ খ্রীঃর মত সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দের গোষ্ঠীভুক্ত। 'ভক্তিরত্নাকর' নামক গ্রন্থের মতে জ্ঞানদাস নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবা দেবীর শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নিবাস ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঁদড়া গ্রামে এবং তাঁহার আরও দুইটি নাম ছিল—'মঙ্গল' ও 'মনোহর'। জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলী দুই ভাষাতেই পদ লিখিয়াছিলেন, তবে তাঁহার বাংলা পদগুলিই উৎকৃষ্টতর। জ্ঞানদাস বিশেষভাবে 'পূর্বরাগ' ও 'আক্ষেপানুরাগ' বিষয়ক পদ রচনাতেই দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্বরাগের পদে তিনি প্রেমাস্পদের জন্য রাধার অন্তরের তীব্র আর্তি ও ব্যাকুলতা অপরূপভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আক্ষেপানুরাগের পদে প্রেমের কণ্টাকাকীর্ণ পথে পদার্পণ করার দরুণ রাধার আক্ষেপকে জ্ঞানদাস সুন্দরভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের পদগুলি রচনা-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদগুলির সমধর্মী; ইহাদের ভাব অত্যন্ত গভীর হইলেও ভাষা অত্যন্ত সরল ও প্রসাদগুণমণ্ডিত। জ্ঞানদাস নারীর হৃদয়ের কথাকে নারীর বাচনভঙ্গীর মধ্য দিয়া নিখুঁতভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। জ্ঞানদাস একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধক ছিলেন, চৈতন্যদেব ছিলেন তাঁহার উপাস্য দেবতা। এইজন্য চৈতন্যদেবের প্রভাব তাঁহার রচনার মধ্যে খুব বেশী পড়িয়াছে। জ্ঞানদাস তাঁহার পদের মধ্যে রাধার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার উপরে বহু স্থানেই চৈতন্যদেবের মূর্তির ছায়া পড়িয়াছে। জ্ঞানদাসের বহু উৎকৃষ্ট পদ পরবর্তী কালে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে।

আর একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তা—অনেকের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা—গোবিন্দদাস কবিরাজ। ইহার জীবৎকাল আনুমানিক ১৫৩০-১৬২০ খ্রীঃ। ইনি শ্রীখণ্ডের বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা চিরঞ্জীব সেন হোসেন শাহের "অধিপাত্র"

এবং চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ ছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ার ফলে গোবিন্দদাস এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র শাক্তধর্মাবলম্বী মাতামহের আশ্রয়ে মানুষ হন এবং মাতামহের প্রভাবে নিজেরাও শাক্তধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পরিণত বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর গোবিন্দদাস পদাবলী রচনায় ব্রতী হন। তাঁহার অপূর্ব সুন্দর পদ আস্বাদন করিয়া বৃন্দাবনের মহান্তরা তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধি দেন। জীব গোস্বামীও তাঁহার পদের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন।

গোবিন্দদাস কবিরাজ প্রধানত ব্রজবুলী ভাষায় পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পদগুলির কাব্যমাধুর্য অতুলনীয়। পূর্বরাগ এবং অনুরাগের বর্ণনায় তিনি প্রেমের সূক্ষ্ম ভাববৈচিত্র্য অপূর্বভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দদাস সর্বাপেক্ষা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন অভিসার বিষয়ক পদে। বিশেষত তাঁহার বর্ষাভিসার সম্বন্ধীয় পদগুলির তুলনা হয় না, এই সব পদের শব্দঝঙ্কারের মধ্য দিয়া বর্ষার ছন্দ আশ্চর্যভাবে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। গোবিন্দদাস অভিসারের বহু নূতন নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। গোবিন্দদাস 'গৌর-চন্দ্রিকা' পদ রচনাতেও অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন; বিভিন্ন পর্যায়ের পদাবলী গাহিবার পূর্বে গায়কেরা চৈতন্যদেবের ঐ পর্যায়ের ভাবে ভাবিত হওয়া বিষয়ক একটি পদ গাহিয়া লন; এই পদগুলিকেই 'গৌরচন্দ্রিকা' বলা হয়; 'গৌর-চন্দ্রিকা' পদের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস। গোবিন্দদাস ভাষা, শব্দপ্রয়োগ, ছন্দ ও অলঙ্কারের ক্ষেত্রে অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন; বাণী-সৌষ্ঠব ও আঙ্গিক-পারিপাট্যের দিক দিয়া তাঁহার পদগুলি তুলনারহিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গোবিন্দদাসের সমসাময়িক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম উড়িষ্যারাজের সেনাপতি রায় চম্পতি, যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য এবং পক্কপল্লীর (পাইকপাড়া) রাজা হরিনারায়ণ।

গোবিন্দদাসের সমসাময়িক আর একজন বিশিষ্ট পদকর্তা নরোত্তম দাস। ইনি উত্তরবঙ্গের জনৈক ধনী ভূস্বামীর পুত্র। যৌবনে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া ইনি বৃন্দাবনে গিয়া লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের সঙ্গে বাংলা দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এ দেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। নরোত্তম বাঙালীর একান্ত পরিচিত ঘরোয়া ভাষায় পদ রচনা করিতেন; পদগুলি অনাড়ম্বর সৌন্দর্যের জন্য আমাদের মনোহরণ করে। প্রার্থনা বিষয়ক

পদে নরোত্তম সর্বাপেক্ষা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। এই পদগুলির মধ্যে ভক্ত-হৃদয়ের আকুতি মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। নরোত্তম কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত।

ষোড়শ শতকের আর একজন বিখ্যাত পদকর্তা বলরাম দাস। ইনি ব্রজবুলী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিতেন, কিন্তু ইহাঁর বাংলা পদগুলিই উৎকৃষ্ট। বলরাম দাস বিশেষভাবে বাৎসল্য রসাত্মক পদ রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। এই পদগুলিতে শিশু কৃষ্ণের জন্য যশোদার মাতৃহৃদয়ের আর্তিকে বলরাম দাস অপূর্বভাবে রূপায়িত করিয়াছেন।

সপ্তদশ শতকের পদকর্তাদের মধ্যে রামগোপালদাস বা গোপালদাসের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার পদগুলি ভাষার সারল্য ও ভাবের গভীরতার দিক দিয়া চণ্ডীদাসের পদকে স্মরণ করায়। গোপালদাসের কোন কোন পদ চণ্ডীদাসের নামেই চলিয়া গিয়াছে। গোপালদাস 'রসকল্পবল্লী' নামে একটি বৈষ্ণব রসতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ এবং বৈষ্ণবদের 'শাখানির্ণয়' অর্থাৎ গুরুশিষ্যপরম্পরা-বর্ণন-গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের পদকর্তাদের মধ্যে দুইজনের নাম উল্লেখযোগ্য—নরহরি চক্রবর্তী এবং জগদানন্দ। নরহরি চক্রবর্তীর নামান্তর ঘনশ্যাম। ইনি 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি বিখ্যাত চরিতগ্রন্থের রচয়িতা। নরহরির পদে ভাষা ও ছন্দের ঝঙ্কার প্রাধান্য লাভ করিলেও ভাবগভীরতার পরিচয়ও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। জগদানন্দ একজন অসাধারণ শব্দকুশলী কবি। ইহার পদগুলি শব্দের ঝঙ্কার এবং অনুপ্রাসের চমৎকারিত্বের জন্য মনোহরণ করে। জগদানন্দের অধিকাংশ পদই ব্রজবুলী ভাষায় রচিত।

যাঁহাদের কথা বলা হইল, ইঁহারা ভিন্ন আরও অসংখ্য কবি পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনন্তদাস, বংশীবদন, যাদবেন্দ্র, দীনবন্ধুদাস, যদুনন্দনদাস, গোবিন্দদাস চক্রবর্তী প্রভৃতি কবিদের রচনায় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগ হইতে পদাবলী চয়ন-গ্রন্থের মধ্যে সঙ্কলিত হইতে থাকে। চারিটি পদ সঙ্কলন-গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—(১) বিশ্বনাথ কবিরাজের 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' (সঙ্কলনকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশক), (২) নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়' (সঙ্কলনকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ),

(৩) রাধামোহন ঠাকুরের 'পদসমুদ্র' এবং (৪) বৈষ্ণবদাস অর্থাৎ গোকুলানন্দ সেনের পদকল্পতরু (সঙ্কলনকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ)। ইহাদের মধ্যে 'পদকল্পতরু' সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কলনগ্রন্থ।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই পদাবলী-সাহিত্যের অবনতি দেখা দেয়। ভাব এবং আঙ্গিক উভয় ক্ষেত্রে ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি হইতে থাকায় এই শতকের শেষে পদাবলী-সাহিত্য একেবারে নিষ্প্রাণ ও কৃত্রিম হইয়া পড়ে।

পদাবলী-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব গৌরবের সামগ্রী। ইহার মধ্যে মানব-জীবনের প্রেম ও বেদনার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলি অপার্থিব আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত হইয়া যেভাবে অপূর্ব শিল্পসুষমার মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, তাহার তুলনা বিরল। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই অমৃত-নিঃস্যন্দী পদগুলির আকর্ষণ প্রথম রচনার সময়ে যেমন ছিল, আজও প্রায় তেমনই আছে।

৭। চরিত-সাহিত্য

চৈতন্যদেবের জীবন-চরিত বর্ণনা করিয়া সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থগুলি এদেশের সাহিত্যে এক নূতন দিগন্ত উদ্‌ঘাটন করিল। কেবল দেবদেবীকে লইয়া নহে, মানুষের বাস্তব জীবনকাহিনী লইয়াও যে গ্রন্থ রচনা করা যাইতে পারে, ইহাদের মধ্য দিয়া তাহাই প্রমাণিত হইল। অবশ্য জীবন-চরিত হিসাবে এই গ্রন্থগুলি আদর্শস্থানীয় নহে। কারণ ইহাদের লেখকেরা সকলেই ভক্ত ছিলেন, চৈতন্যদেবকে তাঁহারা মানুষ হিসাবে দেখেন নাই, দেখিয়াছেন ভগবান হিসাবে। তাহার ফলে চৈতন্যদেবের মানবতা ইহাদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ফোটে নাই। এই সব গ্রন্থের মধ্যে স্থানে স্থানে অলৌকিক বর্ণনার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহার ফলে বাস্তবতার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তবে সে যুগের কবিদের রচনায়, বিশেষত ভক্ত কবিদের রচনায় এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। এগুলি উপেক্ষা করিয়া বিশ্লেষণী দৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হইলে ইহাদের মধ্যে হইতে অকৃত্রিম তথ্য আবিষ্কার করা দুরূহ নয়।

চৈতন্যদেবের সর্বপ্রথম জীবনচরিত-গ্রন্থ মুরারি গুপ্ত রচিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্'। সংস্কৃতভাষায় লেখা এই বইটি সাধারণের কাছে 'মুরারি গুপ্তের কড়চা'

নামে পরিচিত। মুরারি গুপ্ত প্রথম জীবনে চৈতন্যদেবের সহপাঠী ছিলেন, পরে তাঁহার পার্ষদ হন। সুতরাং তাঁহার লেখা এই চৈতন্যজীবনী-গ্রন্থটির মূল্য স্বাভাবিকভাবেই খুব বেশী। মুরারি গুপ্তের পরে যিনি চৈতন্যচরিত অবলম্বনে গ্রন্থ লেখেন—তাঁহার নাম পরমানন্দ সেন, উপাধি 'কবিকর্ণপূর'; কবিকর্ণপূরের প্রথম গ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে' প্রধানত মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া চৈতন্য-জীবনী (শেষ কয়েক বৎসর বাদে অবশিষ্টাংশ) বর্ণিত হইয়াছে; এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৪২ খ্রীঃ। দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক'—এই গ্রন্থে নাটকের আকারে চৈতন্যদেবের জীবনের একাংশ বর্ণিত হইয়াছে; ইহার রচনাকাল ১৫৭২-৭৩ খ্রীঃ। তৃতীয় গ্রন্থটির নাম 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'—এই গ্রন্থে দ্বাপর যুগে কৃষ্ণলীলার সময়ে চৈতন্যদেবের (যিনি কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন) পার্ষদরা কে কী ছিলেন, সেই "তত্ত্ব নিরূপণ" করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় রচিত চৈতন্যদেবের সর্বপ্রথম জীবনচরিতগ্রন্থের নাম 'চৈতন্য-ভাগবত'। ইহার লেখক বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের শিষ্য; তিনি চৈতন্যদেবের কৃপাধন্যা নারী নারায়ণীর পুত্র ছিলেন। বৃন্দাবনদাস ১৫৩৮ হইতে ১৫৫০ খ্রীঃর মধ্যে 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের উপকরণ তিনি অধিকাংশই নিত্যানন্দের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'চৈতন্যভাগবত' তিনটি খণ্ডে বিভক্ত—আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও অন্ত্যখণ্ড। আদিখণ্ডে চৈতন্যদেবের প্রথম জীবন—গয়াগমন পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে, মধ্যখণ্ডে চৈতন্যদেবের গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন ও সন্ন্যাসগ্রহণের মধ্যবর্তী ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে, অন্ত্যখণ্ডে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পরবর্তী কয় বৎসর বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পর আকস্মিকভাবে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ হইয়াছে। 'চৈতন্যভাগবতে' চৈতন্যদেবের জীবনের অজস্র খুঁটিনাটি তথ্য বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে মানুষ চৈতন্যের একটি জীবন্ত মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'চৈতন্যভাগবতে'র আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সে যুগের সমাজ সম্বন্ধে অজস্র তথ্য ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। তবে ইহার মধ্যে লেখক বিরুদ্ধমতাবলম্বী লোকদের প্রতি কিছু অসহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। এরূপ হওয়া খুব স্বাভাবিক, কারণ এই গ্রন্থ রচনার সময়ে বৃন্দাবনদাস যুবক ছিলেন। ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে 'চৈতন্যভাগবত' সবিশেষ শ্রদ্ধার সামগ্রী এবং এই গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহারা বৃন্দাবনদাসকে 'বেদব্যাস' আখ্যা দিয়াছেন।

ইহার পরবর্তী বাংলা চৈতন্যচরিতগ্রন্থ জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'। জয়ানন্দ

১৫১০ খ্রীঃর মত সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অতি শৈশবে চৈতন্যদেবের দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'জয়ানন্দ' নামও চৈতন্যদেবের দেওয়া। ১৫৪৮ হইতে ১৫৬০ খ্রীঃর মধ্যে জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন তথ্য পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্বন্ধে অন্য চরিতগ্রন্থগুলি হয় নীরব না হয় অলৌকিক উক্তিতে পূর্ণ; কেবল জয়ানন্দই এ সম্বন্ধে বিশ্বাসগ্রাহ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন যে চৈতন্যদেবের মৃত্যুর মূল কারণ কীর্তনের সময় পায়ে ইঁট লাগিয়া আহত হওয়া। অবশ্য জয়ানন্দ যে তাঁহার গ্রন্থে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অনেক ভুল সংবাদ দিয়াছেন, তাহাও অস্বীকার করা চলে না। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'ও সেযুগের সমাজ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

জয়ানন্দের প্রায় সমসাময়িক কালেই লোচনদাস নামে জনৈক গ্রন্থকার 'চৈতন্য-মঙ্গল' নামে আর একটি বাংলা চরিতগ্রন্থ রচনা করেন। লোচনদাস ছিলেন চৈতন্যদেবের পার্ষদ নরহরি সরকারের শিষ্য। নরহরি সরকার 'গৌরনাগরবাদ' নামে একটি নূতন মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, এই মতবাদ অনুসারে চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য ভাবের মত নাগরভাবেও ভাবিত হইতেন। লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে' এই গৌরনাগরবাদের প্রতিফলন দেখা যায়। লোচনদাস প্রধানত মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া চৈতন্যচরিত বর্ণনা করিয়াছেন। মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের বহির্ভূত যে সমস্ত সংবাদ লোচনদাস তাঁহার গ্রন্থে দিয়াছেন, সে-গুলির ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। লোচনদাস প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গলে'র কাব্যমূল্য অসামান্য।

ষোড়শ শতাব্দীতে চূড়ামণিদাস নামে আর একজন গ্রন্থকার 'গৌরাঙ্গবিজয়' নামে একখানি বাংলা চরিতগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তথ্যের তুলনায় কল্পনা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বইটির মধ্যে অলৌকিক বর্ণনার খুব বেশী নিদর্শন পাওয়া যায়।

এইসব গ্রন্থকারের পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' নামক বিখ্যাত বাংলা চরিতগ্রন্থ রচনা করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিবাস ছিল কাটোয়ার নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে। যৌবনে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান এবং ছয় গোস্বামী—অর্থাৎ রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্টের নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কৃষ্ণদাস সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণলীলা

অবলম্বনে 'গোবিন্দলীলামৃত' নামক মহাকাব্য এবং বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র টীকা 'সারঙ্গরঙ্গদা' রচনা করেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি বৃন্দাবনের মহান্তদের অনুরোধে 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' তিনটি খণ্ডে বিভক্ত—আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা; ইহার মধ্যে 'আদিলীলা'য় চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ অবধি জীবনকাহিনী, 'মধ্যলীলা'য় সন্ন্যাসগ্রহণের পরবর্তী ছয় বৎসরের তীর্থপর্যটন এবং 'অন্ত্যলীলা'য় অবশিষ্ট জীবন বর্ণিত হইয়াছে, তবে চৈতন্যদেবের মৃত্যুর বর্ণনা ইহাতে নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মুরারি গুপ্তের কড়চা, স্বরূপদামোদরের কড়চা (বর্তমানে পাওয়া যায় না) এবং বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-ভাগবত' হইতে তাঁহার গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' যে সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই কৃষ্ণদাস সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। অন্য বিষয়গুলি তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সমস্ত মূল তত্ত্ব ইহার মধ্যে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য এই গ্রন্থ শুধু চৈতন্যদেবের জীবনচরিত-গ্রন্থ হিসাবেই উল্লেখযোগ্য নহে, দর্শন-গ্রন্থ হিসাবেও ইহার একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। এই গ্রন্থের কাব্যমূল্যও অপরিসীম; নীলাচলে বাসের সময়ে চৈতন্যদেবের 'দিব্যোন্মাদ' অবস্থার যে বর্ণনা কৃষ্ণদাস দিয়াছেন, তাহা প্রথম শ্রেণীর কাব্য। 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার মধ্যে লেখক অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় অত্যন্ত জটিল দার্শনিক তত্ত্বকে অবলীলাক্রমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয়। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র ভাষায় স্থানে স্থানে হিন্দী ভাষার প্রভাব দেখা যায়, লেখক দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ অসাধারণ বিনয়ী লোক ছিলেন, 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে নানাভাবে তিনি নিজের দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলির মধ্যে 'চৈতন্যচরিতামৃত' নানা দিক দিয়াই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে। তবে ইহার একমাত্র ত্রুটি এই যে, ইহার মধ্যে অলৌকিক বর্ণনার কিছু আধিক্য দেখা যায়।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র পরেও আরও কয়েকটি চৈতন্যচরিতগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। তবে নিত্যানন্দদাসের 'প্রেম-বিলাস', মনোহর দাসের 'অনুরাগবল্লী', নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' ও

'নরোত্তমবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বইগুলির মধ্যে অনেক বৈষ্ণব মহান্তের জীবনী এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। 'প্রেমবিলাস'-রচয়িতা নিত্যানন্দদাস ছিলেন নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবা দেবীর শিষ্য; এই বইটি সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকেই রচিত হইয়াছিল, তবে ইহার মধ্যে পরবর্তী কালে অনেক প্রক্ষিপ্ত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে। মনোহর দাসের 'অনুরাগবল্লী' ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়; ইহার মধ্যে মুখ্যত শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' সুবিশাল গ্রন্থ; ইহার মধ্যে প্রমাণ সহযোগে শ্রীনিবাস আচার্য প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যদের জীবনী ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে, অধুনালুপ্ত কয়েকটি গ্রন্থ সমেত বহু গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে, জীব গোস্বামী ও নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামীর লেখা কয়েকটি পত্র অবিকলভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের বিশদ ও উজ্জ্বল বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে 'ভক্তিরত্নাকর'-এর মূল্য অপরিসীম; নরহরি চক্রবর্তীর অপর গ্রন্থ 'নরোত্তমবিলাস' ক্ষুদ্রতর গ্রন্থ, ইহার মধ্যে নরোত্তম দাসের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। নরহরি চক্রবর্তীর দুইটি গ্রন্থই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হইয়াছিল। তিনি 'শ্রীনিবাসচরিত্র' নামে অধুনালুপ্ত আর একটি গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন।

৮। বৈষ্ণব নিবন্ধ-সাহিত্য

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি গৌণ শাখা নিবন্ধ-সাহিত্য। বৈষ্ণবদের পক্ষে প্রয়োজনীয় নানা বিষয় আলোচনা করিয়া ছোট বড় অনেকগুলি নিবন্ধ-গ্রন্থ বাংলায় রচিত হইয়াছিল।

ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও রসশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচনাবলী ও 'চৈতন্যচরিতামৃত'কে অনুসরণ করিয়াছে, মাত্র অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে রচয়িতারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন। এই শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রন্থের মধ্যে প্রধান কবিবল্লভের 'রসকদম্ব' (রচনাকাল ১৫৯৯ খ্রীঃ), রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী' (রচনাকাল ১৬৭৩ খ্রীঃ) এবং রামগোপাল দাসের

পুত্র পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী' ও 'অষ্টরসব্যাখ্যা' (রচনাকাল সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ)।

আর এক শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রন্থে বৈষ্ণব ভক্তদের নামের তালিকা এবং গুরুশিষ্য-পরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে। এই জাতীয় রচনার মধ্যে দৈবকীনন্দনের 'বৈষ্ণব-বন্দনা' (রচনাকাল ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)এবং রামগোপালদাস ও রসিকদাসের 'শাখানির্ণয়' (রচনাকাল সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৯। কৃষ্ণমঙ্গল

কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে যে সমস্ত আখ্যানকাব্য রচিত হইয়াছিল সেগুলিও বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্গত। এই আখ্যানকাব্যগুলিকে 'কৃষ্ণমঙ্গল' বলা হয়।

চৈতন্য-পরবর্তী যুগের সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা মাধবাচার্য। ইনি সম্ভবত চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি চৈতন্যদেবের শ্যালক ছিলেন; কিন্তু এই মতের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই।

মাধবাচার্যের শিষ্য কৃষ্ণদাসও একখানি 'কৃষ্ণমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি ভাগবতবহির্ভূত লীলা বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন যে তিনি 'হরিবংশ' হইতে এগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু 'হরিবংশ'-পুরাণের বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণে এগুলি পাওয়া যায় না। সম্ভবত সেযুগে 'হরিবংশ' নামে অন্য কোন সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল এবং তাহার মধ্যে দানখণ্ড প্রভৃতি লীলা বর্ণিত ছিল।

কবিশেখরের 'গোপালবিজয়'-ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য। এই বইটি ১৬০০ খ্রীঃর কাছাকাছি সময়ে রচিত হইয়াছিল। 'গোপালবিজয়' বৃহদায়তন গ্রন্থ এবং শক্তিশালী রচনা।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভবানন্দ নামক জনৈক পূর্ববঙ্গীয় কবি 'হরিবংশ' নামে একখানি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যটিতেও দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণদাসের মত ভবানন্দও বলিয়াছেন যে তিনি ব্যাসের 'হরিবংশ' হইতে এগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। কাব্যটি

রচনা হিসাবে প্রশংসনীয়, তবে ইহাতে আদিরসের কিছু আধিক্য দেখা যায়।

এইসব 'কৃষ্ণমঙ্গল' ব্যতীত গোবিন্দ আচার্য, পরমানন্দ এবং দুঃখী শ্যামদাস রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' গ্রন্থগুলিও উল্লেখযোগ্য। এই বইগুলি ষোড়শ শতাব্দীর রচনা। সপ্তদশ শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে পরশুরাম চক্রবর্তী রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' ও পরশুরাম রায় রচিত 'মাধবসঙ্গীত'-এর নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্টতম কৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা হইতেছেন "কবিচন্দ্র" উপাধিধারী শঙ্কর চক্রবর্তী; ইনি বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় রাজা গোপালসিংহের (রাজত্বকাল ১৭১২-৪৮ খ্রীঃ) সভাকবি ছিলেন; ইহার কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য অনেকগুলি খণ্ডে বিভক্ত; প্রতি খণ্ডের অজস্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র রামায়ণ, মহাভারত, ধর্মমঙ্গল ও শিবায়নও রচনা করিয়াছিলেন; ইহার লেখা কাব্যগুলির যত পুঁথি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তত পুঁথি আর কোন বাংলা গ্রন্থের মিলে নাই।

১০। সহজিয়া সাহিত্য

"সহজিয়া" নামে (নামটি আধুনিক কালের সৃষ্টি) পরিচিত সম্প্রদায়ের লোকেরা বাহ্যত বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু ইহাদের দার্শনিক মত ও সাধন-পদ্ধতি দুইই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তুলনায় স্বতন্ত্র। ইঁহারা বিশ্বাস করিতেন যাহা কিছু তত্ত্ব ও দর্শন সবই মানুষের দেহে আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা পরকীয়া প্রেমকে সাধনার রূপক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, বাস্তব জীবনে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু সহজিয়া সাধকেরা বাস্তব জীবনেও পরকীয়া প্রেমের চর্চা করিতেন, ইঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে ইহারই মধ্য দিয়া সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব। সহজিয়ারা মনে করিতেন যে, বিল্ব-মঙ্গল, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রূপ, সনাতন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি প্রাচীন সাধক ও কবিরা সকলেই পরকীয়া-সাধন করিতেন।

সহজিয়াদেরও একটি নিজস্ব সাহিত্য ছিল এবং তাহার পরিমাণ সুবিশাল। সহজিয়া-সাহিত্যকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—পদাবলী ও নিবন্ধ-সাহিত্য। এ পর্যন্ত বহু সহজিয়া পদ ও সহজিয়া নিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কিছু উৎকৃষ্ট রচনা থাকিলেও অধিকাংশই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর রচনা। অনেক রচনায়

অশ্লীল ও রুচিবিগর্হিত উপাদানও দেখিতে পাওয়া যায়। সহজিয়া লেখকেরা নিজেদের রচনায় প্রায়ই রচয়িতা হিসাবে নিজেদের নাম না দিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, নরহরি সরকার, রঘুনাথ দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরোত্তম দাস প্রভৃতি প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকারদের নাম দিতেন। নিজেদের নামে যাঁহারা সহজিয়া পদ ও নিবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মুকুন্দদাস, তরুণীরমণ, বংশীদাস প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১১। অনুবাদ-সাহিত্য

রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং অন্যান্য বহু সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হইয়াছিল। কিছু কিছু ফার্সী এবং হিন্দী বইও অনূদিত হইয়াছিল। তবে এই অনুবাদ প্রায়ই আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। ইহাদের মধ্যে কবির স্বাধীন রচনা এবং বাংলা দেশের ঐতিহ্য-অনুসারী মূলাতিরিক্ত বিষয় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক) রামায়ণ

বাংলার অনুবাদ-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে রামায়ণের কথাই প্রথমে বলিতে হয়। প্রথম বাংলা রামায়ণ-রচয়িতা কৃত্তিবাস সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার পরে ষোড়শ শতকে রচিত শঙ্করদেব ও মাধব কন্দলীর রামায়ণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। শঙ্করদেব আসামের বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক। শূদ্র হইয়াও তিনি ব্রাহ্মণদের দীক্ষা দিতেন, এই অপরাধে তাঁহাকে স্বদেশে নিগৃহীত হইতে হয়। তখন তিনি কামতা (কোচবিহার) রাজ্যে পলাইয়া আসেন এবং কামতা-রাজের আশ্রয়ে অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া পরলোকগমন করেন। মাধব কন্দলী শঙ্করদেবের পূর্ববর্তী কবি। "শ্রীমহামাণিক্য বরাহ রাজার অনুরোধে" ইনি ছয় কাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন। উত্তরকাণ্ডটি লেখেন শঙ্করদেব। প্রাচীন বাংলা ও প্রাচীন অসমীয়া ভাষার মধ্যে প্রায় কিছুই পার্থক্য ছিল না। এই কারণে, মাধব কন্দলী ও শঙ্করদেব আসামের অধিবাসী হইলেও ইহাদের রচিত রামায়ণকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা রামায়ণ-রচয়িতাদের মধ্যে "অদ্ভুত আচার্য" নামে পরিচিত জনৈক কবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ। প্রবাদ এই যে, সাত বৎসর বয়সে অক্ষরপরিচয়হীন অবস্থায় ইনি মুখে মুখে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন; এই অদ্ভুত কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া ইনি "অদ্ভুত আচার্য" নাম পাইয়াছিলেন; মতান্তরে, ইনি সংস্কৃত অদ্ভুত-রামায়ণ অবলম্বনে বাংলা রামায়ণ লিখিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম "অদ্ভুত-আচার্য" হইয়াছিল; আর একটি মত এই যে, ইহার নাম "অদ্ভুত-আচার্য" আদপে ছিল না, লিপিকর-প্রমাদে "অদ্ভুত আশ্চর্য রামায়ণ" কথাটিই "অদ্ভুত আচার্য রামায়ণ"-এ পরিণত হইয়াছে এবং তাহা হইতেই সকলে ধরিয়া লইয়াছে যে কবির নাম "অদ্ভুত আচার্য"। সে যাহা হউক, "অদ্ভুত আচার্য" রচিত রামায়ণটি বেশ প্রশংসনীয় রচনা। ইহাতে সপত্নী সুমিত্রার সমব্যথিনী স্নেহময়ী কৌশল্যার চরিত্রটি যেরূপ জীবন্ত হইয়াছে, তাহার তুলনা বিরল। "অদ্ভুত আচার্য"র রামায়ণ এক সময়ে উত্তরবঙ্গের খুব জনপ্রিয় ছিল, ঐ অঞ্চলে তখন কৃত্তিবাসী রামায়ণের তেমন প্রচার ছিল না। বর্তমানে "অদ্ভুত আচার্য"র রামায়ণ তাহার জনপ্রিয়তা হারাইয়াছে বটে, তবে ইহার অনেক অংশ কৃত্তিবাসী রামায়ণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এখন কৃত্তিবাসেরই নামে চলিয়া যাইতেছে।

ইহারা ভিন্ন আরও অনেক বাঙালী কবি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। কয়েকজনের নাম এখানে উল্লিখিত হইল—দ্বিজ লক্ষ্মণ, কৈলাস বসু, ভবানী দাস, কবিচন্দ্র চক্রবর্তী, মহানন্দ চক্রবর্তী, গঙ্গারাম দত্ত, কৃষ্ণদাস। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত রামানন্দ ঘোষের রামায়ণের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে; এই রামায়ণে রামানন্দ নিজেকে বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়াছেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি বাংলা রামায়ণের রচনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। এটি বাঁকুড়া-নিবাসী জগৎরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় দুইজনে মিলিয়া রচনা করেন।

(খ) মহাভারত—কাশীরাম দাস

বাংলা মহাভারত রচনা সুরু হয় আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ)। হোসেন শাহ কর্তৃক নিযুক্ত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান মহাভারত শুনিতে খুব ভালবাসিতেন, কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতের মর্ম ভাল-

ভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তাই তিনি তাঁহার সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে দিয়া একখানি বাংলা মহাভারত রচনা করান। এইটিই প্রথম বাংলা মহাভারত এবং সম্ভবত উত্তর ভারতে প্রচলিত কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষায় লেখা প্রথম মহাভারত। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতখানি সুখপাঠ্য, তবে সংক্ষিপ্ত।

পরাগল খানের পুত্র ছুটি খান (প্রকৃত নাম নসরৎ খান) ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে হোসেন শাহের অধিকৃত অঞ্চলবিশেষের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি জৈমিনি রচিত মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাই তিনি তাঁহার সভাকবি শ্রীকর নন্দীকে দিয়া জৈমিনির অশ্বমেধ-পর্বকে বাংলায় ভাবানুবাদ করান। শ্রীকর নন্দীর এই মহাভারত হোসেন শাহের রাজত্বের শেষ দিকে অথবা নসরৎ শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়।

পূর্ববঙ্গের যে মহাভারতটির প্রচার সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল, সেটির প্রায় আগাগোড়ায়ই সঞ্জয়ের ভণিতা পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন এই মহাভারতের রচয়িতার নাম সঞ্জয়। কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে এই সঞ্জয় মহাভারতের অন্যতম চরিত্র সঞ্জয় ভিন্ন আর কেহই নহে, তাহারই নামে ইহাতে কবি ভণিতা দিয়াছেন। শেষোক্ত মতই সত্য বলিয়া মনে হয়। কোন কোন পুঁথিতে লেখা আছে যে, হরিনারায়ণ দেব নামে জনৈক ভরদ্বাজ-বংশীয় ব্রাহ্মণ 'সঞ্জয়' নামের অন্তরালে নিজেকে গোপন রাখিয়া এই মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে সঞ্জয়ের মহাভারত কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের পূর্বে রচিত হয় এবং ইহাই প্রথম বাংলা মহাভারত। কিন্তু এই মতের সমর্থনে বিশেষ কোন যুক্তি নাই। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতে উহার রচনার যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে উহার পূর্বে অন্তত পূর্ববঙ্গে কোন বাংলা মহাভারত রচিত হয় নাই।

আর একজন বিশিষ্ট মহাভারত-রচয়িতা নিত্যানন্দ ঘোষ। ইনি সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর লোক। ইঁহার মহাভারত আকারে বৃহৎ এবং ইহার প্রচার পশ্চিম বঙ্গেই সমধিক ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত অন্যান্য বাংলা মহাভারতের মধ্যে উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা মুকুন্দদেবের বাঙালী সভাকবি দ্বিজ রঘুনাথ রচিত 'অশ্বমেধপর্ব', উত্তর রাঢ়ের কবি রামচন্দ্র খান রচিত 'অশ্বমেধপর্ব' এবং কোচবিহারের রাজসভার

আশ্রিত দুইজন কবির রচনা—রামসরস্বতীর 'বনপর্ব' ও পীতাম্বর দাসের 'নল-দময়ন্তী-উপাখ্যান'-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইহাদের পরে কাশীরাম দাস আবির্ভূত হন। কাশীরামের পুরা নাম কাশীরামদাস দেব। তাঁহার পিতার নাম কমলাকান্ত দেব। তাঁহার তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস, মধ্যম কাশীরামদাস, কনিষ্ঠ গদাধরদাস। ইহাদের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ইন্দ্রাবনী বা ইন্দ্রাণী পরগনার কোন এক গ্রামে। গ্রামটির নাম কোন পুঁথিতে 'সিঙ্গি', কোন পুঁথিতে 'সিদ্ধি' পাওয়া যায়। তবে কমলাকান্ত দেব দেশত্যাগ করিয়া উড়িষ্যায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানেই কাশীরামদাসের মহাভারত রচিত হয়।

বর্তমানে যে অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারত কাশীরামদাসের নামে প্রচলিত, তাহার সবখানিই কাশীরামদাসের রচনা নহে। ইহার সমগ্র আদিপর্ব, সভাপর্ব ও বিরাট-পর্ব এবং বনপর্বের কিয়দংশ কাশীরামের লেখনীনিঃসৃত। এই সাড়ে তিনটি পর্ব রচনা করিয়া কাশীরামদাস পরলোকগমন করেন, মৃত্যুকালে তাঁহার সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামদাসকে তিনি অনুরোধ জানান তাঁহার আরব্ধ কার্য শেষ করিবার জন্য। নন্দরাম ইহার পর আর কয়েকটি পর্ব রচনা করেন, কিন্তু তিনিও মহাভারত শেষ করিতে পারেন নাই। অন্য বহু কবি মিলিয়া কিছু কিছু লিখিয়া এই মহাভারত শেষ করেন। যে সমস্ত পর্ব কাশীরামদাস লিখেন নাই, সেগুলিতে তাহাদের প্রকৃত রচয়িতাদেরই ভণিতা আদিতে ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে এই মহাভারতের লিপিকর, গায়ন ও প্রকাশকরা ঐসব কবির ভণিতা তুলিয়া দিয়া সর্বত্র কাশীরামদাসের ভণিতা বসাইয়া দিয়াছেন। ফলে এখন সমগ্র মহাভারত-খানিই কাশীরামদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে।

কাশীরামদাসের মহাভারতের বিরাটপর্বের কোন কোন পুঁথিতে যে রচনাকাল-বাচক শ্লোক পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে ঐ পর্বের রচনা ১৬০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। কাশীরামদাসের লেখা অন্যান্য পর্বগুলি ইহার কিছু আগে বা পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কাশীরামদাসের অনুজ গদাধরদাস ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'জগন্নাথমঙ্গল' নামে একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন, এই কাব্যে তিনি কাশীরামদাসের মহাভারত রচনার উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং কাশীরামদাসের রচিত পর্বগুলির রচনাকালের অধস্তন সীমা ১৬৪২ খ্রীঃ।

কাশীরামদাসের রচিত পর্বগুলি হইতে বুঝা যায় যে, কাশীরাম একজন শ্রেষ্ঠ

কবি ছিলেন। বিষ্ণুর মোহিনী-রূপ ধারণ, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভা প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনায় কাশীরাম অতুলনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কাশীরামের মহাভারত বাংলাদেশে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, এক কৃত্তিবাস ছাড়া আর কোন কবির রচনা অনুরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত কাশীরামদাসের মহাভারতও বাঙালীর জাতীয় কাব্য। কিন্তু কৃত্তিবাস শুধু বাংলা রামায়ণের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা নহেন, সেই সঙ্গে আদি রচয়িতাও। পক্ষান্তরে কাশীরামদাসের পূর্বেই অনেক কবি বাংলা মহাভারত রচনা করিয়া কাশীরামকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই কারণে কাশীরামদাসের অপেক্ষা কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব অধিক।

কাশীরামদাসের মহাভারত অভূতপূর্ব্ব জনপ্রিয়তা লাভ করার ফলে তাঁহার পূর্ববর্তী কবিদের রচিত বাংলা মহাভারতগুলি অচিরে বিস্মৃতির জগতে চলিয়া গেল। কাশীরামদাসের পরে সপ্তদশ শতকে ঘনশ্যাম দাস, অনন্ত মিশ্র, রাজেন্দ্র দাস, রামনারায়ণ দত্ত, রামকৃষ্ণ কবিশেখর, শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কবিগণ এবং অষ্টাদশ শতকে কবিচন্দ্র চক্রবর্তী, ষষ্ঠীবর সেন, তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন, "জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ" বাসুদেব, ত্রিলোচন চক্রবর্তী, দৈবকীনন্দন, কৃষ্ণরাম, রামনারায়ণ ঘোষ, লোকনাথ দত্ত প্রভৃতি কবিরা বাংলা মহাভারত রচনা করেন। অবশ্য সম্পূর্ণ মহাভারত খুব কম কবিই রচনা করিয়াছিলেন, অধিকাংশই মহাভারতের অংশবিশেষকে বাংলা রূপ দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের কাহারও রচনা বিশেষ জনপ্রিয় হইতে পারে নাই।

(গ) ভাগবত

রামায়ণ ও মহাভারতের মত ভাগবতেরও বাংলা অনুবাদ হইয়াছিল, তবে খুব বেশী হয় নাই। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং চৈতন্যদেবের দ্বারা 'ভাগবতাচার্য' উপাধিতে ভূষিত বরাহনগর-নিবাসী কবি রঘুনাথ পণ্ডিত 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' নাম দিয়া ভাগবতের অনুবাদ করেন; কিন্তু ভাগবতের বারটি স্কন্ধের মধ্যে প্রথম নয়টি স্কন্ধের তিনি সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন এবং শেষ তিনটি স্কন্ধের আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহার পর আসামের ধর্মপ্রচারক শঙ্করদেব কামতারাজের আশ্রয়ে থাকিয়া ভাগবতের কয়েকটি স্কন্ধের অনুবাদ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ

শতকের মধ্যভাগে সনাতন চক্রবর্তী নামে একজন কবি সমগ্র ভাগবতের বঙ্গানুবাদ করেন—১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়। সপ্তদশ শতকের শেষ দশকে সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশ নামে আর একজন কবি কটকে বসিয়া ভাগবতের প্রথম নয়টি স্কন্ধের আক্ষরিক অনুবাদ করেন; ইনি ছিলেন "কলিকাতা ঘোষাল বংশের" সন্তান।

(ঘ) অন্যান্য অনুবাদ-গ্রন্থ

রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত ভিন্ন অন্যান্য কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থও বাংলায় অনূদিত হইয়াছিল। তবে সেগুলি সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে উল্লেখযোগ্য কিছু হয় নাই। হিন্দী এবং ফার্সী ভাষার যে সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশেরই অনুবাদক মুসলমান। পরবর্তী প্রসঙ্গে সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

১২। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দান

বাংলা সাহিত্যের মুসলমান লেখকেরা হিন্দু লেখকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত পরে অংশগ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। কারণ, বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা যে আরবী বা ফার্সী নহে—বাংলা, ইহা উপলব্ধি করিতে তাঁহাদের কয়েক শতাব্দী লাগিয়াছিল।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকেরা এমন একটি নূতন বস্তু দিয়াছেন, যাহা হিন্দু লেখকেরা দিতে পারেন নাই। ধর্মনিরপেক্ষ বা লৌকিক কাব্য এবং বিশুদ্ধ প্রণয়মূলক কাব্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাঁহারাই প্রবর্তন করিয়াছেন। হিন্দুরা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে সমস্ত ধারায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রায় সবই ধর্মমূলক, কারণ হিন্দুরা সাহিত্যকে ধর্মচর্চার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিতেন। কিন্তু মুসলমানরা সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়া ধর্মচর্চার কোন প্রয়োজন অনুভব করেন নাই; এইজন্য তাঁহারা ধর্মনিরপেক্ষ বা বিশুদ্ধ প্রণয়মূলক বিষয় অবলম্বনে বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন। অবশ্য ধর্মমূলক বিষয় অবলম্বনেও তাঁহারা লিখিয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দী হইতে মুসলমান লেখকদের বাংলা রচনার সাক্ষাৎ পাই। এই শতাব্দীতে সাবিরিদ খান নামে একজন মুসলমান কবি একখানি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন। ইহার ভাষা বেশ প্রাচীন। কবিকল্পনাতেও স্থানে স্থানে অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের সংস্কৃত-জ্ঞানের পরিচয়ও কাব্যের মধ্যে মিলে।

ষোড়শ শতাব্দীর আর একজন বিশিষ্ট বাঙালী মুসলমান কবি চট্টগ্রামের পরাগলপুর-নিবাসী কবি সৈয়দ সুলতান। ইনি 'জ্ঞানপ্রদীপ', 'নবীবংশ' এবং 'শবে মেয়েরাজ' নামে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; প্রথম গ্রন্থটিতে যোগসাধনার তত্ত্ব, দ্বিতীয়টিতে বারজন নবীর জীবনকাহিনী এবং তৃতীয়টিতে হজরৎ মুহম্মদের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। 'নবীবংশ' বইখানি আয়তনে খুব বিরাট।

জৈনুদ্দীন নামে আর একজন কবি 'রসুলবিজয়' নাম দিয়া হজরৎ মুহম্মদের জীবনকাহিনী বর্ণনা করিয়া একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন। ইনি সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর লোক। "ইছপ খান" অর্থাৎ য়ুসুফ খান নামে একজন ব্যক্তি জৈনুদ্দীনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সৈয়দ সুলতানের শিষ্য মোহাম্মদ খান একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। ইনি ১০৫৬ হিজরা বা ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মক্তুল হোসেন' নামে একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন। এই কাব্যটিতে কারবালার করুণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মোহাম্মদ খান সংস্কৃত ভাষা যে খুব ভাল জানিতেন এবং হিন্দু পুরাণসমূহ যে তাঁহার ভাল করিয়া পড়া ছিল, তাহার পরিচয় তাঁহার এই কাব্য হইতে পাওয়া যায়। তাঁহার রচনা-রীতি অত্যন্ত পরিশুদ্ধ। মোহাম্মদ খান 'সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ' বা 'যুগ-সংবাদ' নামে আর একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন; ইহাতে সত্যযুগ ও কলিযুগের কাল্পনিক বিবাদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। 'মক্তুল-হোসেন' কাব্যে মোহাম্মদ খান নিজের মাতৃকুল ও পিতৃকুলের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে, উভয় কুলেই অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার পিতৃকুলের লোকেরা বহু পুরুষ ধরিয়া চট্টগ্রামের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান কবিদ্বয়—দৌলত কাজী ও আলাওল আবির্ভূত হন। ইঁহারা আরাকানের রাজধানী রোসাঙ্গ নগরে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আরাকানরাজের অমাত্যদের কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। দৌলত কাজী আরাকানরাজ শ্রীসুধর্মার

(রাজত্বকাল ১৬২২-৩৮ খ্রীঃ) সেনাপতি লস্কর-উজীর আশরফ খানের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশে 'সতী ময়নামতী' নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যটি সাধন নামে একজন উত্তর-ভারতীয় কবির লেখা 'মৈনা সৎ' নামে একটি ছোট হিন্দী কাব্যের আধারে রচিত। এই কাব্যের নায়িকা সতী ময়নামতী স্বামী লোর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যে বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় দৌলত কাজী অপরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। সংহত স্বল্পপরিমিত ভাবঘন উক্তিসমূহের মধ্য দিয়া কাব্যরস সৃষ্টি করা দৌলত কাজীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই কাব্যে ময়নামতীর বারমাস্যা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও কাব্যরসপূর্ণ রচনা। তবে দৌলত কাজীর আকস্মিক মৃত্যু হওয়ার ফলে 'সতী ময়নামতী' কাব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। দীর্ঘকাল পরে আলাওল এই কাব্যকে সম্পূর্ণ করেন।

আলাওল তাঁহার বিভিন্ন কাব্যে নিজের জীবনকাহিনী বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৬০০ খ্রীঃর কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ফতেহাবাদের (আধুনিক ফরিদপুর অঞ্চল) স্বাধীন ভূস্বামী মজলিস কুতুবের অমাত্য ছিলেন। একদিন জলপথ দিয়া যাইবার সময় আলাওল ও তাঁহার পিতা পর্তুগীজ জলদস্যুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হন। আলাওলের পিতা পর্তুগীজদের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেন। আলাওল কোনক্রমে অব্যাহতি লাভ করিয়া সাঁতরাইয়া আরাকানের কূলে আসিয়া উঠেন। ইহার পর আলাওল আরাকানরাজ্যের অশ্বারোহী-বাহিনীতে নিযুক্ত লইলেন। আলাওলের উচ্চ কুল, পাণ্ডিত্য ও সঙ্গীতনৈপুণ্যের জন্য তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। রাজ্যের প্রধান কর্তা মুখ্য অমাত্য মাগন ঠাকুর আলাওলকে নিজের গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষণ করিতে লাগিলেন। মাগনের অনুরোধে আলাওল 'পদ্মাবতী' নামে একটি কাব্য লিখিলেন ; কাব্যটি জায়সী নামক উত্তর ভারতীয় সূফী মুসলমান কবির লেখা 'পদমাবৎ' নামক কাব্যের' (রচনাকাল ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ) স্বাধীন অনুবাদ। 'পদ্মাবতী' আরাকানরাজ থদো-মিনতারের রাজত্বকালে (১৬৪৫-৫২ খ্রীঃ) রচিত হয়। 'পদ্মাবতী'র মধ্যে রোমাণ্টিক উপাদান এবং অধ্যাত্ম-অনুভূতির আশ্চর্য সমন্বয় সাধিত হওয়ায় কাব্যটি অভিনবত্ব ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। হিন্দু পুরাণ এবং সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আলাওলের প্রগাঢ় জ্ঞানের নিদর্শনও এই কাব্যে পাই। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবও এই কাব্যে দেখা

যায়। মোটের উপর 'পদ্মাবতী' কাব্য হিসাবে সম্পূর্ণ সার্থক এবং এইটিই আলাওলের শ্রেষ্ঠ রচনা।

'পদ্মাবতী'র পরে আলাওল মাগন ঠাকুরের অনুরোধে 'সৈফুলমুল্‌কবদি-উজ্জামাল' নামে একটি কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। এটি ঐ নামের একটি ফার্সী কাব্যের বঙ্গানুবাদ। মাগন ঠাকুরের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে এই কাব্যের রচনায় ছেদ পড়ে। কয়েক বৎসর পরে সৈয়দ মুসা নামে একজন সদাশয় ব্যক্তির আজ্ঞায় আলাওল কাব্যটি শেষ করেন। আলাওল আরাকানরাজের মহাপাত্র সোলেমানেরও পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। সোলেমানের অনুরোধে আলাওল দৌলত কাজীর অসম্পূর্ণ কাব্য 'সতী ময়নামতী' সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। কবি হিসাবে দৌলত কাজী আলাওলের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন; তাহার উপর ফরমায়েসী রচনার মধ্যে আলাওলের নিজস্ব কবিত্বশক্তিও তেমন স্ফূর্তি পায় নাই; সেইজন্য এই কাব্যে আলাওল-রচিত অংশ দৌলত কাজীর রচনার তুলনায় নিকৃষ্ট হইয়াছে। সোলেমানের অনুরোধে আলাওল য়ূসুফ গদার আরবী গ্রন্থ 'তোহ্‌ফা'র বঙ্গানুবাদ করেন; এই বইটি ইসলাম ধর্মের অনুষ্ঠান ও কৃত্য বিষয়ক নিবন্ধ। আলাওলের 'তোহ্‌ফা'র রচনা ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ ও ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়।

কিন্তু ঘটনাচক্রে আলাওল এক বিপদে পড়েন; শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শুজা ঔরঙ্গজেবের নিকট পরাজিত হইয়া আরাকানরাজের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্রসুধর্মার সহিত বিবাদ করিতে গিয়া আরাকানরাজের আজ্ঞায় সপরিজনে নিহত হন। শুজার সহিত আলাওলের মেলামেশা ছিল। তাই আলাওলের জনৈক শত্রু আলাওলের নামে রাজার মন বিষাক্ত করিয়া দিয়া আলাওলকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করাইল। পঞ্চাশ দিন পরে রাজা আলাওলের নির্দোষিতার প্রমাণ পাইয়া তাঁহাকে মুক্তি দিলেন এবং তাঁহার শত্রুর প্রাণদণ্ড বিধান করিলেন। কিন্তু মুক্তি পাইয়া আলাওল অপরি-সীম দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হইলেন। এগারো বৎসর এইভাবে কাটিবার পর আলাওল মজলিস নবরাজ নামে একজন রাজ-অমাত্যের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিলেন। ইহার আদেশে আলাওল 'সেকেন্দারনামা' নামে একটি কাব্য রচনা করিলেন; এটি নিজামীর লেখা ফার্সী কাব্য 'সেকেন্দারনামা'র বঙ্গানুবাদ। আলাওল আরাকানরাজের সেনাপতি সৈয়দ মোহাম্মদের পৃষ্ঠপোষণও লাভ করিয়া-ছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে 'সপ্তপয়কর' নামে একটি কাব্য লেখেন;

বইটি নিজামীর 'হপ্তপয়কর' নামক সপ্ত-কাহিনী বর্ণনামূলক ফার্সী কাব্যের অনুবাদ।

আলাওল 'রাগনামা' নামা একটি সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। কিছু রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদও তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

'পদ্মাবতী' ভিন্ন অন্য কোন রচনায় আলাওল উল্লেখযোগ্য দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

অন্যান্য মুসলমান কবিরা নানা ধারা অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এখানে কয়েকটি প্রধান ধারা এবং ঐ সব ধারার প্রধান প্রধান কবিদের নাম উল্লিখিত হইল।

(ক) হিন্দী রোমান্টিক কাব্যের অনুবাদ বা অনুসরণ

অন্তত দুইটি হিন্দী রোমান্টিক কাব্য বাংলায় একাধিক কবি কর্তৃক অনূদিত বা অনুসৃত হইয়াছিল। প্রথম—কুৎবনের 'মৃগাবতী' (রচনাকাল ৯০৯ হিজরা বা ১৫০৩ খ্রীঃ); এই কাব্য অবলম্বনে কয়েকজন মুসলমান কবি বাংলা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে মুহম্মদ খাতের ও করিমুল্লার নাম উল্লেখযোগ্য। তারপর, মনোহর ও মধুমালতীর প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে হিন্দীতে কয়েকটি কাব্য রচিত হইয়াছিল। এই সব কাব্য অবলম্বনে বাংলা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন মুহম্মদ কবীর, সৈয়দ হামজা ও সাকের মামুদ।

(খ) ফার্সী রোমান্টিক কাব্যের অনুবাদ বা অনুসরণ

ফার্সী ভাষায় রচিত রোমান্টিক কাব্যগুলির এক বৃহদংশই 'লায়লি-মজনু' এবং 'ইউসুফ-জোলেখা'র প্রেমোপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। কয়েকজন মুসলমান কবি এইসব কাব্যের অনুবাদ বা অনুসরণ করিয়া বাংলা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা 'লায়লি-মজনু'-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চট্টগ্রাম-নিবাসী কবি বাহরাম খান। ইনি "নিজাম শাহ" উপাধিধারী আরাকান ও চট্টগ্রামের অধিপতি শ্রীচন্দ্রসুধর্মার "দৌলত-উজীর" ছিলেন এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা 'ইউসুফ-জোলেখা'র

রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাহ মোহাম্মদ সগীর (বা "সগিরি")। ইহার কাব্যের ভাষা হইতে এবং কাব্যের উপর জামীর (১৪১৪-৯২ খ্রীঃ) ফার্সী 'ইউসুফ-জোলেখা'র প্রভাব হইতে মনে হয়, ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের লোক। কেহ কেহ শাহ মোহাম্মদ সগীরকে বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের (রাজত্ব-কাল ১৩৯০-১৪১০ খ্রীঃ) সমসাময়িক মনে করেন, কিন্তু এই মত কোনমতেই সমর্থন করা যায় না।

(গ) নবীবংশ, রসুলবিজয় ও জঙ্গনামা

'নবীবংশ' পয়গম্বরদের কাহিনী, 'রসুলবিজয়' হজরত মুহম্মদের কাহিনী ও 'জঙ্গনামা' যুদ্ধের (বিশেষত ইসলাম-ধর্ম-প্রচারকদের ধর্মযুদ্ধের) কাহিনী অবলম্বনে লেখা কাব্য। এই শ্রেণীর কাব্যগুলি হরিবংশ ও মহাভারতের অনুসরণে রচিত। যাঁহারা এই জাতীয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অন্যান্য রচয়িতাদের মধ্যে হায়াৎ মামুদ, শাহা বদিউদ্দীন, শেখ চাঁদ, নসরুল্লা খান ও মনসুরের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি হায়াৎ মামুদই শ্রেষ্ঠ। ইনি 'মহরমপর্ব' নামে যে বইটি লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কারবালা-কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতের মিল দেখানোর চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন হায়াৎ মামুদ 'চিত্ত-উত্থান', 'হিতজ্ঞান বাণী' ও 'আম্বিয়া-বাণী' নামে তিনটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে 'চিত্ত-উত্থান' কাব্য হিতোপদেশের ফার্সী অনুবাদ অবলম্বনে রচিত।

(ঘ) পীর ও গাজীর মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক কাহিনী

'পীর' অর্থাৎ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ধর্মগুরু এবং 'গাজী' অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের যোদ্ধাদের লইয়া বঙ্গীয় মুসলমান কবিরা অনেক কাব্য লিখিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে "গরীব ফকীর"-এর 'মাণিকপীরের গীত' এবং ফয়জুল্লার 'গাজীবিজয়' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পীর-মাহাত্ম্যমূলক কাব্যগুলির মধ্যে 'সত্যপীরের পাঁচালী'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে ইহার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া পরবর্তী প্রসঙ্গে ইহার সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হইবে।

(ঙ) পদাবলী

বাংলার মুসলমান কবিরা হিন্দু কবিদের অনুসরণে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক অনেক পদ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বলা বাহুল্য, রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্বন্ধীয় পদই সংখ্যায় অধিক। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মাধুর্য ইঁহাদের কবি-অনুভূতিকে দোলা দিয়াছিল বলিয়াই ইঁহারা এই সমস্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য দুই একজনের পদে ভাবের যে আন্তরিকতা দেখা যায়, তাহা হইতে মনে হয় ইঁহাদের অন্তরে প্রকৃত ভক্তিও ছিল। যে সমস্ত মুসলমান কবি পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সৈয়দ মূর্তজার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। ইঁহার একটি পদে ('শ্যাম বঁধু আমার পরাণ তুমি') ভাবের যে গভীরতা দেখা যায়, তাহা চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পদকে স্মরণ করায়। অন্যান্য মুসলমান পদকর্তাদের মধ্যে নাসির মামুদ, শাহা আকবর, গরীবুল্লা, গরীব খাঁ, আলী রাজা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যদেবের রূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াও কোন কোন বাঙালী মুসলমান কবি পদ রচনা করিয়াছিলেন।

(চ) গাথা

বাংলার মুসলমান কবিদের লেখা গাথা-কাব্য বেশ কয়েকখানি পাওয়া গিয়াছে। এই গাথা-কাব্যগুলির অধিকাংশই প্রণয়বিষয়ক। ইহাদের মধ্যে সরুফের 'দামিনী-চরিত্র', কোরেশী মাগনের 'চন্দ্রাবতী' এবং খলিলের 'চন্দ্রমুখী-পুঁথি'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সব গাথা-কাব্যের কাহিনী এ দেশে লোকমুখে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

(ছ) সাধনতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় নিবন্ধ

কোন কোন বঙ্গীয় মুসলমান কবি সাধনতত্ত্ব বিষয়ক নিবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি বাউল-দরবেশী সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য; যেমন, আলী রাজা বিরচিত 'জ্ঞানসাগর' ও 'সিরাজকুলুপ'।

১৩। সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পাঁচালী

বহু শতাব্দী ধরিয়া বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করিয়া আসিলেও ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক দিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মিলন-সেতু রচনার প্রচেষ্টা

খুব বেশী হয় নাই। সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের উপাসনা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত হওয়া এ দিক দিয়া একটি উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। 'সত্যপীর' ও 'সত্যনারায়ণ' আসলে একই উপাস্যের দুইটি রূপ। এই দুইটি রূপের মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনতর, তাহা বলা দুরূহ। 'সত্যনারায়ণ' প্রাচীনতর হইলে বলিতে হইবে হিন্দু দেবতা পরবর্তী কালে মুসলমানী প্রভাবে 'পীর'-এ পরিণত হইয়াছেন, 'সত্যপীর' প্রাচীনতর হইলে বলিতে হইবে 'পীর' হিন্দু প্রভাবে দেবতা বনিয়াছেন। যাহা হউক, 'সত্যনারায়ণ-এর পূজা কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত, 'সত্যপীর'-এর উপাসনা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত। 'সত্যপীরে'র উপাসনার সময়ে মুসলমানী রীতি অনুযায়ী 'সিন্নি' নিবেদন করা হইয়া থাকে। 'সত্যনারায়ণ'-এর হিন্দুমতে পূজার সময়েও 'সিন্নি' নিবেদন করা হয়।

'সত্যনারায়ণের 'পাঁচালী' ব্রতকথা এবং পূজার সময়ে ইহা পঠিত হয়। ইহার কাহিনী দুইটি—প্রথমটি ধর্মমঙ্গলের ধর্মঠাকুরের আবির্ভাবের কাহিনীর মত, দ্বিতীয়টি চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতির কাহিনীর মত। 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'-রচয়িতাদের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, কবিবল্লভ, জয়নারায়ণ সেন, দৈবকীনন্দন, গঙ্গারাম প্রভৃতি কবির নাম উল্লেখযোগ্য। আরও বহু কবি এই পাঁচালী লিখিয়াছিলেন।

'সত্যপীরের পাঁচালী'-ও অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল। বিভিন্ন পাঁচালীতে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী দেখা যায়। কোন কাহিনীতে দেখা যায় যে, সত্যপীর "আলা বাদশাহ" নামক জনৈক নৃপতির কন্যার কানীন-পুত্ররূপে অবতীর্ণ, কোন কাহিনীতে দেখি তিনি নারীরূপে "হোসেন শাহা বাদশা"র কামনা নিবৃত্ত করিতেছেন, আবার কোন কাহিনীতে অন্য কিছু। সবগুলি কাহিনীতেই দেখা যায় সত্যপীর তাঁহার কৃপাভাজন ব্যক্তিদের দিয়া পৃথিবীতে তাঁহার উপাসনা প্রবর্তন করাইতেছেন। 'সত্যপীরের পাঁচালী'-রচয়িতাদের মধ্যে কৃষ্ণহরি দাস, শঙ্কর, কবি কর্ণ, নায়েক ময়াজ গাজী, আরিফ, ফয়জুল্লা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এখানে উল্লেখযোগ্য, 'সত্যপীর' ভিন্ন আরও কয়েকটি উপাস্যের উপাসনা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুরা বনদুর্গা, ঠাকুর গোরাচাঁদ, কালু রায় (কুমীরের দেবতা), সিদ্ধা মৎস্যেন্দ্রনাথের পূজা করে, এই সব দেবতাই মুসলমানদের কাছে যথাক্রমে বনবিবি, পীর গোরাচাঁদ, কালু শাহ এবং মোছরা পীর রূপে উপাসিত হইয়াছেন। এই সব উপাস্যের প্রশস্তি-বর্ণনামূলক

পাঁচালীও উভয় সম্প্রদায়ের কবিরাই রচনা করিয়াছেন। তবে সেগুলির সাহিত্যিক মূল্য বেশী নয়।

১৪। নাথ-সাহিত্য

বাংলার নাথ সম্প্রদায়ের ধর্ম ও সাধনতত্ত্ব এবং ঐ সম্প্রদায়ের আদি গুরুদের কাহিনী অবলম্বনে বাংলা ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। নাথ সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালী অত্যন্ত বিচিত্র। অন্য সমস্ত সম্প্রদায় সাধনা করেন মৃত্যুর পরে মুক্তি লাভের জন্য; আর নাথদের সাধনার লক্ষ্য নরদেহের অমরত্ব অর্জন করিয়া জীবদ্দশাতেই মুক্তিলাভ করা; এই সাধনার মূল অঙ্গ সংযম, ব্রহ্মচর্য এবং 'কায়া-সাধন' নামক যৌগিক প্রক্রিয়া; নাথদের মতে প্রতি মানুষের মস্তকে অমৃতক্ষরণ-কারী চন্দ্র এবং নাভিদেশে অমৃতগ্রাসী সূর্য থাকে; 'কায়া-সাধন' নামক যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা চন্দ্রের অমৃতকে ক্ষরিত হইতে না দিয়া সূর্যের গ্রাস হইতে রক্ষা করা যায় এবং তাহা করিলেই অমরত্ব লাভ করা যায়। নাথদের আদি গুরু বা আদি সিদ্ধা চারজন—মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা ও কানুপা। গোরক্ষনাথ মীননাথের শিষ্য এবং কানুপা হাড়িপার শিষ্য। ইঁহারা সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়, তবে ইঁহাদের সম্বন্ধে যে কাহিনীগুলি প্রচলিত আছে, সেগুলির মধ্যে অলৌকিক উপাদান এত অধিক যে, তাহা হইতে সত্য নির্ধারণের কোন উপায় নাই।

বাংলার নাথ-সাহিত্যের কাহিনী মূলত দুইটি—গোরক্ষনাথ-মীননাথের কাহিনী এবং হাড়িপা-কানুপা-ময়নামতী-গোপীচাঁদের কাহিনী। প্রথম কাহিনীতে দেবী গৌরীর ছলনায় গোরক্ষনাথ ব্যতীত আর তিনজন আদি সিদ্ধা অর্থাৎ মীননাথ, হাড়িপা ও কানুপার প্রবঞ্চিত ও শাপগ্রস্ত হওয়া, শাপগ্রস্ত মীননাথের কদলী দেশে নারীদের রাজ্যে রাজা হওয়া এবং গোরক্ষনাথের নর্তকী-বেশে মীননাথের সভায় গমন করিয়া তত্ত্বোপদেশ দ্বারা তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কাহিনীতে শাপগ্রস্ত হাড়িপার হাড়ি (মেথর) হইয়া রানী ময়নামতীর রাজ্যে যাওয়া, তাঁহার পরিচয় পাইয়া রানী ময়নামতীর নিজ পুত্র গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদকে তাঁহার নিকট দীক্ষা লওয়াইবার চেষ্টা, গোপীচাঁদের দীক্ষা লইতে অনিচ্ছা, তাহাকে ঘরে রাখিতে তাহার রানীদের

প্রয়াস, গোপীচাঁদ কর্তৃক হাড়িপাকে মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখা, কানুপা কর্তৃক হাড়িপার উদ্ধার সাধন এবং শেষ পর্যন্ত হাড়িপার কাছে গোপীচাঁদের দীক্ষাগ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে। এই দুইটি কাহিনী অবলম্বনে যেসব লেখক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেই নাথ সম্প্রদায়ের লোক নহেন, এমনকি সকলে হিন্দুও নহেন। কেহ কেহ মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক। তবে ইহাদের রচনাগুলি নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষভাবে পঠিত ও আদৃত হইত। প্রথম কাহিনী লইয়া একটিমাত্র কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার নাম 'গোরক্ষবিজয়'। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের বিভিন্ন পুঁথিতে ফয়জুল্লা, কবীন্দ্র দাস, শ্যামদাস সেন, ভীমদাস, ভীমসেন রায় প্রভৃতির ভণিতা পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ পুঁথিতেই ফয়জুল্লার ভণিতা পাওয়া যায় বলিয়া এবং আরও কয়েকটি বিষয় হইতে মনে হয়, ফয়জুল্লাই 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের রচয়িতা। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের রচনাকাল ১৭০০ খ্রীঃর কাছাকাছি বলিয়া মনে হয়। অবশ্য, এই কাব্যের কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত আকারে কোন কোন প্রাচীনতর বাংলা রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। মিথিলাতে বহু পূর্বে—পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে—বিদ্যাপতি এই কাহিনী অবলম্বনে 'গোরক্ষবিজয়' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের মধ্যে নাথ ধর্মের সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কথা প্রাধান্য প্রাপ্ত হওয়ায় ইহার কাব্যরস কতকটা মন্দীভূত হইয়াছে। তবে এই কাব্যে গোরক্ষনাথ তাঁহার উন্নত চরিত্র, দৃপ্ত পুরুষকার, অটল অধ্যবসায় ও অবিচলিত গুরুভক্তির মধ্য দিয়া এবং মীননাথ ভোগলিপ্সা ও কৃচ্ছ্রসাধন-বিমুখতার মধ্য দিয়া জীবন্ত চরিত্র হইয়া উঠিয়াছেন। কাব্যটির মধ্যে শিষ্য কর্তৃক গুরুর উদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে—বিষয়বস্তু হিসাবে ইহা খুবই অভিনব ও মধুর। এই কাব্যের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীতে একটা প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। 'গোরক্ষবিজয়ে' নারী জাতিকে খুব হেয় করিয়া দেখানো হইয়াছে।

নাথ সাহিত্যের দ্বিতীয় কাহিনীটি অর্থাৎ গোপীচাঁদ-ময়নামতীর কাহিনী লইয়া অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নেপালে এই কাহিনী অবলম্বনে একটি নাটক রচিত হয়, তাহার সংলাপ নেওয়ারী ভাষায় রচিত হইলেও গানগুলি বাংলায় রচিত ; রচনা হিসাবে ইহার অভিনবত্ব থাকিলেও ইহার সাহিত্যিক মূল্য খুব বেশী নয়। এই কাহিনী অবলম্বনে রচিত তিনটি বাংলা কাব্য পাওয়া গিয়াছে—ইহাদের রচয়িতাদের নাম দুর্লভ মল্লিক, ভবানী দাস ও

সুকুর মুহম্মদ। দুর্লভ মল্লিকের কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের রচনা, ভবানীদাস ও সুকুরের কাব্যও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া মনে হয়। তিনটি কাব্যের মধ্যে দুর্লভ মল্লিকের রচনাটিই শ্রেষ্ঠ; ভবানীদাসের রচনা কতকটা বৈষ্ণবপদাবলী-প্রভাবিত ও মধ্যে মধ্যে কৌতুকরসোদ্দীপক; সুকুরের রচনা স্থানে স্থানে বেশ সুখপাঠ্য, তবে ইহাতে ময়নামতী, হাড়িপা, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে কতকটা হেয় করিয়া দেখানো হইয়াছে। ইহা ভিন্ন গোপীচাঁদ-ময়নামতীর কাহিনী লইয়া একটি ছড়াও রচিত হইয়াছিল, সেটি রংপুর অঞ্চলে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল; এই ছড়াটির সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত উভয় রূপই পাওয়া গিয়াছে; ছড়াটি বাংলার লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন; এটির পরিণতি মিলনান্ত। গোপীচাঁদ-ময়নামতীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত সমস্ত রচনাতেই মানবিক রসের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে তাহার রানীদের বিরহ-বেদনা সব রচনাতেই মর্মস্পর্শিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গোপীচাঁদ-ময়নামতীর কাহিনীর উদ্ভব সম্ভবত বাংলাদেশেই, কারণ সর্বত্রই গোপীচাঁদকে বঙ্গের রাজা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই কাহিনী বঙ্গের বাহিরেও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে—বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, এমন কি সুদূর মহারাষ্ট্রেও প্রচলিত ছিল ও আছে, এইসব রাজ্যের মধ্যে কোন কোনটিতে বাংলা দেশের রচনাগুলির তুলনায় প্রাচীনতর গোপীচাঁদ-বিষয়ক রচনা পাওয়া গিয়াছে, এখনও এইসব স্থানে যোগী সন্ন্যাসীরা গোপীচাঁদের গাথা গান গাহিয়া ভিক্ষা করে; কিন্তু বাংলা দেশে এক উত্তর বঙ্গ ভিন্ন আর কোথাও জনসমাজে এই কাহিনীর প্রচলন নাই। গোপীচাঁদ-ময়নামতীর কাহিনীর মত বাংলার আর কোন কাহিনীই বাংলার বাহিরে এতখানি ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে নাই।

১৫। মঙ্গলকাব্য

'মঙ্গলকাব্য' প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা। 'মঙ্গলকাব্য' বলিতে দেবদেবীর মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক আখ্যানকাব্য বুঝায়। বাংলাদেশে অসংখ্য লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। মুসলমান আমলে হিন্দুদের মধ্যে এইসব দেবদেবীর জনপ্রিয়তা সবিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিধর্মী রাজশক্তি হিন্দুদের উপর অনেক সময় উৎপীড়ন করিত; ইহা ভিন্ন সর্প, ব্যাঘ্র,

বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি বিপদও সে যুগে খুব বেশী মাত্রায় ছিল। এই সমস্ত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া বাঙালী হিন্দুরা দেবদেবীদের শরণাপন্ন হইত। এইভাবে যেমন ঐসব দেবদেবীর জনপ্রিয়তা বাড়িতে থাকে, তেমনি কবিরা তাহাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া মঙ্গলকাব্যও রচনা করিতে থাকেন।

মঙ্গলকাব্যের ধারায় তিন শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যকে প্রধান বলা যাইতে পারে—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল। ইহা ব্যতীত শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, কালিকামঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি অন্যান্য বহু মঙ্গলকাব্য বিভিন্ন কবি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল।

মঙ্গলকাব্যগুলি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। সর্বসাধারণের মধ্যে এগুলি সমাদর লাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সেযুগের বাঙালী সমাজের আলেখ্য লাভ কর যায় এবং বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য মঙ্গলকাব্যগুলিকে বাঙালীর জাতীয় কাব্য বলা যাইতে পারে।

প্রতি মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অবতারণা দেখা যায়। যেমন, কাব্যের সূচনায় বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা, শাপভ্রষ্ট দেবদেবীর কাব্যের নায়ক-নায়িকারূপে জন্মগ্রহণ করা, নারীদের পতিনিন্দা, অন্তঃসত্ত্বা রমণীদের গর্ভের বর্ণনা, খাদ্যের বর্ণনা, বিবাহের বর্ণনা, চিত্রলিখিত কাঁচুলীর বর্ণনা, 'বারমাস্যা' অর্থাৎ বার মাসের সুখ বা দুঃখের বর্ণনা। মঙ্গলকাব্যগুলির গান এক মঙ্গলবার রাত্রিতে সুরু হইয়া পরের মঙ্গলবার রাত্রিতে শেষ হইত।

(ক) মনসামঙ্গল

সমস্ত মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গলের ধারাতেই এ পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রচনার নিদর্শন মিলিয়াছে। মনসামঙ্গল কাব্যে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। মনসার পূজা করিলে সর্পের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এই মনসা দেবীর ঐতিহ্য খুব প্রাচীন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ঋগ্বেদে মনসার প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে। লৌকিক ঐতিহ্য-মতে মনসা শিবের কন্যা, চণ্ডী ইঁহার বিমাতা ; ঈর্ষ্যার বশে চণ্ডী ইঁহার এক চক্ষু

নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন ; এইজন্য ইঁহাকে অভক্তেরা "কাণী" বলিয়া অভিহিত করিত। ইহা ভিন্ন লৌকিক ঐতিহ্যে মনসা আস্তিক-জননী জরৎকারুর সহিত অভিন্না।

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এই। মনসা বণিক চন্দ্রধর বা চাঁদ সদাগরকে দিয়া তাঁহার পূজা করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু চাঁদ সদাগর শিবের ভক্ত বলিয়া তাহাতে রাজী হন নাই ; ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মনসা চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্রের জীবন নাশ করেন। চাঁদের হতাবশিষ্ট একমাত্র পুত্র লখিন্দরের বিবাহের রাত্রে মনসার প্রেরিতা সর্পিণী কালনাগিনী লখিন্দরকে দংশন করিয়া সংহার করে। লখিন্দরের সদ্যোপরিণীতা স্ত্রী বেহুলা স্বামীর শব লইয়া একটি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যায় এবং স্বর্গে পৌছিয়া নৃত্যগীত প্রভৃতির দ্বারা দেবতাদের সন্তুষ্ট করিয়া—শেষ পর্যন্ত মনসারও ক্রোধ শান্ত করিয়া স্বামীর ও মৃত ভাশুরদের প্রাণ ফিরাইয়া আনে। অতঃপর দেশে ফিরিয়া বেহুলা চাঁদসদাগরকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে দিয়া মনসার পূজা করায়।

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা কানা হরি দত্ত। ইঁহার কাব্য অনেকদিন বিলুপ্ত হইয়াছে, তবে সেই কাব্যের দুই একটি পদ পরবর্তী কোন কোন কবির কাব্যের মধ্যে দেখা যায়।

যাঁহাদের লেখা 'মনসামঙ্গল' পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি বৈদ্যজাতীয় বিজয় গুপ্ত। ইঁহার নিবাস ছিল বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামে। "ঋতু শূন্য বেদ শশী" অর্থাৎ ১৪০৬ শকে (১৪৮৪-৮৫ খ্রীঃ) "হোসেন শাহ" অর্থাৎ জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের (ইঁহার দ্বিতীয় নাম ছিল 'হোসেন শাহ') রাজত্বকালে বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গল রচনা করেন—এই কথা তাঁহার 'মনসামঙ্গলে'র উপক্রম হইতে জানা যায়। বিজয় গুপ্ত লিখিয়াছেন যে দেবী মনসার কাছে হরি দত্তের 'মনসামঙ্গল' প্রীতিকর না হওয়াতে এবং ঐ 'মনসামঙ্গল' লুপ্তপ্রায় হওয়াতে তিনি বিজয় গুপ্তকে স্বপ্নে দেখা দিয়া 'মনসামঙ্গল' রচনা করিতে বলিয়াছিলেন। বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' শক্তিশালী হাতের রচনা। চাঁদসদাগরের পত্নী সনকার মমতা-করুণ মাতৃমূর্তিটি ইহাতে খুব উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়াছে। বিজয় গুপ্তের রচনা খুব বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। এই কারণে তাহাতে অনেক প্রক্ষিপ্ত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার ভাষাও আধুনিকতাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বিজয় গুপ্তের পরে বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বাদুড়িয়া গ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ কবি বিপ্রদাস পিপিলাই মনসামঙ্গল রচনা করেন—"সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক" অর্থাৎ ১৪১৭ শকাব্দে (১৪৯৫-৯৬ খ্রীঃ)। বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে' কাহিনী খুব বিস্তৃত আকারে মিলিতেছে। এই গ্রন্থে মনসার পূজাপদ্ধতির খুব বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে' অনেকগুলি আধুনিক স্থানের উল্লেখ থাকার জন্য কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে এই কাব্যের সবটাই প্রাচীন বা অকৃত্রিম নয়।

'মনসামঙ্গলে'র আর একজন প্রাচীন কবি কায়স্থজাতীয় নারায়ণদেব। ইঁহার নিবাস ছিল বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বোরগ্রামে। নারায়ণদেব "সুকবি বা "সুকবিবল্লভ" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার কাব্যের ভাষা বেশ প্রাচীন; রচনাকাল সঠিকভাবে জানা যায় না; ভাষা দেখিয়া কাব্যটিকে ষোড়শ শতাব্দীর রচনা বলিয়া মনে হয়। নারায়ণদেবের 'মনসামঙ্গলে' চাঁদসদাগরের চরিত্রটি অত্যন্ত জীবন্ত। চাঁদের দুর্জয় ব্যক্তিত্ব ও অদম্য পুরুষকার নারায়ণদেব অত্যন্ত চমৎকারভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। নারায়ণদেবের চাঁদসদাগর শেষ পর্যন্ত মনসার নিকট নতি স্বীকার করেন নাই—বেহুলার ও ইষ্টদেবতা শিবের অনুরোধ ঠেলিতে না পারিয়া তিনি পিছন ফিরিয়া বাম হাতে মনসার উদ্দেশ্যে একটি ফুল ফেলিয়া দিয়াছেন মাত্র। নারায়ণদেবের 'মনসামঙ্গল' প্রতিবেশী রাজ্য আসামে খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল, সেখানে তাহার ভাষা লোকমুখে পরিবর্তিত হইয়া অসমীয়া হইয়া গিয়াছে। আসামে নারায়ণদেব "হুকনান্নি" ("সুকবি নারায়ণ"-এর অপভ্রংশ) নামে পরিচিত।

অপর একজন প্রাচীন ও জনপ্রিয় মনসামঙ্গল-রচয়িতা বংশীদাস। ইঁহার নিবাস ছিল বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পাটবাড়ী (বা পাতুয়ারী) গ্রামে। ইনি সম্ভবত সপ্তদশ শতকের লোক। বংশীদাসের 'মনসামঙ্গল' পূর্ববঙ্গে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। সেখানে নারীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই 'মনসামঙ্গল' গাওয়া হইত। পূর্ববঙ্গের বহু লোকে এই 'মনসামঙ্গল' আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে। বংশীবদনের কন্যা চন্দ্রাবতীও কবি ছিলেন। তিনি একটি বাংলা রামায়ণ এবং কিছু কিছু ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যর্থ প্রণয় সম্বন্ধে একটি কাহিনী 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'র মধ্যে পাওয়া যায়।

মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। ইঁহার আত্মকাহিনী

হইতে জানা যায় যে, পশ্চিম বঙ্গের সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত কাঁথড়া গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। সেখানে স্থানীয় শাসনকর্তার মৃত্যুর পরে অরাজকতা দেখা দিলে কবির পিতা তিন পুত্রকে লইয়া দেশ ত্যাগ করেন এবং রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই ভরামলের কাছে আশ্রয় ও সম্পত্তি লাভ করেন। নূতন বাসভূমিতে একদিন বর্ষাকালে মাছ ধরিয়া ফিরিবার পথে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বস্ত্রবিক্রয়িণী মুচিনীর মূর্তিধারিণী মনসার দেখা পাইলেন। মনসা কবিকে মনসামঙ্গল রচনা করিতে বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গল রচনা করেন। সম্ভবত ইঁহার প্রকৃত নাম 'ক্ষেমানন্দ', 'কেতকাদাস' (অর্থ 'মনসার দাস') উপাধি। ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' পশ্চিমবঙ্গে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। সে জনপ্রিয়তা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গলে'র বেহুলা একটি অপূর্ব চরিত্র; কবিত্বপ্রতিভার দিক্ দিয়া বাল্মীকির সহিত ক্ষেমানন্দের তুলনা হয় না। কিন্তু ক্ষেমানন্দের বেহুলা বাল্মীকির সীতার মতই করুণ ও মর্মস্পর্শী।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ব্যতীত ক্ষেমানন্দ নামক আরও দুইজন পশ্চিমবঙ্গীয় কবি মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য মনসামঙ্গলরচয়িতাদের মধ্যে সীতারাম দাস, দ্বিজ রসিক, দ্বিজ বাণেশ্বর, কবিচন্দ্র, কালিদাস ও বিষ্ণুপালের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে কেহ সপ্তদশ শতকের, কেহ অষ্টাদশ শতকের লোক।

উত্তরবঙ্গের অনেক কবিও মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুর্গাবর, বিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দুর্গাবর ষোড়শ শতাব্দীর, অন্যেরা সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক। ইঁহাদের মধ্যে জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যই শ্রেষ্ঠ—যদিও এই কাব্যে মাঝে মাঝে গ্রাম্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

(খ) চণ্ডীমঙ্গল কাব্য—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

মনসার মত চণ্ডীর ঐতিহ্যও খুব প্রাচীন। তন্ত্রে ও পুরাণে চণ্ডীদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে বাংলাদেশের চণ্ডীমঙ্গলে যে চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার পৌরাণিক স্বরূপটি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ নাই, তাহার সহিত লৌকিক ঐতিহ্য মিলিয়া দেবীকে এক নূতন রূপ দিয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গলগুলির মধ্যে দুইটি কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি ব্যাধ-দম্পতি কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী; কালকেতু অপূর্ব শক্তিধর পুরুষ এবং তাঁহার স্ত্রী ফুল্লরা সাধ্বী নারী; ইহারা চণ্ডীর কৃপা লাভ করে এবং চণ্ডীর দেওয়া অর্থে বন কাটাইয়া এক নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে; ইহার পর কলিঙ্গরাজের আক্রমণের ফলে তাহাদের সৌভাগ্য-সূর্য সাময়িক ভাবে রাহুগ্রস্ত হয়, কিন্তু চণ্ডীর কৃপায় অচিরেই বিপদ কাটিয়া যায়। দ্বিতীয়টি এক বণিক-পরিবারের—ধনপতি-লহনা-খুল্লনা-শ্রীমন্তের কাহিনী। প্রথমা স্ত্রী লহনা থাকা সত্ত্বেও বণিক ধনপতি খুল্লনাকে বিবাহ করিয়াছিল; এই খুল্লনা সপত্নীর হাতে নানারূপ নির্যাতন সহ্য করিয়া অবশেষে চণ্ডীর কৃপা লাভ করে; কিন্তু শিবভক্ত ধনপতি চণ্ডীর অমর্যাদা করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়; সিংহলে যাইবার সময় সে পদ্ম ফুলের উপর দণ্ডায়মানা নারীর হস্তী গলাধঃকরণ করার এক অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে পায়, কিন্তু সিংহলের রাজাকে তাহা দেখাইতে না পারায় তাহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়; খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত বড় হইয়া পিতার সন্ধানে সিংহলে যায়, সেও সেই একই দৃশ্য দেখে এবং সিংহলরাজকে তাহা দেখাইতে না পারায় তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, অবশেষে চণ্ডীর কৃপায় সমস্ত বিপদ কাটিয়া যায়, ধনপতি মুক্ত হয়, শ্রীমন্ত সিংহলের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া স্ত্রী ও পিতাকে লইয়া দেশে ফিরে।

মনসামঙ্গলের মত চণ্ডীমঙ্গলের রচনাও চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগেই আরম্ভ হইয়াছিল,—কারণ 'চৈতন্যভাগবতে' 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' (যাহা চণ্ডীমঙ্গলের নামান্তর)-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালে রচিত কোন চণ্ডীমঙ্গলের এপর্যন্ত নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

প্রথম চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন মাণিক দত্ত। ইহার রচিত কাব্য এ পর্যন্ত মিলে নাই, পরবর্তী কবিদের উক্তি হইতে তাহার অস্তিত্বের কথা মাত্র জানিতে পারা যায়। এক মাণিক দত্তের লেখা চণ্ডীমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইনি দ্বিতীয় মাণিক দত্ত—পরবর্তী কালের লোক।

ষোড়শ শতাব্দীতে যাঁহারা চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন (বা অন্তত করিয়াছিলেন বলিয়া বলা হয়), তাঁহাদের মধ্যে দ্বিজ মুকুন্দ কবিচন্দ্র, বলরাম কবিকঙ্কণ এবং দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বিজ মুকুন্দের কাব্যের বিশিষ্ট নাম 'বাশুলীমঙ্গল', ইহা "শাকে রস রস বেদ" অর্থাৎ

১৪৬৬ শকাব্দে (১৫৪৪-৪৫ খ্রীঃ) রচিত হয় বলিয়া গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই কাব্যের ভাষা অত্যন্ত আধুনিক। বলরাম কবিকঙ্কণের কাব্য যে ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই, তবে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে কবির "গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ"-এর উল্লেখ আছে, অনেকে মনে করেন বলরামই এই শ্রীকবিকঙ্কণ। বলরাম মেদিনীপুর অঞ্চলের লোক ছিলেন, তাঁহার কাব্য উড়িষ্যায় জনপ্রিয় হইয়াছিল ও উড়িয়া রূপান্তর লাভ করিয়াছিল। দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য "ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক" অর্থাৎ ১৫০১ শকাব্দে (১৫৭৯-৮০ খ্রীঃ) তাঁহার কাব্য রচনা করেন। কাব্যের সূচনায় কবি "পঞ্চগৌড়"-এর রাজা "একাব্বর" অর্থাৎ ভারতসম্রাট আকবরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিজ মাধবের নিবাস ছিল সপ্তগ্রামে, ইহার পিতার নাম পরাশর। দ্বিজ মাধবের 'চণ্ডীমঙ্গলে' অল্পস্বল্প গ্রাম্যতা থাকিলেও কাব্যটি সুলিখিত, ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র অঙ্কনে কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গী অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর। দ্বিজ মাধবের কাব্যে কালকেতু ও ফুল্লরার উপাখ্যানটি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অপর উপাখ্যানটির বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত। আশ্চর্যের বিষয়, দ্বিজ মাধব পশ্চিমবঙ্গীয় কবি হইলেও চট্টগ্রাম ব্যতীত বাংলার অন্য কোন অঞ্চলে তাঁহার কাব্যের প্রচারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, সম্ভবত মুকুন্দরামের কাব্যের অত্যধিক জনপ্রিয়তার ফলে অন্য সব অঞ্চলে দ্বিজ মাধবের কাব্যের প্রচার লোপ পাইয়াছিল। দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গল ব্যতীত কৃষ্ণমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন।

চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত হন। তিনি যে সুন্দর আত্মকাহিনীটি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার নিবাস ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দামুন্যা বা দামিন্যা গ্রামে, এখানকার ডিহিদার মামুদ (বা মুহম্মদ) সরিফ প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতে থাকেন এবং মুকুন্দরামের প্রভু ভূস্বামী গোপীনাথ নন্দীকে বন্দী করেন; তখন মুকুন্দরাম হিতৈষীদের সহিত পরামর্শ করিয়া দেশত্যাগ করেন; অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া এবং ঠিকমত স্নানাহার করিতে না পাইয়া তাঁহাকে পথ চলিতে হয়; পথে এক জায়গায় চণ্ডী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিতে বলেন; ইহার পর মুকুন্দরাম বর্তমান মেদিনীপুর

জেলার অন্তর্গত আরড়্যা গ্রামে উপনীত হন ; সেখানে ব্রাহ্মণভূমির রাজা বাঁকুড়া রায় বাস করিতেন ; বাঁকুড়া রায় কবির সকল দুঃখ দূর করিয়া দিয়া নিজের পুত্রকে পড়াইবার কাজে কবিকে নিযুক্ত করেন ; বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পরে—তাঁহার পুত্র রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকালে মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন এবং রঘুনাথের কাছে তিনি পুরস্কার লাভ করেন। মুকুন্দরামের আত্মকাহিনী হইতে জানা যায় যে মানসিংহ যখন গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলের শাসনকর্তা (১৫৯৪-১৬০৬ খ্রীঃ), তখন মুকুন্দরাম জীবিত ছিলেন।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য হিসাবে উচ্চাঙ্গের। ইহার মধ্যে যে মানবিক রস আছে, তাহা তুলনারহিত। এই কাব্যের মধ্যে মানুষের জীবন, মানুষের সুখদুঃখ, মানুষের হৃদয়ের কথা যেমন নিখুঁতভাবে রূপায়িত হইয়াছে, তেম্‌নি ইহার চরিত্রগুলি পরিপূর্ণভাবে রক্তমাংসের মানুষ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের ভাষা সরল, বর্ণনা অনাড়ম্বর, কিন্তু তাহারই মধ্যে অপূর্ব কবিত্বশক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। এই কাব্যে নারীচরিত্র—বিশেষভাবে ফুল্লরা ও খুল্লনার চরিত্র অঙ্কনে মুকুন্দরাম নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। কুটিল স্বার্থান্বেষী প্রতারকের চরিত্র সৃষ্টিতে মুকুন্দরাম এই কাব্যে অপরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। মুরারি শীল, ভাঁড়ু দত্ত ও দুর্বলা দাসী এই শ্রেণীর চরিত্র। ইহাদের মধ্যে ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রটি অতুলনীয়। শঠতার এমন জীবন্ত প্রতিমূর্তি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয় একটিও মিলে না।

জীবন সম্বন্ধে মুকুন্দরামের যে ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞতা ছিল, তাহারই রূপায়ণ এই কাব্যে দেখা যায়। মুকুন্দরাম বিশেষভাবে দুঃখের অভিজ্ঞতাই লাভ করিয়াছিলেন, তাই এই কাব্যে দুঃখের চিত্রগুলিই জীবন্ত ও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির আত্মকাহিনী হইতে সুরু করিয়া কালকেতুর শরে জর্জর পশুদের খেদোক্তি, ফুল্লরার বারমাস্যা, খুল্লনার ক্লিষ্ট জীবনযাত্রা প্রভৃতি বর্ণনাগুলিতে সর্বত্রই দুঃখের তীব্র নগ্ন রূপ দেখিতে পাই। এই জন্য কেহ কেহ মুকুন্দরামকে 'দুঃখবাদী কবি' বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু ইহাদের মত সমর্থন করা যায় না। কারণ মুকুন্দরাম দুঃখকেই জীবনের সার কথা বলেন নাই, দুঃখের পিছনে যে আশা আছে, সে কথাও তিনি শুনাইয়াছেন।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কাব্যটি নাটকীয় রীতিতে রচিত। কবির নিজের উক্তি ইহাতে খুব কমই আছে, বেশীর ভাগই

বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর উক্তিপ্রত্যুক্তির মাধ্যমে রচিত। এই কাব্যের জাগরণ-পালার মধ্যে নাটকীয় সঙ্কট-মুহূর্ত অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টির প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখা যায়। এই কারণে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকে নাট্যধর্মী কাব্যও বলা যায়।

আর একটি কারণে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল বিশেষভাবে মূল্যবান। এই কাব্য হইতে সে যুগের সমাজ সম্বন্ধে অজস্র তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষত, কালকেতুর নগরপত্তন-সংক্রান্ত অংশটি অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ। এই গ্রন্থ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের বাঙালী-সমাজের দর্পণস্বরূপ।

মুকুন্দরামের পরেও আরও অনেক কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে রামদেব, দ্বিজ জনার্দন ও দ্বিজ কমললোচন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে মুক্তারাম সেন, জয়নারায়ণ সেন ও রামানন্দ যতির নাম উল্লেখযোগ্য। রামানন্দ যতির 'চণ্ডীমঙ্গলে'র মধ্যে কিছু অভিনবত্ব আছে ; এই কাব্যে তিনি অলৌকিক ব্যাপারে নিজের অনাস্থার পরিচয় দিয়াছেন এবং মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(গ) ধর্মমঙ্গল ও ধর্মপুরাণ

চণ্ডী ও মনসার মত ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়াও বাংলাদেশে এক বিরাট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মঠাকুর সম্পূর্ণভাবে লৌকিক দেবতা। তবে ইঁহার পরিকল্পনার উপরে বুদ্ধ, সূর্য, বরুণ, যম প্রভৃতির পরিকল্পনার প্রভাব আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ধর্মঠাকুরের পূজা কেবলমাত্র রাঢ় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা—ডোম, বাগ্‌দী, হাড়ি প্রভৃতি জাতির লোকেরাই বিশেষভাবে ধর্মঠাকুরের উপাসক। এইজন্য ধর্মমঙ্গল কাব্যও রাঢ় ভিন্ন অন্য কোন অঞ্চলের লোকেরা রচনা করেন নাই এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যের জনপ্রিয়তা পূর্বোক্ত জাতিসমূহের লোকদের মধ্যেই অধিক ছিল। ইঁহাদের রচয়িতা অবশ্য তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরাই হইতেন ; কিন্তু ধর্মমঙ্গল রচনার 'অপরাধে' (বিশেষ করিয়া আসরে গান করার 'অপরাধে' ইঁহারা অনেক সময়ে নিজেদের সমাজে পতিত হইতেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এই। জনৈক গৌড়েশ্বর (ইনি ধর্মপালের পুত্র বলিয়া অভিহিত, ইঁহার নাম কোথাও উল্লিখিত নাই) তাঁহার শ্যালক মহাপাত্র

মহামদকে না জানাইয়া তরুণী শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত ময়নাগড়ের বৃদ্ধ সামন্তরাজ কর্ণসেনের বিবাহ দেন। মহামদ পরে এ কথা জানিয়া খুব ক্রুদ্ধ হয়। এদিকে রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের পূজা এবং তদুপলক্ষে কঠোর আত্মনিপীড়ন করার পরে ধর্মের অনুগ্রহে লাউসেন নামক পুত্রকে লাভ করে। মহামদ শিশু লাউসেনকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। বড় হইয়া লাউসেন মহাবীর হয় এবং পিতামাতার আপত্তি সত্ত্বেও কর্পূরধবল (রঞ্জাবতীর পালিত পুত্র)-কে সঙ্গে লইয়া গৌড়েশ্বরের নিকটে যায়। ইহার পর লাউসেন বহুবার অলৌকিক বীরত্ব দেখায়, অনেকবার বিপদেও পড়ে, কিন্তু ধর্মঠাকুরের কৃপায় প্রতিবার রক্ষা পায়। শেষ পর্যন্ত লাউসেন কঠিন তপস্যার দ্বারা ধর্মঠাকুরকে সন্তুষ্ট করিয়া পশ্চিমদিকে সূর্যোদয় দেখাইতেও সমর্থ হয়। মহামদ লাউসেনকে বিনষ্ট করিবার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই; অবশেষে একবার লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করিল এবং লাউসেনের স্ত্রী কলিঙ্গা ও অনেক অনুচরকে বধ করিল; লাউসেন ফিরিয়া আসিয়া ধর্মের স্তব করিল এবং ধর্মের কৃপায় সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া ময়নায় নিরুদ্বেগে রাজত্ব করিতে লাগিল; ধর্মঠাকুরের অভিশাপে মহামদ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইল।

ধর্মমঙ্গল কাব্য অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল। সবগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ষ সমান নয়। তবে চরিত্রগুলি (এক নায়ক লাউসেন ছাড়া) প্রায় সব ধর্মমঙ্গলেই জীবন্ত হইয়াছে। রঞ্জাবতী পুত্রস্নেহে অন্ধা; কর্ণসেন ভীরু ও দুর্বল প্রকৃতির; গৌড়েশ্বর ব্যক্তিত্বহীন; মহামদ খল ও জিঘাংসু; কর্পূরধবল কাপুরুষ ও ভাঁড়; লাউসেনের দুই স্ত্রী কলিঙ্গা ও কানড়া মহীয়সী বীরাঙ্গনা; কালুডোম, কালুর স্ত্রী, ধুমসী, হরিহর বাইতি প্রভৃতি চরিত্রগুলি ন্যায়ের জন্য আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়া আমাদের হৃদয়ে স্থান লাভ করে। এই সব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সব ধর্মমঙ্গলেই জীবন্ত হইয়াছে; ধর্মমঙ্গলগুলিতে তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকদের চাইতে নিম্নবর্ণের লোকদের চরিত্রগুলিই বেশী জীবন্ত হইয়াছে। সে যুগের যোদ্ধজাতি ডোমদের বীরত্বও ধর্মমঙ্গলে সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তবে নায়ক লাউসেনের চরিত্র—তাহার বীরত্ব বাস্তবতার সীমা ছাড়াইয়া যাওয়ার জন্য এবং প্রতিপদেই তাহার ধর্মঠাকুরের উপর নির্ভর করা ও ধর্মঠাকুরের কৃপায় বিপন্মুক্ত হওয়ার ফলে জীবন্ত হইতে পারে নাই। ধর্মমঙ্গলকাব্যগুলিতে রাঢ়ের লোকদের জীবনযাত্রার পরিচয় বেশ সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

প্রথম ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ময়ূরভট্ট ; পরবর্তী ধর্মমঙ্গল-কাব্য-রচয়িতারা ইহার নাম করিয়াছেন ; কিন্তু ময়ূরভট্টের কাব্য পাওয়া যায় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে 'ময়ূরভট্ট বিরচিত শ্রীধর্মপুরাণ' নাম দিয়া যাহা বাহির হইয়াছিল, তাহা জাল। খেলারাম নামক জনৈক ধর্মমঙ্গল-কাব্যরচয়িতাকে কেহ কেহ ষোড়শ শতাব্দীর লোক বলেন, কিন্তু এই মতের যাথার্থ্যে গভীর সংশয় আছে ; খেলারামের কাব্যের কয়েকটি পংক্তি মাত্র পাওয়া গিয়াছে ; এগুলি হইতে তাঁহাকে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের লোক বলিয়া মনে হয়। শ্রীশ্যাম পণ্ডিত সম্ভবত সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের লোক, কিন্তু তাঁহার রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যও সম্পূর্ণ মিলে নাই। যাঁহাদের লেখা ধর্মমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক, সীতারাম দাস, ঘনরাম চক্রবর্তী ও মাণিকরাম গাঙ্গুলীর নাম উল্লেখযোগ্য। রূপরামের নিবাস ছিল বর্তমান বর্ধমান জিলার শ্রীরামপুর গ্রামে। শুজা যে সময় বাংলার শাসনকর্তা (১৬৩৯-৫৯ খ্রীঃ), সে সময়ে রূপরাম ধর্মের গান গাহিতে শুরু করেন এবং শুজার শাসন অবসানের কিছু পরে ধর্মমঙ্গল রচনা করেন ; রূপরামের ধর্মমঙ্গলের চরিত্রগুলি বেশ জীবন্ত ; ইহার মধ্যে সেযুগের যুদ্ধযাত্রার বাস্তব ও উজ্জ্বল বর্ণনা পাওয়া যায় ; রূপরামের আত্মকাহিনী সুরচিত ও তথ্যপূর্ণ। রামদাস ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মমঙ্গল রচনা করেন ; ইনি রূপরামকেই অনুসরণ করিয়াছেন। সীতারাম ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মমঙ্গল সম্পূর্ণ করেন ; ইহার আত্মকাহিনী বেশ কবিত্বপূর্ণ ; ইনি একটি মনসামঙ্গলও লিখিয়াছিলেন। ঘনরাম ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মমঙ্গল রচনা শেষ করিয়াছিলেন। ইনি বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন। ঘনরাম পণ্ডিত লোক ছিলেন, তাঁহার কাব্যেও পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে ; ইহার ধর্মমঙ্গলখানি আয়তনে অত্যন্ত বৃহৎ ; কিন্তু কাব্য হিসাবে তাহার বিশিষ্ট মূল্য রহিয়াছে ; ছন্দ ও অলঙ্কার—বিশেষত অনুপ্রাসের ক্ষেত্রে ঘনরাম এই কাব্যে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ঘনরাম একটি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'ও রচনা করিয়াছিলেন। মাণিকরাম ১৭১১ হইতে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন ; ইহার রচিত ধর্মমঙ্গল আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ; তাহার মধ্যে উপভোগ্য হাস্যরসের নিদর্শন পাওয়া যায়। মাণিকরাম একটি শীতলামঙ্গল কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। এই কয়জন কবি ব্যতীত নিধিরাম চক্রবর্তী, প্রভুরাম মুখটি, রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জ্যা, রামকান্ত রায়, নরসিংহ বসু, ভবানন্দ রায়, দ্বিজ রাজীব প্রভৃতি

কবিরাও ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক।

ধর্মঠাকুরের ব্যাপার অবলম্বনে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি ব্যতীত আরও এক ধরনের গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এগুলিকে 'ধর্মপুরাণ' বলা হয়। ইহাদের মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির কাহিনী (ধর্মঠাকুরের উপাসকদের মতানুযায়ী), ধর্মপূজা প্রবর্তনের কাহিনী এবং ধর্মপূজার পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বসৃষ্টির কাহিনীটি বেশ বিচিত্র। এই কাহিনী অনুসারে ধর্মই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তাঁহার পুত্র ; ধর্ম পুত্রত্রয়কে পরীক্ষা করিবার জন্য ছয় মাসের শব হইয়া তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যান ; ইহাদের মধ্যে শিবই পিতাকে চিনিতে পারেন ; অতঃপর শিবের জানুর উপরে বিষ্ণুকে কাষ্ঠ করিয়া ব্রহ্মার নিঃশ্বাসে আগুন ধরাইয়া ধর্মকে সৎকার করা হয় ; ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের জননী কেতকা অনুমৃতা হন। ধর্মপূজা-প্রবর্তনের কাহিনীতে সদা নামক ডোম কর্তৃক ধর্মঠাকুরকে প্রথম পূজা করা এবং রামাই পণ্ডিত (আদিত্যের অবতার) কর্তৃক ধর্মপূজা সুপ্রতিষ্ঠিত করা বর্ণিত হইয়াছে। ধর্মপূজার পদ্ধতির মধ্যে নানা ধরনের জিনিস দেখা যায় ; যেমন, ধর্মঠাকুরের নিত্যপূজার প্রণালী, ধর্মের "ঘরভরা" নামক গাজনের বিধি, সূর্যের ছড়া, ধর্মের চাষ ও শিবের চাষ প্রভৃতির কাহিনী।

ধর্মপুরাণ প্রথম রামাই পণ্ডিত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু রামাই পণ্ডিতের 'ধর্মপুরাণ' পাওয়া যায় নাই। যাদুনাথ, সহদেব চক্রবর্তী, লক্ষ্মণ, রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জ্যা প্রভৃতি কবির লেখা ধর্মপুরাণ পাওয়া গিয়াছে। যাদুনাথের গ্রন্থ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকের এবং অন্যদের গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে "শূন্যপুরাণ" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল ; ইহা ধর্মের পূজাপদ্ধতির সংকলন। এই বইটিকে প্রথম প্রকাশের সময়ে খুব প্রাচীন রচনা বলিয়া মনে করা হইয়াছিল, কিন্তু ইহার রচনা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়।

শিবমঙ্গল বা শিবায়ন

শিবের সম্বন্ধে বাংলাদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে কাব্য রচনা হইয়া আসিতেছে। বাংলাদেশে শিবের বিশুদ্ধ পৌরাণিক রূপটি অক্ষুণ্ণ ছিল না।

তাহার সহিত বহু লৌকিক ঐতিহ্য মিশিয়া গিয়াছিল। এইসব লৌকিক ঐতিহ্য অনুসারে শিব চাষ করেন, গাঁজা-ভাঙ খান, এমন কি নীচজাতীয় লোকদের পাড়ায় গিয়া নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকদের সহিত অবৈধ সংসর্গ পর্যন্ত করেন। শিবের গৃহস্থালীর চিত্রও বাঙালীর পরিচিত, কিন্তু সে গৃহস্থালী দরিদ্রের গৃহস্থালী।

শিবের চরিত্র ও তাঁহার গৃহস্থালীর বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শিব সম্বন্ধে স্বতন্ত্র মঙ্গলকাব্যও রচিত হইতে থাকে। এইগুলির নাম 'শিবমঙ্গল' বা 'শিবায়ন'।

যাঁহাদের রচিত 'শিবায়ন' পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীনতম রামকৃষ্ণ রায়। ইঁহার উপাধি ছিল কবিচন্দ্র। ইঁহার নিবাস ছিল বর্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত রসপুর-কলিকাতা গ্রামে। রামকৃষ্ণের 'শিবায়ন' সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয়। ইহার মধ্যে প্রধানত পৌরাণিক শিবের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

'কবিচন্দ্র' উপাধিধারী আর একজন কবি আর একখানি 'শিবায়ন' রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম শঙ্কর চক্রবর্তী। গ্রন্থের মধ্যে কবি লিখিয়াছেন যে, বিষ্ণুপুরের রাজা বীরসিংহের রাজত্বকালে (১৬৬৯-৮২ খ্রীঃ) তিনি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

দ্বিজ রতিদেব নামক জনৈক কবি ১৫৯৬ শকাব্দ বা ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মৃগলুব্ধ' নামে একটি ক্ষুদ্র শিবমাহাত্ম্য-বর্ণনামূলক আখ্যানকাব্য রচনা করেন। এই কবি সম্ভবত চট্টগ্রামের লোক ছিলেন।

'শিবায়ন' কাব্যের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য। ইঁহার নিবাস ছিল বর্তমান মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার যদুপুর গ্রামে। পরে ইনি কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেন এবং রামসিংহের পুত্র যশমন্ত সিংহের রাজত্বকালে 'শিবায়ন' রচনা করেন। এই গ্রন্থের রচনাসমাপ্তিকাল বিষয়ক যে শ্লোক কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অর্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা একমত না হইলেও তিনি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা চলে। রামেশ্বরের 'শিবায়ন' অত্যন্ত সুখপাঠ্য রচনা। ইহার ভাষাও খুব সরল। এই কাব্যে কবি গ্রাম্য কাহিনীকে ভদ্র রূপ দিয়া সাহিত্যে প্রবেশ করাইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত কৃতিত্বের বিষয়। কাব্যটিতে স্থানে স্থানে অল্পস্বল্প

গ্রাম্যতা থাকিলেও মোটামুটিভাবে অধিকাংশ স্থানে সুরুচিরই পরিচয় পাওয়া যায়। রামেশ্বরের শিবায়নে সমসাময়িক সমাজের নিখুঁত প্রতিফলন পাওয়া যায়। সেযুগে লোকেরা এত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিল যে কোনক্রমে খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকাই চরম কাম্য মনে করিত—ইহা এই কাব্য হইতে জানা যায়। এই কাব্যের চাষ-পালাতে রামেশ্বর ধান-চাষের অত্যন্ত বিশদ ও সুনিপুণ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রামেশ্বর একটি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'-ও লিখিয়াছিলেন।

কালিকামঙ্গল

কালিকামঙ্গল কাব্যে বাংলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেবী কালীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কালিকামঙ্গল কাব্যে বিদ্যা ও সুন্দরের রোমান্টিক প্রেম-কাহিনী প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে রাজশেখর সুরী, বররুচি প্রভৃতি লেখকেরা বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে কাহিনী লৌকিক কাহিনী, তাহার সহিত কালী দেবীর কোন সম্পর্ক নাই। বাংলাদেশের 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে বলা হইয়াছে সুন্দরের উপাস্যা দেবী কালী এবং তিনি সুন্দরকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এইভাবে কালীর মাহাত্ম্যের সহিত বিদ্যাসুন্দরের প্রেম-কাহিনী এক সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে।

যাঁহাদের লেখা 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে সময়ের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ। ইনি নসরৎ শাহের রাজত্বকালে (১৫১৯-২২ খ্রীঃ) তাঁহার পুত্র ফিরোজ শাহের পৃষ্ঠপোষণ ও আদেশ লাভ করিয়া এই বইটি লিখিয়াছিলেন; ইহার একটি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সাবিরিদ খান নামক একজন মুসলমান কবির লেখা একটি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যেরও খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; ইহার ভাষা বেশ প্রাচীন; কাব্যটি সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। গোবিন্দদাস নামক একজন চট্টগ্রাম-নিবাসী কবি ১৫২৭ শকাব্দে (১৬০৫-০৬ খ্রীঃ) একটি 'কালিকামঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর আর একজন 'কালিকামঙ্গল'-রচয়িতা প্রাণরাম চক্রবর্তী; ইঁহার কাব্যরচনাকাল ১৫৮৮ শকাব্দ (১৬৬৬ খ্রীঃ)। ইহা ভিন্ন কলিকাতার নিকটবর্তী নিমতার অধিবাসী কৃষ্ণরাম

দাস ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ও শায়েস্তা খাঁর বঙ্গশাসনকালে—১৫৯৮ শকাব্দে (১৬৭৬-৭৭ খ্রীঃ) মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে একখানি 'কালিকামঙ্গল' রচনা করেন। ইহাদের কাহারও রচনা অসাধারণ নয়, এবং সকলের রচনাতেই অল্প-বিস্তর অশ্লীলতা আছে। কৃষ্ণরামের কাব্যে এ দোষ সর্বাপেক্ষা বেশী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বলরাম চক্রবর্তী 'কালিকামঙ্গল' রচনা করেন। ইহার পর ১৬৭৪ শকাব্দে (১৭৫২-৫৩ খ্রীঃ) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন, ইহার অন্যতম খণ্ড 'বিদ্যাসুন্দর' এবং সমস্ত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের কিছু পরে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন আর একখানি 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সম্বন্ধে পরে আমরা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব। ইঁহারা ভিন্ন নিধিরাম আচার্য ১৬৭৮ শকাব্দে (১৭৫৬-৫৭ খ্রীঃ) এবং কলিকাতা-নিবাসী রাধাকান্ত মিশ্র ১৬৮৯ শকাব্দে (১৭৬৭-৬৮ খ্রীঃ) 'কালিকা-মঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। কবীন্দ্র চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তিও অষ্টাদশ শতাব্দীতে একখানি 'কালিকামঙ্গল' লিখিয়াছিলেন। ইহাদের রচনা গতানুগতিক শ্রেণীর, তবে রাধাকান্ত মিশ্র অন্য কবিদের দেবতার প্রত্যাদেশ-প্রাপ্তিতে আংশিক অনাস্থা প্রকাশ করিয়া দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

রায়মঙ্গল

মনসা যেমন সাপের দেবতা, তেমনি বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়। তাঁহাকে উপাসনা করিলে বাঘের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায় বলিয়া বাংলাদেশের লোকেরা বিশ্বাস করিত। 'রায়মঙ্গল' কাব্যে এই দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কাব্যের মধ্যে আরও দুইজন উপাস্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একজন কুমীরের দেবতা কালুরায়, অপর জন মুসলমানদের পীর বড় খাঁ গাজী। 'রায়মঙ্গল' কাব্যে এই দুইজনের মাহাত্ম্যও বর্ণিত হইয়াছে। দক্ষিণরায়, কালু-রায় ও বড় খাঁ গাজী, তিনজনেরই পূজা সুন্দরবন অঞ্চলে অধিক প্রচলিত। 'রায়মঙ্গলে'র মধ্যে দক্ষিণরায় ও বড় খাঁ গাজীর যুদ্ধ এবং ঈশ্বরের অর্ধ-শ্রীকৃষ্ণ অর্ধ-পয়গম্বর বেশে অবতীর্ণ হইয়া উভয়ের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করার বর্ণনা পাওয়া যায়।

'রায়মঙ্গলে'র প্রথম রচয়িতার নাম মাধব আচার্য। ইনি কৃষ্ণমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল

ও গঙ্গামঙ্গলের রচয়িতা মাধব আচার্যের সঙ্গে অভিন্ন হইতে পারেন। ইঁহার নাম কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গলে' উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইঁহার কাব্য পাওয়া যায় নাই। যে কয়টি রায়মঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে নিমতা গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণরাম দাসের রচনাটিই প্রাচীনতম। ইঁহার লেখা 'কালিকামঙ্গলে'র নাম পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল' ১৬০৮ শকাব্দে (১৬৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত হয়। এই কাব্যখানি অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট হইলেও শক্তিশালী হাতের রচনা; ইহার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইহার মধ্যে অনেক রকমের বাঘের নাম ও বর্ণনা পাওয়া যায়।

কৃষ্ণরামের পর আরও দুইজন কবি 'রায়মঙ্গল' লিখিয়াছিলেন। একজনের নাম হরিদেব। ইঁহার কাব্যের খণ্ডিত পুঁথি মিলিয়াছে। ইনি সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের লোক ছিলেন। দ্বিতীয় জনের নাম হরিদেব। ১৬৫০ শকাব্দে (১৭২৮ খ্রীঃ) ইঁহার 'রায়মঙ্গল' সম্পূর্ণ হয়।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্য

যে সমস্ত মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিলাম, সেগুলি ভিন্ন আরও অনেক মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল। ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও প্রধান প্রধান রচয়িতাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

শীতলামঙ্গল—ইহাতে বসন্ত রোগের দেবী শীতলার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। মাণিকরাম গাঙ্গুলী, নিত্যানন্দ বল্লভ, দয়াল, অকিঞ্চন চক্রবর্তী, দ্বিজ গোপাল, শঙ্কর এবং পূর্বোল্লিখিত নিমতাবাসী কৃষ্ণরাম দাস প্রভৃতি কবিগণ শীতলামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠীমঙ্গল—ষষ্ঠী শিশুদের রক্ষয়িত্রী দেবী। ইঁহার মাহাত্ম্য 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। নিমতার কৃষ্ণরাম দাস (কাব্যের রচনাকাল ১৬০১ শক বা ১৬৭৯-৮০ খ্রীঃ) এবং রুদ্ররাম প্রভৃতি কবিগণ ষষ্ঠীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

সারদামঙ্গল—'সারদামঙ্গলে' সারদা অর্থাৎ সরস্বতী দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। দয়ারাম, দ্বিজ বীরেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ ইহার রচয়িতা।

জগন্নাথমঙ্গল—ইহার মধ্যে 'স্কন্দপুরাণ' অবলম্বনে জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অন্যতম লেখক গদাধরদাস দেব (কাশীরামদাসের অনুজ)।

সূর্যমঙ্গল—সূর্যদেবতার মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক কাব্য 'সূর্যমঙ্গল'। ইহার রচয়িতাদের মধ্যে রামজীবন ও কালিদাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্মীমঙ্গল—ধনের দেবী লক্ষ্মী বা কমলার মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক কাব্য 'লক্ষ্মীমঙ্গল'। ইহার রচয়িতাদের মধ্যে নিমতার কৃষ্ণরাম দাস, গুণরাজ খান এবং দ্বিজ নরোত্তমের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কৃষ্ণরাম দাস মোট পাঁচখানি মঙ্গলকাব্য লিখিয়াছিলেন—কালিকামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও লক্ষ্মীমঙ্গল।

গঙ্গামঙ্গল—'গঙ্গামঙ্গলে' গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত। মাধব আচার্য, দ্বিজ গৌরাঙ্গ, জয়রাম দাস, দ্বিজ কমলাকান্ত, শঙ্কর আচার্য প্রভৃতি কবিগণ 'গঙ্গামঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। দুর্গাপ্রসাদ মুখুজ্জ্যের লেখা 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'ও (রচনাকাল অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদ) 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্যের শ্রেণীভুক্ত; এই কাব্যে কবির শক্তির পরিচয় আছে; ইহার মধ্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব ও অনুকরণ দেখা যায়। এই কাব্যটি একসময়ে কলিকাতা অঞ্চলে বহুলপ্রচারিত ছিল।

কপিলামঙ্গল—ব্রহ্মার কামধেনু কপিলার অপহরণ ও কপিলার মাহাত্ম্য 'কপিলামঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। 'কপিলামঙ্গল'-এর প্রধান রচয়িতা শঙ্কর কবিচন্দ্র, কাশীনাথ, ও কেতকাদাস-ক্ষুদিরাম দাস।

গোসানীমঙ্গল—এই কাব্যে উত্তর বঙ্গের এক স্থানীয় দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত একটি মাত্র 'গোসানীমঙ্গল' পাওয়া গিয়াছে, তাহার রচয়িতার নাম রাধাকৃষ্ণ দাস।

বরদামঙ্গল—ইহার মধ্যে ত্রিপুরার বরদাখাত পরগণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বরদেশ্বরীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত কেবলমাত্র নন্দকিশোর শর্মার লেখা একখানি 'বরদামঙ্গল' পাওয়া গিয়াছে।

ঐতিহাসিক কাব্য

আধুনিক-পূর্ব যুগে হিন্দুরা ইতিহাসবিমুখ ছিলেন। বাংলা দেশে আবার হিন্দু-মুসলমান সকলেরই মধ্যে ইতিহাস সম্বন্ধে একটা নিস্পৃহতার ভাব ছিল। এইজন্য মুসলিম যুগের বাংলাদেশ সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থ রচিত হয় নাই বলিলেই চলে। এই যুগের বাংলা সাহিত্যেও তাই ঐতিহাসিক রচনা একান্ত দুর্লভ।

কেবলমাত্র ত্রিপুরায় বাংলা ভাষায় কয়েকটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য 'রাজমালা'; এই গ্রন্থে আদিকাল হইতে সুরু করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের ধারাবাহিক ও বিশদ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বইটি চারি খণ্ডে বিভক্ত; প্রথম খণ্ড পঞ্চদশ শতকে ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে, দ্বিতীয় খণ্ড ষোড়শ শতকে অমরমাণিক্যের রাজত্বকালে, তৃতীয় খণ্ড সপ্তদশ শতকে গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালে এবং চতুর্থ খণ্ড অষ্টাদশ শতকে কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। 'রাজমালা'তে স্থানে স্থানে অলৌকিক উপাদান ও একদেশদর্শিতা-দোষ থাকিলেও মোটের উপর বইটির মধ্যে প্রামাণিক বিবরণই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উনবিংশ শতকের প্রথমে দুর্গামণি উজীর নামে ত্রিপুরার একজন রাজকর্মচারী 'রাজমালা'র স্বেচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন সাধন করেন, সেই পরিবর্তিত রূপটিই পরে মুদ্রিত হইয়াছে। এই মুদ্রিত সংস্করণটির তুলনায় দুর্গামণি উজীরের আবির্ভাবের পূর্বে লিপিকৃত পুঁথিগুলি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। 'রাজমালা' ব্যতীত ত্রিপুরায় রচিত 'চম্পকবিজয়', 'কৃষ্ণমালা' ও 'বরদামঙ্গল' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'চম্পকবিজয়' গ্রন্থে ত্রিপুরারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৬৮৫-১৭১০ খ্রী:) নরেন্দ্রমাণিক্যের বিদ্রোহ এবং রত্নমাণিক্যের সাময়িক রাজ্যচ্যুতি বর্ণিত হইয়াছে। 'কৃষ্ণমালা'য় ত্রিপুরারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের (রাজত্বকাল ১৭৬০-৮৩ খ্রী:) জীবনেতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। 'বরদামঙ্গল' গ্রন্থ বাহ্যত বরদেশ্বরী দেবীর মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক মঙ্গলকাব্য হইলেও ইহার মধ্যে ত্রিপুরার অন্যতম পরগণা বরদাখাতের ইতিহাস বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' নামক গ্রন্থটিকেও ঐতিহাসিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। ইহার লেখকের নাম গঙ্গারাম। ইহার 'ভাস্কর-পরাভব' নামক প্রথম কাণ্ডটি পাওয়া গিয়াছে, অন্যান্য কাণ্ড রচিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। অষ্টাদশ শতকের পঞ্চম দশকে বর্গীদের পশ্চিমবঙ্গ আক্রমণ ও লুণ্ঠন, নবাব আলীবর্দীর সাময়িক পরাজয়, অবশেষে জনসাধারণের বিরোধিতায় বর্গী-সেনাপতি ভাস্করের পরাভব এবং আলীবর্দীর চক্রান্তে ভাস্করের নিধন এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে লেখকের প্রত্যক্ষদৃষ্ট "বর্গীর হাঙ্গামা"র জীবন্ত ও উজ্জ্বল বর্ণনা পাওয়া যায়; এই গ্রন্থের রচনাকাল ১১৫৮ বঙ্গাব্দ (১৭৫১-৫২ খ্রী:)।

অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় পাদে বিজয়রাম নামক জনৈক বৈদ্যজাতীয় লেখক 'তীর্থমঙ্গল' নামে একখানি ভ্রমণকাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। খিদিরপুরের কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল নামে একজন ধনী ব্যক্তি নৌকাযোগে নবদ্বীপ, হাঁড়রা, ঝিনুক-ঘাটা, টুঙ্গীবালী, জলঙ্গী, রাজমহল, মুঙ্গের, গয়া, রামনগর, কাশী, প্রয়াগ, বিন্ধ্যগিরি প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ ও তীর্থদর্শন করিয়াছিলেন; বিজয়রামও তাঁহার দলের সহিত গিয়াছিলেন। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই গ্রন্থটিতে বর্ণিত। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র দেশে ফিরেন এবং তাহার কিছু পরে 'তীর্থমঙ্গল' রচিত হয়। বইখানির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

ময়মনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকা

পূর্ব বঙ্গের ময়মনসিংহ জিলা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলে অনেকগুলি গীতিকা অর্থাৎ কাহিনীবর্ণনাত্মক গাথা লোকমুখে প্রচলিত আছে। এইগুলিই আধুনিক কালে সঙ্কলিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই গীতিকাগুলি যেভাবে সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইহাদের প্রাচীন রূপটি অক্ষুন্ন নাই; সংগ্রাহকদের হস্তক্ষেপের ফলে ইহাদের কলেবর অনেকাংশে রূপায়িত হইয়াছে এবং ভাষা আধুনিকতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। দুই একটি গীতিকার প্রাচীনতর রূপ অন্য সূত্র হইতে পাওয়া যায়; যেমন মেওয়া (নামান্তর মহুয়া) সুন্দরী, ভেলুয়া সুন্দরী ও জয়ানন্দের বিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গীতিকাগুলি; এগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীতেই সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। তবে ইহাদের আদি রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না।

মোটের উপর, 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গণ্ডীভুক্ত হইতে পারে কিনা সে বিষয়ে কিছু সংশয়ের অবকাশ আছে। তবে এগুলি যে সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে খুব উল্লেখযোগ্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই গীতিকাগুলির অধিকাংশই প্রণয়মূলক। ইহাদের মধ্যে গ্রাম্য প্রেমেরই বর্ণনা পাই, কিন্তু তাহা একটি অপূর্ব রোমান্টিকতায় মণ্ডিত। কাঞ্চনমালা, কাজলরেখা, মেওয়া (মহুয়া), ভেলুয়া, মলুয়া, মদিনা, লীলা, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি

নায়িকাদের প্রেম যেভাবে কৃচ্ছ্রসাধন ও ত্যাগের মধ্য দিয়া মহিমান্বিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। দুই একটি গীতিকা প্রণয়মূলক নহে, যেমন দস্যু কেনারামের পালা ; এই পালাটিতে একজন নরহন্তা দস্যুর ভক্ত ও সুগায়কে পরিণত হওয়ার জীবন্ত চিত্র পাই ; এগুলিও কারুণ্যরসমণ্ডিত ও মর্মস্পর্শী।

এই গীতিকাগুলির মধ্যে পুরাণের প্রভাব খুবই অল্প। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখা যেমন ধর্মাশ্রিত, এই শাখাটি তাহার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। এই শাখাটিতে হিন্দু-সংস্কৃতি ও মুসলিম-সংস্কৃতির সম্মিলনেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নায়কনায়িকার প্রণয়কাহিনীই এই গীতিকাগুলির মধ্যে সমান দক্ষতা ও সহানুভূতির সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে পূর্ব বঙ্গের পল্লীজীবনের যে আলেখ্য ফুটিয়াছে, তাহাও অপরূপ। এই পল্লীজীবনের পটভূমিতে নায়কনায়িকাদের প্রেম মনোহর বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত হইয়াছে এবং তাহার রূপায়ণে একটি নবতর লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই গীতিকাগুলিতে যেন প্রকৃতি ও মানবহৃদয় একাত্ম হইয়া গিয়াছে, কবিরা প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্য দিয়া আশ্চর্য কৌশলে মানুষের নিগূঢ় হৃদয়রহস্যকে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

মানুষের নানা অনুভূতি এই গীতিকাগুলির মধ্যে সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। রূপমোহ, অন্তরের আলোড়ন, মিলনের আকুতি, বিরহের জ্বালা এবং বিদায়ের হাহাকার—সমস্ত কিছুকেই কবিরা আশ্চর্য কুশলতার সহিত জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এই সমস্ত ভাবের বর্ণনায় যেমন তাঁহাদের কবিত্ব-শক্তির নিদর্শন মিলে, অপরদিকে তেমনি জীবন সম্বন্ধে তাঁহাদের গভীর ও বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

এই গীতিকাগুলির ভাষা অমার্জিত ও গ্রাম্য পূর্ববঙ্গীয় কথ্যভাষা। কিন্তু ইহারই মধ্য দিয়া অপরিসীম কাব্যসৌন্দর্য স্ফূর্ত হইয়াছে। এই ভাষার মধ্য দিয়া যেন আমরা রূপকথার জগতে উত্তীর্ণ হই। ইহার মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যাংশগুলি যেন রূপকথার মায়াঞ্জনজড়িত ; অথচ সেগুলি যেমনই স্বাভাবিক, তেমনই প্রাণবন্ত।

মোটের উপর, 'ময়মনসিংহগীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ইহাদের মধ্যে মানুষের হৃদয়ানুভূতি, মানুষের

সৌন্দর্য এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য এই তিন উপাদানের সমন্বয়ে এক সজীব ব্যঞ্জনাময় কবিত্ব-স্বর্গ রচিত হইয়াছে। এই স্বর্গ যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে পণ্ডিত, সংস্কৃতিবান্ নাগরিক কবিগোষ্ঠি নহেন, সুদূর গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত কবি-সম্প্রদায়—ইহা ভাবিয়া আমরা বিস্ময় অনুভব করি।

ভারতচন্দ্র

ভারতচন্দ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। শুধু তাহাই নয়, জনপ্রিয়তার দিক দিয়া তাঁহার সমকক্ষ কবি এপর্যন্ত বাংলাদেশে খুব কমই আবির্ভূত হইয়াছেন। ১৭১২ খ্রীঃর মত সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আদি নিবাস ছিল বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুরশুট পরগণার পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো গ্রামে। ভারতচন্দ্র মুখুজ্জ্যে-বংশীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার বংশ রাজবংশ হইলেও বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্র কবির পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লওয়ার ফলে তাঁহাদের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। ভারতচন্দ্রের প্রথম জীবন দুঃখকষ্টেই অতিবাহিত হয়। তাহা সত্ত্বেও তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং ব্যাকরণ, অলংকার, পুরাণ, আগম প্রভৃতি শাস্ত্রের বিশারদ হন। বাংলা ও সংস্কৃত ভিন্ন হিন্দী, উড়িয়া ও ফার্সী ভাষাতেও তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি কবিত্বশক্তিরও পরিচয় দেন। প্রথম যৌবনে তিনি ঘটনাচক্রে এক সন্ন্যাসীর দলের সঙ্গে মিশিয়া যান এবং নানা দেশে ভ্রমণ করেন। অবশেষে আত্মীয় ও কুটুম্বদের নির্বন্ধে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ফরাসডাঙার (চন্দননগরের) ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মারফতে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়লাভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে সভাকবির পদে নিয়োগ করেন; তিনি ভারতচন্দ্রকে 'রায়গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং অনেক ভূসম্পত্তি দান করিয়া মূলাজোড় গ্রামে স্থিত করান। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রেরই আদেশে ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

অন্নদামঙ্গলই ভারতচন্দ্রের রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্য। ১৬৬৪ শকাব্দে (১৭৪২-৪৩ খ্রীঃ) বাংলার নবাব আলীবর্দী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে বার লক্ষ টাকা নজরানা চান এবং কৃষ্ণচন্দ্র তাহা না দিতে পারায় তাঁহাকে বন্দী করেন। কারাগারে

দেবী অন্নপূর্ণা তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন যে তিনি যেন তাঁহার সভাকবি ভারতচন্দ্রকে তাঁহার মাহাত্ম্যবর্ণনমূলক কাব্য রচনা করিতে বলেন। মুক্ত হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে ঐ কাব্য রচনা করিতে বলেন এবং তদনুসারে ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' লেখেন; ১৬৭৪ শকাব্দে (১৭৫২-৫৩ খ্রীঃ) এই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। এই কাব্য তিনটি খণ্ডে বিভক্ত; প্রথম খণ্ডে কৃষ্ণচন্দ্রের বিপন্মুক্তি অবলম্বনে অন্নদার মাহাত্ম্য বর্ণনা, কাব্য রচনার উপলক্ষ বর্ণনা, শিবের উপাখ্যান বর্ণনা এবং কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের বাসভবনে অন্নদার আগমনের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে পাই কালিকামঙ্গল অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যান। তৃতীয় খণ্ডে ভবানন্দ মজুমদারের প্রশস্তি উপলক্ষে মানসিংহ কর্তৃক প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের বর্ণনা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী; এই খণ্ডে শিব, অন্নপূর্ণা, নারদ, মেনকা প্রভৃতি দেবচরিত্রগুলিও মানবতাগুণে মণ্ডিত হইয়াছে; মানবচরিত্রগুলির মধ্যে ঈশ্বরী পাটনী জীবন্ত ও উপভোগ্য। দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ভারতচন্দ্রের প্রতিভার স্পর্শে অনুপম লাবণ্য লাভ করিয়া রূপায়িত হইয়াছে; ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে অশ্লীলতা-দোষ থাকিলেও ইহার বর্ণনাভঙ্গীর মনোহারিত্ব সকলকেই মুগ্ধ করে; ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে' বিগতযৌবনা দূতী হীরা মালিনীর দুষ্ট চরিত্রটি যেরূপ জীবন্ত হইয়াছে; তাহার তুলনা বিরল। ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ' বাহ্যত ঐতিহাসিক কাব্য হইলেও আদর্শ ঐতিহাসিক কাব্যের লক্ষণ ইহাতে দেখা যায় না, কারণ ইহাতে বর্ণিত কাহিনীটির মধ্যে তথ্যের সহিত কল্পনার নির্বিচার সংমিশ্রণ হইয়াছে এবং ইতিহাসের পরিবেশ ইহার মধ্যে জীবন্ত হয় নাই; তবে এই খণ্ডটি বেশ সরস ও সুখপাঠ্য; ইহাতে বর্ণিত ঘেসেড়ানী, দাসু, বাসু প্রভৃতি গৌণ-চরিত্রগুলি বেশ জীবন্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যুদ্ধের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা খুবই উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। 'অন্নদামঙ্গলে'র ভাষা অত্যন্ত স্বচ্ছ, সাবলীল ও বৈদগ্ধ্যপূর্ণ। ভারতচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর হাস্যরসিক ছিলেন এবং শ্লেষ ও যমক সৃষ্টিতে তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল। তাঁহার এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় 'অন্নদামঙ্গলে' পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। ছন্দের ক্ষেত্রেও ভারতচন্দ্র এই কাব্যে অপরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন; বহু সংস্কৃত ছন্দকে তিনি এই কাব্যে বাংলা ভাষায় প্রথম প্রয়োগ করিয়াছেন। মোটের উপর, 'অন্নদামঙ্গলে'র বহিরাঙ্গিকের লাবণ্য অতুলনীয়।

অবশ্য ইহার মধ্যে গভীরতার খানিকটা অভাব লক্ষিত হয়। তবে ইহার মধ্যে যে গানগুলি রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মাধুর্য ও ভাবগভীরতার নিদর্শন পাই। 'অন্নদামঙ্গল' তাহার অসামান্য গুণগুলির জন্য শতাধিক বর্ষ ধরিয়া বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় কাব্যের আসন অধিকার করিয়াছিল। 'অন্নদামঙ্গল'-এর মধ্যে কিয়ৎ-পরিমাণে আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাভাবনার পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

ভারতচন্দ্রের অন্যান্য রচনাগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র। তিনি দুইটি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' রচনা করিয়াছিলেন; একটি ত্রিপদী ছন্দে, অপরটি চৌপদী ছন্দে লেখা; দ্বিতীয়টি ১১৪৪ সনে (১৭৩৭-৩৮ খ্রীঃ) রচিত হয়। তাঁহার আর একটি কাব্য 'রসমঞ্জরী', ইহা মৈথিল কবি ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরী' নামক নায়ক-নায়িকার লক্ষণ-বর্ণনামূলক গ্রন্থের অনুবাদ; ইহা ১৭৪৯ খ্রীঃর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। তাঁহার 'নাগাষ্টক' কাব্যে আটটি সংস্কৃত শ্লোক ও তাহাদের বঙ্গানুবাদ রহিয়াছে; দুই-একটি শ্লোক দ্ব্যর্থমূলক; এক অর্থে কালীয়নাগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কালীয়-হ্রদের জীবজন্তুরা কৃষ্ণের কাছে অভিযোগ জানাইতেছে, দ্বিতীয় অর্থে মূলাজোড় গ্রামের পত্তনিদার রামদেব নাগের (বর্ধমানরাজের কর্মচারী) অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে অভিযোগ জানাইতেছেন; এই কাব্যটি পড়িয়া কৃষ্ণচন্দ্র রামদেব নাগের অত্যাচার নিবারণ করিয়াছিলেন। এই বইগুলি ভিন্ন ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ভাষায় একটি 'গঙ্গাষ্টক' লিখিয়াছিলেন এবং হিন্দী, বাংলা ও সংস্কৃত তিন ভাষা মিলাইয়া 'চণ্ডী-নাটক' নামে একটি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহা ব্যতীত ভারতচন্দ্র নিতান্ত লৌকিক বিষয়বস্তু লইয়া 'বসন্তবর্ণনা', 'বর্ষাবর্ণনা' 'বাসনাবর্ণনা' 'ধেড়ে ও ভেড়ে' প্রভৃতি কয়েকটি ছোট বাংলা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার পূর্বে এই জাতীয় কবিতা এদেশে আর কেহ লেখেন নাই।

রামপ্রসাদ ও তাঁহার অনুবর্তী কবিগোষ্ঠী

রামপ্রসাদ সেন ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক এবং তিনিও বাংলার শ্রেষ্ঠ ও জন-প্রিয় কবিদের অন্যতম। রামপ্রসাদ ১৭২০ খ্রীঃর মত সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে বৈদ্য। তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত হালিসহর-কুমারহট্ট গ্রাম রামপ্রসাদের নিবাস-ভূমি। অল্প বয়স

হইতেই রামপ্রসাদ কবিতা রচনায়, বিশেষত শ্যামাসঙ্গীত রচনায় দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি প্রথম হইতেই তাঁহার ইষ্টদেবী কালীর ভক্ত সাধক, বিষয়কর্মে তাঁহার তেমন মন ছিল না। তাঁহার রচিত গানগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশে জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং তাঁহার প্রতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি ও অনেক ভূসম্পত্তি দান করেন। তিনি রামপ্রসাদকে তাঁহার সভাকবির পদেও নিয়োগ করিতে চাহেন; বিষয়াসক্তিহীন রামপ্রসাদ তাহাতে সম্মত হন নাই। দীর্ঘকাল সাধনা ও কাব্যরচনার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিবার পরে রামপ্রসাদ ১৭৮১ খ্রীঃর মত সময়ে পরলোকগমন করেন।

রামপ্রসাদের রচনাবলীর মধ্যে দেবীবিষয়ক গানগুলিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আধুনিক কালে এই গানগুলিকে "শাক্ত পদাবলী" নাম দেওয়া হইয়াছে। দেবী-বিষয়ক গানগুলি দুইভাগে বিভক্ত—(১) বাৎসল্যরসাত্মক, (২) ভক্তিরসাত্মক। বাৎসল্যরসাত্মক গানগুলিতে শক্তি দেবী হিমালয় ও মেনকার কন্যা হইয়া দেখা দিয়াছেন এবং তাঁহার বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়া এই গানগুলির মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই গানগুলি অপূর্ব সুধানির্যাসে ভরপুর। মেনকার মাতৃহৃদয়ের স্নেহ ও ব্যাকুলতা গানগুলিতে যেরূপ মর্মস্পর্শিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার তুলনা বিরল। আগমনী-গানে তিন দিনের জন্য উমার পিতৃগৃহে আগমনে মেনকার অপার আনন্দ বর্ণিত হইয়াছে এবং বিজয়া-গানে তিন দিনের অবসানে উমার বিদায়ে মেনকার বেদনা বর্ণিত হইয়াছে। তখনকার দিনে বাঙালী পিতামাতারা নববিবাহিতা বালিকা কন্যাদের পিতৃগৃহে আগমন ও শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তনের সময়ে ঠিক এইরূপ আনন্দ ও বেদনা অনুভব করিত। তাহারই প্রতিধ্বনি আগমনী ও বিজয়া গানগুলির মধ্যে শোনা যায়। রামপ্রসাদই এই অপূর্ব বাৎসল্যরসাত্মক গানের আদি রচয়িতা এবং তিনিই ইহাদের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা।

রামপ্রসাদের ভক্তিরসাত্মক দেবীবিষয়ক গানগুলিতে শক্তিদেবী কালীর রূপে দেখা দিয়াছেন। এই গানগুলির মধ্য দিয়া ভক্ত কবি—সন্তান যেমন জননীকে ভালোবাসা জানায়, তেমনিভাবেই দেবীকে মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার ভালোবাসা জানাইয়াছেন। এইরূপ অনাবিল অকৃত্রিম ভালোবাসার মধ্য দিয়া আরাধ্যের প্রতি ভক্তি-নিবেদন বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার মধ্যেও অবশ্য আমরা ভালোবাসার ভিতর দিয়া পূজারই নিদর্শন পাই, কিন্তু

সে প্রেম কান্তাপ্রেম,—শুধু তাহাই নয়, পরকীয়া প্রেম। এই কারণের জন্য এবং সে প্রেম সামাজিক বিধিনিষেধের দ্বারা বারিত বলিয়া তাহার আবেদন ততটা ব্যাপক নহে। কিন্তু রামপ্রসাদের গানের মধ্যে যে ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা যেমনই পবিত্র, তেমনই মধুর। তাহার আবেদন সর্বসাধারণের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। কতকগুলি গানে রামপ্রসাদ অবোধ শিশুর মত তাঁহার শ্যামা-মাতার কাছে আবদার করিয়াছেন, এমনকি কোন কোন গানে তিনি শ্যামা-মাতাকে ভৎ'সনা ও গঞ্জনা পর্যন্ত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অন্তরের সরলতা ও ভক্তির অকপটতার অত্যন্ত মধুর নিদর্শন পাই। রামপ্রসাদের গানগুলির মধ্যে অত্যন্ত গভীর ভাব একান্ত অবলীলাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। এই গানগুলির ভাষা অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল। ইহাদের মধ্যে রামপ্রসাদ আমাদের পরিচিত লৌকিক জীবন হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা ভাব পরিস্ফুট করিয়াছেন, এমনকি নিতান্ত জটিল দার্শনিক তত্ত্বকেও এই সব উপমার মধ্য দিয়াই তিনি রূপায়িত করিয়াছেন। ভক্তির প্রগাঢ়তা, ভাবের মাধুর্য ও অকপটতা এবং প্রকাশভঙ্গীর সরলতার জন্য রামপ্রসাদের এই গানগুলি সর্বজনপ্রিয় হইয়াছিল এবং এই সমস্ত গুণের জন্যই এগুলি এখনও আমাদের মুগ্ধ করে।

দেবীবিষয়ক গান ছাড়া রামপ্রসাদ কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ সম্ভবত 'কালীকীর্তন'; ইহা রাজকিশোর নামে একজন ধনী ব্যক্তির আজ্ঞায় রচিত হইয়াছিল; বইটির মধ্যে অনেক মধুর পদ রহিয়াছে; তবে ইহার একটি ত্রুটি এই যে, ইহার মধ্যে কালীর লীলাকে কৃষ্ণলীলার ছাঁচে ঢালিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং কৃষ্ণের মত কালীরও গোষ্ঠলীলা, রাসলীলা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে; রামপ্রসাদের এই অভিনব প্রচেষ্টাকে তাঁহার গানের প্যারডি-রচয়িতা আজু গোঁসাই ব্যঙ্গ করিয়া "কাঁঠালের আমসত্ত্ব" বলিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ 'কৃষ্ণ-কীর্তন' নামেও একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন; ইহার একটি মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে। রামপ্রসাদ শাক্ত হইলেও বৈষ্ণবদের প্রতি যে তাঁহার কোন বিদ্বেষ ছিল না, তাহার প্রমাণ তাঁহার 'কৃষ্ণ-কীর্তন' রচনা হইতে পাওয়া যায়। রামপ্রসাদের অপর গ্রন্থ 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' বা 'কবিরঞ্জন'। কেহ কেহ মনে করেন ইহা ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর পূর্বে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ ও বহিরঙ্গ প্রমাণ হইতে বলা যায় যে রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' ভারতচন্দ্রের মৃত্যুরও পরে রচিত হইয়া

ছিল। কাব্য হিসাবে রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর তুলনায় নিকৃষ্ট; ইহার মধ্যে অশ্লীলতাও ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর তুলনায় বেশী; কিন্তু রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর একটি গুণ এই যে, ইহার প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি কৌতুকরসাত্মক বর্ণনায়ও রামপ্রসাদ দক্ষতা দেখাইয়াছেন, যেমন ভণ্ড সন্ন্যাসীদের বর্ণনা।

রামপ্রসাদের পরে আরও অনেক কবি তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া দেবীবিষয়ক গান রচনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে যাঁহার নাম উল্লেখযোগ্য, তিনি হইতেছেন বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের সভাকবি এবং 'সাধকরঞ্জন' নামক তান্ত্রিক যোগ নিবন্ধের রচয়িতা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। ইঁহার রচিত শ্যামাসঙ্গীত-গুলির মধ্যে রামপ্রসাদের গানেরই মত ভক্তির প্রগাঢ়তা, ভাবের গভীরতা ও প্রকাশভঙ্গীর সরলতার নিদর্শন মিলে। অন্যান্য শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতাদের মধ্যে যুগল ব্রাহ্মণ, রামানন্দ, ভৃগুরাম দাস, দ্বিজ নরচন্দ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রামপ্রসাদ সেন ছাড়া রামপ্রসাদ নামক অন্য কোন কোন শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতাও আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' নামক একজন ব্রাহ্মণ কবি ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। আগমনী-বিজয়া গান রচনায় রামপ্রসাদের পরে সর্বাপেক্ষা দক্ষতা দেখাইয়াছেন কবিওয়ালা রাম বসু। মোটের উপর, রামপ্রসাদ রচিত ভক্তিরসাত্মক ও বাৎসল্যরসাত্মক দেবীবিষয়ক গানগুলির অনুসরণে বাংলায় একটি সুবিশাল ও সমৃদ্ধ গীতি-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সাহিত্যের ধারা সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হইবার পরে বিংশ শতাব্দীতে উপনীত হইয়াও প্রাণবন্ত রহিয়াছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট

প্রাচীন বাংলা গদ্য

মধ্যযুগে বাংলায় পদ্য সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইলেও গদ্য সাহিত্যের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য নানা বৈষয়িক ব্যাপারে গদ্য লেখা প্রচলিত ছিল এবং লোকে চিরকাল গদ্যেই কথাবার্তা বলিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে মধ্যযুগের এমন কোন বাংলা গদ্য রচনা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। গদ্যে লেখা যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্ন-লিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

১। সংস্কৃত সূত্রের ন্যায় কতকগুলি ছোট ছোট বাক্য—অনেকগুলিই দুর্বোধ্য প্রহেলিকার মত মনে হয়। দৃষ্টান্ত :

"পশ্চিম দুয়ারে কে পণ্ডিত—সেতাই জে
চারিসত্র গতি আনি লেখ্যা।"
"হে কালিন্দিজল বার ভাই বার আদিত্ত।

হথে পাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি। সেবক হব সুখি আমনি ধীমাং কন্নি"।

এ দুইটি শূন্য পুরাণ হইতে উদ্ধৃত। কেহ কেহ বলেন এই গ্রন্থ ত্রয়োদশ শতকে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু অনেকের মতে ইহার রচনা কাল অষ্টাদশ শতকের পূর্বে নহে।

২। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় ভক্ত রূপ গোস্বামী বিরচিত কারিকা বলিয়া কথিত গ্রন্থ। রূপ গোস্বামী ষোড়শ শতাব্দীর লোক—কিন্তু তিনিই ইহার রচয়িতা কিনা সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। ইহার ভাষার নমুনা : "আগে তারে সেবা। তার ইঙ্গিতে তৎপর হইয়া কার্য করিবে। আপনাকে সাধক অভিমান ত্যাগ করিবে।"

৩। সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা

"জ্ঞানাদি সাধনা" একখানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। ইহাতে জীবের জন্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে। ৺দীনেশ চন্দ্র সেন ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ইহার

একখানি পুঁথি হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার ভাষার নমুনা :

"পরে সেই সাধু কৃপা করিয়া সেই অজ্ঞান জনকে চৈতন্ত করিয়া তাহার শরীরের মধ্যে জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে তাহার বাম কর্ণেতে শ্রীচৈতন্ত মন্ত্র কহিয়া পরে সেই চৈতন্য মন্ত্রের অর্থ জানাইয়া পরে সেই জীব দ্বারাএ দশ ইন্দ্রিয় আদি যুক্ত নিত্য শরীর দেখাইয়া পরে সাধক অভিমানে শ্রীকৃষ্ণাদির রূপ আরোপ চিন্তাতে দেখাইয়া পরে সিদ্ধি অভিমান শ্রীকৃষ্ণাদির মুক্তি পৃথক দেখাইয়া প্রেম লক্ষণার সমাধি-ভক্তিতে সংস্থাপন করিলেন।" ৺দীনেশচন্দ্রের মতে ইহা সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত।[১]

৪। অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোচবিহারের রাজমুন্সী জয়নাথ ঘোষের 'রাজোপাখ্যান' গ্রন্থের ভাষার নমুনা :

"শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুরের বাল্যকাল অতীত হইয়া কিশোরকাল হইবাই পার্শী বাঙ্গলাতে স্বচ্ছন্দ আর খোশখত অক্ষর হইল সকলেই দেখিয়া ব্যাখ্যা করেন বরং পার্শীতে এমত খোষনবিস লিখক সন্নিকট নাহি চিত্রেতে অদ্বিতীয় লোক সকলের এবং পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা পুষ্প তৎস্বরূপ চিত্র করিতেন অশ্বারোহণে ও গজচালানে অদ্বিতীয়।"[২]

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 'ভাষা-পরিচ্ছেদ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ : "গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয় তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন তাবৎ পদার্থ জানিলে মুক্তি হয়।"

ইহার ভাষা প্রাঞ্জল এবং ইহা গদ্যরীতির সূচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

প্রায় সমসাময়িক 'বৃন্দাবনলীলা' গ্রন্থে গদ্য ভাষা আরও একটু উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে :

(কৃষ্ণচন্দ্র) "যে দিবস ধেনু লইয়া এই পর্বতে গিয়াছিলেন সে দিবস মুরলির গানে যমুনা উজান বহিয়াছিলেন এবং পাষাণ গলিয়াছিলেন"।

৫। চিঠিপত্রের ভাষা

ইহা ষোড়শ শতাব্দীতেই অনেকটা উন্নত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে

১। বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড, ১৬৩০-৩৭ পৃঃ। ২। ঐ ১৬৭৮ পৃঃ।

অহোম রাজ্যের রাজাকে লিখিত কোচবিহার মহারাজার পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।"

১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত আর একটি পত্র হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি, "কএক দিবস হইল তথাকার মঙ্গলাদি পাই নাই। মঙ্গলাদি লিখিয়া আপ্যায়িত করিবেন···মহাশয় আমার কত্তা আমি ছাওল আমার দোষসকল আপনকার মাপ করিতে হয়।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৭১ ও ১৭৭২ খ্রীঃ) লিখিত মহারাজা নন্দকুমারের দুইখানি সুদীর্ঘ পত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে কিছু ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু মোটের উপর প্রাঞ্জল গদ্য ভাষা। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র' নামক পত্রসংকলনে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক চিঠি আছে। এইগুলি হইতে দেখা যায় যে তখন বাংলা গদ্য লিখিবার একটি রীতি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে।

৬। খ্রীষ্টীয় মিশনারীর রচনা

সাধারণ লোকের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য পর্তুগীজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় মিশনারীগণ যত্নপূর্বক বাংলা শিখিতেন ও বাংলায় ছোট ছোট পুস্তিকা লিখিয়া খ্রীষ্টের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেন। সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজ মিশনারীরা বাংলা অভিধান ও ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতকের শেষভাগে বাংলা গদ্যে দুইখানি পুস্তিকা লিখিত হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। কিন্তু এই সমুদয় পুস্তক এখন আর পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর যে সকল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বইখানি রচিত হয়। ইহার রচয়িতা ভূষণার (পূর্ব পাকিস্তানে) এক সম্ভ্রান্ত বংশে জাত খ্রীষ্টধর্মান্তরিত বাঙালী হিন্দু। বাল্যকালে (১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) আরাকানের জলদস্যুরা তাহাকে অপহরণ করে। একজন পর্তুগীজ মিশনারী তাহাকে অর্থ দিয়া ক্রয় করিয়া খ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত করেন। তখন তাঁহার নাম হয় দোম আন্তোনিও (Dom Antonio)। এই গ্রন্থে একজন

ব্রাহ্মণ ও রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানের মধ্যে কথাবার্তার অবতারণা করিয়া তিনি খ্রীষ্টধর্মের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। ইহার ভাষার একটু নমুনা দিতেছি।

"রামের এক স্ত্রী তাহান নাম সীতা, আর দুই পুত্ত্রো লব আর কুশ তাহান ভাই লকোন। রাজা অযোধ্যা বাপের সত্ত্যো পালিতে বোনবাসী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহান স্ত্রীরে রাবোণে ধরিয়া লিয়াছিলেন, তাহান নাম সীতা, সেই স্ত্রীরে লঙ্কাত থাক্যা আনিতে বিস্তর যুর্দো করিলেন"।

আর একখানি মিশনারী গ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ'। মনোএল-দা-আস-সুম্পসাঁম (Manoel Da Assumpcam) নামক এক পর্তুগীজ পাদ্রী ১৭৩৪ সালে ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়ালে বসিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার ভাষার একটু নমুনা দিতেছি।

"লুসিয়া এত দুঃখের মধ্যে একলা হইয়া রোদন করিয়া ঠাকুরাণীর অনুগ্রহ চাহিল: কহিল: ও করুণাময়ী মাতা, আমার ভরসা তুমি কেবল; মুনিষ্যের অলক্ষ্য আছি আমি; তথাচ আশা রাখি যে তুমি আমারে উপায় দিবা। আমার কেহ নাহি, কেবল তুমি আমার, এবং আমি তোমার; আমি তোমার দাসী; তুমি আমার সহায়, আমার লক্ষ্য আমার ভরসা। তোমার আশ্রয়ে বিস্তর পাপী অধমে, যেমত আমি, উপায় পাইল। তবে এত অধমেরে যদি উপায় দিলা, আমারেও উপায় দিবা। ইহা নিবেদন করিল"।

এই দুই গ্রন্থের ভাষার গুণাগুণ বিচার করিবার পূর্বে স্মরণ রাখিতে হইবে যে এগুলি বাংলা—কিন্তু রোমান হরফে লেখা। সুতরাং 'লক্ষ্মণ'-এর পরিবর্তে লকোন 'যুদ্ধ'-র পরিবর্তে যুর্দো প্রভৃতি ভুল নহে, মূলে হয়ত শুদ্ধই ছিল।

মোটের উপর এই দুই গ্রন্থ হইতেও প্রমাণিত হয় যে সপ্তদশ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমে এবং সম্ভবত ইহার পূর্বেই বাংলা গদ্যভাষার যে একটি সরল প্রাঞ্জল রূপ ছিল তাহা সর্বাংশে সাহিত্যের উপযোগী। দেশীয় প্রবীণ সাহিত্যিকেরা ইচ্ছা করিলে গদ্যে উৎকৃষ্ট রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক তাঁহারা কবিতায় লেখা পছন্দ করিতেন। সম্ভবত পাঁচালী প্রভৃতি গানের মধ্য দিয়া কাব্য জনপ্রিয় হইয়াছিল—সহজ কথাবার্তার ভাষায় সাহিত্য রচনার সে যুগে আদর হয় নাই। যাহাই হউক, উল্লিখিত দুইখানি মিশনারী গ্রন্থের জন্য বাংলা সাহিত্য পর্তুগীজদের নিকট ঋণী। পাদরী মনোএলের আরও একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহার প্রথমভাগে বাংলা ব্যাকরণের মূল সূত্র

ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়ভাগে বাংলা-পর্তুগীজ ও পর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষ প্রদত্ত হইয়াছে। এই তিনখানি গ্রন্থই বাংলাভাষার সর্বপ্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থের সম্মান দাবী করিতে পারে। পর্তুগীজদের নিকট আমাদের ঋণ আরও আছে। ভারতে তাহারাই প্রথমে মুদ্রণ-যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে—গোয়া শহরে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। পর্তুগীজেরা যে এদেশে নূতন নূতন ফল ফুল আমদানি করিয়াছিল তাহা দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে।[১] সাধারণ ব্যবহারের অনেক দ্রব্যও বাংলাভাষায় পর্তুগীজ নামে পরিচিত—যেমন ছবি, ফিতা, আলমারি, চাবি, বোতাম, বোতল, পিস্তল, বয়াম, বয়া, মাস্তল, বালতী, পেরেক, সাবান, তোয়ালে, আলপিন ইত্যাদি। ইস্ত্রি, আয়া, মিস্ত্রী, নিলাম, দরজা, জানালা, গরাদে, কামরা, কেদারা, মেজ প্রভৃতি শব্দও পর্তুগীজ।

আরবী ও ফার্সীভাবার বহু শব্দ যে বাংলাভাষায় গৃহীত হইয়াছে তাহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই, কারণ ফার্সী ছিল মধ্যযুগে দরবারের ভাষা ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণের কথ্য ভাষা। সুতরাং বিভিন্ন প্রাদেশিক হিন্দুভাবায়ও তাহার বহু শব্দ স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দী ও তাহার পরে অনেক ইংরেজী শব্দও বাংলাভাষার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এইভাবে মধ্যযুগে বাংলাভাষা বিদেশীভাষার সাহায্যে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

১। ৩০৮-৯ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শিল্প[1]

১। সুলতানী যুগ

মধ্যযুগে বাংলার স্থাপত্য-শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় মুসলমান সুলতানদের নির্মিত মসজিদ ও সমাধি-ভবনে। এই শিল্পের কয়েকটি বিশেষত্ব আছে।

প্রথমত, এগুলি প্রধানত ইষ্টকনির্মিত। স্তম্ভ ও কোন কোন স্থলে প্রাচীরের বহিরাবরণের জন্য পাথর ব্যবহার করা হইয়াছে। কখন কখনও আর্দ্রতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্বনিম্নে একসারি পাথর বসান হইয়াছে। ইহার কারণ বাংলাদেশের পশ্চিমপ্রান্তে রাজমহলের নিকটবর্তী অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও পাহাড় নাই। সুতরাং প্রস্তর খুবই দুর্লভ ছিল। ইটের গাঁথনি মজবুত করার জন্য চুণ ব্যবহার করা হইত। তাহা ছাড়া মুঘল যুগে পলস্তারার জন্যও চুণ ব্যবহার করা হইত।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে বেশীরভাগ বাঁশের খুঁটি ও খড়ের চাল দিয়া ঘর তৈয়ারী হইত। দোচালা ও চারচালা সাধারণত ঘরের এই দুই শ্রেণী। দেখা যায়, কাঠের ও ইঁটের বাড়ীর ছাদ ইহার অনুকরণেই নিমিত হইত। অর্থাৎ সরলরেখার পরিবর্তে খড়ের চালের ন্যায় কতকটা বাঁকানো হইত। ঘরগুলিতে যেমন চারিকোণে বাঁশের খুঁটি আড়া-আড়িভাবে বাঁশ লাগাইয়া মজবুত করা হইত, ইঁটের বাড়ীতেও তেমনি চারিকোণে চারিটি ইষ্টক স্তম্ভ অট্টালকের (Tower) আকারে নির্মিত হইত। দুইটি বাঁশ অল্পদূরে পুঁতিয়া তাহার

---

(১) এই পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে ; অট্টালক (Tower) ; অধিষ্ঠান (Basement) ; অর্ধচিত্র (Bas-relief ;) অলিন্দ (Corridor) ; কক্ষা (Bay) ; কুড্যস্তম্ভ (Pilaster) ; কুলুঙ্গি (Niche) ; কেন্দ্রশালা ও পার্শ্বশালা (Nave and Aisle) ; তরঙ্গিত পলকাটা (Cusp) ; প্রাকার (Parapet) ; পলকাটা (Fluted) ; বলভি (Turret)।

এই অধ্যায় প্রধানত আহম্মদ হাসান দানি প্রণীত 'Muslim Architecture in Bengal', মনোমোহন চক্রবর্তী লিখিত 'Bengali Temples and their characteristics' (J, A. S. B. 1909, P. 142) নামক প্রবন্ধ এবং শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বাঁকুড়ার মন্দির' অবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

মাথা নোয়াইয়া বাঁধিয়া দিলে যে আকৃতি ধারণ করে, ইটের ও পাথরের স্তম্ভের উপর গঠিত খিলানগুলিও তাহার অনুকরণ করিত।

তৃতীয়ত, দেয়ালের গঠনে অংশ বিশেষ সম্মুখে বাড়াইয়া এবং পশ্চাতে হঠাইয়া বৈচিত্র্য সৃষ্টি, ইহার গায়ে নানারকমের নক্সা, ও এক খণ্ড প্রস্তরে গঠিত স্তম্ভ প্রভৃতি প্রথম প্রথম হিন্দুযুগের অনুকরণে করা হইত। ক্রমে ক্রমে ইহার পরিবর্তন হয়। হিন্দুমন্দিরের গায়ে চতুষ্কোণ প্রস্তরের ফলকের উপর মানুষের মূর্তি খোদিত হইত। কিন্তু ইসলাম ধর্মে মনুষ্যমূর্তি গঠন নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহার বদলে নানারূপ লতাপাতা ও জ্যামিতিক নক্সা খোদাই করা হইত।

চতুর্থত, নূতন এক প্রণালীতে খিলান নির্মিত হইত। হিন্দুযুগে সাধারণত একখানা ইট (বা পাথরের) উপরে ঠিক সমান্তরালভাবে আর একখানা ইট (বা পাথর) বসান হইত, কেবল তাহার সামান্য একটু অংশ নীচের ইটের (বা পাথরের) চেয়ে একটু বাড়ানো থাকিত। এইভাবে দুইটি স্তম্ভের উপর দুই দিক হইতে ইটের (বা পাথরের) অংশ বাড়িতে বাড়িতে যখন দুইখানি ইটের (বা পাথরের) মধ্যে ব্যবধান খুব সঙ্কীর্ণ হইত তখন এক খণ্ড বড় ইট বা পাথর এই ব্যবধানের উপর বসাইয়া খিলান তৈরী হইত। মধ্যযুগে ইট বা পাথরগুলি সমান্তরালভাবে একটির উপর একটি না বসাইয়া কোনাকুনি-ভাবে পাশাপাশি সাজাইয়া খিলান তৈরী হইত। ইহার নাম প্রকৃত খিলান (True Arch)। ঠিক এই প্রণালীতেই বড় বড় গম্বুজ (dome) নির্মিত হইত। এই প্রকার খিলান ও গম্বুজ মুসলমান শিল্পের প্রধান বিশেষত্ব। হিন্দুযুগে ইহা অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু ইহার ব্যবহার ছিল খুবই কম।

পঞ্চমত, নানা রংয়ের ও নানা আকৃতির মিনা করা কাচের ন্যায় মসৃণ টাইল ও ইটের ব্যবহার। ভিতরের ও বাহিরের দেওয়ালে এইগুলির ব্যবহারের দ্বারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করাই ছিল সাধারণ বিধি।

ষষ্ঠত, ছাদের উপর গম্বুজের পাশে বাংলাদেশের খড়ের চালের ঘরের ন্যায় ইষ্টকনির্মিত ক্ষুদ্র কক্ষের সমাবেশ। ইহার দৃষ্টান্ত খুব বেশী নহে।

মুসলমান আমলের যে সকল ইমারৎ এখন পর্যন্ত মোটামুটি সুরক্ষিত অবস্থায় আছে তাহার কোনটিই চতুর্দশ শতকের পূর্বে নির্মিত নহে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হর্ম্যের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় হুগলী জিলার অন্তঃপাতী ত্রিবেণী ও

ছোট পাণ্ডুয়া গ্রামে। ত্রিবেণীতে জাফরখান গাজির সমাধি-ভবন ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে প্রাচীন হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া তাহারই বিভিন্ন অংশ ও খোদিত কারুকার্য জোড়াতাড়া দিয়া নির্মিত হইয়াছিল। ত্রিবেণীতে একটি বিশাল মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহাও জাফরখানের নির্মিত (১২৯৮ খ্রীঃ)। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭৭ ফুট এবং প্রস্থে প্রায় ৩৫ ফুট। ইহাতে খিলানযুক্ত পাঁচটি দরজা ও ছাদে পাঁচটি গম্বুজ ছিল। এগুলির ধ্বংসাবশেষ হইতে হিন্দু মন্দিরের কারুকার্যখোদিত ও মূর্তিযুক্ত বহুসংখ্যক ফলক পাওয়া গিয়াছে। ছোট পাণ্ডুয়াতে একটি মসজিদ ও একটি মিনার আছে।

স্বাধীন বাংলার মুসলমান সুলতানদের রাজধানী ছিল প্রথমে গৌড়, পরে ইহার ১৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত পাণ্ডুয়া এবং তাহার পরে আবার গৌড়। সুতরাং মধ্যযুগের বাংলার স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই দুই শহরেই আছে। এই দুই শহরে যে সকল মসজিদ ও সমাধি-ভবন আছে তাহা মোটামুটি নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম : সমচতুষ্কোণ একটি গম্বুজওয়ালা কক্ষ—ভিতরে কোন স্তম্ভের ব্যবহার নাই, কার্নিসের উপর চারিকোণে চারিটি অষ্ট-কোণ বলভি এবং সম্মুখে অলিন্দ।

দ্বিতীয় : প্রথমের অনুরূপ, তবে ইহার তিনদিকে তিনটি অলিন্দ।

তৃতীয় : বেশি লম্বা, কম চওড়া একটি বৃহৎ ও উচ্চ কেন্দ্রশালা—ইহার উপরে খিলানের ছাদ ও দুই পাশে দুইটি কম উঁচু পার্শ্বশালা। পার্শ্বশালার উপরে একাধিক গম্বুজ এবং অভ্যন্তরভাগ স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা লম্বালম্বি ও পাশাপাশি অনেকগুলি কক্ষায় বিভক্ত।

চতুর্থ : বেশি লম্বা, কম চওড়া একটি বৃহৎ কক্ষ—ইহার ছাদে বহুসংখ্যক গম্বুজ এবং ভিতর স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা অনেকগুলি কক্ষায় বিভক্ত। প্রত্যেকটি লম্বালম্বি কক্ষার পশ্চিমপ্রান্তে একটি মিহ্‌রাব এবং পূর্বপ্রান্তে অর্থাৎ সম্মুখদিকে ঠিক সেই বরাবর একটি খিলান। ছাদের বহুসংখ্যক গম্বুজের খিলানগুলি স্তম্ভশ্রেণীর শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত।

পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ (চিত্র ১-৫) উল্লিখিত তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত এবং সুরক্ষিত মসজিদগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান সেকন্দর শাহ ইহার নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এত বড় মসজিদ আর কখনও নির্মিত হয় নাই। ৩১৭ ফুট দীর্ঘ এবং

১৫৯ ফুট প্রস্থ একটি মুক্ত অঙ্গনের চারি পাশে চারি সারি কক্ষ। পশ্চিমের সারি আবার স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা পাঁচ ভাগে বিভক্ত এবং ইহার মধ্যেই উপাসনা কক্ষ। অপর তিন দিকের সারিগুলি তিন তিন ভাগে বিভক্ত। পশ্চিম সারিতে মধ্যস্থলে একটি বিশাল উচ্চ কক্ষ (৬৪ ফুট × ৩৪ ফুট) এবং দুই পাশে নীচু আর দুইটি কক্ষ। ইহার প্রত্যেকটি পাঁচ সারি স্তম্ভ দিয়া পাঁচটি কক্ষায় বিভক্ত এবং পাঁচটি খিলানের মধ্য দিয়া মধ্যের কক্ষ হইতে ঐ পাঁচটি কক্ষায় যাওয়ার পথ। মধ্যের বিশাল কক্ষটির উপরে একটি প্রকাণ্ড খিলান আকৃতি ছাদ ছিল, এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মধ্য কক্ষের পশ্চাতের দেয়ালে প্রকাণ্ড মিহ্‌রাব, ইহার দক্ষিণে অনুরূপ আর একটি ছোট মিহ্‌রাব এবং উত্তরে বিশাল তোরণের নিম্নে অপরূপ কারুকার্য শোভিত কষ্টি-পাথর নির্মিত উপাসনার বেদী। দুই পার্শ্বকক্ষের প্রত্যেকটিতে পশ্চাদভাগের প্রাচীরগাত্রে আঠারোটি কুলুঙ্গি এবং ইহাদের বরাবর অপর প্রান্তে সম্মুখের দিকে আঠারোটি উন্মুক্ত খিলান আছে। উত্তরের দিকের পার্শ্বকক্ষের খানিকটা অংশ জুড়িয়া ৮ ফুট উঁচু মোটা খাটো ২১টি কারুকার্যখচিত স্তম্ভের উপর বাদশাহ কা তখ্‌ত অর্থাৎ রাজপরিবারের বসিবার জন্য মঞ্চ তৈরী হইয়াছে। মোট স্তম্ভ সংখ্যা ২৬০।

চারি দিকে চারি সারি কক্ষের উপরের ছাদ মোটামুটি ৩৭৬টি ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটির উপর একটি করিয়া ছোট গম্বুজ নির্মিত হইয়াছে। পশ্চিম দিকের কক্ষের সারির ঠিক মাঝখানে যে বৃহদাকার খিলান আছে তাহা ৩৩ ফুট চওড়া এবং ৬০ ফুটের বেশী উঁচু। ইহার দুই পাশে যে খিলানগুলি আছে তাহাও ৮ ফুট চওড়া। হিন্দু মন্দির হইতে উৎকৃষ্ট কারুকার্য-শোভিত স্তম্ভ খুলিয়া নিয়া মিহ্‌রাবটি তৈয়ারী হইয়াছে।

আদিনা মন্দিরের ধ্বংসের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর অনেক পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মিহ্‌রাব দুইটি উৎকৃষ্ট হিন্দু শিল্পের উপকরণ দিয়া নির্মিত।

গৌড় নগরীর গুণমন্ত এবং দরসবারি মসজিদ আদিনা মসজিদের ন্যায় পূর্বোক্ত তৃতীয় শ্রেণীর মসজিদ। এই দুই মসজিদের নিকটে যে দুইটি লেখ পাওয়া গিয়াছে তাহাদের তারিখ ১৪৮৪ এবং ১৪৭৯ খ্রীঃ এবং অনেকেই মনে করেন যে উক্ত মসজিদ দুইটিরও ঐ তারিখ। কিন্তু আদিনা মসজিদের সহিত সাদৃশ্য বিবেচনা করিলে মনে হয় মসজিদ দুইটি আরও পূর্বেই নির্মিত হইয়াছিল। লেখ দুইটি যে ঐ দুইটি মসজিদেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। গুণমন্ত মসজিদের মধ্যবর্তী বৃহৎ কক্ষের খিলান আকারের ছাদটি এখনও আছে। আদিনা ও

দরসবারির ছাদ ধ্বংস হইয়াছে। সুতরাং গুণমন্ত মসজিদের ছাদের, বিশেষত ইহার নিম্ন অংশের বরগা ও খিলান-যুক্ত কুলুঙ্গিগুলি সম্ভবত অন্য দুইটি মসজিদেও ছিল।

পাণ্ডুয়ার একলাখী (চিত্র নং ৬) পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অনেকেই অনুমান করেন যে ইহা জলালউদ্দীন মুহম্মদ শাহের সমাধি। বাহিরের দিকে ইহা দৈর্ঘ্যে ৭৮ ফুট ও প্রস্থে ৭৪ ফুট, সুতরাং প্রায় সমচতুষ্কোণ। কিন্তু ভিতরে ইহা অষ্ট কোণ, এবং ইহার উপর অর্ধ-বৃত্তাকার গম্বুজ। ইহার প্রতি দিকে একটি করিয়া খিলানযুক্ত তোরণ। কোনও প্রাচীন হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপকরণ দিয়া এই সমাধি-ভবন নির্মিত হইয়াছিল। কারণ, ইহাতে হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শনযুক্ত বহু প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার কষ্টি পাথরে নির্মিত তোরণের তলদেশে হিন্দু দেবতার মূর্তি খোদিত আছে। ইহার কার্নিসটি খড়ের চালের মত ঈষৎ বাঁকানো এবং দেয়াল হইতে অনেকটা বাড়ানো।

গৌড়ের নত্তন বা লত্তন মসজিদ (চিত্র নং ৭-৯) প্রথম শ্রেণীর মসজিদের আর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কানিংহামের মতে ইহা ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু কাহারও কাহারও মতে ইহা হোসেন শাহের আমলে অর্থাৎ আরও ৩০।৪০ বৎসর পরে নির্মিত হইয়াছিল। প্রবাদ এই যে রাজার কোন প্রিয় নর্তকী ইহা নির্মাণ করে বলিয়াই মসজিদের নাম নত্তন। মসজিদের অভ্যন্তর ৩৪ ফুট বর্গক্ষেত্র এবং বহির্দেশ ৭২ ফুট দীর্ঘ এবং ৫১ ফুট প্রস্থ। পূর্বদিকে ১১ ফুট চওড়া অলিন্দ এবং প্রতি কোণে অষ্টকোণ অট্টালক। পূর্বদিকে খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ। মধ্যবর্তী প্যানেলগুলিতে বিচিত্র কারুকার্যখচিত কুলুঙ্গি। কার্নিসগুলি ঈষৎ বাঁকানো। বারান্দার উপরে তিনটি গম্বুজ, মধ্যবর্তীটি চৌচালা ঘরের আকৃতি। অন্তর্কক্ষের উপর বৃহৎ গম্বুজ, কিন্তু ইহার ভিত্তিবেদী অতিশয় নীচু। এককালে সমগ্র মসজিদটির ভিতর ও বাহির নানা রঙের মসৃণ টালির বিচিত্র জ্যামিতিক নকসায় সজ্জিত ছিল। এখন ইহার বাহিরের অংশের সাজসজ্জা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কানিংহাম, ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি এই মসজিদের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

গৌড়ের চিকা মসজিদ একলাখীর মত, কিন্তু আয়তনে ছোট। ইহার মধ্যে মিহ্‌রাব বা বেদী নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহা সুলতান মামুদের (১৪৩৭-৫৯ খ্রীঃ) সমাধি-ভবন, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন কবর নাই। কাহারও কাহারও মতে ইহা সুলতান হোসেন শাহের নির্মিত একটি তোরণ (১৫০৪ খ্রীঃ)—কিন্তু ইহার গঠন প্রণালী অনেক প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়।

গৌড়ে এবং বাংলাদেশের নানা স্থানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেক মসজিদ আছে। কোন কোনটিতে মসজিদের সামনে একটি দরদালান আছে এবং ইহার ছাদে তিনটি গম্বুজ—মসজিদে যাইবার তিনটি দরজার ঠিক উপরিভাগে। কোন কোনটিতে চারি কোণে চারিটি মিনারের জায়গায় ছয়টি মিনার আছে—অতিরিক্ত দুইটি দরদালানের দুই প্রান্তে। কোন কোনটিতে ছাদের উপর বিশাল গম্বুজ একটি বৃত্তাকার স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানের উপর থাকায় সমস্ত হর্ম্যটি অনেকটা উচ্চ বলিয়া মনে হয় এবং ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এইরূপ অধিষ্ঠানের অভাবে অধিকাংশ গম্বুজ খর্বাকৃতি হওয়ায় সমস্ত সৌধটির সৌন্দর্য ও মহিমা ম্লান হয়।

গৌড়ের তাঁতিপাড়া (চিত্র নং ১০) এবং ছোট সোনা মসজিদ, ত্রিবেণীতে জাফর খাঁর মসজিদ এবং বাংলাদেশের নানা স্থানে বহুসংখ্যক মসজিদ পূর্বোক্ত চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কেহ কেহ তাঁতিপাড়া মসজিদকে (আঃ ১৪৮০খ্রীঃ) গৌড়ের সর্বোৎকৃষ্ট হর্ম্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু দেয়ালের উপর পোড়া মাটির ফলক এবং অন্যান্য খোদিত আভরণগুলির যে বিচিত্র সৌন্দর্য্য এখনও বর্তমান তাহা উক্ত মতের সমর্থন করে।

ছোট সোনা মসজিদটিও উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন। ইহার ইষ্টক নির্মিত বাহিরের দেয়াল পুরাপুরি এবং ভিতরের দেয়াল আংশিক ভাবে প্রস্তরমণ্ডিত। এই পাথরের উপর অনেক রকমের চিত্র ও নকসা খোদিত আছে। কিন্তু এগুলি অর্ধচিত্র অপেক্ষা আরও কম উচ্চ হওয়ায় তাঁতিপাড়ার মসজিদের ভাস্কর্যের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ছোট সোনা মসজিদের কোন কোন গম্বুজের ভিতরের দিকে সোনার গিল্টি করার চিহ্ন আছে। সম্ভবত ইহা হইতেই "সোনা মসজিদ" নামের উৎপত্তি। ছোট সোনা মসজিদে গম্বুজগুলির মধ্যে একখানি চৌচালা খড়ের ঘরের আকৃতি ছোট কুটির আছে।

গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ এবং বাগেরহাটের সাত গম্বুজ মসজিদ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের অভ্যন্তর ভাগ স্তম্ভের সারি দিয়া এগারটি পাশাপাশি ভাগ করা হইয়াছে। সাধারণত তিনটি বা পাঁচটি ভাগ থাকে। কেবলমাত্র ছোট পাণ্ডুয়ার (হুগলী জিলা) বারদোয়ারি মসজিদে একুশটি ভাগ আছে।

বড় সোনা মসজিদ (চিত্র নং ১১) সুলতান নসরৎ শাহ ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৬৮ ফুট ও প্রস্থে ৭৬ ফুট। ইহাতে ছয়টি মিনার আছে—

চারি কোণে চারিটি এবং সম্মুখের দরদালানের দুই প্রান্তে দুইটি। দরদালান ও প্রধান কক্ষের মধ্যে দশটি বৃহৎ স্তম্ভ আছে। এই কক্ষের অভ্যন্তরে দশ দশ স্তম্ভের দুইটি সারি লম্বালম্বিভাবে তিনটি ভাগে ইহাকে বিভক্ত করিয়াছে। দরদালান ও কক্ষে এগারটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার আছে ও সেই বরাবর পশ্চাৎ ভাগের প্রাচীরে এগারটি মিহ্‌রাব আছে। কক্ষের উত্তর-পশ্চিম কোণে তিনটি পাশাপাশি ভাগ জুড়িয়া একটি উচ্চ মঞ্চ আছে অনেকটা আদিনা মসজিদের বাদশাহকা তখ্‌তের ন্যায়। অন্য দুএকটি মসজিদেও এরূপ ব্যবস্থা আছে। কক্ষের লম্বালম্বি তিন ভাগের উপর তিন সারি, দরদালানের উপর এক সারি এবং এই প্রতি সারিতে এগারটি করিয়া মোট ৪৪টি গম্বুজ দিয়া ছাদ করা হইয়াছিল কিন্তু কক্ষের গম্বুজগুলি সবই ধ্বংস হইয়াছে। মসজিদটি ইঁটের তৈরী কিন্তু বাহিরে পুরাপুরি এবং ভিতরে খিলানের আরম্ভ পর্যন্ত দেয়ালের অংশ প্রস্তরমণ্ডিত। ছোট সোনা মসজিদের ন্যায় বড় সোনা মসজিদেও সোনার গিল্টি করা ছিল। ইহাতে খোদাই করা আভরণের আধিক্য নাই, কিন্তু ইহার খিলানযুক্ত দরদালান, আয়তনের বিশালতা এবং পাথরের মজবুত গঠন ইহাকে একটি অনির্বচনীয় গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য প্রদান করিয়াছে। ফার্গুসন ইহাকে গৌড়ের সর্বোৎকৃষ্ট সৌধ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই মসজিদের সম্মুখে একটি মুক্ত সমচতুষ্কোণ অঙ্গন আছে, ইহার প্রতি দিক ২০০ ফুট এবং ইহার উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বে তিনটি খিলানযুক্ত তোরণ আছে।

বাগেরহাটের সাতগম্বুজ মসজিদ দৈর্ঘ্যে ১৬০ ফুট ও প্রস্থে ১০৮ ফুট। ইহার বৈশিষ্ট্য—অভ্যন্তর ভাগে ছয় সারি সরু স্তম্ভ দিয়া লম্বালম্বি সাতটি ভাগ, এগারটি মিহ্‌রাব ও এগারটি খিলানযুক্ত প্রবেশ দ্বার (ঠিক মাঝেরটি অন্য দশটির চেয়ে বড়) এবং ছাদে সাত সারিতে ৭৭টি গম্বুজ—কতকগুলি গম্বুজ বাংলা দেশের চৌচালা ঘরের মত। ঠিক মধ্যপানের দরজার উপর দোচালা ঘরের চালের প্রান্তের মত একটি ত্রিভুজাকৃতি গঠন—ইহা হইতে দুইধারে কার্নিস নামিয়া কোণের মিনারের দিকে গিয়াছে। কোণের মিনারগুলি গোল, সাধারণ মিনারের মত বহুকোণযুক্ত নহে, এবং দুই তলায় বিভক্ত।

ছোট পাণ্ডুয়ার বারদোয়ারি মসজিদ দৈর্ঘ্যে ২৩১ ফুট ও প্রস্থে ৪২ ফুট। বিভিন্ন নকসার দুই সারি স্তম্ভ (মোট কুড়িটি) দিয়া লম্বালম্বি তিন ভাগে বিভক্ত। পশ্চাতে একুশটি মিহ্‌রাব, সম্মুখে একুশটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার

এবং প্রতিপাশে আরও তিনটি। মিহ্‌রাবগুলি এবং বেদির উপর একখণ্ড পাথরে নির্মিত একটি ছত্রী নানা কারুকার্যখোদিত। ছাদে তিন সারিতে ২১টি করিয়া ৬৩টি গম্বুজ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর হর্ম্যের একমাত্র নিদর্শন ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে নসরৎ শাহ কর্তৃক ইষ্টকনির্মিত গৌড়ের কদম রসুল (চিত্র নং ১২)। ইহার প্রধান কক্ষটি সমচতুষ্কোণ এবং ভিতরের দিকে ১৯ ফুট বর্গক্ষেত্র।[১] ইহার তিন দিকে তিনটি দরজা। এই কক্ষের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বে ১৫ ফুট চওড়া তিনটি বারান্দা। পূর্বদিকের বারান্দার সম্মুখ ভাগ খোদিত ইষ্টকের কারুকার্যশোভিত ফলকে সম্পূর্ণ ঢাকা। খাটো পাথরের স্তম্ভের উপর খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ আছে। প্রধান কক্ষের উপর একটি মাত্র গম্বুজের ছাদ। গম্বুজের উপর পদ্মের ন্যায় চূড়া। প্রতি বারান্দার ছাদ অর্ধবৃত্তাকার খিলানের আকৃতি, চারি কোণে চারিটি অষ্টকোণ মিনার এবং প্রত্যেক মিনারের উপর একটি স্তম্ভ। সাধারণত মসজিদশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও কদম রসুল মসজিদ নহে। হজরৎ মহম্মদের পদচিহ্নাঙ্কিত একখণ্ড কাল মার্বেল পাথর এখানে রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা কদম রসুল নামে খ্যাত।

পূর্বোক্ত মসজিদগুলি ছাড়াও বাংলাদেশের নানা স্থানে উল্লিখিত শ্রেণীর আরও বহু কারুকার্যখচিত মসজিদ আছে। ইহাদের মধ্যে চারিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১। শ্রীহট্ট জিলার শঙ্করপাশা গ্রামের মসজিদ।

২। রাজশাহীর ২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে বাঘা গ্রামে নসরৎ শাহ নির্মিত মসজিদ।

৩। রাজশাহী জিলার কুসুম্বা গ্রামের মসজিদ (১৫৫৮ খ্রীঃ)।

৪। পাণ্ডুয়ার কুৎবশাহী মসজিদ (১৫৮২ খ্রীঃ) মুঘল আমলের প্রথমে নির্মিত কিন্তু সুলতানী আমলের স্থাপত্য রীতি। (চিত্র নং ১৩-১৪)

মসজিদ বাদ দিলে কয়েকটি তোরণ কক্ষ ও মিনার মধ্যযুগে স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

গৌড়ের দাখিল-দরওয়াজা (চিত্র নং ১৫-১৬) অর্থাৎ দুর্গের উত্তর প্রবেশ দ্বার

১। অনেকে কানিংহামের অনুকরণে ইহার দৈর্ঘ্য ২৫ ফুট ও প্রস্থ ১৫ ফুট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। A. H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* ১২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এই শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহা ইষ্টকনির্মিত এবং ইহার ৬০ ফুট উচ্চ এবং ৭৩ ফুট প্রশস্ত ও কারুকার্যে শোভিত সম্মুখ ভাগের মধ্যখানে ৩৪ ফুট উচ্চ খিলানযুক্ত বিশাল তোরণ। ইহার দুই ধারে দুইটি বিশাল কুড্যস্তম্ভ এবং তাহার সহিত সংযুক্ত দ্বাদশ-কোণ-সমন্বিত দুইটি অট্টালক (Tower) ক্রমশঃ সরু হইয়া উপরে উঠিয়াছে। প্রতি অট্টালক পাঁচটি তলায় বিভক্ত। সম্মুখ ভাগের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত তোরণের প্রবেশদ্বার হইতে অভ্যন্তরে যাইবার পথ ১১৩ ফুট লম্বা এবং ২৪ ফুট উচ্চ খিলানে ঢাকা। ইহার দুই ধারে রক্ষীদের কক্ষ। এইটিই দুর্গের প্রধান তোরণ ছিল এবং সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে নির্মিত হইয়াছিল।

গৌড়দুর্গের পূর্বদিকের তোরণ—লুকোচুরি দরওয়াজা (চিত্র নং ১৭-১৮) একটি গম্বুজের ছাদে ঢাকা এবং সমচতুষ্কোণ কক্ষ (চিত্র নং ১৭-১৮)। কক্ষের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৪২ ফুট, প্রবেশপথের খিলান ৫ ফুট চওড়া। ইহার দুই ধারে পল কাটা ইঁটের স্তম্ভ তিন তলায় বিভক্ত। কক্ষের চারিটি মিনার ছিল সবই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

গৌড়ের আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সমাধির তোরণও উৎকৃষ্ট কারুকার্যের নিদর্শন।

গৌড়ের ফিরোজা মিনার (চিত্র নং ১৯) এই শ্রেণীর স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এটি পাঁচতলায় বিভক্ত এবং ৮৪ ফুট উচ্চ। ইহার সর্বনিম্ন অংশের পরিধি ৬২ ফুট। নীচের তিনটি তলা দ্বাদশ-কোণ-সমন্বিত এবং উপরের দুই তলা গোলাকৃতি। ইঁটের তৈরী এই মিনারের উপরিভাগ পোড়ামাটির নানা নকসার এবং নীল ও সাদা রংয়ের মসৃণ টালি দ্বারা শোভিত। কেহ কেহ মনে করেন যে হাবসী সুলতান সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহই ইহা নির্মাণ করেন। ইহা সম্ভবত দিল্লীর কুতব মিনারের আদর্শে নির্মিত।

হুগলী জিলার ছোট পাণ্ডুয়াতে ফিরোজ মিনার নামে আর একটি ইঁটের মিনার আছে। এটি সম্ভবত চতুর্দশ শতকের প্রথমে নির্মিত হইয়াছিল। ইহা প্রায় ১২০ ফুট উচ্চ এবং পাঁচটি তলায় বিভক্ত। ইহা গোলাকৃতি এবং লম্বালম্বি ভাবে পলকাটা। ইহার উচ্চতা ও নীচের বিশাল ছয় ফুট পরিধির মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় এবং কারুকার্যের অভাবে গৌড়ের ফিরোজ মিনারের সহিত ইহার তুলনা হয় না।

২। মুঘল যুগ

রাজশক্তির সহিত শিল্পের উৎকর্ষের যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের যুগের শিল্পের সহিত মুঘল যুগের শিল্পের তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। মুঘল যুগে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল দিল্লী ও আগ্রায় মুসলমান শিল্পের চরম উৎকর্ষ হইয়াছিল। কিন্তু বাংলা দেশে তখন কোন স্বাধীন রাজশক্তি ছিল না, একজন সুবাদার শাসন করিতেন—কার্যান্তে তিনি বাংলার বাহিরে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেন। উচ্চ কর্মচারীদের সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়, এবং এই অবস্থা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুর্শিদকুলি খাঁর শাসন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সুতরাং বাংলাদেশের প্রতি তাহাদের অন্তরের টান ছিল না। তাহা ছাড়া সুবাদার ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কোটি কোটি টাকা এ দেশ হইতে লইয়া যাইতেন এবং কোটি কোটি টাকা রাজস্ব স্বরূপ বাংলা দেশ হইতে আগ্রা ও দিল্লীতে যাইত। রাজশক্তির ইচ্ছা ও উৎসাহ এবং ধন সম্পদের প্রাচুর্য না থাকিলে কোন দেশেই শিল্পের উন্নতি সম্ভবপর হয় না। মুঘল যুগে বাংলাদেশে পূর্বযুগের তুলনায় এ দুয়েরই অভাব ছিল, সুতরাং শিল্পের উৎকর্ষ বিশেষ কিছুই হয় নাই।

অবশ্য এ যুগেও বহু সংখ্যক মসজিদ, সমাধিভবন, স্তম্ভ ও তোরণ নির্মিত হইয়াছিল; কিন্তু শিল্পের উৎকর্ষ হিসাবে তাহা খুব উচ্চস্থান অধিকার করে না। সুতরাং সংক্ষেপে এই বিভিন্ন শ্রেণীর স্থাপত্য কলার বর্ণনা করিব। এখানে বলা আবশ্যক যে স্থাপত্য-শিল্পে ছোটখাট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইলেও মুঘলযুগে বিশেষ কোন রীতিগত পরিবর্তন দেখা যায় না—সুলতানী আমলের শিল্পের ধারা মোটামুটি অব্যাহতই ছিল। বিশেষ প্রভেদ এই যে ইঁট, পাথর বা পোড়া মাটির ফলকে খোদিত ভাস্কর্যের পরিবর্তে চূণের পলস্তারাদ্বারা বাহিরের দেয়ালের শোভাবর্ধন করা হইত।

(ক) মসজিদ

এ যুগের সর্বপ্রাচীন উল্লেখযোগ্য মসজিদ পুরাতন মালদহে অবস্থিত। এই জমি মসজিদ ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। ইহা ইঁটের তৈয়ারী, দৈর্ঘ্যে ৭২ ফুট ও প্রস্থে ২৭ ফুট। ইহার দুইটি বিশেষত্ব আছে।

প্রথমত, পূর্বদিকের সম্মুখভাগে মধ্যকার খানিক অংশ সম্মুখে প্রসারিত।

ইহার দুই পাশে দুইটি ছোট মিনার এবং মধ্যখানে খিলানযুক্ত প্রবেশপথের দুইধারে ছোট দেয়াল। এই খিলানের তলদেশ সমতল নহে—ছোট ছোট তরঙ্গিত পলকাটা (Cusp)।

দ্বিতীয়ত, প্রসারিত অংশের পরট (Parapet) অন্য দুই অংশের পরট অপেক্ষা উচ্চ। ইহার ছাদ অনেকটা ছোট নৌকা বা গরুর গাড়ীর ছইয়ের আকৃতি। দুই পাশের নিম্নতর অংশের ছাদ নীচু গম্বুজের মত। এই দুই অংশের খিলানযুক্ত প্রবেশ-পথও মধ্যকার প্রবেশ পথ অপেক্ষা নীচু।

ঢাকার অল্লকুরি মসজিদ সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষভাগে নির্মিত। ইহা সুলতানী আমলের প্রথম শ্রেণীর ন্যায় একটি মাত্র গম্বুজে ঢাকা একটি সমচতুষ্কোণ ক্ষুদ্র কক্ষ। ইহার তিনটি বিশেষত্ব। প্রথমত, ইহা একটি উচ্চ ও প্রশস্ত অধিষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত, ইহার চারিদিকের মধ্যকার অংশই ঈষৎ প্রসারিত। তৃতীয়ত, চারিকোণের চারিটি স্তম্ভই কক্ষের দেয়াল ছাড়াইয়া অনেকটা উঁচুতে উঠিয়াছে। এগুলি পাঁচটি তলায় বিভক্ত এবং তাহার উপরে একটি ছত্রী।

ঢাকার লালবাগের মসজিদে পূর্বোক্ত প্রথম ও তৃতীয় বিশেষত্বটি বর্তমান। তবে ইহার ছাদে তিনটি গম্বুজ এবং গম্বুজগুলির গাত্রে পাতাকাটা নকসা এবং উপরে একটি চূড়া। ইহা দৈর্ঘ্যে ৬৫ ফুট ও প্রস্থে ৩২ ফুট।

ঢাকার নিকটবর্তী সাতগম্বুজ মসজিদ দৈর্ঘ্যে ৫৮ ফুট ও প্রস্থে ২৭ ফুট। ইহার চারি কোণের স্তম্ভগুলির ভিতরে ফাঁপা ও মাথায় একটি করিয়া গম্বুজ। ছাদের তিনটি গম্বুজ লইয়া মোটমাট সাতটি গম্বুজ।

ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীনে এগারসিন্দুর গ্রামে ঈশাখানের দুর্গ ছিল। এখানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মসজিদ আছে। শাহ মুহম্মদের মসজিদ আকারে ক্ষুদ্র (৩১ × ৩২ ফুট) এবং সমসাময়িক ঢাকার পূর্বোক্ত অল্লকুরি মসজিদের অনুরূপ। কিন্তু মসজিদটি ইঁটের হইলেও ইহার সম্মুখের অঙ্গন শান বাঁধানো। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহার প্রবেশদ্বার ঠিক একখানি দোচালা ঘরের আকৃতি (২৫ × ১৪ ফুট)। মুর্শিদাবাদের নিকটে মুর্শিদকুলি খাঁ কর্তৃক ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে নির্মিত কাটরা মসজিদ একটি বৃহৎ সমচতুষ্কোণ অঙ্গনের (১৬৬ ফুট) মধ্যস্থলে এক অধিষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৩০ ফুট ও প্রস্থে ২৪ ফুট। ইহার চারিদিকে প্রায় ২০ গজ উচ্চ

চারিটি বিশাল অষ্টকোণ মিনার ছিল। অভ্যন্তরস্থিত ৬৭টি ঘোরান সিঁড়ি দিয়া মিনারের চূড়াতলে ওঠা যায়। অঙ্গনের চারিপাশে দুই তলায় বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর। ১৪টি সোপান বাহিয়া অঙ্গনে উঠিতে হয়। এই সোপানের নিম্নে মুর্শিদকুলি খাঁর সমাধি-কক্ষ। অনেকগুলি হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার উপকরণ দিয়া এই মসজিদ নির্মিত হয়।

এই মসজিদগুলি ছাড়া ঢাকায় কর্তলব খানের মসজিদ, নারায়ণগঞ্জের বিবি মরিয়মের মসজিদ, ময়মনসিংহ জিলার আতিয়ায় জামি মসজিদ ও গুরাইয়ের মসজিদ, এবং চট্টগ্রামের বায়াজিদ দরগা ও কদম-ই-মুবারিক মসজিদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(খ) সমাধি-ভবন, তোরণ-কক্ষ ও মিনার

গৌড়ে পূর্বোক্ত কদম রসুল নামক সৌধের পাশে ইষ্টক নির্মিত নাতিবৃহৎ একটি গৃহ আছে (৩১×২২ ফুট), ইহা ঠিক একখানি দোচালা ঘরের অনুকৃতি। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এটি ফৎ খানের সমাধি এবং সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি নির্মিত। আবার কেহ বলেন যে ইহা রাজা গণেশের সময়কার একটি হিন্দু মন্দির, কারণ ঘরটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং ইহার চাল হইতে শিকলে ঘণ্টা বাঁধার জন্য একটি হুকের চিহ্ন দেখা যায়। ঘরটির তিনদিকে তিনটি দরজা আছে।

ঢাকার লালবাগ কিল্লার মধ্যে পরীবিবির সমাধি-ভবন আছে। বাহিরের গঠনপ্রণালী লালবাগের মসজিদের মত। তবে সমতল ছাদের উপরে তামার একটি কৃত্রিম গম্বুজ আছে অর্থাৎ ইহার নীচে কোন খিলান নাই। এককালে ইহা সোনার গিল্টি করা ছিল। অভ্যন্তর ভাগে নয়টি কক্ষ আছে। ঠিক মাঝখানে সমচতুষ্কোণ সমাধি-কক্ষ (১৯ ফুট), চারিকোণে চারিটি সমচতুষ্কোণ কক্ষ (১০ ফুট) এবং সমাধিকক্ষের চারিপাশে চারিটি প্রবেশ-কক্ষ (২৫×১১ ফুট)। কেবলমাত্র দক্ষিণদিকের কক্ষই এখনকার প্রবেশ পথ। ইহার চৌকাঠ পাথরের এবং দরজা চন্দন কাঠের। অন্য তিন দিকের দরজায় সুন্দর মার্বেলের জালি। সমাধি-কক্ষের দেয়াল সাদা মার্বেল পাথরের এবং মেজে ছোট ছোট নানা নক্সার কালো মার্বেল পাথরের খণ্ড দিয়া মণ্ডিত। সমাধি-কক্ষের মধ্যখানে মার্বেল পাথরের কবর—ইহার তিনটি ধাপের উপর লতাপাতা উৎকীর্ণ। সব

কক্ষের দরজাতেই চৌকাঠ, কোন খিলান নাই। ইহা এবং ছাদের অভ্যন্তর ভাগের নির্মাণপ্রণালী হিন্দু শিল্পের প্রভাব সূচিত করে।

কক্ষের বিন্যাসপ্রণালী আগ্রা ও দিল্লীর সৌধের অনুরূপ। মোটের উপর এই সমাধি-সৌধের সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য বাংলাদেশের শিল্পে খুবই অপরিচিত—ইহার গঠন প্রণালীও বাংলাদেশের গঠন প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র। লোকপ্রবাদ এই যে নবাব শায়েস্তা খাঁ তাঁহার কন্যা পরীবিবির এই সমাধি-সৌধ নির্মাণ করেন।

মুঘল যুগের অনেকগুলি তোরণ-কক্ষ বেশ কারুকার্যখচিত। গৌড়ের দুর্গের দক্ষিণ দিকের তিনতলা বৃহৎ (৬৫ ফুট) তোরণটি শাহ্ সুজা আনুমানিক ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন। ইহার অল্পকাল পরেই (১৬৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত ঢাকার লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ তোরণটি এখনও মোটামুটি ভালভাবেই আছে। মুর্শিদাবাদের খুসবাগে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব আলিবর্দি ও সিরাজউদ্দৌল্লার কবর তিনটি প্রাচীর দিয়া ঘেরা। ইহার প্রবেশ পথে একটি তোরণ কক্ষ আছে।

মুঘলযুগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য স্তম্ভ নিমাসরাই মিনার। ইহা ঠিক গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত। একটি উচ্চ অষ্ট কোণ মঞ্চের উপর এই মিনারটি প্রতিষ্ঠিত। মঞ্চটির প্রতিদিক ১৮ ফুট দীর্ঘ এবং কয়েকটি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে হয়। মঞ্চের ভিতরে ছোট ছোট খিলানযুক্ত কক্ষ আছে; এগুলি সম্ভবত প্রহরীদের বাসস্থান ছিল। মিনারটি গোল এবং ক্রমশঃ ছোট হইয়া উপরে উঠিয়াছে; ইহার পাদদেশের ব্যাস প্রায় ১৯ ফুট। ইহার চূড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন যে অংশ আছে তাহার উচ্চতা ৬০ ফুট। মাঝখানে একটি ছজ্জ অর্থাৎ গোল প্রস্তরখণ্ড চারিদিকে একটু বাড়ান থাকায় মিনারটি দুইভাগে বিভক্ত। ইহার ঠিক উপরেই আলো বাতাস প্রবেশের জন্য একটি গবাক্ষ ছিদ্র। অভ্যন্তরে একটি ঘোরান সিঁড়ি দিয়া চূড়ায় ওঠার ব্যবস্থা আছে। মিনারের গায়ে গজদন্তের অনুকারী বহু প্রস্তর-শলাকা বিদ্ধ করা আছে—প্রত্যেকটি প্রায় আড়াই ফুট লম্বা। ইহা সম্ভবত পর্যবেক্ষণ স্তম্ভের কাজ করিত অর্থাৎ কোন বিপদ বা শত্রুর আক্রমণ আসন্ন হইলে ইহার চূড়ায় উঠিয়া আগুন জ্বালাইয়া সঙ্কেত করা হইত। গৌড় বা ছোট পাণ্ডুয়ার ফিরোজ মিনারের সহিত এই মিনারের বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। কিন্তু ফতেপুর শিক্রীতে সম্রাট আকবর নির্মিত হিরণ মিনারের সহিত ইহার খুব সাদৃশ্য দেখা যায়। সম্ভবত হিরণ মিনারের অনুকরণে এবং তাহার অল্পকাল পরেই নিমাসরাই মিনার নির্মিত হইয়াছিল।

৩। মধ্যযুগের রাজপ্রাসাদ

মধ্যযুগে সুলতানদের প্রাসাদ ও ধনীগণের সুরম্য হর্ম্যের কোন নিদর্শনই নাই। পঞ্চদশ শতকের প্রথমে লিখিত চীনদেশীয় পর্যটকের বর্ণনায় রাজধানী পাণ্ডুয়ায় সুলতানের প্রাসাদের বর্ণনা আছে। দরবার কক্ষের পিত্তল মণ্ডিত স্তম্ভগুলিতে ফুল ও পশুপক্ষীর মূর্তি খোদিত ছিল। চুনকাম করা ইটের তৈরী বাড়ী খুব উঁচু ও প্রকাণ্ড ছিল। তিনটি দরজা পার হইয়া গেলে প্রাসাদের অভ্যন্তরে নয়টি অঙ্গন দেখা যাইত।[১] দরবার কক্ষের দুই দিকের বারান্দা এত দীর্ঘ ও প্রশস্ত ছিল যে এক সহস্র অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, বর্মে আচ্ছাদিত অশ্বারোহী এবং ধনুর্বাণ ও তরবারি হস্তে পদাতিকের সমাবেশ হইতে পারিত। অঙ্গনে ময়ূরপুচ্ছের তৈরী ছত্র হস্তে লইয়া একশত অনুচর দাঁড়াইত এবং বিরাট দরবার কক্ষে হস্তীপৃষ্ঠে ১০০ সৈন্য থাকিত। আঙ্গিনার সম্মুখে কয়েক শত হস্তী সারি দিয়া রাখা হইত।

কিন্তু সুলতানী আমলের পর যখন বাংলা দেশ মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুবায় পরিণত হইল, তখন এ সকল কিছুই ছিল না। ট্যাভার্ণিয়র ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার রাজধানী ঢাকায় আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে শাসনকর্তা উঁচু দেয়াল দিয়া ঘেরা একটা ছোট কাঠের বাড়ীতে থাকেন। বেশীর ভাগ তিনি ইহার আঙ্গিনায় তাঁবুতে বাস করেন। সমসাময়িক গ্রন্থে প্রকাণ্ড বাড়ী, বাগান প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে—কিন্তু বিস্তৃত বর্ণনা নাই। বাড়ীগুলি সাধারণত ইটের, কাঠের বা বাঁশের তৈরী হইত। কিন্তু ইহা অনেক সময় বিচিত্র কারুকার্যে খচিত হইত। আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে খগরঘাটার বাদশাহী কর্মচারীরা ১৫০০ টাকা খরচ করিয়া এক একটি বাংলো তৈরী করিত এবং বাঁশের তৈরী বাড়ীতে অনেক সময় পাঁচ হাজার টাকারও বেশী খরচ হইত। ৺দীনেশচন্দ্র সেন এইরূপ একখানি খড়ের ঘরের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তাহাতে খরচ পড়িয়াছিল ১২,০০০ কাহারও মতে ৩০,০০০ টাকা।[২]

১। বিভিন্ন চীনা পর্যটক প্রাসাদের বর্ণনা করিয়াছেন। একটি বর্ণনায় 'তিনটি দরজা ও নয়টি অঙ্গনের' উল্লেখ আছে। কিন্তু অনুরূপ আর একটি বর্ণনায় সেই স্থলে আছে 'ভিতরের দরজাগুলি তিনগুণ পুরু এবং প্রত্যেকের নয়টি পাল্লা (panels)'। সম্ভবত শেষের বর্ণনাটিই সত্য। (*Visva-Bharati Annals*, I. pp. 130, 121, 126)

২। বৃহৎ বঙ্গ, ৫৬০-৬১ পৃষ্ঠা।

৪। মধ্যযুগের হিন্দু শিল্প

(ক) মন্দির

হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই শিল্প ধর্মভাবের উপরই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। মুসলমানদের মসজিদ ও সমাধি-ভবন তাহাদের শিল্পের প্রধান ও সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। হিন্দু শিল্পও মন্দির এবং দেবদেবীর মূর্তি ও ছবির মধ্য দিয়াই প্রধানত আত্মপ্রকাশ ও উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইসলামের নির্দেশ অনুসারে হিন্দু মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করাই মুসলমানের কর্তব্য ও পুণ্যার্জনের অন্যতম উপায়। কার্যত যে মুসলমানেরা ভারতে এই নীতি পালন করিয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে সিন্ধুদেশ বিজয়ী মুহম্মদ বিন কাশিম হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ তৈরী করেন। সহস্র বৎসর পরে ঔরঙ্গজেবও ভারতের বৃহত্তর পটভূমিতে ঠিক সেই নীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। বাংলাদেশেও ঠিক ঐ নীতিই অনুসৃত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতকে অর্থাৎ বাংলাদেশে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে হিন্দুর প্রসিদ্ধ তীর্থ ত্রিবেনীতে এক বা একাধিক বিচিত্র কারুকার্য খচিত হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া জাফর খাঁ গাজি তাহার উপকরণ দিয়া মসজিদও সমাধি-ভবন তৈরী করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান রাজত্বের অবসানে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ কয়েকটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া রাজধানী মুর্শিদাবাদের নিকটে কাটরা মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বাংলার মধ্যযুগের হিন্দু মন্দির বা দেবদেবীর মূর্তির যে বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না তাহাতে আশ্চর্যবোধ করিবার কোন কারণ নাই। তবে ধ্বংস করিবার শক্তিরও একটা সীমা আছে; তাই ঔরংজেবও ভারতকে একেবারে মন্দিরশূন্য করিতে পারেন নাই। বাংলাদেশেও অল্পসংখ্যক কয়েকটি মধ্যযুগের মন্দির এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হয়ত যাহা ছিল তাহার এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র এখনও আছে—সুতরাং ইহা দ্বারা হিন্দু শিল্পের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা যায় না। তবে ইহাও খুবই সম্ভব যে হিন্দুরাও কতকটা অর্থ-সম্পদের অভাবে এবং কতকটা মুসলমানদের হাতে ধ্বংসের আশঙ্কায়, বিশাল মন্দির গড়িতে উৎসাহ পায় নাই। সেজন্য মধ্যযুগে খুব বেশী উৎকৃষ্ট হিন্দু মন্দিরও তৈয়ারী হয় নাই। এই কারণে হিন্দু শিল্পেরও অবনতি হইয়াছিল এবং উৎকৃষ্ট নূতন মন্দিরের সংখ্যাও অনেক কম ছিল। আর যে কয়েকটি তৈয়ারী

১। আদিনা মসজিদ (পাণ্ডুয়া)—সাধারণ দৃশ্য

২। আদিনা মসজিদ—বাদশাহ-কা-তক্ত

৩। আদিনা মসজিদ—বড় মিহ্‌রাব

৪। আদিনা মসজিদ—বড় মিহ্‌রাবের কারুকার্য

৫। আদিনা মসজিদ—ছোট মিহ্‌রাবের ইষ্টক নির্মিত কারুকার্য

৬। একলাখী সমাধিভবন (পাণ্ডুয়া)

৭। নত্তন মসজিদ (গৌড়)

৮। নতুন মসজিদ (গৌড়)—পার্শ্বের দৃশ্য

৬। লত্তন মসজিদ (গৌড়)—ভিতরের দৃশ্য

১০। তাঁতিপাড়া মসজিদ (গৌড়)

১১। বারদুয়ারী মসজিদ (গৌড়)

১২। কদম রসূল (গৌড়)

১৩। কুতুবশাহী মসজিদ (পাণ্ডুয়া)

১৪। কুতুবশাহী মসজিদ (পাণ্ডুয়া)

১৫। দাখিল দরওয়াজা (গৌড়)

১৬। দাখিল দরওয়াজা (গৌড়)—ভিতরের দৃশ্য

১৭। গুমতি দরওয়াজা (গৌড়)

১৮। গুমতি দরওয়াজা (গৌড়)

১৯। ফিরোজ মিনার (গৌড়)

২০। সিদ্ধেশ্বর মন্দির (বহুলাড়া)

২১। হাড়মাসড়ার মন্দির

২২। ধরাপাটের মন্দির

২৩। বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরীর মন্দির (১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত)

২৪। পাটপুরের মন্দির

২৫। জোড়বাংলা মন্দির (বিষ্ণুপুর)

২৬। লালজীর মন্দির (বিষ্ণুপুর)

২৭। কালাচাঁদ মন্দির (বিষ্ণুপুর)

২৮। রাধাশ্যামের মন্দির (বিষ্ণুপুর)

২৬। রাধাবিনোদ মন্দির (বিষ্ণুপুর)

৩০। নন্দদুলালের মন্দির (বিষ্ণুপুর)

৩১। মদনমোহন মন্দির (বিষ্ণুপুর)

৩২। মুরলীমোহন মন্দির (বিষ্ণুপুর)

৩৩। জোড় মন্দির (বিষ্ণুপুর)

৩৪। রাধামাধবের মন্দির (বিষ্ণুপুর)

৩৫। শ্যামরায়ের মন্দির (বিষ্ণুপুর)

৩৬। গোকুলচাঁদের মন্দির (সলদা)

৩৭। মল্লেশ্বরের মন্দির (বিষ্ণুপুর)

৩৮। রাসমঞ্চ (বিষ্ণুপুর)

৩৯। ইষ্টকনির্মিত রথ (রাধাগোবিন্দ মন্দির, বিষ্ণুপুর)

৪০। দুর্গতোরণ (বিষ্ণুপুর)

৪১। রামচন্দ্রের মন্দির (গুপ্তিপাড়া)

৪২। রামচন্দ্রের মন্দির (গুপ্তিপাড়া)—বাহিরের কারুকার্য

৪৩। বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির (গুপ্তিপাড়া)

৪৪। কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির (গুপ্তিপাড়া)

৪৫। আনন্দভৈরবের মন্দির (সোমড়া সুখড়িয়া)

৪৫ ক। সোমড়া সুখড়িয়ার আনন্দভৈরবীর মন্দিরের ভাস্কর্য

৪৬। কান্তনগরের মন্দির (দিনাজপুর)

৪৭। রেখ দেউল (বান্দা)

৪৮। ১ ও ২ নং বেগুনিয়ার মন্দির (বরাকর)

৪৯ ক। শিকার দৃশ্য—জোড়বাংলার মন্দির (বিষ্ণুপুর)
৪৯ খ। টিয়াপাখী—শ্রীধর মন্দির (সোনামুখী)
৪৯ গ। হংসলতা—মদনমোহন মন্দির (বিষ্ণুপুর)

৫০ ক। রাসলীলা
[বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দিরের ভাস্কর্য]।

৫০ খ। নৌকাবিলাস—[বাঁকুড়ার মন্দিরের ভাস্কর্য]

৫১। বাঁকুড়ার বিভিন্ন মন্দিরের পোড়ামাটির অলংকার

৫২ ক। বাঁকুড়ার মন্দিরে পোড়ামাটির ভাস্কর্য

৫২ খ। বাঁকুড়ার মন্দিরের ভাস্কর্য

৫৩। যুদ্ধচিত্র—জোড়বাংলা মন্দির (বিষ্ণুপুর)

ত্রিবেণী হিন্দুমন্দিরের ফলক। (৪৩২ পৃ দ্রঃ)
৫৪। সীতাবিবাহঃ।

৫৫। খরত্রিশিরসোর্ব্বধঃ।

৫৬। শ্রীরামেণ রাবণবধঃ।

৫৭। শ্রীসীতানির্বাসঃ শ্রীরামাভিষেকঃ।

৫৮। ধৃষ্টদ্যুম্নদুঃশাসনয়োর্যুদ্ধঃ।

৫৯। কাঠ-খোদাইয়ের নিদর্শন (বাঁকুড়া)

হইয়াছিল তাহারও কতক প্রাকৃতিক কারণে এবং কতক মুসলমানদের হাতে ধ্বংস হইয়াছে। বাকী যে কয়টি এই উভয়বিধ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া এখনও কোন মতে টিকিয়া আছে তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই হিন্দু শিল্পের পরিচয় দিতে হইবে।

মধ্যযুগে বাংলা দেশের মন্দিরও মুসলমান মসজিদ ও সমাধি-ভবনের ন্যায় প্রধানত ইষ্টক নির্মিত। তবে বাংলার পশ্চিম প্রান্তে মাকড়া (laterite) ও বেলে পাথর (sandstone) পাওয়া যায়। সুতরাং এই দুই প্রকারের পাথরে নির্মিত মন্দিরও আছে।

বাংলা দেশের মধ্যযুগের মন্দিরগুলি দুইটি বিভিন্ন স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত। এই দুইটিকে রেখ-দেউল ও কুটির-দেউল এই দুই সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে।

রেখ-দেউল

রেখ-দেউলের বিবরণ এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে দেওয়া হইয়াছে। উড়িষ্যার সুপরিচিত মন্দিরগুলির ন্যায় সুউচ্চ বাঁকানো শিখরই ইহার বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন হিন্দুযুগের যে কয়টি মন্দির এখনও টিকিয়া আছে তাহার প্রায় সবগুলিই এই শ্রেণীর এবং প্রথম ভাগে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কালক্রমে উড়িষ্যার রেখ-দেউল ক্ষুদ্রতর ও অলঙ্কারবর্জিত হইয়া অনেকটা সরল ও আড়ম্বর-হীন স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত হইত। ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত খিচিং-য়ের মন্দিরগুলি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। বাংলা দেশের মধ্যযুগের রেখ-দেউলেও এই পরিবর্তন অর্থাৎ প্রাচীন অলঙ্কৃত রেখ-দেউলের সরলীকরণ ঘটিয়াছে। হিন্দুযুগে নির্মিত বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের (চিত্র নং ২০) সহিত মধ্যযুগের ধরাপাট অথবা হাড়মাসড়ার মন্দির (চিত্র নং ২১, ২২) তুলনা করিলেই এই পরিবর্তন বুঝা যাইবে। পূর্বোক্ত মন্দিরের বিচিত্র কারুকার্য শেষোক্ত মন্দিরে নাই, কিন্তু উভয়ই যে একই স্থাপত্য-রীতিতে নির্মিত তাহা সহজেই বুঝা যায়।

পুরুলিয়া জিলার অন্তর্গত চেলিয়ামা নামক বর্ধিষ্ণু গ্রামের নিকটবর্তী বান্দা গ্রামে একটি উৎকৃষ্ট বেলে পাথরের রেখ-দেউল আছে (চিত্র নং ৪৭)। ইহাতে অনেক কারুকার্য আছে। ইহার তারিখ নিশ্চিতরূপে জানা যায় না—সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকের কিছু পূর্বে বা পরে ইহা নির্মিত হইয়াছিল। এইটি বাদ দিলে বাংলা দেশে মুসলমান রাজত্বের প্রথম দুই শত বৎসরে নির্মিত কোন হিন্দু-

মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায় না। পরবর্তী দুই শত বৎসরের মধ্যে নির্মিত মাত্র ৪।৫টি মন্দির এখনও আছে। ইহার মধ্যে চারিটি বর্ধমান জিলায়। তিনটি বরাকরের বেগুনিয়া মন্দির (চিত্র নং ৪৮), সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে, এবং গৌরাঙ্গপুরে ইছাই ঘোষের মন্দির সম্ভবত আরও কিছুকাল পরে নির্মিত। এই সব মন্দির এবং কল্যাণেশ্বরীর মন্দির প্রস্তরনির্মিত রেখ-দেউল। ইহার মধ্যে কেবল বরাকরের একটি মন্দির ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে নিমত হইয়াছিল বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায়। অপরগুলি কেহ কেহ হিন্দুযুগের মন্দির বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সম্ভবত এইগুলিও পঞ্চদশ শতকে অথবা তাহার পরে নির্মিত হইয়াছিল ইহাই অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মত। পরবর্তীকালে নির্মিত বাঁকুড়ায় বা মল্লভূমে এই শ্রেণীর যে পাঁচটি মন্দির আছে তাহার বিষয় পরে আলোচনা করিব। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত বীরভূম জিলার ভাণ্ডীশ্বরের প্রস্তর-মন্দিরও একটি রেখ-দেউল। ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত[1] পদ্মাতীরবর্তী রাজাবাড়ীর মঠও এই স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত রেখ-দেউলের প্রচলন ছিল।

কুটির-দেউল

মধ্যযুগে বাংলার অন্যান্য মন্দিরগুলি যে নূতন স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত তাহার বিশেষত্ব এই যে ইহা বাংলাদেশের চির পরিচিত কুটির বা কুঁড়ে ঘরের—অর্থাৎ দোচালা ও চৌচালা খড়ের ঘরের গঠনপ্রণালী অনুসরণ করিয়া নির্মিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে কুটির-দেউল এই সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। এই শ্রেণীর মন্দির ইষ্টক বা প্রস্তরনির্মিত হইলেও চালাগুলির ঊর্ধ্ব মিলনরেখা এবং কার্নিস-গুলি অস্বাভাবিকভাবে খড়ের ঘরের মতই বাঁকানো।

এই মন্দিরগুলি নিম্নোক্ত পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম শ্রেণী—দোচালা

দোচালা খড়ের ঘরের অবিকল অনুকৃতি। কেহ কেহ ইহাকে এক-বাংলা মন্দির বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাকে দোচালা বলাই সঙ্গত মনে হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণী—জোড় বাংলা

পাশাপাশি দুইটি দোচালা। ইহাকে জোড়দোচালা বা জোড়-বাংলা বলা

১। বিংশ শতাব্দীতে নদী গর্ভে নিমজ্জিত।

যাইতে পারে। জোড়-দোচালার পার্শ্ববর্তী সংলগ্ন দুইটি চালার সংযোগরেখার ঠিক মধ্যস্থলে দেয়ালদুইটির উপর একটি শিখর স্থাপন করাই সাধারণ বিধি ছিল।

তৃতীয় শ্রেণী—চৌচালা

চারচালা খড়ের ঘরের মত চারটি দেওয়ালের উপর ত্রিভুজের ন্যায় আকৃতি চারটি সংলগ্ন চালা, উর্ধ্বে একটি বক্র সংযোগরেখা বা একটি বিন্দুতে সংযুক্ত। এখানেও খড়ের চালার কার্নিসের ন্যায় প্রতি চালার নিম্নাংশ বাঁকানো। চারিটি চালার ঢাল (slope) অনেকটা কমাইয়া কেন্দ্রস্থলে একটি শিখর স্থাপন করাই সাধারণ বিধি (চিত্র নং ৩০-৩৪)।

চতুর্থ শ্রেণী—ডবল চৌচালা

নীচের চৌচালার উপর অল্প পরিসর বেদী দ্বারা একটু ব্যবধান করিয়া, ক্ষুদ্রতর আকৃতির অনুরূপ আর একটি চৌচালা স্থাপন করাই এই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য। এই দ্বিতল মন্দিরের মাথায় ত্রিশূল এবং (অথবা) এক বা একাধিক চূড়া থাকত—কখনও বা ক্ষুদ্র সৌধাকৃতি অথবা কার্নিসযুক্ত শিখর থাকিত।

পঞ্চম শ্রেণী—রত্নমন্দির

চৌচালা বা ডবল চৌচালা মন্দিরের মাথায় কেন্দ্রস্থলে একটি বৃহৎ শিখর ব্যতীত প্রতি তলের কার্নিসের প্রতি কোণে এক বা একাধিক ক্ষুদ্রতর শিখর স্থাপন করাই এই শ্রেণীর বিশেষত্ব। মন্দিরের তলের পরিমাণ বাড়াইয়া এবং প্রতি তলের কার্নিসের প্রতি কোণের শিখর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া মন্দিরের মোট শিখরের সংখ্যা পঁচিশ বা ততোধিক করা যাইতে পারে। শিখরের সংখ্যা অনুসারে এই মন্দির-গুলিকে পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, পঁচিশ রত্ন ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এই শ্রেণীর মন্দিরের সাধারণ নাম রত্ন-মন্দির।

মন্দিরের সাধারণ প্রকৃতি

বাংলার কুটির-দেউলের শিখর উড়িষ্যার মন্দিরের জগমোহনের ছাদের মত ক্রম-হ্রস্বায়মান উপর্যুপরি বিন্যস্ত বহুসংখ্যক সমান্তরাল কার্নিসের বিন্যাস দ্বারা গঠিত। এই কার্নিসের সারির উপর আমলক অথবা (এবং) চূড়া স্থাপিত হইত। কার্নিস-গুলির সমান্তরাল রেখার দ্বারা পর্যায়ক্রমে আলোছায়ার সমন্বয়ে অপরূপ সৌন্দর্যসৃষ্টি এই গঠনের বৈশিষ্ট্য। উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ কোণারক মন্দিরের জগমোহন এই শ্রেণীর স্থাপত্যের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সাধারণত মন্দিরের সম্মুখভাগে তিনটি

পত্রাকৃতি (cusped) খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ থাকে। মধ্যে দুইটি স্থূল খর্বাকৃতি স্তম্ভ এবং দুই পার্শ্বে প্রাচীর গাত্রে অর্ধপ্রোথিত দুইটি কুড্যস্তম্ভের শীর্ষদেশের উপর এই খিলানগুলির নিম্নভাগ অবস্থিত। এই খিলানের খানিকটা উপরে এক বা একাধিক কার্নিস থাকিত। অনেক স্থলে মন্দিরের এই অংশও বিচিত্র কারুকার্যে শোভিত হইত।

প্রবেশ পথের ঠিক পরেই অনেক মন্দিরে একটি ঢাকা বারান্দা থাকিত। কখন কখন এই ঢাকা বারান্দা গর্ভগৃহের চারিদিকেই বেষ্টন করিয়া থাকিত। কখনও কখনও এই বারান্দার প্রতি কোণে একটি কক্ষ থাকিত। রত্ন মন্দিরে সম্মুখের বারান্দার কোণের কক্ষ হইতে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি থাকিত।

মন্দিরগুলি সাধারণত অঙ্গন হইতে তিন চারি হাত উচ্চ চতুষ্কোণ ভিত্তি-বেদীর (platform) উপর স্থাপিত হইত। কোথাও উঠিবার সিঁড়ি আছে (হুগলী জিলার বক্‌সায় রঘুনাথ মন্দিরে)। মন্দিরের গর্ভগৃহ সাধারণত চতুষ্কোণ এবং অভ্যন্তরভাগ প্রায়ই অলঙ্কারবর্জিত। কিন্তু কোন কোন স্থলে, যেমন গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবন-চন্দ্রের মন্দিরে (চিত্র নং ৪৩), দেওয়ালগুলি চিত্রিত।

কতকগুলি মন্দির কারুকার্যখচিত টালি বা পোড়ামাটির ফলক (terra-cotta) দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন মন্দিরে এই শ্রেণীর ভাস্কর্য বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ভাস্কর্যগুলির বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লতা পাতা ফুল প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং নানারূপ জ্যামিতিক নকসা প্রভৃতির সম্মিলনে অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই চিত্রগুলি (নং ৪৯-৫৩) হইতে সমসাময়িক জীবনযাত্রা, নরনারীর পোষাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, যানবাহন, তৎকালীন সামাজিক আচারপদ্ধতি, গৃহপালিত নানা পশুপক্ষী প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সবই শিল্পের প্রথাবদ্ধতার পরিচায়ক। নরনারী জীবজন্তু প্রভৃতির আকৃতি পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে খুব উচ্চাঙ্গের শিল্প বলা যায় না। অনেকটা বর্তমানকালের সাধারণ পটুয়া, কুমার প্রভৃতি কারিকরের শিল্পের জ্ঞাতি বলিয়াই মনে হয়, নূতন সৃজন-শক্তির বা সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্তুত লোক-সাহিত্যের সহিত উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের যে সম্বন্ধ এই সমুদয় শিল্পের সহিত গুপ্ত, পাল ও সেনযুগের বাংলাশিল্পের সেই সম্বন্ধ। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে মধ্যযুগে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শিল্প সম্বন্ধেও ঠিক এই মন্তব্য প্রযোজ্য।

বাংলার কুটির-দেউলের স্থাপত্য পদ্ধতি বাংলার বাহিরেও প্রচলিত হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দির উড়িষ্যায় গৌড়ীয় বা বাংলারীতি নামে প্রচলিত। এই দুই শ্রেণীর মন্দির সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দে দিল্লী, রাজপুতানা ও পঞ্জাবেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অন্যান্য শ্রেণীর মন্দিরগুলি বাংলার বাহিরে তেমন আদৃত হয় নাই।

বাংলার কুটির-দেউলগুলির শিল্পরীতি যে বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাংলায় মুসলমান স্থপতিও যে এই শ্রেণীর সৌধ নির্মাণ করিয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা তাহাদের সাধারণ স্থাপত্যরীতির ব্যতিক্রম। নিছক অভিনবত্বের জন্যই কদাচিৎ বাংলার মুসলমানেরা এবং বাংলার বাহিরের শিল্পীরা এই রীতির অনুসরণ করিয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সম্ভবত বাংলায় দোচালা ও চৌচালা খড়ের ঘরই প্রথমে দেবালয়রূপে ব্যবহৃত হইত, যেমন এখনও হয়। পরে যখন ইষ্টক বা প্রস্তর উপকরণস্বরূপ ব্যবহৃত হইল তখনও দেবালয়নির্মাণের পূর্বরীতিই বহাল রহিল।

রত্নমন্দির বা বহু শিখরযুক্ত কুটির-দেউল বাংলার বাহিরে বড় একটা দেখা যায় না। উড়িষ্যার মন্দিরের জগমোহনের সহিত ইহার সাদৃশ্য পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থের প্রথমভাগে বাংলার ভদ্র দেউলের (৩-৪ নং) যে বর্ণনা আছে তাহা হইতেই যে কালক্রমে এই শ্রেণীর শিখর ও বহু শিখরযুক্ত রত্নমন্দিরের উদ্ভব হইয়াছে এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। অরপচনের মন্দিরের[১] যে অংশ বৌদ্ধ গ্রন্থের পুঁথিতে চিত্রিত হইয়াছে তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় ইহার ছাদ কয়েকটি ক্রম-হ্রস্বায়মান স্তরে গঠিত; প্রতি স্তরের কোণে কোণে একটি শিখর এবং সর্বোপরি একটি বৃহত্তর শিখর। এই কয়টি বৈশিষ্ট্যই বাংলার রত্নমন্দিরে দেখা যায়। সুতরাং অসম্ভব নহে যে বাংলার রত্নমন্দির প্রাচীন শিখরযুক্ত ভদ্র-দেউলেরই শেষ বিবর্তন। তবে মাঝখানে পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে এরূপ কোন মন্দিরের নিদর্শন না থাকায় এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

কুটির-দেউলগুলির যে সমুদয় নিদর্শন এখনও বর্তমান আছে তাহা ষোড়শ শতকের পরবর্তী। এই শতকে এবং তাহার পূর্বেই বাংলায় মুসলমান স্থাপত্যরীতি

১। A. K. Coomaraswamy, ***History of Indian and Indonesian Art***, Pl. LXXI, Fig. 29

অনুযায়ী বহু সৌধ নির্মিত হইয়াছিল ; সুতরাং ইহার কিছু প্রভাব যে কুটির দেউল-গুলিতে পরিলক্ষিত হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার প্রাচীনতর দৃষ্টান্ত না থাকায় এই প্রভাব কিরূপে কতদূর বিস্তৃত হইয়াছে তাহা বলা শক্ত। কেহ কেহ মনে করেন যে প্রবেশ-পথের পত্রযুক্ত খিলান ও হ্রস্বাকৃতি স্থূল স্তম্ভগুলি, পোড়ামাটি-ফলকের অলঙ্কৃতি এবং কার্নিসের কোণার শিখরগুলি নিঃসন্দেহে মুসলমান শিল্পের প্রভাব সূচিত করে। কিন্তু প্রথম দুইটি সম্বন্ধে এই মত গ্রহণ-যোগ্য হইলেও অপর দুইটি সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবসর আছে। পোড়ামাটির উৎকীর্ণ-ফলক এদেশে মুসলমানদের আগমনের পূর্ব হইতেই প্রচলিত। শিখরের সম্ভাব্য উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

মল্লভূমির মন্দির

মধ্যযুগের যে কয়টি উৎকৃষ্ট মন্দির এখনও অভগ্ন আছে তাহার অনেকগুলিই মল্লভূমে অবস্থিত। ইহা একটি আকস্মিক ঘটনা নহে—এই অঞ্চলে হিন্দু মল্ল-রাজারা কার্যত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন এবং মুসলমান রাজশক্তি কখনও এই অঞ্চলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই কারণেই হিন্দুরা মন্দির গড়িয়াছে এবং তাহা রক্ষাও পাইয়াছে। খরস্রোতা দামোদর নদী ও অতি বিস্তৃত শাল গাছের নিবিড় অরণ্য এই ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যটিকে মুসলমান সম্রাটদের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই অঞ্চলের অধিবাসী সাহসী আদিম বন্যজাতি ও বীর মল্লরাজাদেরও এ বিষয়ে কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। মোটের উপর মাঝে মাঝে দিল্লীর বাদশাহ ও বাংলার সুলতানদের অধীনতা নামেমাত্র স্বীকার করিলেও আভ্যন্তরিক শাসনকার্যে যে মল্লভূমের হিন্দু রাজারা স্বাধীন ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বাংলাদেশের এই এক কোণে স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব ছিল বলিয়াই মল্লভূমিতে (বাঁকুড়া জেলা ও পার্শ্ববর্তী স্থানে), বিশেষত মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুরে, এই যুগের অর্থাৎ সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দের বহু হিন্দু মন্দির এখনও টিকিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠা-ফলক হইতে মন্দির নির্মাণের তারিখও জানা যায় (১৬২২ হইতে ১৭৫৪ খ্রীঃ) ; সুতরাং মল্লভূমের মন্দিরগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই প্রথমে দিব।

পুরুলিয়া জিলার বান্দাগ্রামের মন্দিরের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে (৪৬৫ পৃষ্ঠা)। বাঁকুড়া জিলার ঘটগেড়িয়া ও হাড়মাসড়া (চিত্র নং ২১) গ্রামে দুইটি প্রস্তর নির্মিত রেখ-দেউল আছে। ইহার কোনটিই ৪০ ফুটের বেশী উচ্চ নহে এবং মূল মন্দিরটি ছাড়া উড়িষ্যার রেখ-দেউলের ন্যায় জগমোহন, প্রশস্ত অঙ্গন ও প্রাকার প্রভৃতি কিছুই নাই। এই দুইটি মন্দিরই সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দে নির্মিত। ধরাপাট গ্রামের প্রস্তরনির্মিত রেখ-দেউলটি (চিত্র নং ২২) সম্ভবত ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। ইহারও পরবর্তী কালে নিমিত দুইটি রেখ-দেউল বিষ্ণুপুরে আছে। মন্দিরগুলি কোনপ্রকার বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

পুরুলিয়া জিলায় একাধিক প্রথম শ্রেণীর কুটির-দেউল আছে, কিন্তু বাঁকুড়ায় একটিও নাই। তবে বিষ্ণুপুরের দুই তিনটি দেবালয়ের ভোগরন্ধনগৃহ ঠিক দোচালা ঘরের মত।

বিষ্ণুপুরের জোড়-বাংলা মন্দিরটি (চিত্র নং ২৫, ৫৩) গঠন-সৌকর্যে এবং পোড়ামাটির ভাস্কর্যের উৎকর্ষ ও বাহুল্যে বাংলার মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মন্দিরসমূহের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হয়। সাধারণ প্রথাগত গঠনরীতি অনুযায়ী হইলেও এই জোড়-বাংলা মন্দিরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার প্রধান প্রবেশ-পথের খিলান 'তিনটি পত্রাকৃতি নহে। ইহাতে কেবল দক্ষিণ দিকেই একটিমাত্র ঢাকা বারান্দা আছে। গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য দ্বিতীয় দোচালাটির পূর্ব দেওয়ালে নীচু খিলানের একটি পৃথক দরজা আছে। দোচালা দুইটির সংযোগস্থলে যে চতুষ্কোণ চূড়া-সৌধটি আছে তাহা একটি ভিত্তি-বেদীর উপর স্থাপিত এবং এই সৌধের শীর্ষদেশে চৌচালা আকৃতির একটি ছাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকে লিখিত আছে যে শ্রীরাধিকা ও কৃষ্ণের আনন্দের জন্য রাজা শ্রীবীর হাম্বিরের পুত্র রাজা শ্রীরঘুনাথ সিংহ কর্তৃক ইহা ৯৬১ মল্লাব্দে (বাংলা সন ১০৬১, ইংরেজী ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) প্রতিষ্ঠিত হইল। সুতরাং কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাহিনী ভাস্কর্যের প্রধান বিষয়বস্তু হইয়াছে। তাহা ছাড়া রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, পৌরাণিক উপাখ্যান, স্থল ও জলযুদ্ধ এবং নানাবিধ কার্যে ব্যস্ত বহু নরনারী ও পশুপক্ষী প্রভৃতির মূর্তি আছে।

বিষ্ণুপুর শহর ও শহরতলীতে এক শিখরযুক্ত চৌচালা মন্দির বারোটি আছে এবং আরও তিনটি এককালে ছিল। ইহার মধ্যে দুইটি পোড়ামাটির ইটে এবং বাকি কয়টি ল্যাটেরাইট বা মাকড়া পাথরে নির্মিত। ইহাদের মধ্যে লালজীর

মন্দিরটি (চিত্র নং ২৬) মল্লভূমের এই শ্রেণীর মন্দিরগুলির মধ্যে বৃহত্তম। ভিত্তিবেদীর প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ৫৪ ফুট এবং দক্ষিণমুখী মন্দিরটির সম্মুখভাগ প্রস্থে প্রায় ৪১ ফুট। ইহার পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে তিনটি করিয়া তোরণ-যুক্ত প্রবেশপথ ও সংলগ্ন দরদালান আছে। দক্ষিণ দরদালানের দেওয়ালে বহুবর্ণ ফ্রেসকো অঙ্কিত ছিল কেহ কেহ এরূপ অনুমান করিয়াছেন। নীচের খাড়া অংশের চারিদিকে চারিটি খিলানযুক্ত অলিন্দ ও সাতটি করিয়া পগ (লম্বমান উদ্‌গত অংশ) আছে। উপরের অংশে উচ্চাবচ কার্নিসের সমবায়ে নির্মিত শিখর আছে। ইহাও রাধাকৃষ্ণের মন্দির, ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

লালবাঁধের তীরবর্তী কালাচাঁদ মন্দিরে (চিত্র নং ২৭) চারিটি দেওয়ালেই প্রবেশ-তোরণ এবং পূর্বোক্ত মন্দিরের ন্যায় সাতটি পগ ও শিখর আছে। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত রাধাশ্যাম মন্দিরটি (চিত্র নং ২৮) সর্বাপেক্ষা অপ্রাচীন। মাকড়া পাথরের "এত নিপুণ ও এত অধিক সংখ্যক প্রস্তর-অলংকরণ বাঁকুড়া জেলার আর কোন মন্দিরে আছে কিনা সন্দেহ"। রাধাবিনোদ মন্দির (চিত্র নং ২৯) এই শ্রেণীর ইটের মন্দিরের মধ্যে প্রাচীনতম। ইষ্টকনির্মিত মদনমোহনের মন্দিরের (চিত্র নং ৩১) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য খুবই উচ্চ স্তরের। ভিত্তিবেদীর প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট ও মন্দিরের সম্মুখভাগের প্রস্থ ৪০ ফুট; সুতরাং লালজীর মন্দির অপেক্ষা কিছু ছোট। বিষ্ণুপুরের আরও কয়েকটি এই শ্রেণীর মন্দির ভাস্কর্য-মণ্ডিত (চিত্র নং ৪৯-৫৩)।

মল্লভূমের অন্যান্য অংশেও কয়েকটি এই শ্রেণীর মন্দির আছে। ইহাদের মধ্যে পাত্রসায়েরের প্রসিদ্ধ শিবমন্দির ও সাহারজোড়া গ্রামের নন্দদুলালের মন্দিরের শীর্ষে রেখ-দেউল-আকৃতির চূড়া আছে। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে এগুলি পূর্বে রেখ-দেউল ছিল, চৌচালাটি পরে সংযোজিত হইয়াছে। পুরুলিয়া জিলায় একাধিক চৌচালা মন্দির আছে।

মল্লভূমে অল্পসংখ্যক এবং বিশেষত্ববর্জিত কয়েকটি মাত্র ডবল চৌচালা শ্রেণীর মন্দির আছে। ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত সারাকোনের রামকৃষ্ণমন্দিরটি সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। পাঁচালের এই শ্রেণীর শিবমন্দিরটি অতিশয় বিখ্যাত।

রত্নমন্দিরের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়ের পঞ্চরত্নমন্দির (চিত্র নং ৩৫)। এই মন্দিরটিও শ্রীরাধাকৃষ্ণের আনন্দের জন্য রাজা শ্রীরঘুনাথ সিংহ ১৬৪৩ খ্রীঃ অর্থাৎ জোড়-বাংলা মন্দিরের বারো বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠা করেন।

আকৃতিতে খুব বড় না হইলেও পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অলংকরণের অজস্র সমাবেশে ইহা অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হইয়াছে। কেবলমাত্র ঢালু ছাদ ও শিখরগুলি ছাড়া মন্দিরের আর সকল অংশই ভাস্কর্যসজ্জিত। ইহার কেন্দ্রীয় চূড়াটি অষ্টকোণাকৃতি ও প্রান্তবর্তী শিখরগুলির প্রস্থচ্ছেদ চতুষ্কোণ। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য, ভিত্তি-বেদীর অত্যধিক উচ্চতা। এই মন্দিরটি মধ্যযুগের বাংলার হিন্দুশিল্পের একটি অমূল্য সম্পদ। প্রাচীনত্বে এই মন্দিরটি বিষ্ণুপুরে দ্বিতীয়। মাকড়া পাথরে নির্মিত এবং মদনগোপালের নামে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুরের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি আয়তনে মল্লভূমের মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম। সলদা গ্রামের মাকড়া পাথরে নির্মিত গোকুলচাঁদের মন্দির (চিত্র নং ৩৬) পঞ্চরত্ন দেবালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন, কারণ কেহ কেহ মনে করেন যে এইটিই মল্লভূমের সর্বপ্রাচীন দেবালয়।

বিষ্ণুপুরের বসুপল্লীতে নবরত্ন শ্রীধর মন্দির বসু-পরিবারের কোন ব্যক্তি সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দে নির্মাণ করেন।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত সোনামুখীর পঞ্চবিংশতি-চূড় মন্দিরটি প্রতিপন্ন করে যে মল্লভূমের স্থাপত্যশিল্প মধ্যযুগের পরেও একেবারে লুপ্ত হয় নাই।

বাঁকুড়া শহরের দুই মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এক্তেশ্বরের শিবমন্দির খুবই প্রাচীন কিন্তু পুনঃ পুনঃ সংস্কারের ফলে ইহার আদিম আকৃতি সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুরের প্রাচীনতম মল্লেশ্বর মন্দির সম্বন্ধেও একথা খাটে (চিত্র নং ৩৭)। ইহাদের বর্তমান আকৃতি পরিচিত কোন স্থাপত্যশৈলীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

পরম বৈষ্ণব রাজা বীর হাম্বির কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চও (চিত্র নং ৩৮) একটি উল্লেখযোগ্য সৌধ। রাসলীলার সময় বিষ্ণুপুরের যাবতীয় রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ এই সৌধে একত্র করা হইত। যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক ইহার চতুর্দিকস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গন হইতে উৎসব দেখিতে পারে সেই জন্য চৌচালা ছাদে আবৃত এই সৌধের নিম্নাংশ বহু খিলানযুক্ত তিন প্রস্থ দেয়ালে পরিবেষ্টিত। ভিতরের দিক হইতে এই তিনটি দেয়ালের প্রতিদিকে যথাক্রমে ৫, ৮, ও ১০টি প্রশস্ত খিলান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শীর্ষদেশের চারিটি ঢালু চাল পিরামিডের আকৃতিতে ক্রমহ্রস্বায়মান ধাপে ধাপে উপরে উঠিয়া একটি বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। খিলানগুলির ঠিক উপরে এবং পিরামিডের ঠিক নিম্নপ্রান্তের চারি কোণে

চারিটি চারচালা এবং অন্তর্বর্তী স্থানে তিন দিকে চারিটি করিয়া দোচালা নির্মিত হইয়াছিল। এগুলি অলঙ্কারমাত্র, কোন স্থাপত্যপ্রয়োজনে গঠিত নহে।

বিষ্ণুপুরের আর দুইটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন—ইষ্টকনির্মিত রথ (চিত্র নং ৩৯) এবং দুর্গ-তোরণ (চিত্র নং ৪০)।

মল্লভূমের বাহিরে মন্দির

মল্লভূমের বাহিরেও কুটীর-দেউলের পূর্বোক্ত সকল শ্রেণীর নিদর্শনই পাওয়া যায়।

চন্দননগরের নন্দদুলালের মন্দির প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ দোচালা মন্দিরের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ জোড়-বাংলা মন্দিরের বহু নিদর্শন আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১। হুগলী জিলার গুপ্তিপাড়ায় চৈতন্যের মন্দির[১]—ইহার প্রতি দোচালার উপর একটি লোহার শিকের চূড়া, সম্ভবত ১৭শ শতাব্দে নির্মিত।

২। মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বড়নগর নামক স্থানে রাণী ভবানী (১৮শ শতাব্দে) বহু মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে একটি পুষ্করিণীর চারিপাশে চারিটি ইষ্টকনির্মিত জোড়-বাংলা আছে। অর্ধভগ্ন বিশাল ভবানীশ্বর মন্দিরই এখানকার বহুসংখ্যক মন্দিরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।

৩। মহানাদে একটি জীর্ণ জোড়-বাংলা মন্দির আছে।

হুসেন শাহের সময়কার (ষোড়শ শতাব্দী) একটি জোড়-বাংলা মন্দির নাটোরের ৩৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ভবানীপুর গ্রামে ছিল, কিন্তু ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পে ইহা ধ্বংস হয়। রাজা সীতারাম রায় নির্মিত মামুদাবাদের বলরাম মন্দিরেরও এখন কোন চিহ্ন নাই।

মেদিনীপুর জিলায় আরামবাগের নিকটে বালী দেওয়ানগঞ্জ গ্রামে একটি জোড়-বাংলার উপরে একটি নবরত্ন মন্দির স্থাপিত হইয়াছে।

বর্ধমান জিলার গারুই গ্রামে প্রস্তরনির্মিত একটি চৌচালা মন্দির আছে[২]।

১। *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1909, p. 160, Fig. 9

২। Ibid, 153, Fig. 1

অষ্টাদশ শতাব্দের শেষে নির্মিত হুগলী জিলার গুপ্তিপাড়ায় চৌচালা রামচন্দ্র-মন্দিরের শীর্ষদেশের শিখর একটি অষ্টকোণ বাঁকানো কার্নিসযুক্ত ছাদওয়ালা সৌধের অনুকৃতি (চিত্র নং ৪১-৪২)। হুগলী জিলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত বিষ্ণুমন্দির[১] এই শ্রেণীর মন্দিরের অন্যতম নিদর্শন।

চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ ডবল চৌচালা মন্দির বাংলায় সর্বত্র ও বহু সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায় এবং বর্তমান কালে ইহাই হিন্দুমন্দিরের আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে। প্রায় তিন শত বৎসরের পুরাতন কালীঘাটের কালী মন্দির ইহার সুপরিচিত দৃষ্টান্ত। নদীয়া জিলার শান্তিপুর গ্রামে ১৬২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত শ্যামচাঁদের মন্দির সম্ভবত এই শ্রেণীর মন্দিরের মধ্যে বৃহত্তম[২]। অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি উল্লেখযোগ্য।

১। আমতার (হাওড়া) মেলাইচণ্ডীর মন্দির (১৬৪৯-৫০ খ্রীঃ)

২। চন্দ্রকোণার (ঘাটাল, মেদিনীপুর) লালজী মন্দির (১৬৫৫-৫৬ খ্রীঃ)।

৩-৮। শান্তিপুরের গোকুলচাঁদ, গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র (চিত্র নং ৪৩) এবং কৃষ্ণচন্দ্র (চিত্র নং ৪৪), কালনার বৈদ্যনাথ এবং তারকেশ্বর ও উত্তরপাড়ার শিবমন্দির।

এই শ্রেণীর মন্দিরে সাধারণত কোন ভাস্কর্যের নিদর্শন থাকে না। অষ্টাদশ শতাব্দে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির একসঙ্গে সারি সারি নির্মাণ করার প্রথা দেখা যায়। রাজ্মার দ্বাদশ মন্দির ও বর্ধমান জিলার নবাবহাটলিঙ্গে আমবাগানের চতুর্দিকে একটি কেন্দ্রীয় মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া নির্মিত ১০৮টি মন্দির ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বলাবাহুল্য সংখ্যাধিক্যহেতু এই সকল মন্দিরে কোনরূপ বিশেষত্ব থাকে না।

রত্নমন্দির-শৈলীটি মল্লভূমে খুব বেশী প্রচলিত ছিল না। ভাগীরথীর তীরবর্তী প্রদেশে ইহা খুব বেশী সংখ্যায় দেখা যায়। তবে মল্ল রাজবংশের পতনের পর বর্ধমান রাজ্যের সমৃদ্ধির দিনে বহুচূড় ভাস্কর্যে অলঙ্কৃত রত্নমন্দির-শৈলী প্রবর্তিত হয়।

হুগলী জিলার সোমড়া-সুখড়িয়া গ্রামের পঁচিশ চূড়াবিশিষ্ট আনন্দ-ভৈরবীর মন্দির (চিত্র নং ৪৫) রত্নমন্দিরের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই ত্রিতল মন্দিরের প্রথম তলে প্রতি কোণে তিনটি, দ্বিতীয় তলের প্রতি কোণে দুইটি, তৃতীয় তলের

১। দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৬৩০ (খ) পৃষ্ঠা।

২। *J. A. S. B.* 1909, p. 15=, Fig. 8.

প্রতি কোণে একটি এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীয় শিখরটি লইয়া মোট ২৫টি শিখর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বর্ধমান জিলার কালনা গ্রামে পঁচিশ রত্ন লালজীর মন্দির[১] ও কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির মধ্যযুগের অনতিকাল পরেই ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়।

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণায় রঘুনাথপুরে বুড়া শিবের মন্দিরটি সতের রত্ন, কিন্তু ইহার নির্মাণকাল সঠিক জানা যায় না।

ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা কর্তৃক নির্মিত নবরত্ন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ খুলনা জিলার সাতক্ষীরার নিকট দামরাইল গ্রামে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

দিনাজপুর হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত ১৭০৪-২২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত কান্তনগরের বিচিত্র কারুকার্য-খচিত নবরত্ন মন্দির (চিত্র নং ৪৬) দেশীয় ও বিদেশীয় লেখকগণের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। ইটের এই মন্দিরটির গাত্রে পোড়ামাটির ফলকে যে সকল মূর্তি ও দৃশ্য খোদিত আছে তাহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় বাঙালীর জীবন-যাত্রা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার প্রতিফলিত হইয়াছে। শিল্পের দিক হইতে প্রাচীন হিন্দুযুগের শিল্প অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও ইহার কঠোর শ্রমসাধ্য বহু জীবন্ত আলেখ্য বিশেষ প্রশংসনীয়[২]। ফার্গুসনের এই মন্তব্য এ যুগের আরও কয়েকটি মন্দির সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। পঞ্চরত্ন মন্দিরের অনেক নিদর্শন আছে—যথা, চন্দ্রকোণায় ১৬৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত রামেশ্বরের মন্দির, বিক্রমপুরের অন্তর্গত জপসায় লালা রামপ্রসাদ রায় কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথম পাদে নির্মিত মন্দির, এবং প্রায় সমসাময়িক রাজা সীতারাম রায়ের (অধুনা ভগ্ন) কৃষ্ণমন্দির (১৭০৩-৪ খ্রীঃ)।

সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত দুইটি মন্দিরের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব—মুর্শিদাবাদ জিলায় বড়নগরে রাণী ভবানীকৃত শিখরযুক্ত অষ্টকোণ মন্দির এবং চারিটি দোচালা মন্দিরের সমবায়ে গঠিত মন্দির।

১। *J. A. S. B.*, 1909, P. 153, Fig.7

২। James Fergusson, *History of Indian and Eastern Architecture*, Vol. II, p. 161.

চিত্র বিদ্যা

মধ্যযুগের অনেক পুঁথিতে এবং তাহাদের কাঠের মলাটে ছবি আছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

১। কালচক্রতন্ত্র (১৪৪৩ খ্রীঃ)।

২। হরিবংশ (১৪৭৯ খ্রীঃ)। বর্তমানে এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত।

৩। ভাটপাড়ায় প্রাপ্ত ভাগবত পুঁথি (১৬৮৯ খ্রীঃ)।

৺দীনেশচন্দ্র সেন মন্দির-গাত্র, পুঁথি, পুঁথির মলাটে রঞ্জিত চিত্রপট প্রভৃতি হইতে বহু বৈষ্ণব চিত্রের প্রতিকৃতি দিয়াছেন (বৃহৎ বঙ্গ, ৪৩৮ ও ৪৩৯ এবং ৬৯৬ ও ৬৯৭ পৃষ্ঠার মধ্যে)। তিনি এগুলিকে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই ছবিগুলি খুব উন্নত শিল্পের পরিচায়ক নহে। অনেকটা পটের ছবির মত। তবে লোক-সংগীতের মত এই সমুদয় লোক-শিল্পেরও ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

পরিশিষ্ট

কোচবিহার ও ত্রিপুরা

১। উপক্রমণিকা

বহু প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গদেশের উত্তর ও পূর্ব প্রান্তে বিভিন্ন মোঙ্গল জাতীয় লোক বাস করিত। তাহাদের মধ্যে অনেকে ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম ও বাংলাভাষা গ্রহণ করে। মধ্যযুগে ইহারা যে সমুদয় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কোচবিহার ও ত্রিপুরাই সর্বপ্রধান এবং ইহাদের কতকটা নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলা দেশের সহিত প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিক সম্বন্ধ খুব বেশি না থাকিলেও মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে কোচবিহার ও ত্রিপুরার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কারণ প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশে মুসলমানদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেও কোচবিহার ও ত্রিপুরা যথাক্রমে বঙ্গদেশের উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূভাগে বহুদিন পর্যন্ত স্বাধীন হিন্দুরাজ্যরূপে বিরাজ করিত এবং শক্তিশালী মুসলমান রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই দুই রাজ্যেই ফার্সীর পরিবর্তে বাংলা ভাষাতেই রাজকার্য নির্বাহ হইত। এই দুই রাজ্যের হিন্দুধর্ম ও বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থে সম্ভবপর নহে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে মধ্যযুগে বাংলাদেশে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি যে সমুদয় ধর্মমত ও পূজাপদ্ধতি দেখা যায় তাহা মোটামুটি-ভাবে এই দুই রাজ্যেই প্রচলিত ছিল। প্রধানত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দুই রাজ্যেই বাংলা সাহিত্যের খুব উন্নতি হইয়াছিল। এই বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশই সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদির অনুবাদ অথবা তদবলম্বনে রচিত। ইহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক আখ্যানও আছে। এ বিষয়ে ত্রিপুরা রাজ্য কোচবিহার অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর ছিল। ত্রিপুরার রাজমালার ন্যায় ধারাবাহিক ঐতিহাসিক কাহিনী এবং চম্পকবিজয়ের ন্যায় ঐতিহাসিক আখ্যানমূলক কাব্য কোচবিহারে নাই। তবে রাজবংশাবলী আছে। কিন্তু এই এক বিষয়ে কোচবিহা-রের সাহিত্য ন্যূন হইলেও ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ এই সাহিত্যে অনেক বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় রামায়ণ মহভারতের অনুবাদ নাই, কোচবিহারে আছে।

পুরাণাদির অনুবাদও সংখ্যার দিক দিয়া কোচবিহারেই বেশি। লোকের মনে ধর্মভাব জাগ্রত করাই ছিল এই সকল অনুবাদের উদ্দেশ্য। মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি এই দুই রাজ্যের কোনটিতেই বেশি নাই। এই দুই রাজ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যেরও অনুশীলন হইত। অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বাংলার মুসলমান সুলতান ও ওমরাহের উৎসাহেই বাংলা সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই গ্রন্থের ৩৪৮-৪৯পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। কোচবিহার ও ত্রিপুরার রাজগণের অনুগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের কি উন্নতি হইয়াছিল তাহার বিবরণ জানিলে উল্লিখিত মতবাদের নিরপেক্ষ বস্তুতান্ত্রিক আলোচনা করা সম্ভবপর হইবে।

কোচবিহার ও ত্রিপুরার রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। কোচবিহারের প্রথম রাজা বিশু অথবা বিশ্বসিংহ চন্দ্রবংশীয় হৈহয় রাজকুলে এবং শিবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন; এই বংশীয় দ্বাদশ রাজকুমার পরশুরামের ভয়ে, 'মেচ জাতীয়' এই পরিচয়ে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার রাজমালার আরম্ভ এইরূপ।

"চন্দ্রবংশে মহারাজা যযাতি নৃপতি।
সপ্তদ্বীপ জিনিলেক এক রথে গতি ॥
তান পঞ্চসুত বহু গুণযুত গুরু।
যদুজ্যেষ্ঠ তুর্বসু যে দ্রুহ্য অনু পুরু ॥

দ্রুহ্য কিরাত রাজ্যের রাজা হইলেন। দ্রুহ্যর বংশে দৈত্য রাজার পুত্র ত্রিপুর স্বীয় নামানুসারে রাজ্যের নাম (কিরাত) পরিবর্তন করিয়া ত্রিপুর রাখিলেন।

বলা বাহুল্য যে এই সমুদয় কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। এই দুইটি রাজ্যের আদিম অধিবাসী ও রাজবংশ যে মঙ্গোলীয় জাতির শাখা এবং বাঙালী হিন্দুর সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশ হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উভয় রাজ্যের রাজারাই যে বাংলা দেশ হইতে বহু হিন্দুকে নিয়া নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াই ইহার পথ সুগম করিয়াছিলেন তাহা এই দুই রাজ্যের কাহিনীতেই বর্ণিত হইয়াছে।

২। কোচবিহার

কোচবিহার নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে

কোচ জাতির বাসস্থান বা বিহারক্ষেত্র হইতে কোচবিহার নামের উৎপত্তি—ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন হিন্দুযুগে এই অঞ্চল প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলার মুসলমান রাজগণ, বখতিয়ার খিলজী (পৃঃ ৪), গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ শাহ (পৃঃ ৭), এবং ইখতিয়ারুদ্দীন যুজবক তুগরল খান (পৃঃ ১২) কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই শতাব্দেই শান জাতীয় আহোমগণ ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকার পূর্বাংশ অধিকার করে এবং ইহার নাম হয় আসাম। এই সময়েই কামরূপ রাজ্যের পশ্চিমাংশে এক নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান কোচবিহার শহরের সন্নিকটে কামতা বা কামতাপুর নামক স্থানে ইহার রাজধানী ছিল এবং এই জন্য ইহা কামতা রাজ্য নামে পরিচিত। বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৪৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপ ও কামতা জয় করেন (.৭৮ পৃঃ)।

কামতা ও কামরূপ রাজ্য পতনের পরে ভুঁঞা উপাধিধারী বহু নায়ক এই অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাদেরই একজন, কোচজাতীয় হরিয়া মণ্ডলের পুত্র বিশু, অন্য নায়কদিগকে পরাজিত করিয়া আনুমানিক ১৫১৫ (মতান্তরে ১৫৩০) খ্রীষ্টাব্দে কামতায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার রাজধানীর নাম হইল কোচবিহার (কুচবিহার)। বিশু রাজা হইয়া 'বিশ্বসিংহ' এই নাম গ্রহণ করেন এবং ঐ অঞ্চল হইতে মুসলমান প্রভাব সম্পূর্ণরূপে দূর করেন। তিনি ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীর দিয়া অগ্রসর হইয়া পূর্বে গৌহাটি পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহার রাজ্যের পশ্চিম সীমা ছিল করতোয়া নদী। বিশ্বসিংহ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন। মুসলমানেরা কামতেশ্বরীর মন্দির ধ্বংস করিয়াছিল, বিশ্বসিংহ উহা পুনরায় নির্মাণ করেন এবং বিদেশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ আনাইয়া স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আনুমানিক ১৫৪০ (মতান্তরে ১৫৫৫) খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বসিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র মল্লদেব নরনারায়ণ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং ভ্রাতা শুক্লধ্বজকে মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে পূর্বআসামে সৈন্য চলাচল করিবার পথ অতি দুর্গম ছিল। আহোমদিগকে পরাজিত করিবার জন্য রাজা তাঁহার ভ্রাতা গোঁহাই (গোসাই) কমলকে

মধ্যযুগে কোচবিহার রাজ্য

সৈন্য ও যুদ্ধসম্ভার প্রেরণের উপযোগী একটি পথ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে কমল ভুটানের পর্বতমালা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী ভূভাগের উপর দিয়া কোচবিহার হইতে সুদূর পরশুকুণ্ড (মতান্তরে নারায়ণপুর) পর্যন্ত প্রায় ৩৫০ মাইল দীর্ঘ যে রাস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার কোন কোন অংশ এখনও আছে এবং ইহা "গোঁসাই কমল আলী" নামে পরিচিত। নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরস্থ এই পথে গোয়ালপাড়া ও কামরূপের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন। আহোমদিগকে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহারা ডিক্রাই বা ডিহং নদী পর্যন্ত পৌঁছিলে এই নদীর তীরে দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ হয়। 'দরংরাজ-বংশাবলী' অনুসারে সাতদিন যুদ্ধের পর আহোমগণ পলায়ন করে এবং নরনারায়ণ আহোম রাজধানী অধিকার করেন। কিন্তু আহোম বুরঞ্জীর মতে কোচ সৈন্য প্রথম প্রথম জয় লাভ করিলেও পর পর দুইটি যুদ্ধে হারিয়া পশ্চাৎপদ হয়। এই যুদ্ধে শুক্লধ্বজ বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করায় 'চিলা রায়' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। চিলের মত ছোঁ মারিয়া অকস্মাৎ শত্রু সৈন্য বিপর্যস্ত করার জন্যই সম্ভবত তাঁহার এইরূপ নামকরণ হয়। কাহারও কাহারও মতে তিনি অশ্বপৃষ্ঠে ভৈরবী নদী পার হইয়াছিলেন বলিয়া 'চিলা রায়' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

কোচরাজ আহোমদিগকে পরাজিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কাছাড়, মণিপুর, জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা, খয়রাম, দিমরুয়া, শ্রীহট্ট প্রভৃতি দেশেও সামরিক অভিযান করিয়াছিলেন এবং এই সমুদয় দেশের রাজগণের অনেকেই পরাজিত হইয়া কোচরাজকে কর দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই প্রকারে ষোড়শ শতাব্দের শেষার্ধে কোচবিহার রাজ্য ভারতের পূর্ব সীমান্তে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়।

এই সময়ে বাংলাদেশের অধিকার লইয়া পাঠান ও মুঘলেরা ব্যস্ত থাকায় কোচরাজ সেদিক হইতে কোন বাধা পান নাই। কিন্তু কররাণী বংশ বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে সুলেমান কররাণী কোচরাজ্য আক্রমণ করেন। ইহার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে (১২৪ পৃঃ)। কিন্তু অনতিকাল পরেই বাংলাদেশে পাঠানদের ধ্বংসের উপর মুঘল রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। নরনারায়ণ মুঘলের সহিত মৈত্রী স্থাপনের জন্য আকবরের রাজসভায় বহু উপঢৌকনসহ এক দূত পাঠান এবং মুঘলরাজ ও নরনারায়ণ দুই সমকক্ষ রাজার ন্যায় সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন (১৫৭৮ খ্রীঃ)। বাংলাদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রায় চারি শত

বৎসর পরে এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যের মধ্যে শান্তিসূচক সন্ধি স্থাপিত হইল।

কিন্তু শীঘ্রই কোচবিহার রাজ্যে একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটিল। রাজা নরনারায়ণ বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করেন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেবকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু নরনারায়ণের এক পুত্র হওয়ায় রঘুদেব রাজ্যলাভে নিরাশ হইয়া পূর্বদিকে মানস নদীর অপর পারে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রকে দমন করিতে না পারিয়া কোচরাজ তাঁহার সহিত আপসে মিটমাট করিলেন। স্থির হইল নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ সঙ্কোশ নদীর পশ্চিম ভূভাগে রাজত্ব করিবেন এবং উক্ত নদীর পূর্ব অংশে রঘুদেব রাজা হইবেন। এইরূপে কোচবিহার রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইল। পূর্বদিকের রাজ্য সাধারণত প্রাচীন কামরূপ নামেই পরিচিত হইত। এই বিভাগের ফলে কোচবিহার রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িল এবং ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অনেক কমিয়া গেল। আর এই দুই রাজ্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে উভয়েই মুঘলের পদানত হইল।

১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ কোচবিহারের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বীরত্ব ও অন্যান্য রাজোচিত গুণ তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। ওদিকে রঘুদেবও স্বাধীন রাজার ন্যায় নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ স্বয়ং রঘুদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে ভরসা না পাইয়া রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিতকে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিলেন। রঘুদেব কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করিলে পরীক্ষিত লক্ষ্মীনারায়ণের আশ্রয় লাভ করিল। লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত মুঘলরাজের সখ্যতার কথা স্মরণ করিয়া রঘুদেব মুঘলশত্রু ঈশাখাঁর সহিত বন্ধুত্ব করিলেন এবং কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বাহিরবন্দ পরগণা জয় করিতে মনস্থ করিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ নিরুপায় হইয়া এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন (১৫৯৬ খ্রীঃ)। রঘুদেব বাহিরবন্দ অধিকার করিয়া কোচবিহার আক্রমণ করিলেন। এই সময় মানসিংহ বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ সাহায্য প্রার্থনা করিলে মানসিংহ সৈন্য পাঠাইলেন। রঘুদেব পরাজিত হইয়া কামরূপে ফিরিয়া গেলেন। বাহিরবন্দ পুনরায় কোচবিহার রাজ্যের অধীন হইল। এই যুদ্ধের বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে (১৩৪-৫ পৃঃ)।

ইসলাম খাঁ মুঘলসুবাদাররূপে বাংলাদেশে আসিয়া কিরূপে বিদ্রোহী হিন্দু জমিদার ও পাঠান নায়কগণকে পরাজিত করিয়া মুঘল-শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে (১৩৯-৪৫ পৃঃ)। কোচবিহার ও কামরূপের পরস্পর বিবাদের সুযোগে এই উভয় রাজ্যই মুঘলের পদানত হইল। কামরূপের রাজা রঘুদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পরীক্ষিতনারায়ণ রাজা হইলেন। তিনিও পিতার ন্যায় কোচবিহারের অধীনস্থ বাহিরবন্দ পরগণা অধিকার করিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া গুরুতররূপে পরাজিত হইলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ আহোম রাজার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিফল-মনোরথ হইয়া ইসলাম খাঁর শরণাপন্ন হইলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ সম্পূর্ণরূপে মুঘলের দাসত্ব স্বীকার করিলে ইসলাম খাঁ তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ অনেক ইতস্তত করিয়া অবশেষে মুঘলের দাসত্ব স্বীকার করিলেন। পরীক্ষিত মুঘল সাম্রাজ্যের সামন্ত সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথের পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়াছিলেন। সুতরাং রঘুনাথও লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ইসলাম খাঁর দরবারে উপস্থিত হইলেন। মুঘল সম্রাটকে করদানে সম্মত হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ মুঘলের দাসত্ব স্বীকার করিলেন। এইরূপে স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যের অবসান হইল।

অতঃপর লক্ষ্মীনারায়ণের প্ররোচনায় ইসলাম খাঁ কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণও পশ্চিমদিক হইতে কামরূপ আক্রমণ করিলেন। পরীক্ষিত সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। (১৬১৩ খ্রীঃ)।

লক্ষ্মীনারায়ণ আশা করিয়াছিলেন যে পরাজিত রাজ্যের এক অংশ তিনি পাইবেন। যুদ্ধ শেষ হইবার পরে কামরূপ রাজ্যের শাসনভার তাঁহাকে দেওয়ায় এই আশা বদ্ধমূল হইল ; কিন্তু অকস্মাৎ ইসলাম খাঁর মৃত্যু হওয়ায় (১৬১৩ খ্রীঃ) সম্পূর্ণ অবস্থা-বিপর্যয় ঘটিল। লক্ষ্মীনারায়ণ নূতন সুবাদার কাশিম খাঁর সঙ্গে ঢাকায় সাক্ষাৎ করিলে তিনি প্রথমে তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন কিন্তু পরিশেষে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। এই সংবাদে কোচবিহার রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, কিন্তু মুঘল সৈন্য সহজেই ইহা দমন করিল। অতঃপর লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র কোচবিহারের রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের বন্দীদশার সংবাদ ঠিক জানা যায় না। সম্ভবত এক বৎসর তাঁহাকে ঢাকায়

রাখিয়া সম্রাটের দরবারে পাঠানো হয়। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশিম খানের পরিবর্তে ইব্রাহিম খান নূতন সুবাদার হইয়া বাংলায় আসেন। তাঁহার অনুরোধে সম্রাট জাহাঙ্গীর লক্ষ্মীনারায়ণকে মুক্তি দেন (১৬১৭ খ্রীঃ)। কিন্তু কোচবিহারে রাজত্ব করা তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। লক্ষ্মীনারায়ণ বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলে বাংলার সুবাদার তাঁহাকে কামরূপের মুঘল শাসনের সাহায্যার্থে তথায় প্রেরণ করেন। তিনি প্রায় দশ বৎসর কামরূপে অবস্থান করেন এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয় (১৬২৭ খ্রীঃ)। পুত্র বীরনারায়ণ তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কোচবিহারের রাজকার্য চালাইতে থাকেন এবং পিতার মৃত্যুর পর নিজ নামে রাজ্য শাসন করেন। তিনি মুঘলদরবারে রীতিমত কর পাঠাইতেন।

সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া বীরনারায়ণের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র প্রাণনারায়ণ রাজা হন এবং ৩৩ বৎসর রাজত্ব করেন (১৬৩৩-৬৫ খ্রীঃ)। প্রাণনারায়ণ রাজভক্ত সামন্তের ন্যায় আহোমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘলসৈন্যের সাহায্য করেন। কিন্তু ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের অসুখের সংবাদ পাইয়া যখন বাংলার সুবাদার শুজা দিল্লীর সিংহাসনের জন্য ভ্রাতা ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন তখন সুযোগ বুঝিয়া প্রাণনারায়ণ ঘোড়াঘাট অঞ্চল লুঠ করিলেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া মুঘল সম্রাটকে কর দেওয়া বন্ধ করিলেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া প্রাণ-নারায়ণ কামরূপ আক্রমণ করিলেন এবং মুঘল ফৌজদারের সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া হাজো পর্যন্ত অধিকার করিলেন। কিন্তু আহোমরাজ কোচবিহারের এই জয়লাভে ভীত হইয়া কোচবিহার রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। গৌহাটির মুঘল ফৌজদার দুই দিক হইতে আক্রমণে ভীত হইয়া ঢাকায় পলায়ন করিলেন। আহোমসৈন্য বিনা আয়াসে গৌহাটি অধিকার করিল। অতঃপর কামরূপের অধিকার লইয়া কোচবিহার ও আহোম রাজের মধ্যে যুদ্ধ হইল। প্রাণনারায়ণ মুঘলসৈন্য তাড়াইয়া ধুবড়ী অধিকার করিলেন। কিন্তু পরিণামে আহোমদেরই জয় হইল এবং কোচবিহাররাজ কামরূপের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ঔরংজেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই মীরজুমলাকে বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত করিলেন এবং বাংলার বিদ্রোহী জমিদারদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিবার নির্দেশ দিলেন। প্রাণনারায়ণ ভীত হইলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মীরজুমলার নিকট দূত পাঠাইলেন। মীরজুমলা দূতকে বন্দী করিলেন এবং কোচবিহারের

বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন। অবশেষে স্বয়ং সসৈন্যে কোচবিহার শহরের নিকট পেঁ ছিলেন। প্রাণনারায়ণ রাজধানী ত্যাগ করিয়া ভুটানে পলায়ন করিলেন। কোচবিহার মীরজুমলার হস্তগত হইল (১৯শে ডিসেম্বর, ১৬৬১)। মীরজুমলা কোচবিহার মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন এবং ইহার শাসনের জন্য ফৌজদার, দিওয়ান প্রভৃতি নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তিনি আসাম অভিযানে যাত্রা করিবার পরেই কোচবিহারে জমির রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা করার ফলে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বর্ষাগমে মীরজুমলার সৈন্য আসামে বিষম দুরবস্থায় পড়িল এবং কোচবিহারে মুঘলসৈন্য আসার কোন সম্ভাবনা রহিল না। এই সুযোগে রাজা প্রাণনারায়ণ ফিরিয়া আসিলেন। মুঘল সৈন্য কোচবিহার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং প্রাণনারায়ণ পুনরায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন (মে, ১৬৬২)।

ইহার অনতিকাল পরেই মীরজুমলার মৃত্যু হইল (১৬ মার্চ, ১৬৬৩) এবং পর বৎসর শায়েস্তা খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। তিনি রাজমহল পর্যন্ত আসিয়াই রাজধানী যাইবার পথে কোচবিহার জয় করিতে মনস্থ করিলেন। প্রাণনারায়ণের স্বাস্থ্য তখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; রাজ্যের অভ্যন্তরেও নানা গোলযোগ। সুতরাং তিনি মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে দূত পাঠাইলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ মুঘল সুবাদারকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। শায়েস্তা খান ইহাতে রাজী হইলেন (১৬৬৫ খ্রীঃ) এবং কোচবিহারের সীমান্ত হইতে মুঘল সৈন্য ফিরাইয়া আনিলেন। ইহার কয়েক মাস পরেই রাজা প্রাণনারায়ণের মৃত্যু হইল (১৬৬৬ খ্রীঃ)।

প্রাণনারায়ণের মৃত্যুর পর হইতেই কোচবিহারের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। তাঁহার পুত্র মোদনারায়ণ ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন (১৬৬৬-৮০ খ্রীঃ), কিন্তু প্রাণনারায়ণের খুল্লতাত নাজীর মহীনারায়ণ এবং তাঁহার পুত্রেরাই প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। ইহার ফলে রাজ্যে নানা গোলযোগের সৃষ্টি হইল। পরবর্তী রাজা বসুদেবনারায়ণ মাত্র দুই বৎসর রাজত্ব করেন (১৬৮০-৮২ খ্রীঃ)। অতঃপর প্রাণনারায়ণের প্রপৌত্র মহীন্দ্রনারায়ণ (১৬৮২-৯৩ খ্রীঃ) পাঁচ বৎসর বয়সে রাজা হইলেন কিন্তু নাজীর মহীনারায়ণের দুই পুত্র জগৎনারায়ণ ও যজ্ঞনারায়ণই রাজ্য চালাইতেন। তাঁহাদের অত্যাচারে রাজ্যে নানাবিধ

অশান্তির সৃষ্টি হইল। এমন কি চাকলার ভারপ্রাপ্ত বহু কর্মচারী স্বাধীন রাজার ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মুঘলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই সুযোগে মুঘল সুবাদার পুনরায় কোচবিহার রাজ্য হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। ১৬৮৫, ১৬৮৭ ও ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনটি সামরিক অভিযানের ফলে কোচবিহারের কতক অংশ মুঘলদের হস্তগত হইল।

অবশেষে কোচবিহাররাজ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যজ্ঞনারায়ণ সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন এবং ভুটিয়ারাও তাঁহাকে সাহায্য করিল। দুই বৎসর (১৬৯১-৯৩) যাবৎ যুদ্ধ চলিল। অনেক পরগণার বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীরা মুঘল সুবাদারকে কর দিয়া জমির মালিকানা-স্বত্ব লাভ করিল। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে কোচবিহার রাজ্যের অনেক অংশ মুঘলের অধিকারে আসিল।

রাজা মহীন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর (১৬৯৩ খ্রীঃ) কিছুদিন পর্যন্ত গোলমাল চলিল। পরে তাঁহার পুত্র রূপনারায়ণ রাজত্ব করেন (১৭০৪-১৪ খ্রীঃ)। তিনিও কিছুদিন যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ এই তিনটি প্রধান চাকলাও মুঘলেরা দখল করিল। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি হইল। রূপনারায়ণ বর্তমান কোচবিহার রাজ্য পাইলেন এবং স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ নিজ নামে মুদ্রা প্রচলনের অধিকারও বজায় রহিল। কিন্তু তিনি উল্লিখিত তিনটি চাকলার উপর শুধুমাত্র নামে বাদশাহের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া উহা নিজের অধীনে রাখার জন্য মুঘল বাদশাহকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নিজের নামে কর দেওয়া অপমান-জনক মনে করায় ছত্রনাজীর কুমার শান্তনারায়ণের নামে ইজারাদার হিসাবে কর দেওয়া হইবে এইরূপ স্থির হইল।

এই সন্ধি স্থাপনের পরে বাংলার নবাবের সহিত রূপনারায়ণের মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছিল এবং তিনি মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে উকিল পাঠাইয়াছিলেন।

রূপনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন (১৭১৪-৬৩ খ্রীঃ)। তাঁহার দত্তক পুত্র বিদ্রোহী হইয়া রংপুরের ফৌজদারের সাহায্যে কোচবিহার রাজ্য দখল করেন। উপেন্দ্র-নারায়ণ ভুটানের রাজার সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া মুঘল সৈন্য পরাস্ত করেন এবং পুনরায় সিংহাসন অধিকার করেন (১৭৩৭-৩৮ খ্রীঃ)। মুঘলের সহিত কোচবিহারের ইহাই শেষ যুদ্ধ। ভুটান-রাজের সাহায্য গ্রহণের ফলে রাজ্যে ভুটিয়াদের প্রভাব ও

মধ্যযুগে ত্রিপুরা রাজ্য

প্রতিপত্তি অনেক বাড়িল এবং পরবর্তীকালে ইহার ফলে নানারূপ অশান্তি ও উপদ্রবের সৃষ্টি হইয়াছিল।

৩। ত্রিপুরা

ত্রিপুরার রাজবংশ যে খুবই প্রাচীন এবং মধ্যযুগের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মধ্যযুগে এই রাজ্যের ও রাজবংশের একখানি ইতিহাস (বাংলা পদ্যে) রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় উক্ত হইয়াছে যে রাজা ধর্মমাণিক্যের আদেশে বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর নামক দুইজন প্রধান এবং চন্তাই (প্রধান পূজারী) দুর্লভেন্দ্র কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হয়। ধর্মমাণিক্য পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। তাঁহার পরবর্তী রাজাদের সময় পরবর্তী কালের ইতিহাস এই গ্রন্থে সংযোজিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ইহা পূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে। এই গ্রন্থের মূল সংস্করণ এখন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে যে রূপ ধারণ করে বর্তমানে তাহাই রাজমালা নামে পরিচিত।[১]

রাজমালায় বর্ণিত হইয়াছে যে চন্দ্রবংশীয় যযাতি স্বীয় পুত্র দ্রুহ্যকে কিরাত-দেশে রাজা করিয়া পাঠান এবং এই বংশে ত্রিপুর নামক রাজার জন্ম হয়। ইহার সময় হইতেই রাজ্যের নাম হয় ত্রিপুরা। ইনি দ্বাপরের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজমালার সম্পাদকের মতে সম্ভবত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন।

এই সমুদয় কাহিনীর যে কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই তাহা বলাই বাহুল্য। ত্রিপুরের পরবর্তী ৯৩ জন রাজার পরে ছেংথুম-ফা রাজার নাম পাওয়া যায়। রাজমালা অনুসারে ইনি গৌড়েশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং এই গৌড়েশ্বর যে মুসলমান নরপতি ছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং এই রাজার সময় হইতেই ত্রিপুরার ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

বাংলার মুসলমান সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ শাহ (১২১২-২৭ খ্রীঃ) পূর্ববঙ্গ ও কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নাসিরুদ্দীন মাহমুদের আক্রমণ সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া যান (৭ পৃঃ)। সম্ভবত ইহাই গৌড়াধিপের ত্রিপুরা আক্রমণ ও পরাজয়রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

১। ৪৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

ছেংথুম-ফার প্রপৌত্র ডাঙ্গর-ফার আঠারোটি পুত্র ছিল। সর্বকনিষ্ঠ রত্ন-ফা গৌড়ের রাজ দরবারে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং গৌড়েশ্বরের সৈন্যের সহায়ে ত্রিপুরার রাজসিংহাসন লাভ করেন। সম্ভবত সিকন্দর শাহ্ই এই গৌড়েশ্বর (১৫ পৃঃ)। রত্ন-ফা গৌড়েশ্বরকে একটি বহুমূল্য রত্ন উপহার দেন। গৌড়েশ্বর তাঁহাকে মাণিক্য উপাধি দেন। এতকাল ত্রিপুরার রাজগণ নামের শেষে 'ফা' উপাধি ব্যবহার করিতেন; স্থানীয় ভাষায় 'ফা'-র অর্থ পিতা। অতঃপর 'ফা'-র পরিবর্তে রাজাদের নামের শেষে মাণিক্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং রত্ন-ফা হইলেন রত্নমাণিক্য।

রত্নমাণিক্য সম্বন্ধে রাজমালায় বিস্তৃত বর্ণনা আছে। গৌড়েশ্বরের অনুমতিক্রমে তিনি দশ হাজার বাঙালীকে ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রত্নমাণিক্য যে বাংলাদেশীয় হিন্দুদের সংস্কৃতি ও সামাজিক আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে প্রথমে খুবই অজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু কিছু কাল পরে তাহার দিকে আকৃষ্ট হন—রাজমালায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং রত্নমাণিক্যের সময় হইতেই যে ত্রিপুরার সহিত বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং বাংলার হিন্দুসংস্কৃতি ও সভ্যতা ত্রিপুরায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। 'ফা'-র পরিবর্তে 'মাণিক্য' উপাধি ধারণও সম্ভবত ইহারই সূচক। রত্নমাণিক্য সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকের শেষে অথবা চতুর্দশ শতকের প্রথমে রাজত্ব করিতেন।

রত্নমাণিক্যের প্রপৌত্র রাজা ধর্মমাণিক্য। ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইহার তারিখই সঠিক জানা যায়, কারণ তাঁহার একখানি তাম্রশাসনে ১৩৮০ শক অর্থাৎ ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ আছে। "ত্রিপুর-বংশাবলী" অনুসারে ধর্মমাণিক্য ৮৪১ হইতে ৮৭২ ত্রিপুরাব্দ অর্থাৎ ১৪৩১ হইতে ১৪৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজমালায় ইহার পিতার নাম মহামাণিক্য, তাম্রশাসনেও তাহাই আছে। সুতরাং অন্তত এই সময় হইতে ত্রিপুরার প্রচলিত ঐতিহাসিক বিবরণ মোটামুটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ধর্মমাণিক্যই যে 'রাজমালা'-নামক ত্রিপুরার ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করান তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

রত্নমাণিক্য ও ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার মুসলমান সুলতানগণ ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া ইহার কতকাংশ অধিকার করেন এবং ধর্মমাণিক্য তাহার পুনরুদ্ধার করেন—এই প্রচলিত কাহিনী কতদূর সত্য বলা যায় না। তবে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২ খ্রীঃ) ময়মনসিংহ ও

প্রভৃতি তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন (২৫ পৃঃ), ফকরুদ্দীন মুবারক শাহ চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন (৩২ পৃঃ), শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৮ খ্রীঃ) সোণারগাঁও ও কামরূপের কতক অংশ জয় করিয়াছিলেন (৩৫ পৃঃ), ত্রিপুরার কতক অংশ জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের (১৪১৮-৩৩ খ্রীঃ) রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল (৫৪ পৃঃ)—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে এবং ইহারা সম্ভবত ত্রিপুরা রাজ্যেরও কতক অংশ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত সুলতানের মৃত্যুর পর হইতে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের (১৪৫৫-৭৬ খ্রীঃ) রাজত্বের মধ্যবর্তী ২২ বৎসর কাল মধ্যে বাংলার সুলতানগণ খুব প্রভাবশালী ছিলেন না—আভ্যন্তরিক গোলযোগও ছিল (৫৫ পৃঃ)। সুতরাং এই সুযোগে ধর্মমাণিক্য সম্ভবত ত্রিপুরার বিজিতাংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ধর্মমাণিক্যের মৃত্যুর পরে সৈন্যগণ খুব প্রবল হইয়া উঠে এবং যখন যাহাকে ইচ্ছা করে তাহাকেই সিংহাসনে বসায়। রাজা ধন্যমাণিক্য ইহাদের দমন করেন এবং চয়চাগ নামক ব্যক্তিকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি ত্রিপুরার পূর্বদিকস্থিত কুকিদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের পার্বত্য বাসভূমি ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিলন। হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) বাংলা দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়া পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি আক্রমণ করেন। আসাম ও উড়িষ্যায় বিফল হইয়া তিনি ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। ইহার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে (৮২-৮৪ পৃষ্ঠা)।

ধন্যমাণিক্যের পরে উল্লেখযোগ্য রাজা বিজয়মাণিক্য আকবরের সমসাময়িক ছিলেন এবং আইন-ই-আকবরীতে স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি একদল পাঠান অশ্বারোহী সৈন্য গঠন করেন এবং শ্রীহট্ট, জয়ন্তিয়া ও খাসিয়ার রাজাদিগকে পরাজিত করেন। কররাণী রাজগণের সঙ্গে তাঁহার সংঘর্ষের কাহিনী এবং সোণার গাঁ ও পদ্মানদী পর্যন্ত অভিযানের কাহিনী সমসাময়িক মুদ্রার প্রমাণে সমর্থিত হইয়াছে।

পরবর্তী প্রসিদ্ধ রাজা উদয়মাণিক্য রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার রাজ-জামাতাকে হত্যা করিয়া ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি রাজধানী রাঙ্গামাটিয়ার নাম পরিবর্তন করিয়া নিজের নামানুসারে উদয়পুর এই নামকরণ করিলেন। কথিত আছে যে মুঘল সৈন্য চট্টগ্রাম অধিকার করিতে অগ্রসর হইলে তিনি মুঘল সৈন্যের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হন।

উদয়মাণিক্যের পুত্র জয়মাণিক্যকে বধ করিয়া বিজয়মাণিক্যের ভ্রাতা অমরমাণিক্য ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এইরূপে ত্রিপুরার পুরাতন রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি একদিকে আরাকানরাজ ও অন্যদিকে বাংলার মুসলমান সুবাদারের আক্রমণ হইতে ত্রিপুরারাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং শ্রীহট্ট জয় করিয়াছিলেন।

অমরমাণিক্যের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের জন্য ঘোরতর বিরোধ হয়। এই সুযোগে আরাকানরাজ ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিলেন। মনের দুঃখে অমরমাণিক্য বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার পৌত্র যশোধরমাণিক্যের সময়ে বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খান ত্রিপুরা-রাজ্য আক্রমণ করেন (১৬১৮ খ্রীঃ)। এই সময়ে মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর আরাকানরাজকে পরাস্ত করিবার জন্য ইব্রাহিম খানকে আদেশ করেন। সম্ভবত আরাকান অভিযানের সুবিধার জন্যই ইব্রাহিম প্রথমে ত্রিপুরা জয়ের সংকল্প করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি বিপুল আয়োজন করেন। উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম হইতে দুইদল সৈন্য স্থলপথে এবং রণতরীগুলি গোমতী নদী দিয়া রাজধানী উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হইল। ত্রিপুরারাজ বীরবিক্রমে বহু যুদ্ধ করিয়াও মুঘলসৈন্য বা রণতরীর অগ্রগতি রোধ করিতে পারিলেন না এবং মুঘলেরা উদয়পুর অধিকার করিল। রাজা আরাকানে পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু মুঘলসৈন্য তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাঁহাকে সপরিবারে ও বহু ধনরত্নসহ বন্দী করিল। বিজয়ী মুঘল সেনাপতি কিছু সৈন্য উদয়পুরে রাখিয়া বহু হস্তী ও ধনরত্নসহ বন্দী রাজাকে লইয়া সুবাদারের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ত্রিপুরাবাসিগণ অতঃপর কল্যাণমাণিক্যকে রাজপদে বরণ করেন। তাঁহার সহিত প্রাচীন রাজবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা তাহা সঠিক জানা যায় না। তাঁহার সময়েও সম্ভবত বাংলার সুবাদার শাহ্ ‌শুজা ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন। কল্যাণের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করিলে কনিষ্ঠ পুত্র নক্ষত্ররায় বাংলার সুবাদারের সাহায্যে সিংহাসনলাভের জন্য চেষ্টা করেন। গোবিন্দ ভ্রাতৃ-বিরোধের অবশ্যম্ভাবী অশুভ ফলের কথা চিন্তা করিয়া স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করেন এবং নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' উপন্যাস ও 'বিসর্জন' নাটক রচনা করেন।

ছত্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর গোবিন্দমাণিক্য পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার পৌত্র রত্নমাণিক্য (২য়) অল্পবয়সে সিংহাসনে আরোহণ করায় রাজ্যে অনেক গোলযোগ ও অত্যাচার হয়। তিনি শ্রীহট্ট আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার শাস্তিস্বরূপ বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করেন (১৬৮২ খ্রীঃ)। রাজমালায় বর্ণিত হইয়াছে যে রাজা রত্নমাণিক্যের পিতৃব্য-পুত্র নরেন্দ্রমাণিক্য শায়েস্তা খানকে ত্রিপুরাযুদ্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তাহার পুরস্কারস্বরূপ শায়েস্তা খান তাঁহাকে ত্রিপুরার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রত্নমাণিক্য ও তাঁহার তিন পুত্রকে বন্দী করিয়া সঙ্গে লইয়া যান। কিন্তু তিন বৎসর পরে শায়েস্তা খান নরেন্দ্রমাণিক্যকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পুনরায় রত্নমাণিক্যকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। রত্নমাণিক্য প্রায় ২৯ বৎসর রাজত্ব করার পর তাঁহার ভ্রাতা মহেন্দ্রমাণিক্য তাঁহাকে বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহেন্দ্রমাণিক্যের পর তাঁহার ভ্রাতা ধর্মমাণিক্য (২য়) সিংহাসন অধিকার করেন।

ধর্মমাণিক্যের রাজ্যকালে ছত্রমাণিক্যের বংশধর (প্রপৌত্র?) জগৎরায় (মতান্তরে জগৎরাম) রাজ্যলাভের জন্য ঢাকার নায়েব নাজিম মীর হবীবের শরণাপন্ন হইলেন। হবীব প্রকাণ্ড একদল সৈন্য লইয়া ত্রিপুরা আক্রমণ করিলেন এবং জগৎরায়ের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া সহসা রাজধানী উদয়পুরের নিকট পৌঁছিলেন। রাজা ধর্মমাণিক্য যুদ্ধে প্রথমে কিছু সাফল্য লাভ করিলেও অবশেষে পরাজিত হইয়া পর্বতে পলায়ন করিলেন (আঃ ১৭৩৫ খ্রীঃ)।

কেবলমাত্র পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত ত্রিপুরা রাজ্যের অবশিষ্ট সমস্ত অংশই মুসলমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। জগৎরায় স্বাধীন পার্বত্য-ত্রিপুরারাজ্যের রাজা হইয়া জগৎমাণিক্য নামে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মুসলমান অধিকৃত ত্রিপুরার ২২টি পরগণা—চাকলা রোসনাবাদ—তাঁহাকে জমিদারিস্বরূপ দেওয়া হইল। ত্রিপুরারাজ্যের যে অংশ মুসলমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল তাহা বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জিলার চতুর্থাংশ, শ্রীহট্টের অর্ধাংশ, নোয়াখালির তৃতীয়াংশ এবং ঢাকা জিলার কিয়দংশ লইয়া গঠিত ছিল। তন্মধ্যে জিলা ত্রিপুরার ছয় আনা অংশমাত্র ত্রিপুরাপতিগণের জমিদারি।[১]

১। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত "ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত" ৪৫ পৃষ্ঠা।

এইরূপ রাজ্যলোভী জগৎরায়ের বিশ্বাসঘাতকতায় পাঁচশত বৎসরেরও অধিককাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়া ত্রিপুরা রাজ্য নামেমাত্র আংশিকভাবে স্বাধীন থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানের পদানত হইল।

ধর্মমাণিক্য বাংলার নবাব শুজাউদ্দীনকে সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিলে তিনি জগৎমাণিক্যকে বিতাড়িত করিয়া ধর্মমাণিক্যকে পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু মীর হবীবের অন্যান্য ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হইল না। বরং এই সময় হইতে একজন মুসলমান ফৌজদার সসৈন্যে ত্রিপুরায় বাস করিতেন।

অতঃপর ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাসে রাজসিংহাসন লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মুসলমান কর্তৃপক্ষের সহায়তায় চক্রান্ত করিয়া এক রাজাকে সরাইয়া অন্য রাজার প্রতিষ্ঠা ও কিছুকাল পরে অনুরূপ চক্রান্তের ফলে পূর্ব রাজার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি ঘটনা ছাড়া আর বিশেষ কিছু নাই।

৪। কোচবিহারের মুদ্রা[১]

কোচবিহারের প্রথম রাজা বিশ্বসিংহের মুদ্রার উল্লেখ থাকিলেও অদ্যাবধি তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই[২]। তাঁহার পুত্র নরনারায়ণের সময় হইতে কোচ রাজারা প্রায় নিয়মিতভাবেই মুদ্রা তৈয়ার করিয়াছেন। এই মুদ্রাগুলি রৌপ্য নির্মিত এবং মুসলমান স্থলতানদের তন্‌খা (টঙ্ক বা টাকা) মুদ্রার রীতিতে প্রায় ১৬৫ গ্রেণ ওজনে এবং গোলাকারে প্রস্তুত হইত। এগুলিতে কোন চিত্রণ (device) নাই; ইহাদের মুখ্য (obverse) ও গৌণ (reverse) উভয় দিকেই শুধু সংস্কৃত ভাষায় ও বাংলা অক্ষরে লেখন (legend) থাকে। মুখ্য দিকে রাজার বিরুদ (epithet) এবং গৌণ দিকে রাজার নাম ও শকাব্দে তারিখ লেখা হয়। এই ব্যবস্থা নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বের কিছু সময় পর্যন্ত বলবৎ ছিল। পরে তাঁহার দ্বারা শাসিত 'পশ্চিম' কোচরাজ্য মুঘল বাদশাহের 'মিত্ররাজ্যরূপে' পরিগণিত হয় এবং কোচ

১। খানচৌধুরী আমানতউল্লা সম্পাদিত 'কোচবিহারের ইতিহাস' (কোচ) ১ম খণ্ড (বিশেষত ২৭৯-২৯৬ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত রাজাদের রাজত্বকালের প্রথম ও শেষ তারিখগুলি এই পুস্তক হইতে লওয়া হইয়াছে।

২। দুর্গাদাস মজুমদার, রাজবংশাবলী (১৩ পত্র): "১৩ শকায় মহারাজ বিশ্বসিংহ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া আপন নামে ছিক্কা অরূপ করিয়াছেন।" কোচ-পৃঃ ২৮০ ও ২৮১ দ্রষ্টব্য।

রাজারা পূর্ণ টঙ্ক নির্মাণের অধিকারে বঞ্চিত ও শুধু অর্ধ টঙ্ক নির্মাণ করিতে বাধ্য হন। লক্ষ্মীনারায়ণের অর্ধ মুদ্রাগুলি তাঁহার পূর্ণ মুদ্রার ক্ষুদ্রতর সংস্করণ হইলেও তাঁহার পরবর্তী রাজাদের অর্ধটঙ্কগুলি বেশ একটু বিচিত্র ধরণের। পূর্ণ বৃহত্তর টঙ্কের ছাঁচ দিয়া এই সকল ক্ষুদ্রতর অর্ধ মুদ্রা মুদ্রিত হওয়ায় তাহাদের উভয় পার্শ্বের লেখনই আংশিকভাবে দৃষ্ট হয়, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজার নাম পড়া দুঃসাধ্য। যাহা হউক, কোচ রাজাদের নামের শেষাংশ 'নারায়ণ' হইতেই এই জনপ্রিয় মুদ্রাগুলির 'নারায়ণী মুদ্রা' নাম হইয়াছে।

নরনারায়ণের মুদ্রাগুলির লেখন বাংলা অক্ষরে লিখিত হইলেও আকৃতি ও প্রকৃতিতে সেগুলি হুসেন সাহী তন্‌খারই অনুরূপ। এগুলির মুখ্য দিকে 'শ্রীশ্রীশিবচরণ কমলমধুকরস্য' ও গৌণদিকে 'শ্রীশ্রীমন্নরনারায়ণস্য' (বা 'নারায়ণ ভূপালস্য') 'শাকে ১৪৭৭', এই লেখন থাকে[১]। নরনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের মুদ্রার মুখ্য দিকে নরনারায়ণের মুদ্রার মতই লেখন থাকে এবং গৌণ দিকে থাকে 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণস্য শাকে ১৫০৯' বা '১৫৪৯'[২]। লক্ষ্মীনারায়ণের পরে তাঁহার পৌত্র প্রাণনারায়ণের অর্ধ ও পূর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; সেগুলির মুখ্য দিকে নরনারায়ণের মুদ্রার মতই লেখন এবং 'শ্রীশ্রীমৎপ্রাণনারায়ণস্য শাকে ১৫৫৪', '১৫৫৫' বা '১৫৫৯' থাকে।[৩] বৃটিশ মিউজিয়ামের একটি মুদ্রাতে শকাব্দের পরিবর্তে কোচবিহারের 'রাজশকের' তারিখ হিসাবে 'শাকে ১৪০' (অর্থাৎ ১৬৪৯) লেখা দেখা যায়।[৪] বলা বাহুল্য, প্রাণনারায়ণ যখন মুঘল বাদশাহের আনুগত্য ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার পূর্ণ মুদ্রাগুলি প্রচারিত হয়। প্রাণনারায়ণ পুত্র মোদনারায়ণের ১৭৯ (?) রাজশকের তারিখযুক্ত অর্ধটঙ্ক পাওয়া গিয়াছে।[৫] তাঁহার পর খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মহীন্দ্রনারায়ণ ব্যতীত অন্য সকল রাজারই তারিখহীন ও অসম্পূর্ণ লেখন যুক্ত মামুলি অর্ধটঙ্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১। কোচ-পৃঃ ২৮২ ও চিত্র।

২। কোচ-পৃঃ ২৮৩—৮৪ ও চিত্র।

৩। কোচ-পৃঃ ২৮৬ ও চিত্র।

৪। কোচ-পৃঃ ২৮৬, মুদ্রা সংখ্যা ১০।

৫। আমানতউল্লা ১৭৯ রাজশকের (অর্থাৎ ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের) তারিখযুক্ত অর্ধটঙ্কের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তারিখটি নিশ্চয়ই ঠিক নয়, কারণ ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্ব শেষ হয়। কোচ-পৃঃ ২৮৮।

অপর পক্ষে পূর্ব কোচরাজ্যে রঘুদেবও পূর্ণ টঙ্ক নির্মাণ করেন; তাহা নরনারায়ণের মুদ্রার অনুরূপ হইলেও তাহার মুখ্য দিকের লেখনে শুধু শিবের পরিবর্তে হর-গৌরী'র প্রতি শ্রদ্ধা জানান হইয়াছে। ইহাতে লেখা আছে: (মুখ্যদিকে) 'শ্রীশ্রীহরগৌরীচরণ-কমলমধুকরস্য' (গৌণদিকে) 'শ্রীশ্রীরঘুদেবনারায়ণ-ভূপালস্য শাকে ১৫১০'।[১] রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিৎনারায়ণের মুদ্রার লেখনও অনুরূপ: মুখ্যদিকে 'শ্রীশ্রীহরগৌরী-চরণ-কমল-মধুকরস্য' ও গৌণদিকে 'শ্রীশ্রীপরীক্ষিতনারায়ণ-ভূপালস্য শাকে ১৫২৫"।[২] পূর্ব কোচ রাজ্যের কোন অর্ধ টঙ্ক পাওয়া যায় নাই।

৫। ত্রিপুরারাজ্যের মুদ্রা

ত্রিপুরার 'রাজমালার' (৩-পৃঃ ॥০) ১৪৫ সংখ্যক রাজা রত্ন-ফা প্রথম 'মাণিক্য' উপাধি গ্রহণ করেন এবং শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনের লেখা অনুযায়ী ত্রিপুরারাজদের মধ্যে তিনিই প্রথম ১২৮৬ শকাব্দে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন (রাজ ২—পৃঃ ২/০)। রত্নের পরবর্তী যে সমুদয় রাজা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ত্রিপুরায় রাজত্ব করেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ পনের জনের মুদ্রা আবিষ্কারের কথা জানা যায়[৩]। প্রধানতঃ রাজ্যাভিষেকের সময় (ও অধিকন্তু কখন কখন পরবর্তী কোন সময়ে)

১। কোচ-পৃঃ ২৮৪র সম্মুখের চিত্র, ৪ সংখ্যক মুদ্রা। Botham's *Cal. Prov, Coin Cabinet, Assam*, p. 528. pl. III. 4.

২। কোচ-পৃঃ ২৮৪র সম্মুখের চিত্র, ৫ সংখ্যক মুদ্রা। Botham, ibid., P. ii, Pl. III. 6.

৩। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন কর্তৃক তিন লহরে বা খণ্ডে সম্পাদিত 'শ্রীরাজমালা' এই প্রবন্ধে 'রাজ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহার ১ম, ২য় ও ৩য় লহরকে যথাক্রমে বেষ্টনী মধ্যে ১, ২, ও ৩ সংখ্যা দ্বারা সূচিত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি ত্রিপুরার মুদ্রা বিষয়ে প্রধান অবলম্বন। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতেও ত্রিপুরার মুদ্রার আলোচনা আছে।

(a) Marsden's *Numismata Orientalia Illustrata*, p.793, Plate LII; (b) R. D. Banerji, *An. Rep., Arch. Surv. Ind.*, 1913-14, pp. 249-253 and Plate; (c) N. K. Bhattasali, *Numismatic Supplement*, *XXXVII*, pp, 47-53 (d) E. A, Gait, *Rep. Progr. of Hist, Res. in Assam*, p. 4; (e) Md. Reza-ur-Rahim, *Jour. Pakistan Hist. Soc.* Vol. IV, pp. 103-115; (f) শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বর্মণ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯শে পৌষ, ১৩৫৪ সাল।

ত্রিপুরারাজরা তাঁহাদের 'সাধারণ মুদ্রা' এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 'রাজ্য-জয়ের' ও তীর্থস্নানের (বা তীর্থদর্শনের) 'স্মারক মুদ্রা' উৎকীর্ণ করিতেন।

ত্রিপুরার মুদ্রাগুলি প্রধানতঃ রৌপ্য নির্মিত ও গোলাকার। এগুলি বাংলার সুলতানদের 'তন্‌খা' (টঙ্ক বা টাকা) মুদ্রার রীতিতে প্রায় ১৬৫ গ্রেণ ওজনে তৈয়ারী হইত। কল্যাণ—, গোবিন্দ—, ইন্দ্র—, ও কৃষ্ণ-মাণিক্যের কয়েকটি এক-চতুর্থাংশ ও গোবিন্দমাণিক্যের একটি এক-অষ্টমাংশ টঙ্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এছাড়া মাত্র বিজয়—, গোবিন্দ—, ও কৃষ্ণ-মাণিক্যের কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ আছে। ত্রিপুরার তাম্রমুদ্রা মিলে নাই; বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় ত্রিপুরা-রাজ্যেও কড়ি দিয়া ছোটখাট কেনাবেচার কাজ চলিত (রাজ ৩—পৃঃ ২২৮)।

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাক্‌-মধ্যযুগীয় মুদ্রাগুলির মধ্যে ত্রিপুরা-মুদ্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িককালে একমাত্র ত্রিপুরার মুদ্রাতেই চিত্রণ (device) আছে এবং ভারতীয় মুদ্রাগুলির মধ্যে শুধু এগুলিতেই রাজার নামের সহিত প্রায় নিয়মিত ভাবেই রাজমহিষীর নামও দেখা যায়। ত্রিপুরা মুদ্রার মুখ্যদিকে (obverse) যে লেখন (legend) থাকে, তাহা সংস্কৃত ভাষায় ও বাংলা অক্ষরে লিখিত। এই লেখনের প্রথমাংশে রাজার বিরূদ (epithet) এবং দ্বিতীয়াংশে রাজা ও রাণীর নাম থাকে; যথা—'ত্রিপুরেন্দ্র শ্রীশ্রীধন্যমাণিক্য-শ্রীকমলাদেব্যৌ'। গৌণদিকে (reverse) 'পৃষ্ঠে ত্রিশূলযুক্ত সিংহমূর্তি' ও শকাব্দে তারিখ থাকে। ক্ষুদ্র মুদ্রায় মাণিক্য-উপাধিবিহীন রাজার নাম এবং চিত্রণ (ও কখন কখন তারিখ) থাকে।

ত্রিপুরা-সিংহের পরিবর্তে যশোধর মাণিক্যের মুদ্রার গৌণদিকে 'ত্রিপুরা-সিংহের উপর নারীযুগল পরিবেষ্টিত কৃষ্ণমূর্তি' আছে। বিজয়মাণিক্যের এক প্রকার মুদ্রায় দশভুজা দুর্গা ও চতুর্ভুজ শিবের অর্ধাংশ দিয়া গড়া এক বিচিত্র অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দেখা যায়; এই অভূতপূর্ব মূর্তিটির পঞ্চভুজ দুর্গাংশ সিংহের উপর ও দ্বিভুজ শিবাংশ বৃষের উপর অধিষ্ঠিত।[১]

ঐতিহাসিক তথ্যহিসাবে ত্রিপুরা-মুদ্রাগুলি বিশেষ মূল্যবান। অনেক সময় এই মুদ্রাগুলি রাজাদের কাল নির্ণয়ে সাহায্য করে। ইহা ছাড়াও রাজমালায় বর্ণিত কতকগুলি বিশেষ ঘটনার কথা ত্রিপুরারাজদের 'স্মারক মুদ্রা' আবিষ্কারের ফলে সমর্থিত হইয়াছে। রাজমালায় ধন্যমাণিক্যকর্তৃক '১৪৩৫ শকে' 'চাটিগ্রাম বিজয়ের'

১। বর্তমান লেখকই সর্বপ্রথম এই অর্ধনারীশ্বর মূর্তির পরিচয় দেন।

(রাজ ২—পৃঃ ১২৬) ও অমরমাণিক্য কর্তৃক 'শ্রীহট্ট জয়ের' (রাজ ৩—পৃঃ ১৪) এবং উভয় ঘটনার 'স্মারক মুদ্রা' নির্মাণের কথা আছে; যথাক্রমে ১৪৩৫ ও ১৫০৩ শকাব্দের তারিখযুক্ত উভয় প্রকারের স্মারক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[১]। প্রথমটিতে লেখা আছে "চাটিগ্রাম-বিজয়ি-শ্রীশ্রীধন্যমাণিক্য-শ্রীকমলাদেব্যৌ" এবং দ্বিতীয়টিতে লেখা আছে "শ্রীহট্টবিজয়ি-শ্রীশ্রীযুতামরমাণিক্য-শ্রীঅমরাবতী দেব্যৌ"। রাজমালায় বিজয়মাণিক্য কর্তৃক সুবর্ণগ্রাম জয়ের পর ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ ধ্বজঘাটে স্নানের ও ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী লক্ষ্যায় স্নানের যে দুই প্রকার স্মারক মুদ্রা প্রস্তুতের কথা আছে (রাজ ২—পৃঃ ৫৫), তাহাও পাওয়া গিয়াছে[২]। ১৪৭৬ শকে মুদ্রিত একটিতে লেখা আছে "ধ্বজঘাটজয়ি-শ্রীশ্রীবিজয়মাণিক্যদেব—শ্রীসরস্বতী-মহাদেব্যৌ" এবং ১৪ [৮] ২ শকাব্দের তারিখযুক্ত অন্য মুদ্রাটিতে লেখা আছে "লাক্ষাস্নায়ি-শ্রীশ্রীত্রিপুরমহেশ-বিজয়মাণিক্যদেব-শ্রীলক্ষ্মীবালাদেব্যৌ"। শেষোক্ত মুদ্রাটির গৌণ দিকেই উপরিলিখিত বিচিত্র অর্ধনারীশ্বরের মূর্তিটি আছে। এই প্রসঙ্গে বিজয়মাণিকের আর দুইটি সাধারণ মুদ্রার পাঠ আলোচনা করা যাইতে পারে। ১৪৫১ শকে মুদ্রিত একটিতে আছে "শ্রীশ্রীবিজয়মাণিক্য-শ্রীলক্ষ্মী-মহাদেব্যৌ" ও ১৪৭৯ শকাব্দে মুদ্রিত অপরটিতে আছে "প্রতিসিন্ধুসি(সী)ম-শ্রীশ্রীবিজয়মাণিক্যদেব-লক্ষ্মীবালাদেব্যৌ"। প্রকারান্তরে বিজয়মাণিক্য কর্তৃক মহিষী লক্ষ্মীকে নির্বাসন দেওয়া ও পরে আবার তাঁহাকে গ্রহণ করার যে কাহিনী রাজমালায় (২—পৃঃ ৪৩) আছে তাহা মহাদেবী লক্ষ্মীর নামের সহিত মুদ্রিত বিজয়ের ১৪৫১ শকের, সরস্বতীর নামযুক্ত ১৪৭৬ শকের ও লক্ষ্মীর নামাঙ্কিত ১৪৭৯ শকের মুদ্রাগুলি সমর্থন করিতেছে। দেখা যায়, ১৪৭৬ শকাব্দের পূর্বে কোন সময় লক্ষ্মীকে বনবাস দিয়া সরস্বতীকে রাণী করা হয় এবং ১৪৭৯ অব্দের পূর্বে কোন সময় লক্ষ্মীকে পুনরায় গ্রহণ করা হয়। যাহা হউক, কাছাড়-রাজ ইন্দ্রপ্রতাপ নারায়ণের ১৫২৪ শকে মুদ্রিত 'শ্রীহট্ট বিজয়ের'[৩], এবং সুলতান হুসেন সাহের 'কামরূ, কামতা, জাজনগর ও ওড়িষা' জয়ের বিখ্যাত স্মারকমুদ্রাগুলি ছাড়া ত্রিপুরারাজদের মত স্মারক মুদ্রা প্রচারের আর বিশেষ সমসাময়িক নজির নাই।

১। রাজ (৩), পৃঃ ১৫৪, সম্মুখের চিত্র।

২। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯শে পৌষ, ১৩৫৪ সাল।

৩। বৃটিশ মিউজিয়ামের এই মুদ্রাটির ছাঁচ বর্তমান লেখক পাইয়াছেন; *Numismatic Chronicle*-এ ইহা প্রকাশিত হইবে।

কোচবিহারের মুদ্রা

	প্রস্তুত কাল	সম্মুখের দিকে	অপর পৃষ্ঠে
১।	১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ	শ্রীশ্রী মল্লর নারা য়ণ ভূপাল স্য শাকে ১৪৭৭	শ্রীশ্রী শিবচরণ কমল মধু করস্য
২।	১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ	শ্রীশ্রী মল্লর নারা য়ণস্য শাকে ১৪৭৭	শ্রীশ্রী শিবচরণ কমল মধু করস্য
৩।	১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ	শ্রীশ্রীম লক্ষ্মী নারায় ণস্য শাকে ১৫০৯	শ্রীশ্রী শিবচরণ কমল মধু করস্য
৪।	১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ	শ্রীশ্রীম লক্ষ্মী নারায় ণস্য শাকে ১৫০৯	শ্রীশ্রী শিবচরণ কমল মধু করস্য

	প্রস্তুত কাল	সম্মুখের দিক	অপর পৃষ্ঠে
৫।	প্রস্তুত কাল ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ	শ্রীশ্রীম লক্ষ্মী নারায় ণস্য শাকে ১৫০৯	শ্রীশ্রী শিবচরণ কমল মধু করস্য
৬।	প্রস্তুত কাল ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ	শ্রীশ্রীম লক্ষ্মী নারায় ণস্য শাকে ১৫০৯	শ্রীশ্রী শিবচরণ কমল মধু করস্য
৭।	প্রস্তুত কাল ১৬৩২ খৃষ্টাব্দ	শ্রী.শ্রীম ৎ প্রাণ নারায় ণস্য শাকে	শিবচরণ কমল মধু করস্য

চিত্র—ক

১

২

৩

৪

বাংলা দেশের ইতিহাস—কোচবিহারের মুদ্রা

চিত্র—খ

৫

৬

৭

ত্রিপুরার মুদ্রা

চিত্র-পরিচিতি—গ

		মুখ্য দিক	গৌণ দিক
১।	প্রথম রত্নমাণিক্য—	লেখন : "পার্বতীপ-/ রমেশ্বরচ-/রণপরৌ/১২৮৯"	শ্রীলক্ষ্মী-/মহাদেবী/ শ্রীশ্রী-রত্ন-/মাণিক্যো।
২।	ধন্যমাণিক্য—	লেখন : "ত্রিপুরেন্দ্র/শ্রীশ্রী-ধন্য-মাণিক্য-শ্রীক-/মলাদেব্যৌ"।	ত্রিপুরাসিংহ। "শক। ১৪১২"।
৩।	—ঐ—	লেখন : "চাটিগ্রাম [বি-]/ জয়ি শ্রীশ্রীধ-/ন্যমাণিক্য-শ্রী/কমলাদেব্যৌ"।	ত্রিপুরাসিংহ। "শক ১৪৩৫"।
৪।	প্রথম বিজয়মাণিক্য—	লেখন : "ধ্বজঘট[জ-]/য়ি শ্রীশ্রীবিজ-/য়মাণিক্য-দে-/ব-শ্রীসরস্ব-/তী মহাদেব্যৌ"।	ত্রিপুরাসিংহ। "শক ১৪৭৬"।
৫।	—ঐ—	লেখন : প্রতিসিন্ধুসি-/ম-শ্রীশ্রীবিজয়-/মাণিক্যদেব-ল-/ক্ষ্মীরাণীদেব্যৌ"।	ত্রিপুরাসিংহ। "শক ১৪৭৯"।
৬।	—ঐ—	লেখন : "লাক্ষাস্নায়ি-শ্রীশ্রী-ত্রিপুরম-হেশ-বিজয়-মা-ণি-/ক্যদেব শ্রীলক্ষ্মী-/রাণী দেব্যৌ"।	বৃষবাহন চতুর্ভুজ শিব ও সিংহবাহিণী দশভুজা দুর্গার অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। "শক ১৪[৮]২"।
৭।	অনন্তমাণিক্য—	লেখন : "শ্রীশ্রীযুতান-/ন্ত-মাণিক্যদে-/ব-শ্রীরত্না-ব-/তীমহাদেব্যৌ"।	ত্রিপুরাসিংহ। "শক ১৪৮৯"।
৮।	উদয়মাণিক্য—	লেখন : "শ্রীশ্রীযুতোদ-/য়-মাণিক্য-/দেব শ্রীহিরা-/মহাদেব্যৌ"।	ত্রিপুরাসিংহ। "শক ১৪৮৯"।
৯।	অমরমাণিক্য—	লেখন : "শ্রীহট্টবিজয়ী/শ্রী শ্রীযুতামর/মাণিক্যদেব-অ/মরাবতীদেব্যৌ"।	ত্রিপুরাসিংহ। "শক ১৫০৩"।

চিত্র-পরিচিতি—খ

	মুখ্য দিক	গৌণ দিক
১। জয়মাণিক্য—	লেখন : "শ্রীশ্রীযুত/জয়মা-ণি/কাদেবঃ	ত্রিপুরাসিংহ। "শক ১৪৯৫"।
২। রাজধরমাণিক্য—	লেখন : শ্রীশ্রীযুতরাজ-/ধরমাণিক্যদে-/ব-শ্রী সত্য ব-/তীমহাদেব্যৌ"।	ত্রিপুরাসিংহ। "শক ১৫০৮"।
৩। যশোমাণিক্য—	লেখন : "শ্রীশ্রীযুতযশো/মাণিক্যদেব/লক্ষ্মীগৌরী জ-/য়ামহাদেব্যঃ	ত্রিপুরাসিংহ ; উপরে নারী-যুগল পরিবৃত বংশীধারী কৃষ্ণ-মূর্তি। "শক ১৫২২"। (অস্পষ্ট)।
৪। নরনারায়ণ—	লেখন : "শ্রীশ্রী/শিবচরণ-/কমলমধু-/করস্য"	লেখন : "শ্রীশ্রী/মল্লর নারা-/য়ণ ভূপাল/স্য শাকে/১৪৭৭"।
৫। লক্ষ্মীনারায়ণ—	লেখন : "শ্রীশ্রী/শিবচরণ-/কমলমধু-/করস্য"	লেখন : "শ্রীশ্রী/লক্ষ্মীনারায়-/ণস্য শাকে ১৫০৯"।
৬। প্রাণনারায়ণ—	লেখন : "শ্রীশ্রী/শিবচরণ-/কমলমধু-/করস্য"	লেখন : "শ্রীশ্রী/প্রাণনারা-য়-/ণস্য শাকে/১৫৫৭ (?)"।
৭। —ঐ— (অর্ধ মুদ্রা)	লেখন : "শ্রীশ্রী/শিবচর-[ণ*]/কমলম[ধু*]/করস্য"	লেখন : শ্রীশ্রীম[ৎ*]প্রাণ-নারা[য়-*]/[ণ*]স্য শাকে/[...]

ত্রিপুরার মুদ্রা—গ

ত্রিপুরার মুদ্রা—ঘ

রত্নমাণিক্যের নামাঙ্কিত তিনটি তারিখবিহীন মুদ্রা শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত করিয়াছেন[১]। রাজমালার সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন প্রথমে (রাজ—১২ পৃঃ ১৯২ ও ১৯৬) ১২৮৮ শকের দুইটি এবং পরে (রাজ ২—পৃঃ ২) ১২৮৬, ১২৮৮ ও ১২৮৯ শকের ২০টি মুদ্রা আবিষ্কারের কথা বলিয়াছেন। রত্নের পরবর্তী পাঁচজন রাজার কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। পরবর্তী রাজা ধন্যমাণিক্যের বহুবিধ মুদ্রার উল্লেখ আছে[২]; ইহার তারিখবিহীন ও ১৪১২ শকের 'সাধারণ মুদ্রা', ছাড়াও ১৪৩৫ শকের 'চাটিগ্রাম-বিজয়ের' পূর্ব উল্লিখিত 'স্মারক মুদ্রা' আবিষ্কৃত হইয়াছে; তারিখবিহীন প্রথম মুদ্রাটি ছাড়া আর সব-গুলিতেই ধন্যের মহিষী কমলার নাম আছে। ধন্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজমাণিক্যের মুদ্রা না মিলিলেও কনিষ্ঠ পুত্র দেবমাণিক্য ও তাঁহার রাণী পদ্মাবতীর নামাঙ্কিত ১৪৪৮ শকের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[৩]। দেবমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়ের ১৪৫১ ও ১৪৮২ শকাব্দের মধ্যে মুদ্রিত যে বিচিত্র সব মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বিজয়ের পুত্র অনন্তের ১৪৮৭ শকের যে মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে মহিষী রত্নাবতীর নাম আছে[৪]। অনন্তমাণিক্যের শ্বশুর সেনাপতি গোপীপ্রসাদ তাঁহাকে হত্যা করিয়া ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন ও 'উদয়মাণিক্য' নাম লইয়া পত্নী হীরার সহিত ১৪৮৯ শকাব্দে যে মুদ্রা নির্মাণ করেন, তাহা পাওয়া গিয়াছে[৫]। উদয়ের পুত্র প্রথম জয়মাণিক্যকে হত্যা করিয়া অমরমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন ও মুদ্রা প্রচার করান; তাঁহার ও মহিষী অমরাবতীর নামাঙ্কিত ১৪৯৯ শকের[৬]; 'সাধারণ' ও ১৫০৩ শকের পূর্বোল্লিখিত শ্রীহট্টবিজয়ের 'স্মারক' মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অমরমাণিক্যের আত্মহত্যার পর তাঁহার পুত্র প্রথম রাজধরমাণিক্য ত্রিপুরা-সিংহাসনে আরোহণ করেন; তাঁহার ও মহিষী সত্যবতীর নামে মুদ্রিত ১৫০৮ শকের মুদ্রা আবিষ্কৃত

১। *An. Rep., Arch. Surv. Ind.* 1913-14, p. 249 f.

২। রাজমালায় (২-পৃঃ ২/০) ধন্যের ১৭টি ১৪১২ শকের, ১টি ১৪১৯ শকের, ১টি ১৪২৮ শকের ও ২টি অঙ্কবিহীন মুদ্রার উল্লেখ আছে।

৩। রাজমালায় প্রথম ও চতুর্থ প্রকারের মুদ্রার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে (২-পৃঃ ২ ও চিত্র)।

৪। *J.P. H.S*, IV, pp. 109 ff.

৫। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯শে পৌষ, ১৩৫৩ সাল।

৬। ঐ।

হইয়াছে[১]। রাজধর-পুত্র যশোমাণিক্য কোথাও ১৫১৩ শকে (রাজ ৩-পৃঃ ২৩৫) আবার কোথাও ১৫২৪ শকে (রাজ ৩-পৃঃ ২৩৬) রাজা হন বলিয়া বলা হইয়াছে, যদিও তাঁহার ১৫২২ শকের দুই প্রকার অভিষেককালীন মুদ্রার প্রমাণ হইতে জানা যায় যে তিনি ১৫২২ অব্দে সিংহাসনে বসেন। এ-গুলির একটিতে লেখা আছে "শ্রীশ্রীযশোমাণিক্যদেব-শ্রীলক্ষ্মীগৌরীমহাদেব্যৌ"[২] এবং অপরটিতে লেখা আছে "শ্রীযশোমাণিক্যদেব-শ্রীলক্ষ্মীগৌরী-জয়া-মহাদেবীঃ" (রাজ ৩-পৃঃ ২৩৫-২৩৬)। ইহা হইতে অনুমিত হইয়াছে যে যশোমাণিক্যের লক্ষ্মী ও জয়া নামে দুই মহিষী ছিলেন এবং তাঁহারা উভয়েই অভিষেককালে প্রায় সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন (রাজ ৩-পৃঃ ১৫৬ ও ২৩৫-৩৭)। যদি ইহা ঠিক হয়, তবে যশোমাণিক্যের মুদ্রার পূর্ববর্ণিত "নারীযুগলপরিবেষ্টিত কৃষ্ণমূর্তির" চিত্রণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যশোমাণিক্যের পর কল্যাণমাণিক্য রাজা হন; ১৫৪৮ শকে মুদ্রিত তাঁহার যে এক-চতুর্থাংশ টঙ্ক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন রাণীর নাম নাই।[৩] কল্যাণের পুত্র গোবিন্দের ১৫৮১ (১৫৮৯ ?) শকের এক-চতুর্থাংশ টঙ্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৪] গোবিন্দ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছত্রমাণিক্য কর্তৃক প্রথমে বিতাড়িত হন এবং ছত্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর আবার সিংহাসনে বসেন (রাজ ৩-পৃঃ ৩৪৭)। ছত্রমাণিক্যের ১৫৮২ শকের মুদ্রার উল্লেখ আছে[৫]।

গোবিন্দের পুত্র রামদেবমাণিক্যের কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। রামদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র 'কালিকাপদপদ্মমধুপ' দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের নামাঙ্কিত ১৬০৭ শকের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৬] রত্নের তৃতীয় ভ্রাতা 'শিবদুর্গাপদরজমধুপ' দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের ১৬৩৬ শকের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে[৭]। রাজা দ্বিতীয় ইন্দ্রমাণিক্যের ১৬৬৬ শকে মুদ্রিত একটি এক-চতুর্থাংশ টঙ্ক ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।[৮]

১। রাজ. ৩-পৃঃ ২৩৮এর সম্মুখের চিত্র। *Num. Suppl.* XXXVII, p. N.47, Fig. 1

২। Ibid., Fig. 2. রাজ (৩)-পৃঃ ২৩৭

৩। Ibid., p. 48N., Fig. 3.

৪। গোবিন্দমাণিক্যের ১৬০২ শকের উল্লেখ আছে (V. A. Smith—*Catalogue of Coins in the Indian Museum*, p 297)

৫। *Num. Suppl.* XXXVII p. N. 53

৬। Ibid., p. N. 48 Fig. 4

৭। Marsden, *Num. Ori.* p795, Pl. LII. MCCIX, and Gait's *Rep.*, p 4.

৮। *J.P.H.S.*, IV, pp. 109ff.

মুদ্রার সাহায্যে ত্রিপুরার রাজগণের যে রাজ্যকাল নিশ্চিতরূপে জানা যায় তাহার তালিকা।

রাজার নাম	মুদ্রায় লিখিত শকাব্দ	খ্রীষ্টাব্দ
প্রথম রত্নমাণিক্য	১২৮৬-৯	১৩৬৪-৭
ধন্যমাণিক্য	১৪১২-৩৬	১৪৯০-১৫১৪
দেবমাণিক্য	১৪৪৮	১৫২৬
বিজয়মাণিক্য	১৪৫১-৮২	১৫২৯-৬০
অনন্তমাণিক্য	১৪৮৭	১৫৬৫
উদয়মাণিক্য	১৪৮৯	১৫৬৭
অমরমাণিক্য	১৪৯৯-১৫০৩	১৫৭৭-৮১
রাজধরমাণিক্য	১৫০৮	১৫৮৬
যশোধরমাণিক্য	১৫২২	১৬০০
কল্যাণমাণিক্য	১৫৪৮	১৬২৬
গোবিন্দমাণিক্য	১৫৮১	১৬৫৯
	১৬০২	১৬৮০
ছত্রমাণিক্য	১৫৮২-৭	১৬৬০-৬৫
দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য	১৬০৭	১৬৮৫
দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য	১৬৩৬	১৭১৪
ইন্দ্রমাণিক্য	১৬৬৬	১৭৪৪

বাংলার সুলতান, শাসক ও নবাবদের কালানুক্রমিক তালিকা

(ক) মুসলিম অধিকারের প্রথম পর্বের সুলতান ও শাসকগণ

	নাম	শাসনকাল (খ্রীষ্টাব্দ)
(১)	ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী	১২০৪-১২০৬
(২)	ইজ্জুদ্দীন মুহম্মদ শিরান খিলজী[১]	১২০৬-১২০৮
(৩)	আলী মর্দান বা আলাউদ্দীন[১]	১২০৮-১২১২
(৪)	গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ শাহ[১]	১২১২-১২২৭
(৫)	নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ (ইলতুৎমিশের জ্যেষ্ঠ পুত্র)	১২২৭-১২২৯
(৬)	ইখতিয়ারুদ্দীন দৌলৎ শাহ-ই বলকা[১]	(আঃ) ১২২৯-(আঃ)১২৩১
(৭)	আলাউদ্দীন জানী	(আঃ) ১২৩১-(আঃ)১২৩৩
(৮)	সৈফুদ্দীন আইবক য়গানতৎ	(আঃ) ১২৩৩-১২৩৬
(৯)	আওর খান[১]	১২৩৬-(আঃ)১২৩৭
(১০)	ইজ্জুদ্দীন তুগরল তুগান খান	(আঃ) ১২৩৭-১২৪৫
(১১)	কমরুদ্দীন তমুর খান	১২৪৫-১২৪৭
(১২)	জলালুদ্দীন মসুদ জানী	১২৪৭-(আঃ)১২৫১
(১৩)	ইখতিয়ারুদ্দীন য়ুজবক তুগরল খান বা মুগীসুদ্দীন য়ুজবক শাহ[১]	(আঃ) ১২৫১-(আঃ)১২৫৭
(১৪)	জলালুদ্দীন মসুদ জানী (দ্বিতীয় বার)	১২৫৮
(১৫)	ইজ্জুদ্দীন বলবন য়ুজবকী[১]	(আঃ) ১২৫৯-১২৬০[২]
(১৬)	তাজুদ্দীন আর্সলান খান[১]	? - ১২৬৫[২]
(১৭)	তাতার খান[১] (তাজুদ্দীন আর্সলান খানের পুত্র)	১২৬৫ - ?[৩]
(১৮)	শের খান	? - (আঃ) ১২৬৯[৩]
(১৯)	আমিন খান	(আঃ) ১২৬৯-(আঃ) ১২৭৮
(২০)	তুগরল বা মুগীসুদ্দীন[১]	(আঃ) ১২৭৮-(আঃ)১২৮২

১ ইঁহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

২ ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কয়েক বৎসরের বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

৩ ইঁহাদের শাসনকাল ১২৬৫ ও ১২৬৯ খ্রীঃর মধ্যবর্তী, এ সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

(খ) বলবনী বংশের সুলতানগণ

নাম	শাসনকাল (খ্রীষ্টাব্দ)
(১) বুগরা খান বা নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ (গিয়াসুদ্দীন বলবনের পুত্র)	(আঃ) ১২৮২-(আঃ) ১২৯১
(২) রুকনুদ্দীন কাইকাউস	১২৯১-১৩০১

(গ) ফিরোজ শাহী বংশের সুলতানগণ

নাম	শাসনকাল (খ্রীষ্টাব্দ)
(১) শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ	১৩০১-১৩২১
(২) জলালুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ (ফিরোজ শাহের পুত্র)	১৩০৭ বা ১৩০৯[৪]
(৩) শিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহ (ঐ)	১৩১৭-১৩১৮[৪]
(৪) গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ (ঐ)	১৩১০-১৩২২[৪]
	১৩২২-১৩২৩[৫]
	১৩২৫-১৩২৮[৬]
(৫) নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ (ঐ)	১৩২৪-১৩২৬[৬]

(ঘ) মুহম্মদ তোগলকের অধীনস্থ শাসকগণ

নাম	শাসনকাল (খ্রীষ্টাব্দ)
(১) তাতার খান বা বহ্‌রাম খান (সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা)	১৩২৫-১৩৩৮
(২) কদর খান (লখনৌতির শাসনকর্তা)	১৩২৫-১৩৩৮
(৩) ইজ্জুদ্দীন য়াহয়া (সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা)	১৩২৫-?

৪ সম্ভবত পিতার অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে এই সমস্ত বৎসরে ইঁহারা মুদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৫ এই সময়টুকু ইনি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ছিলেন।

৬ এই সময়ে ইঁহারা দিল্লীর সুলতানের অধীনস্থ শাসনকর্তা ছিলেন।

(ঙ) মুবারক শাহী বংশের সুলতানগণ ও আলী শাহ

নাম	শাসনকাল (খ্রীষ্টাব্দ)
(১) ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ[৭]	১৩৩৮–১৩৪৯
(২) ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ[৭] (মুবারক শাহের পুত্র)	১৩৪৯–১৩৫২
(৩) আলাউদ্দীন আলী শাহ[৮]	১৩৪১–১৩৪২

(চ) ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানগণ

(১) শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ	১৩৪২–১৩৫৮
(২) সিকন্দর শাহ (ইলিয়াস শাহের পুত্র)	১৩৫৮–(আঃ) ১৩৯০
(৩) গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ (সিকন্দর শাহের পুত্র)	(আঃ) ১৩৯০–১৪১০
(৪) সৈফুদ্দীন হমজা শাহ (আজম শাহের পুত্র)	১৪১০–১৪১২

(ছ) বায়াজিদ শাহী বংশের সুলতানগণ

(১) শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ	১৪১২–১৪১৪
(২) আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (বায়াজিদ শাহের পুত্র)	১৪১৪

(জ) রাজা গণেশ ও তাঁহার বংশের সুলতানগণ

(১) রাজা গণেশ বা দনুজমর্দনদেব	১৪১৫
	১৪১৭–১৪১৮
(২) জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ (রাজা গণেশের পুত্র)	১৪১৫–১৪১৬
	১৪১৮–১৪৩৩
(৩) মহেন্দ্রদেব (রাজা গণেশের পুত্র)	১৪১৮

---

৭ সোনারগাঁওয়ের সুলতান।

৮ লখনৌতির সুলতান।

নাম	শাসনকাল (খ্রীষ্টাব্দ)
(৪) শামসুদ্দীন আহমদ শাহ (মুহম্মদ শাহের পুত্র)	১৪৩৩-(আঃ) ১৪৩৬

(ঝ) মাহ্‌মুদ শাহী বংশের সুলতানগণ

নাম	শাসনকাল (খ্রীষ্টাব্দ)
(১) নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ	(আঃ) ১৪৩৬-১৪৫৯
(২) রুকনুদ্দীন বারবক শাহ (মাহ্‌মুদ শাহের পুত্র)	১৪৫৫-১৪৭৬[৯]
(৩) শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ (বারবক শাহের পুত্র)	১৪৭৪-১৪৮০
(৪) সিকন্দর শাহ (য়ুসুফ শাহের পুত্র ?)	১৪৮০-১৪৮১ (?)
(৫) জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহ (মাহ্‌মুদ শাহের পুত্র)	১৪৮১-১৪৮৭

(ঞ) সুলতান শাহজাদা ও হাবশী সুলতানগণ

নাম	শাসনকাল (খ্রীষ্টাব্দ)
(১) বারবক বা সুলতান শাহজাদা	১৪৮৭
(২) সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ (হাবশী)	১৪৮৭-১৪৯০
(৩) দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ (হাবশী) (ফিরোজ শাহের পুত্র)	১৪৯০-১৪৯১
(৪) শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ (হাবশী)	১৪৯১-১৪৯৩

(ট) হোসেন শাহী বংশের সুলতানগণ

নাম	শাসনকাল (খ্রীষ্টাব্দ)
(১) আলাউদ্দীন হোসেন শাহ	১৪৯৩-১৫১৯
(২) নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ (হোসেন শাহের পুত্র)	১৫১৯-১৫৩২[১০]

---

৯ রুকনুদ্দীন বারবক শাহ ১৪৫৫-১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতা নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের সঙ্গে এবং ১৪৭৪-১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন।

১০ নসরৎ শাহ ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কয়েক বৎসর হোসেন শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

নাম	শাসনকাল (খ্রীষ্টাব্দ)
(৩) দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (নসরৎ শাহের পুত্র)	১৫৩২-১৫৩৩
(৪) গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ (হোসেন শাহের পুত্র)	১৫৩৩-১৫৩৮[১১]

(ঠ) হুমায়ুন, শের শাহ ও তাঁহাদের অধীনস্থ শাসকগণ

নাম	শাসনকাল
(১) হুমায়ুন	১৫৩৮-১৫৩৯[১২]
(২) জাহাঙ্গীর কুলী বেগ (হুমায়ুনের অধীনস্থ শাসনকর্তা)	১৫৩৯
(৩) শের শাহ	১৫৩৯-১৫৪০[১২]
(৪) খিজ্‌র্ খান (শের শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা)	১৫৪০-১৫৪১
(৫ কাজী ফজীলৎ (বা ফজীহৎ) (শের শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা)	১৫৪১-?
(৬; মুহম্মদ খান[১৩] (শের শাহ ও ইসলাম শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা)	?-১৫৫৩

) মুহম্মদ শাহী বংশের সুলতানগণ ও তাঁহাদের সমসাময়িক অন্যান্য শাসকগণ

নাম	শাসনকাল
(১) শামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ গাজী	১৫৫৩-১৫৫৫
(২) শাহবাজ খান (মুহম্মদ শাহ আদিলের অধীনস্থ শাসনকর্তা)	১৫৫৫-১৫৫৬
(৩) গিয়াসুদ্দীন বহাদুর শাহ (মুহম্মদ শাহ গাজীর পুত্র)	১৫৫৬-১৫৬০
(৪) দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন (মুহম্মদ শাহ গাজীর পুত্র)	১৫৬০-১৫৬৩

১১ মাহ্‌মুদ শাহ নসরৎ শাহের রাজত্বের শেষদিকে স্বনামে মুদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১২ হুমায়ুন ও শের শাহ যে সময়ে গৌড়ে ছিলেন, সেই সময়টুকু এখানে উল্লিখিত হইয়াছে।

১৩ ইনি ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া শামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ গাজী নাম লইয়া সুলতান হন।

নাম	শাসনকাল (খ্রীষ্টাব্দ)
(৫) অজ্ঞাতনামা (দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীনের পুত্র)	১৫৬৩
(৬) তৃতীয় গিয়াসুদ্দীন (পরিচয় অজ্ঞাত)	১৫৬৩-১৫৬৪

(ঢ) কররানী বংশের শাসকগণ

নাম	শাসনকাল
(১) তাজ খান কররানী	১৫৬৪-১৫৬৫
(২) সুলেমান কররানী (তাজ খান কররানীর ভ্রাতা)	১৫৬৫-১৫৭২
(৩) বায়াজিদ কররানী (সুলেমান কররানীর পুত্র)	১৫৭২-১৫৭৩
(৪) দাউদ কররানী (সুলেমান কররানীর পুত্র)	১৫৭৩-১৫৭৫[১৪]
	১৫৭৫-১৫৭৬

(ণ) মোগল সম্রাটদের অধীনস্থ শাসকগণ[১৫]

নাম	শাসনকাল
(১) খান-ই-খানান মুনিম খান	১৫৭৫[১৬]
(২) খান-ই-জহান হোসেন কুলী বেগ	১৫৭৬-১৫৭৮
(৩) ইসমাইল কুলী (অস্থায়ী)	১৫৭৮-১৫৭৯
(৪) মুজাফফর খান তুরবতী	১৫৭৯-১৫৮০[১৭]
(৫) খান-ই-আজম মীর্জা আজিজ কোকাহ্	১৫৮৩
(৬) ওয়াজীর খান (অস্থায়ী)	১৫৮৩
(৭) শাহবাজ খান	১৫৮৩-১৫৮৫
(৮) সাদিক খান	১৫৮৫-১৫৮৬
(৯) শাহবাজ খান (দ্বিতীয় বার)	১৫৮৬

---

১৪ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কয়েক মাস দাউদ কররানী মোগল বাহিনীর সহিত পরাজয়ের ফলে ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছিলেন।

১৫ এই সমস্ত শাসনকর্তাদের শাসনভার গ্রহণের সময় হইতে শাসনকাল গণনা করা হইয়াছে—নিয়োগের সময় হইতে নহে। দুইজন স্থায়ী শাসনকর্তার মাঝখানে যে সব অস্থায়ী শাসনকর্তা শাসনকার্য চালাইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম এই তালিকায় উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু স্থায়ী শাসনকর্তাদের সাময়িক অনুপস্থিতির সময়ে যাঁহারা শাসনকার্য নির্বাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হয় নাই।

১৬ দাউদ কররানীর দুই দফা শাসনের মাঝখানে কয়েক মাস।

১৭ ১৫৮০ হইতে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় তিন বৎসর বাংলাদেশ আকবরের ভ্রাতা মীর্জা হাকিমের সমর্থক বিদ্রোহী সেনাধ্যক্ষদের অধিকারে ছিল।

নাম	শাসনকাল (খ্রীষ্টাব্দ)
(১০) ওয়াজীর খান	১৫৮৬-১৫৮৭
(১১) সৈয়দ খান	১৫৮৭-১৫৯৪
(১২) রাজা মানসিংহ	১৫৯৪-১৬০৬
(১৩) কুৎবুদ্দীন খান কোকাহ্	১৬০৬-১৬০৭
(১৪) জাহাঙ্গীর কুলী বেগ	১৬০৭-১৬০৮
(১৫) ইসলাম খান চিস্তী	১৬০৮-১৬১৩
(১৬) শেখ হোসাঙ্গ (অস্থায়ী)	১৬১৩-১৬১৪
(১৭) কাশিম খান চিস্তী	১৬১৪-১৬১৭
(১৮) ফতেহ্-ই-জঙ্গ ইব্রাহিম খান	১৬১৭-১৬২৪
(১৯) দারাব খান[১৮]	১৬২৪-১৬২৫
(২০) মহাবৎ খান	১৬২৫-১৬২৬
(২১) মুকাররম খান চিস্তী	১৬২৬-১৬২৭
(২২) ফিদাই খান বা মীর্জা হেদায়েৎ-উল্লাহ্	১৬২৭-১৬২৮
(২৩) কাশিম খান জুয়িনী	১৬২৮-১৬৩২
(২৪) আজম খান মীর মুহম্মদ বাকর	১৬৩২-১৬৩৫
(২৫) ইসলাম খান মাশাদী	১৬৩৫-১৬৩৯
(২৬) সৈফ খান (অস্থায়ী)	১৬৩৯
(২৭) শাহজাদা মুহম্মদ শুজা	১৬৩৯-১৬৬০
(২৮) মীর জুমলা বা খান-ই-খানান মুআজ্জম খান	১৬৬০-১৬৬৩
(২৯) দিলীর খান (অস্থায়ী)	১৬৬৩
(৩০) দাউদ খান (অস্থায়ী)	১৬৬৩-১৬৬৪
(৩১) শায়েস্তা খান	১৬৬৪-১৬৭৮
(৩২) ফিদাই খান বা আজম খান কোকাহ্	১৬৭৮
(৩৩) শাহজাদা মুহম্মদ আজম	১৬৭৮-১৬৭৯
(৩৪) শায়েস্তা খান (দ্বিতীয় বার)	১৬৭৯-১৬৮৮

১৮ ১৬২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র শাহজাহান বাংলাদেশ অধিকার করিয়াছিলেন ; দারাব খান তাঁহারই অধীনস্থ বাংলায় শাসনকর্তা ছিলেন।

	নাম	শাসনকাল (খ্রীষ্টাব্দ)
(৩৫)	খান-ই-জহান বহাদুর	১৬৮৮-১৬৮৯
(৩৬)	ইব্রাহিম খান	১৬৮৯-১৬৯৭
(৩৭)	শাহজাদা আজিম-উদ্-দীন[১৯] (পরে আজিম-উস্-সান)	১৬৯৭-১৭১২
(৩৮)	শাহজাদা ফরখুণ্ডা সিয়র (শিশু)[২০]	১৭১৩
(৩৯)	মীর জুমলা বা মুজাফফর জঙ্গ[২০]	১৭১৩-১৭১৬

(ত) মুর্শিদাবাদের নবাবগণ

(১)	মুর্শিদ কুলী খান	১৭১৭-১৭২৭
(২)	শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান (মুর্শিদ কুলী খানের জামাতা)	১৭২৭-১৭৩৯
(৩)	সর্ফরাজ খান (শুজাউদ্দীনের পুত্র)	১৭৩৯-১৭৪০
(৪)	আলীবর্দী খান মহাবৎজঙ্গ	১৭৪০-১৭৫৬
(৫)	সিরাজ-উদ্-দৌলাহ্[২১] (আলীবর্দী খানের দৌহিত্র)	১৭৫৬-১৭৫৭
(৬)	মীর জাফর	১৭৫৭-১৭৬০
(৭)	মীর কাশিম (মীর জাফরের জামাতা)	১৭৬০-১৭৬৩
(৮)	মীর জাফর (দ্বিতীয় বার)	১৭৬৩-১৭৬৫

---

১৯ ইঁহার শাসনকালের শেষ ছয় বৎসর ইনি দিল্লীতেই থাকিতেন, যদিও নামে তিনি বরাবর বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। এই ছয় বৎসর ইঁহার সহকারীরা বাংলাদেশ শাসন করিয়াছিলেন।

২০ এই দুইজন কখনও বাংলাদেশে আসেন নাই। ইঁহাদের শাসনকালে বাংলায় প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন সহকারী শাসনকর্তা মুর্শিদ কুলী খান।

২১ ইঁহার নাম বাংলায়—সিরাজউদ্দৌলা, সিরাজউদ্দৌল্লা, সিরাজদ্দৌলা—প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে লেখা হয়।